প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৬৬
১৪ই এপ্রিল ১৯৫৯

সম্পাদনা : বিশ্বনাথ দে

প্রকাশক : নির্মলকুমার সাহা, সাহিত্যম্।
১৮ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী : গণেশ বসু

ব্লক ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ : ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী।
৬৮, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : মদনমোহন চৌধুরী। শ্রীদামোদর প্রেস।
৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট। কলিকাতা-৬

যথাসম্ভব, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা সংগ্রহ করে 'তারাশঙ্কর বীথিকা' সাজানো হলো। গল্পগুলি কোথায় কবে প্রকাশিত হয়েছিলো তা লেখার শেষে উল্লেখ করা আছে। গানগুলির মধ্যে অধিকাংশই তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস থেকে সংকলিত হয়েছে। স্মৃতিমূলক রচনাগুলি দু'তিনটি ব্যতীত সবই অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ছিলো। একমাত্র উপন্যাসের ক্ষেত্রেই কিছু ব্যতিক্রম ঘটলো। এই গ্রন্থে দেওয়ার মতো নতুন উপন্যাস তাঁর কিছু না থাকায় 'অভিযান' রচনাটি ছাপা হয়েছে।

—সম্পাদক

সূচীপত্র

মা,

প্রথম জীবনের সহপাঠী। এবং বন্ধু। শম্ভু আমাকে ভাইয়ের মত দেখতেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি। সেই কারণেই না-লিখে পারলাম না। শম্ভুর পরলোকে শান্তি প্রার্থনা করি এবং তোমাদের — তোমার এবং তোমার সন্তানদের মঙ্গল কামনা করি। তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে, ছেলেমেয়েদের পিঠে-হাত দিয়ে চলতে হবে — ভয় কি-আমি আছি। আশা করি তা তুমি ইতিমধ্যেই পেয়েছ।

ইতি
শুভার্থী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৪/৮/৬৮

উপন্যাস

অভিযান

উত্তর দক্ষিণে বরাবর চলে গিয়েছে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তা। দেশের লোক বলে পাকা সড়ক। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের খাতায় আছে—মেটাল্ড রোড। বরো ফুট চওড়া; লম্বায় মেন মেটাল্ড রোড থেকে "রামনগর রিভার ঘাট" পর্যন্ত টুয়েলভ মাইলস্—অর্থাৎ রামনগর নদীর ঘাট পর্যন্ত বারো মাইল লম্বা।

পাথরের নুড়ি বিছিয়ে তার উপর বালিবহুল লাল আঁঠালো কাঁকর-মাটি ফেলে বর্ষার সময় রোলার চালিয়ে জমানো হয়েছে। বারো ফুট চওড়া লাল ফিতের মত মাঠ ও গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে। অ্যাশফল্ট কি কংক্রিটের রাস্তার মত মসৃণ নয়, লাল কাঁকর-মাটির বিছানির সর্বাঙ্গে পাথরের নুড়িগুলোর মাথা বেরিয়ে আছে, সেই জন্যই খুব শক্ত। দেশের লোকে বলে বজ্র-কঠিন। বজ্র-কঠিনই বটে—আছাড় খেয়ে পড়লে সর্বাঙ্গে পাথরের নুড়ির মাপের কালশিটেতে ভরে যায়, মাথা কপাল ফাটে, দু-চার জায়গায় কেটেও যায়। পাথরের নুড়িগুলো গোলালো, দু-একটা তীক্ষ্ণ ধারালো হয়েও উঠে থাকে। উপর থেকে দেখে বেশ মসৃণ কোমল মনে হয়। লাল মাটির ধুলো কোমল ফাগের মত জমে থাকে। লালচে ধোঁয়ার মত ওড়ে। আজ উড়ে চলেছে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর মুখে।

নরসিংয়ের মোটরখানা চলছে। পুরনো মডেলের গাড়ি। হুডের কাঠামো নতুন, বডির রংও চকচকে। কিন্তু মাডগার্ডগুলো টোল খাওয়া—মধ্যে মধ্যে জং ধরে ছিদ্রও হয়ে গেছে। দরজার হ্যাণ্ডেলগুলোর রুপোলী কলাই উঠে গিয়ে পেতল বেরিয়ে পড়েছে। দরজাগুলো গাড়ির চলার বেগে বিচিত্র ভঙ্গিতে নড়ছে, এ কোণটা যখন নামছে, ও মাথাটা তখন উঠছে, তবে বেশী নয়, অল্প-স্বল্প। সামনের কাচের চারপাশের রবার লাইনিং খসখসে; শীতকালের রুক্ষ মানুষের গায়ের মত ফাট-ধরা, জায়গায় জায়গায় একটু-আধটু খসেও গিয়েছে। পুরনো গাড়ি। বয়স হয়েছে। কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দে একটু খুঁত নাই। একটানা ওঁ-ওঁ শব্দ করে চলেছে। আয়রন-চেস্টের মত শক্ত কলিজার মানুষের

মত কলিজা ওর—এই কথা নরসিং বলে রসিকতা করে। বছর দুয়েক আগে নরসিং একবার বুক দেখাতে গিয়ে ডাক্তারকে প্রশ্ন করেছিল—চেস্ট কেমন দেখলেন স্যার? ডাক্তার হেসে বলেছিলেন—আয়রন-চেস্টের মত শক্ত। প্রাণ-সম্পদ তোমার নিরাপদেই আছেন। কোন ভয় নেই। নরসিং সেই অবধি উপমাটি ব্যবহার করে তার গাড়ির ইঞ্জিন সম্পর্কে।

নরসিংয়ের গাড়িখানা শখের নয়, 'ট্যাক্সি-কার', নিয়মিত সময় ধরে ছাড়ে ইমামবাজার থেকে—জেলার সদর শহর। ছাড়ে ভোর ছটার সময়। সাত মাইল পাল্লা দেয় ছোট-লাইনের গাড়ির সঙ্গে। রেল-লাইন আর ডি বি রোড চলেছে পাশাপাশি। দস্তুর নরসিং। বড় বড় দাঁত বার করে রেল ইঞ্জিনের ড্রাইভারকে ভেঙচায়, কখনও ব্যঙ্গ হাসি হাসে আর রেল-লাইনের পাশের রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে যায়। ড্রাইভারও ভেঙচায়, হাসে। রাস্তায় তিনটে লেবেল-ক্রসিং আছে, প্রথমটা পড়ে ইমামবাজার পেরিয়েই, সেখানে রেল-কোম্পানীর ফটক নাই; নরসিং সেটা পার হয় প্রায় লাফ দিয়ে; সার্কাসের মোটরগাড়ির নালা পার হওয়ার কৌশলে রেল-ইঞ্জিনের দশ-পনেরো গজ সামনে দিয়ে পার হয়ে যায়। গ্রাম থেকে বেরিয়েই পড়ে একটা বাঁক, পার হয়েই নরসিং বাঁ পায়ে ক্লাচ চেপে গীয়ার বদলে আনে টপ-গীয়ারে। তারপর ক্লাচ ছেড়ে দিয়ে পা দিয়ে চাপে এ্যাক্সিলারেটারকে; সেটাকে একেবারে নিঃশেষে বসিয়ে দিয়ে দু-হাতের মুঠোয় স্টিয়ারিং শক্ত করে ধরে। পেট্রোলগন্ধী ধোঁয়ার রাশি বের হয়; গাড়িখানা গর্জন করে ওঠে। স্থানীয় প্যাসেঞ্জারেরা সাবধান হয়ে বসে, কিন্তু তারা ভয় পায় না; নরসিংয়ের এ কৌশল তাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে; গাঁইয়া কেউ থাকলে সে ভয় পায়, চীৎকার করে ওঠে। গাড়িখানাকে উল্কাবেগে ছুটতে দিয়ে—সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নরসিং হিংস্র বিরক্তিতে গর্জন করে ওঠে—এ্যাও! বলতে বলতে গাড়িখানা তখন ওপারে পেরিয়ে যায়। নরসিং ভীরু প্যাসেঞ্জারের কথা ভুলে যায়, সে গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে পিছনের দিকে ইঞ্জিন-ড্রাইভারের দিকে চেয়ে ব্যঙ্গ হাসি হাসে আর ডান হাত বাইরে প্রসারিত করে বুড়ো আঙুল নাড়ে।

ফটক যেখানে আছে, সেখানে আটকে পড়তে হয় নরসিংকে। সেখানে ইঞ্জিন-ড্রাইভার হাসতে হাসতে দাড়িতে হাত বুলোয়, মুখ বাড়িয়ে জোরে শিস দেয়—যেভাবে কুকুরের মালিক শিস দিয়ে ডাকে কুকুরকে। এমনি ভাবে পাল্লা দিয়ে সাত মাইল দূর পর্যন্ত চলে। সাত মাইল দূরে রেলওয়ে জংশন।

সেইখানেই শেষ হয়েছে ছোটলাইন। তার পর বাইশ মাইল পাল্লা বিশখানা মোটর-বাস আর ট্যাক্সি-কারের [illegible] মূল রেল-লাইন চলে গিয়েছে সোজা উত্তরমুখে। সদর শহরের মামলা-মকদ্দমা সরকারী কাজকে সে গ্রাহ্য করে নি; সে গিয়েছে বিপুল শস্য-সম্পদ-উৎপাদনকারিণী গাঙ্গেয় তটভূমি ধরে গঙ্গার পাশে-পাশে। সদর শহর রেল-জংশন থেকে বাইশ মাইল পশ্চিমে। অনুর্বর প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ। এই পথে নরসিংয়ের এবার পাল্লার কৌতুক—সর্বাগ্রে যাওয়ার কৌতুক। রাশি-রাশি ধূলো উড়িয়ে চলে সে। সেই ধূলোয় পিছনের গাড়ির যাত্রীদলের চুলের ডগা থেকে কাপড় জামা সমস্ত ধূসর হয়ে ওঠে; তারা নাকে কাপড় দেয়, কাশে।

সদর থেকে ফেরে আড়াইটার সময়। ইমামবাজারে পৌঁছায় বেলা পাঁচটায়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আর একটা ট্রিপ; ট্রিপ সদর পর্যন্ত নয়—রেলওয়ে জংশন পর্যন্ত। সেখানে সাড়ে আটটার ও ন'টার ট্রেন ধরিয়ে দেয় এবং ওই দুটো ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিয়ে ফিরে আসে। এ সময় প্রতিযোগিতা নাই। ছোটলাইনের ট্রেন যায়, কিন্তু সাড়ে আটটার ট্রেনখানা ধরায় না এবং সমস্ত রাত্রের মধ্যে আর ফেরেও না। রাত্রে ফেরবার সময় নরসিংয়ের গাড়ির মাডগার্ডে লোক চাপে; ফুটবোর্ডে লোক দাঁড়ায়, ভিতরে লোক চাপে খোঁয়াড়ের ভিতর গরু-ছাগলের মত অথবা পাখিওয়ালার খাঁচার 'বগেড়ি' পাখির মত। গাড়িখানা তখন চলে ধীর মন্থর গতিতে। রাস্তার দু-পাশে ঘন গাছের সারির মধ্যে হেড-লাইটের আলো ফেলে নরসিং ভাবতে থাকে সেই সব কথা, যা ভাববার অবকাশ আর সমস্ত দিনের মধ্যে হয় না।

কত মুখ মনে পড়ে, যে সব সুন্দর মুখ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে মোটর চালাবার সময় চকিতের মত চোখে পড়েছিল। সারিবন্দী চলমান লোকের মুখ যাওয়া-আসার পথে তার দ্রুত ধাবমান গাড়ির পাশ দিয়ে চলে যায় বায়স্কোপের ছবির মত। তার মধ্যে আশ্চর্যভাবে মনে থাকে একখানি কি দুখানি সুন্দর মুখ। রোজ নতুন একখানি দুখানি মুখ। আবার কতদিন আগে দেখা একখানি মুখ নিত্যই মনে পড়ে। সে রোজ ভাবে কাল আবার দেখবে তাকে। নরসিং জানে না—তার বিধাতা জানেন—কখনও কখনও তাদের একজনের সঙ্গে তার দেখাও হয়, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, নরসিং তাকে তখন সেই সুন্দর মুখ বলে চিনতে পারে না। হয়তো পাশ-থেকে-দেখা মুখ সামনে থেকে দেখে অন্য রকম মনে হয়। তা ছাড়া যে মুখখানা সে দেখতে

চায়, সে মুখ তো একজনের মুখ নয়। কত মুখ মিশে সে মুখ রচিত হয়েছে তার মনে। রোজই সে তিল তিল করে বদলায়। শুধু অবশ্য এই মুখই ভাবে না সে ; এই অলস রথ-চালনার সময় মাকে মনে পড়ে, বাপকে মনে পড়ে, গ্রাম মনে পড়ে। আবার কোনদিন মনে মনে হিসেব করে টাকা কড়ির ' পাশ বইয়ে কত আছে, নিজের কাছে কত আছে, সবসুদ্ধ জড়িয়ে কত হল, যোগ দিয়ে খতিয়ে দেখে ভাবে গাড়িখানা পাল্টে একখানা নতুন গাড়ি কেনার কথা, ট্যাক্সির বদলে বাস কেনার কথা, পেট্রোল-বিক্রির ব্যবসার কথা। কিন্তু সাত মাইল রাস্তায় যতই আস্তে চলুক মোটর, বিলাস করে ভাববার সময় কতটুকু ! দেখতে দেখতে ইমামবাজারের হাটের চৌ-মাথায় এসে পৌঁছে যায়। তার পর গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে স্নান করে। আট মাস দীঘির জলে, অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন চারটে মাস বাড়িতে, চার মাসের দু-মাস গরম জলে স্নান করে। তার পর আরাম করে আধ পাট পঁচিশ-ডিগ্রী পাকী মদ একটু করে পান করে, তার সঙ্গে গরম তেলে-ভাজা আর সিগারেটের বদলে গুড়গুড়িতে তামাক। সঙ্গে থাকে নিতাই ক্লীনার। রাম কণ্ডাকটার সে ছেলেমানুষ, তার উপর সে নরসিংয়েরই শালা। নরসিং রামকে মদের ভাগ দেয় না। ছেলেমানুষ—ভিতরটা এখনও কাঁচা নরমই আছে, পঁচিশ-ডিগ্রীর বড় ঝাঁঝ।

রবিবার দিন সদর শহরে যায় না গাড়ি। কোর্ট বন্ধ। সেদিন সকালে যায় ওই জংশন পর্যন্ত। ফেরে ন'টার মধ্যে। ফিরেই গাড়িখানা নিয়ে যায় বামুনপুকুরে। মজে এসেছে বামুনপুকুর, পাড় ক্ষয়ে গেছে, নরসিং সটান গাড়িখানাকে নিয়ে যায় পুকুরের জলের কিনারায়। তার পর তিন জনে ধুতে আরম্ভ করে গাড়িকে। ধুয়ে মুছে বাড়ি এসে—যন্ত্রের অস্থি-সন্ধিতে ভাল করে মুছে দেয় গ্রীজ, মোবিল, যেখানে যা প্রয়োজন।

নিজেরা চুল কাটে, দাড়ি কামায়, নখ কাটে, কাপড় পাঠায় ধোবার বাড়ি, জুতোতে কালি লাগায়। জুতো অবশ্য একা নরসিংয়েরই আছে। নিতাইয়ের জুতো নাই ; রামের আছে একজোড়া স্যাণ্ডেল। রবিবারে আছে সাবান মাখার পালা। সে সাবান মাখা এক ঘণ্টার পর্ব। দুপুরে সেদিন পড়ে তাসের বাজি, পাশার দান ; রাত্রে সেদিন মাংস রান্না হয়, বাজারে মাংস বড় পাওয়া যায় না, হাঁস কিনে আনে নিতাই ; হাঁসের মাংস রান্না হয়। পুরো বোতল আসে সেদিন। রাম সেদিন ভাঙ খায়। নরসিংয়ের আসরে সেদিন চলে তে-তাসের জুয়াখেলা। যারই হার হোক—ভাঙের নেশায় রাম অনর্গল হাসে।

নরসিং নেশায় এবং খেলায় মশগুল হয়ে থাকে। নিতাইটা বসে থাকে ভাম হয়ে, প্রকাণ্ড বড় মুখখানার মধ্যে অত্যন্ত ছোট ছুটো চোখ—সেও আধখানা বন্ধ হয়ে আসে। খেলা চলে। খেলতে আসে নরসিংয়ের বন্ধুরা—এখানকার স্টেশনের স্টলওয়ালা লোকটা দুর্দান্ত মাতাল, কয়লার ডিপোওয়ালা কালী সিং পশ্চিমা ছত্রী, সোনার গয়নার শান-পালিশওয়ালা লুত্‌ফর রহমন, থানার কনেস্টবল জোবেদ আলি, ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার রমেশ, বুড়ো-দোকানী শশী চৌধুরী, আরও মধ্যে মধ্যে আসে রেল-লাইনের ভারপ্রাপ্ত ফিটার—হরকিষণ। যে রবিরার হরকিষণ এ স্টেশনে আসে—থাকে—সেদিন তার আসা চাই-ই। সকলে মিলে সেদিন মদের জন্যে চাঁদা দেয়, রাত্রিতেই ছুটে যায় আরও কয়েকটা হাঁসের বা একটা খাসীর খোঁজে। ঠন-ঠান শব্দ করে টাকার দান পড়ে, লোকগুলি নিঃশব্দ; তাস উল্টানো হয়—যে দান পায় সে টাকা নেয়, বাকী টাকা নেয় যে তাস খেলেছে—সে। রাম হা হা শব্দে অনর্গল হাসে। সাধারণত নরসিং কিছু বলে না। এক-আধ দিন ক্ষেপে যায়। বেমক্কা মাটির উপর একটা চাপড় মেরে বলে ওঠে, এ বেতমিজ, বেসায়েস্ত, বেয়াদপ কাঁহাকা!

রাম চমকে ওঠে। নিতাইও ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠে সজাগ হয়ে বসে—কুকুরের মত জিজ্ঞাসা করে—এঁ্যা?

কালী সিং নরসিংকে শান্ত করে—মান যা ভাইয়া—যানে দো। আবার অনেক সময় বলতেও হয় না—রাম চমকে উঠে চুপ করতেই নরসিং চুপ করে খেলায় মজে যায়।

সোমবার ভোরেই আবার সপ্তাহের বাঁধা-কাজ শুরু হয়। রবিবারের কাচা ফরসা গেঞ্জি, হাত-কাটা খাকী হাফ-শার্ট পরে চোখে গগল-চমষা এঁটে গাড়ির চাবি খুলে সীটে বসে বলে—মার হ্যাণ্ডেল!

নিতাই হ্যাণ্ডেল ঘুরোয়। রাম ভালমানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে—গাড়ির দরজা ধরে। গাড়ি যখন ছুটতে থাকে—তখন নিতাই বসে মাডগার্ডে; রাম থাকে ফুটবোর্ডে খাড়া। দু-রকম হর্ন আছে গাড়িতে—রবারের বল দেওয়া হর্নটা বাজে ভোঁ ভোঁ শব্দে—আর একটা হর্ন বাজে অতর্কিত মানুষকে চমকে দিয়ে কঁ্যা—এঁ্যা। ইলেকট্রিক হর্ন আর বাজে না।

আজ কিন্তু মোটরখানা তার বাঁধা-রুটে চলছে না। সদর শহর থেকে

ইমামবাজার পর্যন্ত যে রাস্তা—সেই রাস্তাই হল ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের মেন মেটাল্ড রোড। ওটা গেছে সিধে পূর্বদিকে—এ জেলা থেকে অন্য জেলায়। পূর্ব পশ্চিমে ও রাস্তাটা আটচল্লিশ মাইল লম্বা। বাইশ মাইলে ইমামবাজার, এই ইমামবাজার থেকেই এই শাখা রাস্তাটি বেরিয়েছে—চলে গিয়েছে রামনগর নদীর ঘাট পর্যন্ত—দূরত্ব বারো মাইল। এ রাস্তাতেও একখানা মোটর-বাস চলে। ওই ছোটলাইনের রেল-কোম্পানী এ জেলার মোটর ব্যবসায়ের হর্তা-কর্তা 'বুধাবাবু'র সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এ মোটর-বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছে। এর জন্য ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের সঙ্গেও বিশেষ বন্দোবস্ত করেছে রেল কোম্পানী। তারা রাস্তা মেরামতের জন্য মোরাম আর পেব্‌ল্‌স্‌ অর্থাৎ কাঁকর-মাটি আর নুড়ি পাথর দেয়। নগদ টাকাও কিছু দেয়। বিনিময়ে এ রাস্তার ওই একখানি বাস ছাড়া অন্য বাস বা মোটর নিয়মিত সার্ভিস খুলবার ছাড়পত্র পায় না। তবে কেউ পুরো মোটর ভাড়া করে গেলে মোটর যেতে পারে—পুরো বাস ভাড়া করলে সেও যায়। মধ্যে মধ্যে নরসিংও যায় বর্ধিষ্ণু লোকেদের নিয়ে, তাদের মধ্যে প্রধান হল সা-আলমপুরের মিঞা সাহেবরা। কলকাতায় ছোট-লাটের দপ্তরে চাকরি করেন। একেবারে খাঁটি সাহেবী পোশাক। দরাজ দিল। তা ছাড়া আরও আছে। কিন্তু সে সব লোককে খাতির করে না নরসিং। বিয়ের ভাড়া নিয়েও যায় মধ্যে মধ্যে। বাসে যায় বরযাত্রী, 'কারস্তের' গৌরব নরসিংয়ের ট্যাক্সিতে যায় বর। কালে কস্মিনে আনতে যায় ডাক্তার। জটাধারী ডাক্তার বিচক্ষণ চিকিৎসক। কিন্তু সে থাকে তার গ্রামে—নদীর ধারে এক অজ পাড়াগাঁয়ে। দিনের বেলা হলে জটাধারী নিজের ঘোড়ায় আসে। রাত্রি হলে নরসিংয়ের ট্যাক্সি যায়। এ সব হল দাঁও।

আজ কিন্তু নরসিংয়ের ট্যাক্সি চলেছে খালি। খালি অর্থে নরসিং, রাম এবং নিতাই ছাড়া আর লোক নাই গাড়িতে। খালি রাস্তা, হু-হু করে চলেছে গাড়ি, এ্যাক্সিলারেটার চেপেই আছে পায়ে। পিছনে লাল ধুলোর আবর্তের মধ্যে পেট্রোলের ধোঁয়া নদীর গেরুয়া রঙের বন্যার জলের মধ্যে পাশের গ্রাম্য ঝরনার কালো জলের ধারার মত ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। দু-ধারে ধান-কাটা মাঠ। পথের পাশে বট-পাকুড়ের গাছ। মাঠের মধ্যে রাস্তা চলেছে সোজা। দু-তিন মাইল অন্তর এক-একখানা গ্রাম। গ্রামে ঢুকবার এবং বের হবার মুখে রাস্তা বিসর্পিল পাকে বাঁক নিতে বাধ্য হয়েছে। আকুলিয়া গ্রাম ফেলে এসেছে পিছনে। গ্রাম থেকে উত্তর মুখে নির্গমন পথে ঘন তেঁতুলভরা পুকুরটাকে বেড়

দিয়ে রাস্তায় যে বাঁকটা—সেটা পার হয়েই সোজা চলেছে গাড়ি। চুপচাপ বসে আছে নিতাই। পিছনে খুব আরাম করে লক্ষপতির মত ঢঙে হেলে বসে রাম বিড়ি খাচ্ছে। নরসিং একটা আক্রোশের উপর যেন গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

আক্রোশই বটে!

বুধাবাবুর চোখ-রাঙানি, পুলিস-সায়েবের ড্যাম-সোয়াইন গালি-গালাজ, দারোগা ইনসপেক্টারের হুমকি সবই এতদিন সহ্য হয়েছে। রাত্রে বাড়ি ফিরে হিসেব করে থলি ঝেড়ে সিকি আধুলি টাকা নোট গুনবার সময় দিনের ওই সব গ্লানি সে ভুলে যেত। কিন্তু কিছুদিন থেকে রেল-কোম্পানী প্রথম সাত মাইলে উঠে পড়ে লেগেছে—নরসিংকে ঘায়েল করতে। সাত মাইলের মধ্যে ছখানা শটল্ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে ওদিকে জংশন থেকে সদর পর্যন্ত বুধাবাবুর একচেটিয়া এলাকা। একেবারে ইমামবাজার থেকে সদর শহরের যাত্রী না গেলে জংশনে যাত্রী সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। ইমামবাজারের লোকরাও বেইমান। তারা এখন ওই শাটল্ ট্রেনের সুবিধা পেয়ে ওতেই ছুটেছে। বলে পয়সা দিয়ে কথাই বা শুনব কেন আর গরু-ছাগলের মত ঠাসা-ঠাসি করেই বা যাব কেন? এতেও সে চালিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। দমে নাই। কিন্তু হঠাৎ আজ চারদিন আগে এস-ডি-ও তাকে বললে—শূয়ার কি বাচ্চা! শুধু তাই নয়। আচমকা পিঠের উপর বসিয়ে দিলে হাতের লিকলিকে বেতখানা। একবার, দুবার, তিনবারের বার নরসিং খপ করে ধরে ফেলেছিল বেতখানা। বড় বড় চোখ দুটো ধক-ধক করে জ্বলে উঠেছিল—ছত্রী রাজপুতের ছেলে সে, পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত সন্-সন্ করে রক্ত চলতে আরম্ভ করেছিল, কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল আগুনের মত। বেতখানা চেপে ধরে সে বলেছিলো—মারবেন না স্যার!

ঘটনাটা ঘটেছিল এই।

সেদিন ইমামবাজারেই নরসিংয়ের ট্যাক্সি সদর পর্যন্ত পুরো ভাড়া হয়ে গিয়েছিল। একটা মামলার সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে যাচ্ছিল বাদী। গাড়ির পুরো ভাড়ায় নরসিং নিয়েছিল আট জনের ভাড়া। গাড়িতে প্যাসেঞ্জার নেওয়ার বিধি পাঁচ জন। নরসিং সাধারণত সকালের ট্রিপে নেয় সাতজন। তার পাশে দু'জন, পিছনের সীটে চার জন, তাদের পায়ের তলায় একজন। রাত্রের ট্রিপে তারও বেশী হয় অবশ্য। সদর শহরে ঢুকবার আগেই ভাড়া আদায় করে

নিয়ে প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দেয়। বুধাবাবুর বাস, ট্যাক্সিও তাই করে। যাক সেকথা। আট জনের ভাড়া পেয়ে নরসিংয়ের গাড়ি ছাড়ার তাড়া ছিল না। বাদীরও সাক্ষীদের ডেকে একত্র করতে অল্প দেরি হয়েছিল। গাড়ি যখন জংশনে পৌঁছুল, তখন বুধাবাবুর বাস, ট্যাক্সি সবই প্রায় ছেড়ে গিয়েছে। মাত্র একখানা বাস তখনও দাঁড়িয়ে ছিল—প্যাসেঞ্জার জোটে, সেখানা ছাড়বে, না হলে এখানেই থেকে যাবে। নরসিং জংশনে না দাঁড়িয়েই সটান বেরিয়ে গেল। জংশনের বাজার থেকে বের হয়েই দু-ধারে অনুর্বর প্রান্তর—তার মধ্য দিয়ে সেই রোড, মেটাল্ড রোডের ওপর সামনেই ধুলোর মেঘ মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। নরসিংয়ের কাছে এটা অসহ্য। প্রথমত—সকলের পিছনে যাওয়ার কথা ভাবতে গেলেই তার মেজাজ বিগড়ে যায়, দ্বিতীয়তঃ—ধুলো। দুটোই সে বরদাস্ত করতে পারে না। চৌদ্দ-পনেরো-খানা আকণ্ঠ-বোঝাই ঢাউস বাস সামনে—খান তিন-চার ট্যাক্সি আছে তার আগে। তার উপর ঠিক তার সামনে কয়েকখানা গরুর গাড়ি। গরুর গাড়ি অবশ্য একেবারে রাস্তার ধার ঘেঁষে চলে, রাস্তাটার মাঝখানটা পাকা, দু-ধার কাঁচা। একখানা গাড়ি কিন্তু মাঝখান দিয়ে চলছিল। গাড়োয়ানটা ছোকরা. গরু দুটোরও বয়স কাঁচা, চেহারাও বেশ তাজা। ছোকরা গরু দুটোকে ছুটিয়ে চীৎকার করেছিল—এই ছুটেছে আরবী ঘোড়া! পিছনের হর্ন শুনেও সে হুঁশ হল না—নিজেদের অর্থাৎ গরুর গাড়ির সারির সকলকে অতিক্রম করে আগে এসে তবে পাশ কাটিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল।

নরসিং পায়ের কাছ থেকে গোল কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা খানিকটা দড়ি তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবেই বলল—নিতাই! বলেই সে দড়ির কুণ্ডলীটা রামের হাতে দিলে। রাম অভ্যাস মত ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ছিল, নিতাই বসেছিল বাঁ-দিকের মাডগার্ডে। রাম দড়িটা এগিয়ে দিলে নিতাইয়ের হাতে। নিতাইকে কিন্তু কিছু বলতে হল না, চট করে দড়ির কুণ্ডলীটা খুলে নিয়েই ঘোরাতে আরম্ভ করলে দড়িটা। গরুর গাড়িখানার কাছ ঘেঁষে নরসিংয়ের ট্যাক্সি পার হবার সময় গতি ঈষৎ মন্থর হয়ে গেল; নিতাইয়ের হাতের দড়িটা পাক খেতে খেতে ঠিক সময়টিতে সোজা আছাড় খেয়ে পড়ল ছোকরা-গাড়োয়ানটার পিঠে। ডগায় গিঁট-দেওয়া মজবুত-পাকের সওয়া ইঞ্চি মোটা দড়ি; নিতাই প্রায় ছ-ফুট লম্বা জোয়ান; ছাতির মাপ ছত্রিশ ইঞ্চি, তার হাতের জোরে ওই দড়িটা সপ্ শব্দ করে পড়ল পিঠে। গাড়োয়ান ছোকরা চীৎকার করে উঠল—বাপ।

তার চেয়েও কিন্তু জোরে কঠিন আক্রোশভরা-কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল নরসিং—এ্যাও শূয়ার কি বাচ্চা !

বলতে বলতে ট্যাক্সি হু-হু করে বেরিয়ে গেল। এর পর সামনে বাস। পঞ্চাশ-ষাট গজ অন্তর চলেছে ; ওরা রাস্তা ছেড়ে দেবে না। পাশের ধূলো-ভরা কাঁচা অংশটার উপর দিয়ে পাশ-কাটিয়ে-যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে একবার ডান দিক একবার বাঁ দিক দেখে নিল সে। মাডগার্ডের ওপর থেকে নিতাই বললে—রাইট সাইড।

হাড়ির ছেলে নিতাই অনেক ইংরেজি কথা শিখেছে। তা ছাড়া গাড়ি চালানোর ব্যাপারে নিতাইয়ের বিচার-বুদ্ধি খুব পাকা। স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে নরসিং ডান পাশের কাঁচা দিকটায় নিয়ে এল গাড়ি। টপ্-গীয়ারে এনে চেপে ধরলে এক্সিলারেটার। ধূলোর রাশি ঠেলে উড়িয়ে গাড়ি বাস অতিক্রম করে চলল। চারখানা বাস অতিক্রম করে চলল। চারখানা বাস অতিক্রম করে কিন্তু আবার তাকে মাঝখানে আসতে হল, রাস্তা সংকীর্ণ হয়েছে এবং উঁচু বাঁধের মত চলেছে। দু-পাশের ঊষর প্রান্তর, শেয়াকুলের গুল্ম-সঙ্কুল বিস্তীর্ণ পতিত জমি। বালিতে মাটিতে জমে পাথরের মত শক্ত, বর্ষার সময় ছাড়া ঘাস পর্যন্ত গজায় না। প্রায় মাইল দেড়েক চলে গিয়েছে এ প্রান্তর। উপায় নাই। নরসিং দু-বার সামনের বাসের পিছনে খুব কাছে গিয়ে হর্ন দিলে। কিন্তু বুধাবাবুর বাস-ড্রাইভার তা গ্রাহ্যও করলে না। ফুট কয়েক যদি বাঁয়ে সরে যায়, তবে অনায়াসে নরসিং পার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে তারা দেবে না। উল্টে গাড়ির স্পীড কমিয়ে খানিকটা বেশী ধোঁয়া ছেড়ে দিলে। নরসিং পিছনের দিকে চেয়ে যাত্রীদের বললে—চুপ করে বসবে সবাই, কোন ভয় নাই। নিতাই, রাম—হুঁশিয়ার ! বলেই সে গাড়িখানার মুখ আরও ডান দিকে ঘুরিয়ে রাস্তা থেকে পাশের প্রান্তরমুখী ঢালের মুখে ছেড়ে দিলে। ফুট-ব্রেক হ্যাণ্ডব্রেক কষবার জন্য উদ্যত থেকে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে। ঢেউয়ে-দোল-খাওয়া নৌকার মত দুলতে দুলতে গাড়িখানা নেমে পড়ল প্রান্তরে। তার পর আবার একবার সে গাড়িখানাকে ছাড়ল। যথাসম্ভব শেয়াকুলের গুল্ম-গুলোকে এড়িয়ে শক্ত সমতল প্রান্তরের উপর দিয়ে মসৃণ গতিতে গাড়ি ছুটল।

নিতাই উৎসাহ আনন্দে বলে উঠল, বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা—কেয়াবাত। বাম বাঁ-দিকে রাস্তার উপর চলমান বাসগুলোকে অতিক্রম করতে করতে বলতে লাগল, চলো তুফান মেল !

নরসিংয়ের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিয়েছে। সমস্ত বাসগুলোকে পেরিয়ে সে একবার পিছন দিকে তাকিয়ে বললে—শা (সা)—লা!

এর পর সামনে দুখানা 'কার'। একখানা—বুধাবাবুর, অন্যখানা হরেন সাহার। ট্যাক্সির স্পীড আরও বাড়িয়ে দল নরসিং। সামনে এখন প্রায় সিকি মাইল পতিত ডাঙা রয়েছে। সিকি মাইল অতিক্রম করতে হল না, খানিকটা যেতেই সে গাড়ি দুখানাও পিছনে পড়ল। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা সড়কের চেয়ে সমতল প্রান্তরে গাড়ি অনেক বেশী অনায়াস গতিতে চলতে পারছে।

নিতাই বললে, এমনি রাস্তা হয় শালা!

নরসিং গম্ভীরভাবে বললে, ভগবানের তৈরী আর মানুষের তৈরী, বুঝলি! তফাত অনেক! বলতে বলতে সে ফের টপ-গীয়ার দিয়ে গাড়িখানার মুখ রাস্তার বাঁধের দিকে ঘুরিয়ে দিলে। সুকৌশলে সে তুলে নিলে গাড়িখানাকে রাস্তার উপর। তার পর চলতে লাগল আমিরী চালে। অর্থাৎ পিছনের গাড়ির উদ্দেশে ধুলো ওড়াতে আরম্ভ করলে। পিছনের গাড়িখানা বার কয়েক হর্ন দিলে। উত্তরে নরসিং ধোঁয়ার রাশি ছাড়লে।

হঠাৎ নিতাই ত্রস্ত হয়ে উঠল।—এই, এই সিংজী! সিংজী!

সামনের দিকে নিস্পৃহ অসল দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল নরসিং—কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করেই সে বললে—কি?

রামও এই সময়ে চঞ্চল হয়ে উঠল, দাদাবাবু! দাদাবাবু!

—কি রে? নরসিং একটু রুষ্ট না হয়ে পারলে না।

—এস-ডি-ও সায়েব!

—কে? চমকে উঠল নরসিং।

—এস-ডি-ও সায়েব! পেছুকার গাড়িতে!

গাড়ির পাশে মুখ বাড়িয়ে চকিতের মত পিছনের গাড়িটা দেখে নিলে নরসিং। এস-ডি-ও'র তকমা-পাগড়ি-আঁটা চাপরাসী গাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে গম্ভীর আওয়াজে হাঁকছে, এই! এই! এই! খাড়া করো গাড়ি! এই—

গাড়িতে ভিতরে সাহেবী-পোশাক-পরা কেউ বসে আছে। নাকে রুমাল চাপা দিয়েছে। এবার চঞ্চল হয়ে উঠল নরসিং। এবং যা করলে সেও ভেবে চিন্তে করলে না, করব বলেও করলে না। গাড়ি তার রোখাই উচিত ছিল, কিন্তু

সে করলে তার বিপরীত। পূর্ণবেগে গাড়ি চালিয়ে দিলে। গাড়ির স্পীডোমিটার খারাপ হয়ে গিয়ে কাঁটাটা সরে না, গাড়ির গতির বেগে কাঁটাটা শুধু ঠক ঠক করে নড়তে লাগল। পঁচিশ-ত্রিশ মাইল বেগে চলছিল গাড়িখানা, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পিছনের গাড়িখানাও মোটরকার। তার উপর গাড়িখানা নরসিংয়ের গাড়ির তুলনায় নতুন। নরসিংয়ের অবশ্য দুর্দান্ত সাহস, যন্ত্রপাতির উপর তেমনি আয়ত্তশক্তি, তার উপর তাগিদটা ভয়ে পালাবার। সে আগেই এসে ঢুকল শহরে। শহরের মুখে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল একটা ছোট পথে। তবুও নরসিং ধরা পড়ল শহর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে। দুপুর বেলায় বে-টাইমে সে খালি গাড়ি নিয়েই যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু শহরের মোড়ে মোড়ে পুলিস। ধরা পড়ল।

তার পরই ওই কাণ্ড।

নরসিং বেত ধরতেই এস-ডি-ও বেত আর চালালেন না। ওভার-লোডের জন্য বিপজ্জনক গতিতে গাড়ি হাঁকাবার অপরাধে এ্যারেস্ট করলেন। অবশ্য জামিন সঙ্গে সঙ্গেই হল। মামলাতেও হল অল্প জরিমানা। কিন্তু হাতের সাধ মিটিয়ে না মারতে পেয়ে ক্ষোভে নরসিংকে মারলেন ভাতে। নানা অজুহাতে তার ট্যাক্সির লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হল। ইচ্ছে ছিল, ড্রাইভিং লাইসেন্সখানাও বাতিল করার, কিন্তু সে হয় নি। মোটর-অভিজ্ঞ বড় সাহেব-ইঞ্জিনীয়ারের মুক্ত-কলমে-লেখা প্রশংসাপত্র ছিল নরসিংয়ের।

তাই নরসিং চলেছে—ইমামবাজার সদর সার্ভিস লাইনের রাস্তা ছেড়ে এই ইমামবাজার-রামনগর ঘাটের পথে। এ পথেও সার্ভিসের লাইসেন্স মিলবে না।

বুধাবাবু এ্যাণ্ড রেল কোম্পানীর মনোপলি সার্ভিস—এটা একচেটিয়া অধিকার।

নরসিং সে উদ্দেশ্যেও চলছে না। তার উদ্দেশ্য সে বলেও নাই। নিতাই এবং রামকেও বলে নাই। বলেছে—বাড়ি যাচ্ছি।

রামনগরের ঘাট পেরিয়ে ওপারে মাঠান—অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্র-প্রধান অঞ্চলে তার বাড়ি। ধুলো-ভরা মাঠের পথ। গরু চলে, মানুষ চলে—গরুর গাড়ি চলে।

হঠাৎ নিতাই বললে—আস্তে সিংজী, আস্তে।

—আস্তে ?

সোনাডাঙার বাঁকে ধুলো উড়ছে। গরুর গাড়ি বোধ হয়।

—হুঁ! নরসিং গাড়িখানাকে ছুটাতে চাইছিল নিজের মনের গতির সঙ্গে সমান বেগে। নরসিং গাড়ির বেগ সংযত করলে। গাড়িই বটে।

সোনাডাঙার বাঁক ঘুরে গাড়ি আবার পড়ল উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্রের মধ্যে। সামনে তিন মাইল দূরে অভয়াপুর—ডান দিকে চার-পাঁচ মাইল পূর্বে ভাসতোর, পুনাশী, কামারপাড়া; বাঁয়ে পাঁচ মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে গ্রামবনরেখা। গাড়ি ছুটছে। পাশের গ্রামের গাছপালা প্রায় স্থিরই আছে, মধ্যবর্তী ফসল-কাটা ধূসর মাঠখানা যেন বৃত্তাকারে ঘুরছে। সামনের গ্রাম অভয়াপুর এগিয়ে আসছে। নদীর এপারে অভয়াপুর, ওপারে নামনগর।

গাড়ি চড়াইয়ে উঠেছিল। এবার ঢাল আরম্ভ হল। বুঝা যায় না ঠিক, মনে হয় সমতল মাঠ। কিন্তু নরসিং জানে এবং গাড়ির চাকার টানে বুঝতে পারছে। ক্ষেতও ক্রমশ শ্যামল হয়ে আসছে। সামনে দেখা যাচ্ছে রবিশস্য-ভরা মাঠ। কলাই, গম, সরষে। তিলের জমিগুলি গাঢ় সবুজ। তরকারির গাছ সব লতাতে শুরু করেছে। দু-চারটে জমিতে বাডন্ত লতার ফুল ফুটেছে। এই হল নদীর মাঠ। ভারী জোরালো মাটি। বীজ পড়লে এড়ায় না অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না এ মাটিতে। তবুও বন্যা কখনও এতটা ওঠে না।

অভয়াপুরের ভিতর রাস্তা অতি সংকীর্ণ। বাঁকগুলোও তেমনি বিচিত্র এবং আকস্মিক। এই গ্রামেই বুধাবাবু এ্যাণ্ড রেল-কোম্পানীর বাসের এ-প্রান্তের আড্ডা। ইউ পি স্কুলঘরের সামনের খোলা জায়গায় বাসটা দাঁড়িয়ে আছে। এর পরেই একটা 'ত'-কারের মত বাঁক। বাঁক ঘুরে ত্রিশ গজ গিয়ে আবার একটা এমনি বাঁক। তার পরই নদীর ঢাল। কাঁচা পথ। এখানে পাকা করলেও টেকে না। নদী ধুয়ে নিয়ে যায়। মাটি চাপিয়ে দিয়ে যায়। নরম ধুলো-ভরা পথ। প্রায় দু-ফুট ধুলো জমে আছে, তুলোর চেয়েও নরম। নরসিং ছেড়ে দিল গাড়িকে। ইঞ্জিন বন্ধ। ঢালের মুখে নেমে চলেছে গাড়ি। দু-পাশে ঘন শরবন এবং নানা আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হল। গাড়ি গড়িয়ে চলেছে। সামনে দেখা যাচ্ছে নদী। হাঁটুর চেয়েও কম জল। বিস্তীর্ণ বালুকাময় গর্ভ চিক্ চিক্ করছে। ওপারে দেখা যাচ্ছে—প্রকাণ্ড বড় পরিত্যক্ত সিল্ক-ফ্যাক্টরী। নদীর ওধার পাকা, বাঁধানো। বাঁধিয়েছিল সেকালে কুঠিয়ালেরা। রামনগরের ওপারে সহোড়া-চন্দ্রহাট, তারপরই পড়ল দোসরা জেলা। জেলা মুর্শিদাবাদ। এই জেলাতেই নরসিংয়ের ঘর।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ সিংজী। নিতাই সতর্ক করে দিলে।

গাড়ি ঢালের মুখে জোরে নামছে। সামনেই নদীগর্ভ। নদীর ঘাট না দেখে নামা উচিত নয়।

ফুটব্রেকে চাপ দিতে দিতে হ্যাণ্ডব্রেকে শুধু হাত দিয়ে নরসিং ঈষৎ হাসলে। গ্রামের কথায় তার ভাবীকালের কল্পনা মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল—একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

গাড়ি থেমে এল।

নরসিং বললে, কি জানি—গাড়ি থেকে ইট দুখানা বার করে সামনের চাকায় লাগিয়ে দে! সে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

জেলা মুর্শিদাবাদ গ্রাম 'গিরবরজা'। ছত্রীর গ্রাম। নরসিং চলেছে—ওই গ্রামের মুখে।

দুই

জেলা মুর্শিদাবাদের এই অংশটা নরম কালো মাটির দেশ। কাঁকর নাই, পাথর নাই, বালি যা আছে. তাও অত্যন্ত মিহি আর ঝিক্-মিক্ করে গুঁড়ো রূপোর মত, চোখ-জুড়ানো কালো মেয়ের অঙ্গ-লাবণ্যের মত মিশে আছে মাটির সর্বাঙ্গে। জল পড়বামাত্র ওই বালির গুণে মাটি এলিয়ে পড়ে ঘষা-চন্দনের মত। আবার ওই বালির গুণেই বাতাসের স্পর্শ এবং রোদের উত্তাপ সিক্ত-মাটির কাদাভাব অত্যন্ত সত্বর কাটিয়ে মাটিকে সরস ঝুর-ঝুরে করে তোলে। ওই মাটির সমতল মাঠ। বর্ষার সময় জলে একবার ভরলে আর জল মরতে চায় না। গঙ্গার ধারে খাল-বিল তখন ভরে ওঠে, সেই সব জল-ভরা বিলের চাপে মাঠের জল মরে না। বন্যাও হয় না অথচ জলও মরে না। মাটিতে অফুরন্ত উর্বরতা, কাজেই ধান এখানে অমর। সরকারী সায়েব সুবোরা মাঝে মাঝে আসে। তারা বলে, এতেও যখন তোমাদের লক্ষ্মী নাই, তখন আর তোমাদের হবে না। এমন ধান-ফলানো মাটি বাংলাদেশে আর নাই, বাখরগঞ্জ আর বর্ধমানের খানিকটা জায়গা ছাড়া। বাখরগঞ্জ কোথায় সে কথা এখানকার চাষী-ভূষিতে জানে না, খোঁজ করার মত কৌতূহলও তাদের হয় না। তবে বর্ধমান তাদের পাশেই। এই গঙ্গার ধারের এলাকার নীচের দিকটাই খানিকটা বর্ধমানের মধ্যে পড়েছে। সাহেব সুবোর কথা

মিথ্যে নয়, সায়েবরা কি মিথ্যে কথা বলে! খাঁটী সত্য কথা। প্রচুর ধান হয়। হাতি-ঠেলা ধান অর্থাৎ গরু-মহিষে গাড়ি ঠেলে এত ধান তুলতে পারে না, হাতি হলে তবে ঠিক হয়। শুধু কি ধান? কলাই, গম, সরষে, মসনে, তিসি, আলু, পেঁয়াজ, আখ—কোন্ ফসলটাই বা না হয়! কিন্তু তবু যে কেন তাদের লক্ষ্মী নাই, সে কথাটা তারা জানে না। সায়েবরা বলে, তোরা হচ্ছিস কুড়ের সর্দার। সায়েবদের এই কথাটি লোকে মানে না। তারা দেহের এক পিঠ মাটিকে, অন্য পিঠ মেঘ আর রোদকে দিয়ে খাটে। লক্ষ্মী ওদের ঘরের মেয়ের মত; জন্মান, দিনে-দিনে বাড়েন, কচি মুখের হাসিতে আলো করে রাখেন দেশটা, তার পর যেই তাঁর ঘরকন্নার কাজে লাগাবার বয়স হয়, অমনি চলে যান বিবাহিতা মেয়ের মত। কন্যার মতই ঘরে তাঁর অচলা হয়ে বাস করবার অধিকার নাই। লক্ষ্মী-ফলানো দেশের মধ্যে লক্ষ্মীহীন ছন্নছাড়া গ্রাম সব। ছত্রীর গ্রাম 'গিরবরজা'ও লক্ষ্মীহীন ছন্নছাড়ার গ্রাম।

'গির্‌বরজা' বলে মুখে, লিখবার সময় লেখে কিন্তু 'গিরিব্রজ'। গ্রামের জমিদারের সেরেস্তার কাগজে সেই কোন্ আমল থেকে লেখা হয়ে আসছে। নবাবী আমলের ফারসী 'থাকবন্দী'তে চিঠাতেও লেখা আছে গিরিব্রজ। ছত্রীরা বলে, পরশুরাম যখন নিঃক্ষত্রিয় করতে লাগল, সেই সময় গিরিব্রজ রাজ্যের এক অল্পবয়সী ক্ষত্রিয় মনসবদার রাজার অনাথা কন্যাকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে 'পক্ষী'র দেশ এই বাঙ্গলা মুলুকে এসে এইখানে বাস করেন। 'ক্ষত্রিয়' এই পরিচয় ছড়িয়ে পড়লে কোনদিন সে কথা অমর পরশুরামের কানে পৌঁছুতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি পরিচয় দেন—জাতিতে তিনি 'ছত্রী'। এই সব বিবরণ লেখা দুটো তামার পাত আছে। ফারসীতে লেখা। একটা হল, যখন মনসবদার রাজকন্যাকে নিয়ে এখানে পালিয়ে আসেন, সেই পুরনো আমলের। অন্যখানা হল মহারাজ মানসিংহের দেওয়া। মহারাজ মানসিংহ নাকি খাতির করে গোটা গ্রামখানাকেই তাদের মৌরসী বন্দোবস্ত দিয়ে গিয়েছেন। সেই বন্দোবস্তের বলে আজ গোটা গির্‌বরজা মৌজাটাই মোকররী মৌরসী হয়ে রয়েছে। নবাবেরা সে মৌরসী বন্দোবস্ত কাটতে পারে নাই—ইংরেজ সরকারও না। এই তামার পাতটায় মহারাজ মানসিং সীলমোহর দস্তখত দিয়ে গিয়েছেন। এখনও তাদের ঘরে পুরনো তলোয়ার, সড়কি, খাঁটী গণ্ডারের চামড়ার ঢাল আছে। কতবার পুলিস এসে তাদের ঘর-তল্লাসির সময় কতক-কতক নিয়েও গিয়েছে, তবুও কতক এখনও আছে কাঠের মাচানের

মধ্যে, অন্ধকূপের মত গুপ্ত চোর-কুঠুরিতে ; মজা পুকুরের মাটি কাটাতে গিয়েও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। গাদা-বন্দুকও ছিল। সেগুলো লুকানো আছে, কিন্তু তার একটাও গোটা নাই। ভাঙা-ভাঙা টুকরো এখানে-ওখানে পড়ে আছে। ছেলেবেলায় একটা নল নিয়ে নরসিং খেলা করেছে।

সেটেল্‌মেন্টের সময় এসেছিল এক কানুনগো। অনেক দিন আগে। নরসিং তখন ছেলেমানুষ। সে কানুনগো ওই তামার পাতখানার ফটোগ্রাফ তুলে নিয়েছিল। মুরুব্বি ছত্রীদের কাছে পুরনো আমলের গল্প শুনত প্রতিদিন সন্ধ্যায়। তারপর কানুনগো লিখেছিল এখানা কেতাব। সেই বইয়ের একখানা কানুনগো পাঠিয়ে দিয়েছিল গিরবরজার ছত্রীদের নামে। সে এক তাজ্জব কাহিনী বানিয়েছে। সে কাহিনী পড়ে গিরবরজার মুরুব্বিদের কি রাগ! কেতাবখানা আগুনে দিতে হুকুম হয়েছিল। নরসিং ছিল কাছে দাঁড়িয়ে— তাকেই হুকুম হয়েছিল। কিন্তু ছেলেমানুষ নরসিং তখন পাঠশালায় পড়ত, কেতাব কাগজের উপর তখন তার ভারী ঝোঁক। বইখানাকে আগুনে না দিয়ে সে সেখানা নিজের দপ্তরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। সে বয়সে নরসিং বইখানা পড়ে সব বুঝতে পারে নাই ; পরে বড় হয়ে সে কাহিনী নরসিং কয়েকবার পড়েছে। মধ্যে মধ্যে কয়েক জায়গা এখনও তার কাছে একেবারে দুর্বোধ্য। হিজরী-শকাব্দের কচকচি, তামার পাতের মাপ ইঞ্চি-ফুট, ফারসী লেখার ছবি— এমনি সব ব্যাপার আছে। এগুলো বাদ দিয়ে বাকিটা তার অদ্ভুত ভাল লেগেছে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন চন্‌ চন্‌ করে ওঠে। কানুনগোর উপরে রাগও হয়। সে লিখেছে—"মুসলমানেরা যখন প্রথম আসে বাংলাদেশে— পাঠান রাজত্বে—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ অনেক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। মুসলমান-পুরুষেরা হিন্দুর কন্যা বিবাহ করতেন, অনেক স্থলে জোর করে কন্যা হরণ করে আনতেন, অনেক স্থলে রাজনৈতিক কারণে হিন্দু-রাজারা কন্যা দান করতেন—এ সব প্রমাণ ইতিহাসে আছে। হিন্দু-পুরুষেরা অনেক স্থলে মুসলমান-কন্যা বিবাহ করতেন—এ প্রমাণও আছে। রাজা যদু, কালাপাড়ের কাহিনী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এ সব ক্ষেত্রে হিন্দু-পুরুষ সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এক সময় হিন্দু-পুরুষেরা মুসলমান-কন্যাকে বিবাহ করেও হিন্দু সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হতেন না, তাঁরা হিন্দুই থাকতেন—এর প্রমাণও পাওয়া যায়। অর্থাৎ সমাজ মুসলমান-সংশ্রবকে এমন কঠোরভাবে বর্জন করার নীতি প্রথম প্রথম গ্রহণ

করেন নাই। সে সময় অনেক অভিজাত মুসলমান পুত্র-কন্যার সঙ্গে তদানীন্তন অভিজাত হিন্দু পুত্র-কন্যার বিবাহ হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে মুসলমান-কন্যা হিন্দুর ঘরে বধূ হিসাবে এসে হিন্দু-বধূরূপেই পরিগণিত হয়েছেন, যেমন হিন্দু-কন্যা মুসলমান স্বামীর ঘরে গিয়ে মুসলমান-বধূ হিসাবে গৃহীত হয়েছেন বা হয়ে থাকেন। গিরুবরজার রায়-বংশকে প্রদত্ত পাঠান আমলের তামার পাতের সনন্দ এর একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। গিরিধারী সিংহকে সনন্দ দিয়েছেন এক পাঠান করদ নবাব বা জায়গীরদার মহম্মদ খলিল উল্লা খাঁ। 'দস্যুবৃত্তিধারী বর্বর শত্রু আব্দুল্লা খাঁর আক্রমণে মনসবদার গিরিধারী সিংহ তুমি যে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছ, তাহার জন্য তোমার উপর সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে যখন প্রধান-সেনাপতি হত, তখন গিরিধারী সৈন্য পরিচালনা করিয়া অধিকৃত-প্রায় দুর্গ হইতে শত্রুদের বিতাড়িত করিয়াছ; এবং পলায়িত শত্রুদলকে অনুসরণ করিয়া আব্দুল্লা খাঁকে নিহত করিয়াছ, তাহার দুর্গ দখল করিয়াছ; এই জন্য তোমাকে আমি বর্ক-আন্দাজ অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় দ্রুতগামী বীর, এই খেতাব দান করিলাম। এবং রায় অর্থাৎ রাজা এই খেতাবও দান করিলাম। তুমি আব্দুল্লা খাঁর যে কন্যাকে বন্দিনী করিয়াছ, তাহাকে আমার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছ, সে কসুর আমি মাফ করিতেছি। তোমাকে অভয় দিয়া এই সনন্দ পাঠাইলাম, তোমার লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। দরবারে হাজির হইয়া তুমি তোমার খেলাত গ্রহণ করিবে।' ফলকের অপর পৃষ্ঠে খোদিত আছে—'মনসবদার বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ রায় এবং দৌলতোন্নেসা ওরফে ব্রজবালার বিবাহে গিরিধারী রায়ের নব-নির্মিত বাসভবনের চতুর্দিকে এক মৌজা জমি জায়গীর প্রদত্ত হইল। দরবারে এই মৌজার কর বার্ষিক পঞ্চ তঙ্কা হিসাবে ধার্য রহিল।' কানুনগো লিখেন—"পরশুরামের ভয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রবাদের সঙ্গে এই আব্দুল্লা খাঁর কন্যা দৌলতোন্নেসাকে নিয়ে গিরিধারী সিংহের আত্মগোপন করে থাকার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। গিরিধারীর 'গিরি' এবং দৌলতোন্নেসা ওরফে ব্রজবালার 'ব্রজ' থেকেই গ্রামের গিরিব্রজ নামের উৎপত্তি। গ্রামের পত্তনও এই লুক্কায়িত থাকার কাল থেকে।"

নরসিংয়ের খুব ভাল লাগে এই কাহিনী। খানিকটা খুঁতখুঁত করে—অবশ্য, ওই দৌলতোন্নেসা ওরফে ব্রজবালা-সংবাদে; কিন্তু সে যখন কল্পনা করে

দৌলতোন্নেসার রূপ, তখন ওই স্বল্প তিক্ততাটুকুও আর থাকে না। সদর শহরের জজসাহেবের কথা তার মনে পড়ে। জজবাহাদুর মেমসাহেব বিয়ে করেছেন। শাড়ি পরে মেমসাহেব জজসাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। পরিষ্কার বাংলা কথা বলে। ভাল ভাল উকিলদের সে গল্প করতে শুনেছে। মেমসাহেব পাঁউরুটি-মাংস খায় না, ভাত-ডাল-মাছ খায়। জজসাহেবের দুটি ছেলেমেয়েকে দেখেছে—ঠিক বাঙালীর ছেলেমেয়ের মত ধারা-ধরন। ছেলের পৈতেও হবে, নরসিং শুনেছে। নরসিং একথাও জানে যে, জজসাহেব মেম বিয়ে করেছে বলে লোকে তাকে ঘৃণা করে না, হিংসা করে। পূর্বপুরুষ বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ-রায়ের কথা কল্পনা করতে তার মনে হয়—সেকালের লোকও তাকে এই জজসাহেবের মত হিংসা করত দৌলতোন্নেসার স্বামী হিসাবে। বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ-রায় সম্বন্ধে সে যখন কল্পনা করে, তখন তার মনে হয়, তার চেহারা আর গিরিধারী রায়ের চেহারা ঠিক একই রকমই ছিল। সে নিজে মাথায় প্রায় সাড়ে ছ-ফুটের উপর। এর উপর সে যদি দামী পাথর, মুক্তো, পালক বসিয়ে রেশমী মুরেঠা বাঁধে, গায়ে পরে ইহা লম্বা শেরওয়ানী—কাপড়ের বদলে সে যদি পরে চুস্ত পায়জামা, কোমরে ঝুলিয়ে দেয় বাঁকা তলোয়ার, আর যদি পিছিয়ে যায় সেই আমলে, তবে তার গিরিধারী সিংহ-রায় হতে বাধা কি?

গভীর রাত্রে মশালের আলো জালিয়ে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে হাতে রক্ত-মাখা নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে চলেছে সে। ঘোড়া ছুটেছে ঘাড় বাঁকিয়ে ছার্তিকের চালে ঝড়ের মত। পিছনে তার হাজার সওয়ার। মাঠের মাটি ধুলো হয়ে আকাশে উঠছে, কিন্তু অন্ধকারে দেখা যায় না। সামনে কয়েক রশি দূরে প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে তার মালিক নবাব খলিলুল্লা খাঁ বাহাদুরের দুশমন আব্দুল্লা খাঁ এবং তার লোকজন। ওরা নিজেদের এলাকায় পৌঁছে কেল্লার মধ্যে ঢুকে ফটক বন্ধ করবার আগেই তাদের ধরতে হবে। তার কালো ঘোড়া ছুটে চলে—পাশের গাছপালা পিছনের দিকে চলে—মাঠ ঘোরে চক্রাকারে, চলন্ত মোটরের পাশের গাছ ও মাঠের মত। নরসিংয়ের শরীরের ভিতরে একবার রক্ত যেন টগ্-বগ্ করে ফুটতে থাকে। কল্পনায় নরসিং ঝাঁপিয়ে পড়ে পলাতক শত্রুর উপর। চীৎকার, হাজার সওয়ারের উল্লাস! মুণ্ড খসে পড়ে তলোয়ারের আঘাতে, রক্তে মাটি ভেসে যায়, সোজা তুলে ধরে বলে—খবরদার! মেয়েদের ইজ্জৎ সবার আগে! খবরদার!

"ভাঙো অন্দর-মহলের দরজা। ভাঙো তোষাখানার কপাট।" সব ভেঙে পড়ে। হাজার সওয়ার ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। গিরিধারীরূপী নরসিংহ নাঙ্গা তলোয়ার তোলে।

সে নিজে গিয়ে প্রবেশ করে অন্দর-মহলে। ত্রস্ত পলায়নপর দাসী-বাঁদীর দল শুধু। সে বলে—ভয় নাই।

হঠাৎ তার নজরে পড়ে—অপূর্ব-সুন্দরী কিশোরী মেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে ধুলোর ওপর। প্রথম দৃষ্টিতেই সে বুঝতে পারে শাপলা ফুলের বনের মধ্যে 'শতদল' অর্থাৎ পদ্মকলি এটি।

সে বসে যায় শিয়রে, মুরেঠা খুলে হাওয়া করে, হাঁকে, জল—জল পানি। জলদি। কিশোরী চোখ খুলে চায়। সকরুণ সে দৃষ্টি। গিরিধারীরূপী নরসিংহ বলে, কোন ভয় নাই আপনার। তারপর সে হুকুম করে, ডুলি, ডুলি! জলদি ডুলি নিয়ে আয়! জলদি!

ধন-রত্ন সঙ্গে নিয়ে হাজার সওয়ারদের অধিকাংশকে পাঠিয়ে দিল আগে নবাব খলিলুল্লার দরবারে। কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর নিয়ে দোলায় দৌলতোন্নেসাকে চাপিয়ে সে শেষ রওনা হয়ে পালিয়ে এল এইখানে। গঙ্গার ধারের ঘন-জঙ্গলে-ভরা স্থান। বাঘ-সাপে-ভরা জঙ্গল।

কল্পনা নরসিংয়ের যতই রঙীন হোক, তাতে রঙের প্রাচুর্য যতই থাক, বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক গবেষণার গঙ্গাজলে তাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রঙের আধিক্য মুছে দিয়েও মোটামুটি রেখা-বিন্যাস একই থাকে।

গিরিধারী সিং দৌলতোন্নেসা এবং লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ নিয়ে এসে—গঙ্গা পার হয়ে এপারে এসে—এই উর্বর ভূমিখণ্ডে গিরিব্রজ গ্রামের পত্তন করেছিল। ঘর-দুয়ার তৈয়ারি হল, পাঁচিলের ঘেরের পর পাচিলের ঘের, তার মধ্যে এক-এক চত্বরে বড়-বড় মজবুত ফটক। মোটা কাঠের দরজার উপর ঘন-ঘন লোহার গুল বসানো হল, যেন কুড়ুলের ঘা বসাতে না পারে। ফটকের মাথায় লোক দাঁড়াবার মত জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে বর্শা চালিয়ে যেন আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়া যায়। বন্ধু-বান্ধব বিশ্বস্ত লোকদের বাড়ি তৈরি হল আশেপাশে। রাস্তা তৈরি হল—আজকালকার তুলনায় অপ্রশস্ত রাস্তা। মানুষ চলবে, মানুষের কাঁধে পাল্কি-ডুলি চলবে, ঘোড়া চলবে, গরু চলবে, আর চলবে বয়েল গাড়ি। এর জন্য আর বেশী চওড়া রাস্তার দরকার কি? গ্রামের প্রান্তে এসে

বাস করলে শ্রমজীবী নানা জাতি। বাগদী, বাউড়ী, মাল, ডোম, হাড়ী, মুচি। তারা ছত্রীদের বাড়িতে কাজ করত, ঘোড়ার পরিচর্যা করত, পাল্কি বহন করত। প্রয়োজন হলে ছত্রীদের পিছনে লাঠি-সড়কি নিয়ে বের হত।

গিরিধারী শুধু সিংহ-রায়—বাকি যারা ছত্রী, তারা শুধু সিংহ। সিংহ-রায়দের ঘিরে সিংহ ছত্রীরা বসে ঘিউ-রোটি খেত, শরীরের তদ্বির করত, বাব্‌রি চুলের যত্ন করত, গোঁফ পাকাতো, দাড়িতে গালপাট্টা বানাত। গঙ্গার ধারের বন থেকে তখন প্রায়ই বাঘ ছিটকে আসত, তারা দল বেঁধে হৈ-হৈ করে বাঘ মারতে বার হত। বাঘ আসতে দেরি হলে, তারা নিজেরাই যেত গঙ্গার ধারের বন-জঙ্গলে বাঘের সন্ধানে। সে এক সমারোহের বাঘ-শিকার। বাঘ না পেলে বুনো শূয়ার মারত; খরগোস শিকার ছিল প্রায় নিত্য-কর্ম; পাখি শিকারও করত; কিন্তু তার জন্য সিংহ-রায় এবং সিংহরা নিজেদের হাতিয়ার ধরত না। তার জন্য ছিল তাদের পোষা, শিক্ষিত, ছোট জাতের বাজপাখি; এ দেশে এ জাতের বাজপাখির নামই হল 'শিক্‌রে'। নরসিং 'শিক্‌রে' পাখি দেখেছে, 'শিক্‌রে'র শিকারও দেখেছে। ছত্রীদের মধ্যে বা সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে আজকাল 'শিক্‌রে' পোষার রেওয়াজ উঠে গিয়েছে বটে; কিন্তু মুসলমান ফকিরদের এক শ্রেণী এখনও 'শিক্‌রে' পোষে। পায়ে শিকল বাঁধা 'শিক্‌রে' চামড়ার দস্তানা পরা হাতের উপর বসিয়ে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় তারা। সে আমলে ছত্রীদের প্রতিজনে 'শিক্‌রে' পুষত। শিকার, পাশা, দাবা, কুস্তি, সড়কি, তলোয়ার খেলে তলোয়ারে-সড়কিতে শান দিয়ে যে সময় থাকত, সে সময়টা কম নয়, তখন তারা গোঁফে তা দিত আর গল্প-গুজব করত। মধ্যে মধ্যে বাধিয়ে কৃষিজীবীর সঙ্গে—ঠিক তেমনভাবে। তার পর বাধত দাঙ্গা। চাষীদের ঘর চড়াও করে, পুরুষদের মেরে-কেটে সোনা, রুপা, টাকা, বাসন লুঠে নিয়ে আসত। তার সঙ্গে আনত তাদের যুবতী কিশোরী মেয়েদের। ধান, চাল, যব, গমের গোলা ভেঙে লুঠ করে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসত। ফসল উঠবার সময় আশেপাশের গ্রামের মাঠ থেকে ফসল কেটে নেওয়ার রেওয়াজও ছিল। শুধু কৃষিজীবী নয়, আশপাশের জমিদারেরাও সন্ত্রস্ত থাকত ছত্রীদের ভয়ে নিয়ত। তাদের বাড়িতে লুঠ-তরাজ করতে ছত্রীদের দ্বিধা ছিল না, ভয়ও ছিল না।

তাদের এই বৃত্তির আভাস আছে ওই দ্বিতীয় তামার পাতে। কানুনগো লিখেছে—এখানা মহারাজ মানসিংহের দেওয়া সনন্দ নয়, এখানা দিয়েছিলেন

মহারাজ তোডরমল। ছত্রী মুরুব্বিদের এও একটা আপত্তির কারণ। তারা চিরকাল জেনে এসেছে এখানা দিয়ে গেছেন মহাবীর মানসিংহ—অম্বর-স্তানের রাণা। মানসিংহের সনন্দে আর মহারাজ তোডরমলের সনন্দে!

কানুনগো সনদখানির একখানা ছবি ছেপে লিখেছে—"এই সনন্দে মহারাজ তোডরমল লিখেছেন—'পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে গিরিব্রজের সিংহ-রায়রা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, সেই হেতু তাহাদের সম্পত্তি বাহাল রাখা হইল। অন্যথায় এই অঞ্চলে তাহারা দস্যুতার অত্যাচারে যে সমস্ত অপরাধ দীর্ঘকাল ধরিয়া পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহাদের উপর শাস্তিবিধান করাই উচিত। যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য তাহাদের পূর্ব-দস্যুতার অপরাধ মার্জনা করা হইল। এবং ভবিষ্যতে সদ্ভাবে জীপন-যাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় গিরিব্রজ মৌজার সমগ্র পতিত ভূমি হাসিলের জন্য বাদশাহ-সরকার হইতে হাজার তঙ্কা সাহায্য দেওয়া হইল। স্থানীয় তহসিলদার এই পতিত হাসিলের নিয়মিত তদ্বির করিবেন। এবং সিংহ-রায়েরা স্থানীয় ফৌজদার ও বাঙলার সুবাদারের নিকট ভবিষ্যতে সদ্ভাবে থাকিবার জন্য দায়ী রহিল। সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া গিরিব্রজ মৌজার উপর নূতন কায়েম মৌরসী স্বত্ব সিংহ-রায় ও সিংহদের মঞ্জুর করিয়া বার্ষিক কর পাঁচ তঙ্কার পরিবর্তে পঞ্চাশ তঙ্কা ধার্য করা হইল'।"

নরসিংয়ের মনে হয়, এটা নেহাতই অসম্ভব কথা। মনে মনে কল্পনাও করা যায় না। এও কি কখনও হয়?

এই চোখ-জুড়ানো মোলায়েম উর্বর মাটির এই সুসমতল সুন্দর শোভন বিস্তীর্ণ চাষের মাঠ, এও কোনদিন জঙ্গলে-ভরা, ঘাসে আগাছায় কদর্য পতিত হয়ে পড়েছিল! বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কানুনগো বাবুটির উপর তার অনেক শ্রদ্ধা। ওই দুর্বোধ্য ফারসী লেখা সে দেখবামাত্র পড়ছে—সে নিজে যেমন বাঙলা চিঠি পড়ে, তেমনি সহজে পড়েছে। কাগজে ছাপার অক্ষরে ছেপেছে। তা ছাড়া ইদানীং নরসিং নানা ধরনের বইয়ের সঙ্গে দু-চারখানা ইতিহাসও পড়েছে। ইতিহাসের মত অদ্ভুত আর কিছু নাই। সে পড়েছে যে ইংরেজ সায়েবরা আজকাল মোটর তৈরি করেছে, এরোপ্লেন তৈরী করেছে। কলে যারা সূচ তৈরি করে, তারা নাকি পাচশ-সাতশ বৎসর আগে জানোয়ারের ছাল পরে বেড়াত, কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে দাঁত দিয়ে

ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। এত দূরে যেতে হবে কেন, সে চোখে দেখেছে—বামন মাঝি—সাঁওতালের ছেলে, পাদ্রীদের ইস্কুলে পড়ে, কোট-পেণ্টালুন পরে হাকিম হয়েছে। এও হয়তো তেমনি একটা তাজ্জব ব্যাপার।

নরসিং কল্পনা করতে চেষ্টা করে। গিব্‌বরজার চারিপাশের মাঠ গঙ্গার ধারের জমির মত জঙ্গলে ভরা, ছোট বড় গাছের তলায় কাঁটা-ঝোপ—অন্তহীন জট-পাকানো দড়ির জালের মত লতার জাল মাটিতে, মাটি দেখা যায় না—শুধু ঝরাপাতার রাশি—গ্রীষ্মকালে পা দিলে খর্‌-খর্‌ করে, বর্ষায় পা দিলে জ্যাব্‌জ্যাব্‌ করে—তলা থেকে কষের মত জল ওঠে; ভন্‌-ভন্‌ করে মাছি মশা। সেই সমস্ত কেটে ফেলতে দলে দলে লোক লেগেছে। ঠুক্‌ ঠাক্‌, ঠক্‌-ঠক্‌ শব্দ উঠছে, মড়্‌মড়্‌ শব্দ করে মাটির উপর আছড়ে পড়ছে বড় বড় গাছ। তার পর মাটি কেটে সমান করে চারিপাশে আলোর বাঁধন দিয়ে তৈরি হচ্ছে জমি। ওই বাগ্দী, বাউড়ী, ডোম, হাড়ী, মুচি এদের পুরুষেরা মাটি কাটছে ঝপাঝপ্‌—সেই মাটি ঝুড়িতে তুলে ওদের মেয়েরা গান গাইতে গাইতে ফেলে আসছে আলের দড়ির দাগে দাগে।

দেখতে দেখতে সুসমতল বিস্তীর্ণ গিব্‌বরজার সোনা-ফলানো মাঠ গড়ে উঠল। বড় বড় বয়েল জুড়ে হাল নিয়ে এল সিংহদের কৃষাণেরা—ওই সব বাগ্দী বাউড়ীদের দল। দেখতে দেখতে সবুজ ফসলে মাঠ ভরে উঠল। অগ্রহায়ণ আসতেই সে সবুজ ফসল হল সোনার ফসল। রাশি রাশি ধান, ভারে ভারে কলাই, ছালায় ছালায় গম, বোঝা বোঝা যব, শলি শলি সরষে, হাঁড়ি হাঁড়ি গুড় উঠল ছত্রীদের খামারে খামারে।

গিব্‌বরজার ছত্রীরা লক্ষ্মী পেতে প্রণাম করলে, বললে—মাগো, আলা হয়ে ঘরে বাস কর, অধর্মের হাত থেকে রক্ষা কর; অধর্ম করলে জানি তুমি থাকবে না। ধর্মে মতি দাও।

শিকারের ঝোঁক কমে এল ছত্রীদের। তাদের সে সময়ই বা কোথায়? ভোরে উঠে বলদগুলি খেতে পেয়েছে কিনা, খেয়ে পেট ভরল কিনা দেখতে হয়। মাঠে গিয়ে আলের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বর্ষার সময় দেখতে হয় রোয়ার কাজ, ভাদ্র আশ্বিনে নিড়েন, আশ্বিন কার্তিকে দেখতে হয় জমির জল, অগ্রহায়ণ থেকে শুরু হয় একদিকে ধান কাটার কাজ, অন্যদিকে রবিফসলের চাষের কাজ। শিকার করবার সময় কোথায়?

'শিকৃরে' পাখিগুলোর কতক মরে গেল, কারও কারও পাখি উড়ে গেল অবহেলায়। যে দু-পাঁচজনের অবশিষ্ট রইল—সেগুলো টিকটিকি গিরগিটি ধরে খেত ; সুযোগ পেলে লোকের ঘরের পায়রার বাচ্চা অথবা গৃহপালিত হাঁস মারত। গুল্‌তি মারা ধনুকগুলো হনুমান বাঁদর তাড়াবার কাজে লাগল। সড়কি তলোয়ারগুলি যত্ন করে দেওয়ালে রাখা হত। পর্বে পার্বণে বের করে কোমরে বাঁধত ছত্রীরা।

জোয়ান ছেলেদের পাঠানো হত মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে, ফৌজী-কাজের জন্য। অনেকের ছিল বারোমেসে কাজ, অনেকে বাড়িতেই থাকত, ডাক পড়লে যেতে হত। অনেক বাড়িতেই চাষবাস নিয়ে থাকত।

এই সময়ে গিরবরজা গ্রামের উন্নতি হয়েছিল চরম। যে পুরনো শিব-মন্দিরগুলো এখনও ভাঙা ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়—সেগুলি তৈরি হয়েছিল সেই সময়।

সিংহ-রায়েরা প্রথম শিব প্রতিষ্ঠা করে। তাদের দেখাদেখি একে একে প্রায় সকল অবস্থাপন্ন ঘরের প্রত্যেকেই এক এক শিব প্রতিষ্ঠা করলে। ছোট বড় মন্দির, যার যেমন অবস্থা। শিব চতুর্দশীতে উৎসবের প্রতিযোগিতা চলতে আরম্ভ হল। সে সব গল্প আজও প্রবীণ ছত্রীদের মুখের ডগায় লেগে আছে।

সিংহ-রায় বাড়িতে এসেছিল মুর্শিদাবাদ থেকে নাম করা বাইজী—মা ও মেয়ে। তরুণী মেয়ে চটুল হাল্কা পায়ে নাচছিল দ্রুততম গতিতে—তার যেন নেশা লেগেছিল নাচের। তবলচীর হাত তরুণীর পায়ের সঙ্গে সমান তাল রেখে চলতে পারছিল না। হেসে প্রৌঢ়া মা টেনে নিলে তবলা বাঁয়া। নাচের সঙ্গে সঙ্গত চলছিল। হঠাৎ একসময় মৃদু হেসে সিংহ-রায়দের কর্তা তারিফ দিয়ে উঠল, বা বাইজী বাঃ! অমনি প্রৌঢ়া বাইজী মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেল। ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারে নি ; পরে প্রকাশ পেল। বাইজীর হাতেও তাল কেটেছিল। সমঝদার সিংহ-রায় ছাড়া সেটুকু কারোও বোধগম্য হয় নাই। বাইজী দম্ভভরে হেসে টেনে নিয়েছিল তবলা, তাই অতি সূক্ষ্ম চুকের জন্য মৃদু হেসে ব্যঙ্গভরে বাহবা দিলে সিংহ-রায়। সেই অপমানের ক্ষোভে বাইজী মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিল।

খাওয়াদাওয়ার প্রতিযোগিতায় সেও হত সমারোহের ব্যাপার। এক বাড়িতে চারটে করে মিঠাই দিয়ে একবার অন্য সকল বাড়ির অমর্যাদা করেছিল। নিয়ম ছিল জোড়া মিঠাইয়ের। এক বাড়ি যখন সে নিয়ম ভাঙলে,

তখন অন্য বাড়ি রাগে ফুলে উঠল। পরের বার দেখা গেল আটটা, বারোটা, ষোলটা মিঠাই পাতে পড়তে আরম্ভ হল। তার পরের বার সিংহ-রায়েরা সংখ্যা করলে, যে যত খেতে পারে। তার পরের বারে সংখ্যা নির্দিষ্ট হল আটটা, আর ছেলেদের চারটে, কিন্তু সে মিঠাই এল মুর্শিদাবাদ থেকে। তার পর এল কাঁদির মনোহরা।

তারপর শোভা এবং সজ্জার প্রতিযোগিতা। একজন পঞ্চাশ মশাল জ্বাললে অন্যজনে জ্বালত একশ মশাল। সেকালে নিয়ম ছিল, এক বাড়ির কর্তা যেত অন্য বাড়িতে তত্ত্ব করতে। যাবার সময় সঙ্গে থাকত মশালচী পাইক। এ কর্তা যদি দুজন পাইক, একজন মশালচী নিয়ে যেতেন, তবে অন্য কর্তা যেতেন দুই মশালচী চার পাইক সঙ্গে।

নরসিংহ চলেছিল সেই সব পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে। মুর্শিদাবাদ এলাকার নরম উর্বর মাটির মাঠ। মাঠের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা; গরুর গাড়ি চলে, গরু চলে, মধ্যে মধ্যে দু-একখানা ডুলি জেনানা-সওয়ারী নিয়ে, কখনও কখনও একটা-দুটো ঘোড়া। বড় ভাল-জাতের ঘোড়া নয়; ছ্যাকরা-গাড়ির ঘোড়ার জাতের দেশী ঘোড়া, পিঠে তামাক-মসলা-বোঝাই নিয়ে চলে—পিছনে চলে হিন্দুস্থানী ব্যবসাদার, গরুর মত পাঁচন-লাঠি পিটে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ক্বচিৎ কোন লাজ-লজ্জাহীন ছাত্র বা মুসলমান চাষী এমনি জাতের ঘোড়ার পিঠেই চেপে পা দুটো গুটিয়ে মাটি থেকে বাঁচিয়ে চলে। ঘোড়ার পায়ের ছিটানো ধুলোয় দাড়ি-গোঁফ-চুল ধূসর হয়ে যায়। মাঠের রাখালেরা দেখে হি-হি করে হাসে। সেই এক-হাঁটু নরম ধুলো-ভরা মাঠের রাস্তার উপর দিয়ে মন্থর গমনে চলেছে নরসিংয়ের মোটরখানা। গাড়িখানার আপাদমস্তক ধুলোয় ভরে গিয়েছে। নরসিং, নিতাই, রামের সর্বাঙ্গ ধুলোয় ধূসর। নরসিংয়ের গোঁফের গায়ে ধুলো লেগেছে—ঠিক কদম ফুলের কেশরের ডগায় রেণুর মত।

রামের অত্যন্ত হাসি আসছে—দাদাবাবুর গোঁফের এই কদম ফুল ঢং দেখে। কিন্তু ভয়ে সে হাসতে পারছে না। নিতাই মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

নরসিং সামনে দৃষ্টি স্থির রেখে শক্ত হাতে ষ্টীয়ারিং ধরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধুলোর ভেতর কোথায় আছে গর্ত, তার ঠিক কি? তার ওপর চলন্ত সাপের মত আঁকাবাঁকা পথ। রাম অথবা নিতাইয়ের দিকে তার দৃষ্টিও নাই, মানসিক সচেতনতাও নাই। সিংহ-রায় বংশের ছেলে সে, আজ মোটর-ট্যাক্সি চালায়। ক্ষণিকের জন্য আক্ষেপ জেগে ওঠে। পরক্ষণেই হাসে।

দিল্লীর বাদশাহের বংশধররা রেঙ্গুনে নির্বাসিত হয়েছিল, তারা সেখানে নাকি জুতোর দোকান করত। আজ রাজা, কাল ফকির। কালের গতিকই এই।

—সিংজী! নিমাই ডাকলে।

—হুঁ।

—রেডিয়েটারের জল পাল্টালে হত। বেজায় তেতে উঠেছে।

খেয়াল হল নরসিংয়ের, রেডিয়েটারের জলে সোঁ-সোঁ ডাক ধরেছে, মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে অল্প-অল্প। গাড়ি রুখলে নরসিং। নিতাই গিয়ে ঢাকনিটাতে হাত দিয়েই তুলে নিয়ে বললে—বাপ্‌ রে! নরসিং পায়ের কাছ থেকে খানিকটা ময়লা ন্যাকড়া তুলে ছুঁড়ে দিল। নিতাই সেইটা দিয়ে ধরে ঢাকনি খুলে ফেলতেই গরম জল টগ্‌-বগ্‌ করে ফুটে যেন উথলে উঠল—ধোঁয়া বার হল অনেকটা।

রাম একটা পেট্রোলের খালি টিন বার করে বললে, এ-হে! নদীতে জল নিস্ নাই নিতাই?

নিতাই জিভ কেটে বললে, এই যা!

নরসিং বললে, যা চলে—ওই দেখ্‌—মাঠে পুকুর।

পুকুরের ভাবনা এ এলাকায় নাই। ছত্রীরা পুকুরও কাটিয়ে গিয়েছে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। গিরবরজার চারিদিকে এক ক্রোশের মধ্যে পুকুরের ভাবনা নাই। এক ঝুড়ি মাটি, পাঁচ গণ্ডা কড়ি।

তিন

বিস্তীর্ণ মাঠ চারিপাশে। গিরবরজার সীমানা সাধারণ মৌজার অপেক্ষা অনেক বিস্তীর্ণ। পুকুরও অনেক। জলের ভাবনা এখানে? নিতাই কখনও আসে নাই, জানে না, তাই জলের জন্য চিন্তিত হয়েছে সে। নরসিং হাসলে। গির্‌-বরজার সীমানা ছত্রীরা লাঠির জোরে বাড়িয়েছে। সে বিস্তীর্ণ এলাকা জলে-ফলে-ফসলে ভরে তুলেছে। সে আমলে যখন সিংহ-রায়েদের নেতৃত্বে গিরবরজার ছত্রীরা লুঠ-তরাজ চালাত অবাধে, পাশের গ্রামগুলির শস্যক্ষেত্র থেকে পাকা ফসল কেটে নিয়ে আসত, তখন গিরবরজার চারিপাশ থেকে মানুষের সঙ্গে গ্রামগুলিও সরে পালিয়েছিল। ছত্রীদের অত্যাচারে গড়া গ্রাম ভেঙে কৃষিজীবী

অধিবাসীরা যথাসম্ভব দূরে বসবাস করেছিল। পতিত গ্রামগুলির কৃষিক্ষেত্রও পতিত হয়ে আগাছার জঙ্গলে ভরে উঠে গিবৃবরাজার পতিত সীমা-পরিধি বাড়িয়ে তুলেছিল। সে সীমানার দখল কোনদিন আর ছত্রীরা ছাড়ে নাই। মহারাজ তোডরমলের সনদ এবং শাসনের পর যখন গিবৃবরজার সীমানাভোর জমি তৈরি হল, তখন এই সব পতিত জমি আবার হাসিল হল। গিবৃবরজার সীমানা চারিদিকে এক ক্রোশেরও বেশী। মাঠের মধ্যে যে সব গাছপালায় ঢাকা ছোট ছোট গ্রামের মত দেখা যায়, ওগুলি গ্রাম নয়, সব পুকুর, দীঘি।

শিব-দেবতার অর্চনা নিয়ে খাওয়ানো-দাওয়ানো, সাজ-সজ্জা সমারোহের পাল্লা যখন চলছিল, তখনই সিংহ-রায়দের এক তরফ কাটালে এক দীঘি। নাম হল শিবসায়র। দীঘি কাটিয়ে এক হাজার আট ভার গঙ্গাজল আনিয়ে ঢাললে দীঘির মধ্যে। তখন বর্ষা নেমেছে দেশে। সেই গঙ্গাজলের উপর জমল বৃষ্টির জল, দীঘি ভরে উঠল। দীঘির পাড়ে লাগানো হল আম-কাঁঠালের চারা। মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ঘাট থেকে কয়েক ভার মাছের পোনা আনিয়ে ছেড়ে সেদিন কর্তা যখন বাড়ি এলেন, তখন গিন্নী নাতিকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন—

"আয় আয় আয়, আয় চাঁদ আ-রে—
সোনার কপালে আমাব টিপ দিয়ে যারে ;
গাই বিয়োলে দুধ দেব,
সোনার থালায় ভাত দেব,
রুই মাছের মুড়ো দেব,
মনের সুখে খাবি ;
আম-কাঁঠালের বাগান দেব,
ছাওয়ায়-ছাওয়ায় যাবি।"

কর্তা শুনে হেসে বললে, চাঁদ এতদিন আসে নাই, এইবার আসবে !

গিন্নী কথাটা বুঝতে পারলে না—নাতির কপালে হাতের তালু দিয়ে আঘাত করতেই ভ্রূ কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে কর্তার মুখের দিকে।

কর্তা বললে, গোয়ালে গাই ছিল, বাড়িতে সোনার থালা না থাক্ রুপোর থালা আছে। কিন্তু পুকুর ছিল না, মাছও ছিল না, আম-কাঁঠালের বাগানও ছিল না। তাই চাঁদা-বেটা আসত না। এবার শিব-সায়রের পাড়ে আম-কাঁঠালের চারা লাগিয়েছি, পুকুরে মাছও ছেড়েছি। এবার বেটা ঠিক আসবে লোভে লোভে !

সমস্ত গ্রামে রটে গেল কথাটা। অন্য ছত্রী-কর্তারা মুখ বেঁকিয়ে হাসলে। গিন্নীরা বললে—ও মা! তাই তো বলি সিংহ-রায় বাড়ির নয়া-ববুয়ার নাকের সর্দি শুকোয় না কেন? আসলী চাঁদ এসে কপালে বসেছে কিনা! চাঁদের ঠাণ্ডি—বহুৎ ঠাণ্ডি!

ওটা উপেক্ষা করলেও—ওই শিব-সায়রের জলে শিবের স্নানের ব্যবস্থার কল্পনাটার জন্য ছত্রীরা তারিফ করলে। এ কাজটা ভাল করেছে সিংহ-রায় কর্তা। দেবতার সরোবর না হলে চলবে কেন? এর পর বর্ষার শেষে—যখন পুকুরের পাড়ের চারাগুলি বেশ সতেজ-নরম পল্লব মেললে এবং পুকুরের জলে যখন ঝাঁক বেঁধে পোনাগুলি বেড়াতে লাগল, তখন তারা বললে—হ্যাঁ, সিংহ-রায় কর্তার বুদ্ধি বটে! সিংহ-রায় কর্তা চার পাড়ে চার ঘাট তৈরি করালে। এক ঘাট ছত্রী-বাড়ির মেয়েদের জন্য। এক ঘাট ছত্রী-পুরুষদের জন্য। এক ঘাট অন্য পুরুষের জন্য—অন্য ঘাটে নামবে গ্রামের অন্য মেয়েরা। ছত্রী-মেয়েদের ঘাট বাঁশের 'খলপা'র ঘের দিয়ে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করলে সিংহ-রায় কর্তা। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

কয়েকদিন পর শোনা যায় পনেরো দিন না যেতেই কিন্তু ওই ঘিরে-দেওয়া ঘাটের মধ্যে কয়েক ফোঁটা জলের ছিটকানির স্পর্শে একটা অঘটন ঘটে গেল। 'ছিটে জল আর মিছে কথা' নাকি অসহ্য ব্যাপার! আবার সেই ছিটে জল যদি অশুচি অবস্থায় কেউ ছিটিয়ে দেয়—তবে রক্ষা থাকে না। তাই হয়েছিল। মালিক সিংহ-রায় বাড়ির ঝিউড়ী মেয়ে হৈ-হৈ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে জলের ছিটে লাগল অন্য সিংহ-রায়-বাড়ির গিন্নীর গায়ে, গিন্নী তখন স্নান করে উঠেছেন। গিন্নী পূর্ণ-কলসীর জল ফেলে দিয়ে গা না মুছেই গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরে গিয়ে ছত্রী-বাড়ির চিরাচরিত প্রথায় কুয়ার জল তুলে পুনরায় স্নান করলেন। কয়েকদিন পরেই সে বাড়ির পুকুরের পত্তন শুরু হল। মাস-খানেকর মধ্যে আর এক বাড়িও দীঘি কাটাতে আরম্ভ করলে।

এই দীঘিই বিখ্যাত দীঘি! দীঘির মালিক নাম দিতে চেয়েছিল শম্ভু-সায়র, কিন্তু আপনা থেকেই দীঘির নাম হয়ে গেল 'দাঙ্গা দীঘি'। দীঘি কাটাতে গিয়েই আরম্ভ হয়ে গেল ছত্রীদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ। দীঘির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপ করে চারিদিকে খুঁটো পুঁততেই সিংহ-বংশীয়দের এক তরফ এসে এক দিকের খুঁটো তুলে দিলে। দাবি করলে—এর দশ কাঠা জমি সিংহদের। এবং সিংহদের অংশীদার হিসাবে ওটুকু তার ভাগে পড়েছে।

সিংহ-রায়ের এ তরফ মূল্য দিতে চাইলে। দাবিদার সিংহ বললে, বড়লোক সে নয়, কিন্তু মূল্য নিয়ে জমি বিক্রি করবার মত লক্ষ্মীছাড়াও সে নয়।

সিংহ-রায় তাকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করলে—তুমি বিবেচনা করে দেখ। ও দশ কাঠা নইলে পুকুরটার এ কোণটা সমান হয় না; চার কোণের বদলে পাঁচ কোণ হয়।

—সে দেখবার কথা আমার নয়। চার কোণ করতে চাও তো দীঘির আয়তন খাটাও।

—ভাল, জমি বিক্রি না কর, বদল কর। অন্য জায়গায় ভাল জমি দেব তোমকে।

—ওর চেয়ে ভাল জমি আমার কাছে এ চাকলায় আর নাই। ওই আমার সোনা।

সেদিন স্থগিত রইল পুকুর-কাটার কাজ। মীমাংসার জন্য সন্ধ্যায় মজলিস ডাকবার কথা হল। মজলিসে দেখা গেল, পুকুর যারা কাটিয়েছে সেই দু-তরফ সিংহ-রায়েরা জমির দাবিদার সিংহের পক্ষ অবলম্বন করছে। তৃতীয় সিংহ-রায় তাদের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

তার পর দাঙ্গা। দুজন বাগ্দী লাঠিয়াল খুন হল, সিংহ-রায়ের ছেলের ডান হাতখানা ভেঙে ঝুলতে লাগল! সেই হাত নিয়ে ছ-মাস ভুগে ছেলে মারা গেল।

দেশের অবস্থা তখন অরাজক। ক্রোশ-কতক দূরে বছর কয়েক আগে পলাশীর আমবাগানে তখন নবাব সিরাজউদ্দৌলা হেরে গিয়েছেন ইংরজী-কোম্পানীর কাছে। তার পর জাফর খাঁ নবাব হলেন। তারপর নবাব হলেন কাসিম আলি খাঁ। তাঁর সঙ্গে ফের ইংরাজ-কোম্পানীর লড়াই লাগল। কাসিম আলি খাঁ গেলেন। দেশে ফৌজদার আছে, খায়-দায়, ঘুমোয়, যে ভাল নজর দিয়ে নালিশ করে তার নালিশের আরজি হয়, আবার বিবাদী যদি তার চেয়ে ভাল নজর দেয় তবে সে নালিশ তৎক্ষণাৎ খারিজ হয়ে যায়। যারা অবস্থায় দুর্বল, তারা নালিশ জানাতে লাগল ভগবানের কাছে; যারা সবল, তাদের দাবির মীমাংসা হতে লাগল কাজীর কলমের বদলে লাঠিয়ালের লাঠি-সড়কির আগায়। ঠিক এমনি সময়ে গিরবরজায় গৃহ-বিবাদ বাধল। যেন ঠিক ঋতুতে ঠিক ফসলের বীজ বোনা হল; রাজপুত-রক্ত ক্ষেপে উঠল।

সিংহ-রায়ের বিপক্ষে দাবিদার সিংহ অবস্থায় দুর্বল হলেও সাহসে এবং দেহের শক্তিতে দুর্বল ছিল না। দাঙ্গায় হেরে সে একদিন রাত্রে অশান্ত মনে অন্ধকার উঠানে ঘুরছিল। হঠাৎ ইচ্ছা হল গাঁজা খাবার। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাতে গিয়ে আগুনের ফুলকি গিয়ে পড়ল উঠানে বিছানো খড়ের উপর। খড় দপ করে জ্বলে উঠল। তাড়াতাড়ি সে খড়ের আগুন নিভিয়ে দিল বটে, কিন্তু তার লক্‌লকে শিখায় জ্বলে ওঠার যে ছবি তার গাঁজার-নেশায়-আচ্ছন্ন মাথার মধ্যে জ্বলতে লাগল, সে আর নিভল না। কয়েক দিন পরেই আগুন গিয়ে লাগল সিংহ-রায়ের বাড়ির এক কোণে। ক্ষ্যাপা লাল ঘোড়ার মত ছুটল সে আগুন, বড় বড় নালা লাফ দিয়ে পার হয়ে যায় যেমন লড়াইয়ের ঘোড়া—তেমনিভাবে এ-ঘরের চাল থেকে ও-ঘরের চালে লাফিয়ে পড়তে লাগল! সিংহ-রায়ের বাড়ি-ঘর অর্ধেকের উপর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সিংহ-রায় বুঝলে এবং সজাগ হল। সিংহের মাথার আগুনও সমান তেজে জ্বলতে লাগল। অনেক ভেবে সিংহ তৈরি করলে তীর। লম্বা লোহার ফলার নীচে একটা গোল লোহার চাকতি লাগিয়ে তাতে আঁটা দিয়ে সযত্নে লাগালে তামাক খাবার গোল টিকে। গভীর রাত্রে সেই টিকেতে আগুন লাগিয়ে মজবুত সাঁওতালী ধনুকে জুড়ে দূর থেকে সিংহ-রায়ের বড় ঘরের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়লে সেই তীর! কিছুক্ষণ পর সিংহ-রায়ের বড় ঘরের মাথা জ্বলে উঠল।

সিংহ-রায়ের বাড়ি পুড়েই কিন্তু আগুন নিভল না। গোটা গ্রাম পুড়ে গেল।

সিংহের মাথার আগুন ধীরে ধীরে অনেক ছত্রীর মাথায় জ্বলে উঠল। গিবুবরজার আগুনের খ্যাতি রটে গেল চারপাশে। মধ্যরাত্রে আপন-আপন গ্রামের প্রান্তে দাঁড়িয়ে লোকে আকাশ-আলো-করা রোশনাই দেখত।

যে সব দীঘি এই ছত্রীরা কাটিয়েছিল; তারই জল তুলে ঢেলে ঢেলে ছত্রীরা শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু তাদের আগুন কিছুতে নিভল না। গিবুবরজা পুড়ে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। আগুনের আঁচে লক্ষ্মী-ঠাকরুণ ঝলসে গেলেন; তিনি নাকি কাঁদতে কাঁদতে গ্রাম থেকে চলে গিয়েছিলেন একদিন। তিনি গিবুবরজা থেকে গিয়ে উঠেছিলেন পঞ্চমতির কায়স্থ-বাড়িতে। সে নাকি অদ্ভুত কাহিনী —সকলেই জানে, পাঁচজন প্রবীণে সেই কথা আজও হয়। কিন্তু নরসিংয়ের 'দিদিমা' ঠাকুমার মত সুন্দর করে সে কথা কেউ বলতে পারে না।

যেদিন নরসিং প্রথম এই গল্প শোনে সেদিনের কথা আজও মনে আছে। চৈত্র মাসের সন্ধ্যাকাল; হঠাৎ পশ্চিম পাড়ায় এক সিংহ বাড়িতে আগুন জ্বলে

উঠল। চৈত্র মাসেই সেবার ধূ-ধূ খরা উঠেছিল। নরসিং এবং তার ভাইবোনেরা বসে ছিল বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে শিরীষ গাছের তলায়। দুটো চারটে শিরীষ ফুল ফুটতে তখন আরম্ভ হয়েছে। চামরের মত কেশরওয়ালা একটি শিরীষ ফুল কখন খসে পড়বে, তারই প্রত্যাশায় তারা বসে ছিল। হঠাৎ শব্দ উঠল—আগুন, আগুন, সমস্ত গ্রাম কেঁপে উঠল। জোয়ান মরদেরা উঠল আপন আপন ঘরের চালে। হাতে ভিজানো-খড়ের আঁটি, কলসী-ভরা জল। নীচে উঠানে কলসী ভর্তি জল রেখে ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশে উঠতে লাগল জলন্ত খড়ের কুটি। গ্রামটা ভরে গেল পোড়া খড়ের কালো ছাইয়ে। শিরীষ ফুলের গন্ধ যেন কোথায় উড়ে গেল। দেখতে দেখতে আগুন এসে লাগল নরসিংদের গোয়ালে। জলন্ত খড়ের কুটি সাবধানতা সত্ত্বেও সতর্ক চোখ এড়িয়ে কখন এসে পড়েছিল গোয়ালের চালে। চাল জ্বলে উঠল। ভাগ্য ভাল যে, বসতবাড়ি আর গোয়াল-ঘরের মাঝখানে ছিল ঐ শিরীষ গাছটা।

আগুন নিভল। আগুন নিভিয়ে স্নান করে এসে পুরুষেরা বসল তামাক খেতে। মেয়েরা উঠান পরিষ্কার করে জটলা পাকিয়ে বসল। গিরবরজায় আগুন লাগলে আগুনের আঁচ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই থাকে মানুষের উত্তেজনা। আগুন নিভলে আর কিছু নাই। ম্যালেরিয়ার জ্বরের মত; জ্বর ছাড়লেই রোগীও উঠে বসল। সেই দিন কথায়-কথায় মেয়েমহলে উঠে পড়েছিল সেকালের কথা।

দিদিমা বলেছিল—'মানুষের দশ দশা, কখনও হাতি কখনও মশা'—কখনও অবস্থা ভাল থাকে, কখনও মন্দ হয়। যখন মন্দ হয়, তখন হীরা বেচতে হয় জিরার দামে, সোনা যায় সীসার কদরে; মতির হার পুঁতির মালার মত বিকিয়ে যায়। তাতে মা-লক্ষ্মীর আসন টলে অবশ্য, কিন্তু তবুও যেতে মায়ের মন চায় না। তিনি তাকিয়ে থাকেন—মানুষের মনে আচার-বিচারের ঝিনুকের খোলার ভিতর আছে যে অমূল্য 'মতি', যা চোখে দেখা যায় না, অথচ যার আলোতে চোখ ঝলসে যায়, যা হাতে ছোঁয়া যায় না, অথচ যা মানুষের বুক ভরাট করে রাখে, সাপের মাথার মণির মত মানুষের বুকের সেই মতিকে ছুঁয়ে বসে থাকেন। সেই 'মতি' যখন মানুষের পাপের আগুনে গলে যায়, পুড়ে যায় —মতিচ্ছন্ন যখন হয় মানুষের —তখনই মা-লক্ষ্মী কাঁদতে কাঁদতে চলে যান।

গিরবরজার ছত্রীদেরও সেই মতিচ্ছন্ন হল। মা-লক্ষ্মী থাকতে পারেন আর? তিনি চলে গেলেন। চৈত্র মাস, শুক্ল পক্ষ, ত্রয়োদশী তিথি; চাঁদনির রাত

ঘুটঘুট করছে; খামারে গম যব সরষের আঁটি থরে-থরে সাজানো, গোলায় ধান মড়্-মড়্ করছে, চালে নতুন খড় ঝল্-মল্ করছে। ফুটেছে তিল ফুল মাঠে; উঠানে ফুটেছে টগর বেলা, পথের ধারে ফুটেছে শিরীষ; বাগানে আমের গাছ ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে; গিবুবরজায় মা-লক্ষ্মী মনের আনন্দে স্বপ্ন দেখছেন। হঠাৎ তিনি কেঁপে উঠলেন। এ কি হল! কিসের এ আঁচ? কিসের কালিতে সব কালো হয়ে গেল? কই, সে মতির আলো কই? নিজেদের ঘরে নিজেরাই আগুন লাগিয়েছে ছত্রীরা; আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে হাজার জিভ মেলে, ক্ষ্যাপা লাল ঘোড়ার দঙ্গল ছুটছে, ঘাড়ে নাচছে কালো শিখার লম্বা কেশর। শয়তান তার সওয়ার। লাল হয়ে গেল আকাশ, কালো হয়ে গেল মাটি, লাল ঘোড়ার ক্ষুরের দাপটে ধুলোর মত উঠল ধোঁয়া আর ছাই। মা-লক্ষ্মী কাঁদলেন—দিশেহারা হয়ে গেলেন, চারিদিকে আলোয় আলোময়, কিন্তু তাঁর চোখে সব অন্ধকার ঠেকল। ছত্রীদের বুকের মতি নিজেদের বুকের আগুনের আঁচে ফেটে চৌচির হয়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সেই ছাই উড়ে উড়ে তাঁর দমও যেন বন্ধ হয়ে এল, ছত্রীদের বুকের আগুনের আঁচে যেন তাঁর সর্বাঙ্গ ঝল্‌সে গেল। তিনি তখন চোখের জলে ভেসে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। পথে পথে ছুটে এসে দাঁড়ালেন বারেকের জন্য নদীর ঘাটে। পাঁচমতির কায়স্থ-বাড়ির গিন্নী ছিলেন সেখানে। চৈত্র-পূর্ণিমার লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর আটনে আল্‌পনা দেবেন, তারই জল নিতে এসেছিলেন। নদীর ঘাটে। তিনি বললেন, আহা—মা গো! এই রাত্রে একা তুমি কোথায় যাবে? মা বললেন, আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছে। গিন্নী বললেন, বস মা আমি তোমায় আঁচল দিয়ে বাতাস করি। আঁচল দিয়ে বাতাস দিলেন, যত্ন করে সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিলেন। মা বললেন, আমার কাছে কিছু চাই তো বল। গিন্নী বললেন, কি চাইব মা? দেবতাকে পেন্নাম করি, অতিথিকে সেবা করি, তেষ্টা পেলে জল দিই, শোকা-তাপাকে মিষ্টি কথা বলি, এ কি কেউ কিছু দেবে বলে? মা দেখলেন, গিন্নীর বুকের ভেতর আচার-বিচারের খোলা দুটি খুলে গিয়েছে—তার মধ্যে টল্-মল্ করছে সেই 'মতি'; যে মতি রাজা হলেই পায় না, দেবতারা যার সন্ধানে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান—সেই 'মতি'। তিনি গিন্নীর পিছনে পিছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তাঁদের বাড়িতে ঢুকলেন। এদিকে সে রাত্রে গিবুবরজার সে কি আগুন! সে যেন খাণ্ডব-দাহন হয়ে গেল। ঘরের খড় পুড়ল, দরজা-জানালা পুড়ে গেল। সোনা গলে ছাইয়ের মধ্যে হারিয়ে গেল, থালা-কাঁসা

গলে গেল, বহুজনের ছেলে পুড়ল, মেয়ে পুড়ল, কাঁচা তালগাছ জ্বলে গেল দাউ দাউ করে। সকালবেলায় দেখা গেল, মাঠের তিল ফুলের বেগুনে রঙ কালো হয়ে গিয়েছে।

আকাশের দিকে চেয়ে নরসিং কাঁদছিল। তার কান্না কেউ লক্ষ্য করে নাই। দিদিয়া চুপ করলে। কিছুক্ষণ পর আবার বললে—যা থাকল অবশিষ্ট সোনা রুপো—এর পর থেকেই একে একে গিয়ে ঢুকল ওই কায়স্থদের বাড়ি। তার পর যজ্ঞি শেষ হল, কোম্পানীর মালগুজারি দিলে না ছত্রীরা আপনাদের মধ্যে ঝগড়া করে। পঞ্চাশ টাকা! মাত্র পঞ্চাশটা টাকা! বাস্। সুরযনারায়ণ ডুবলেন আর কোম্পানীর লোক ঘড়ি পিটলে—এক দুই তিন। ছুটে গেল গিরবরজার জমিদারী স্বত্ব। সেও কিনলে ওই পাঁচমতির কায়স্থরা।

দিদিয়া আবার চুপ করলে। কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললে, ও মতি গেলে আর ফেরে না। সোনা রুপো যায় আবার আসে, হীরা বেচে আবার কেনা যায়। কিন্তু মনের যে মতি, সে গেলে আর ফেরে না। বোধ হয় পুরুষ-বরাবরই আর ফেরে না। আজও তো ফিরল না। আজও সেই আগুন দেয় ছত্রীরা আপনাদের ঘরে! হায় রে হায়!

হায় রে হায়ই বটে। দিদিয়া ঠিকই বলেছিল।

বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ্-রায়ের বংশ—তার জ্ঞাতি বন্ধুর বংশধরের মতিচ্ছন্ন হয়ে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে বরকন্দাজী বৃত্তি নিলে শেষে। পাইকের কাজ, চাপরাসীর কাজ, দারোয়ানের কাজ। কাজটা প্রথম অবশ্য দেশোয়ালীর ঘরে তারা নেয় নাই, নিয়েছিল ওই রামনগরের সায়েব-কোম্পানীর রেশম-কুঠিতে। তার পর ক্রমে দেশোয়াল জমিদার ধনীর বাড়িতে। লক্ষ্মী গেল, বৃত্তিহীন হল, তবু চৈতন্য হল না; মাথায় পাগড়ি বেঁধে, গোঁফে তা দিয়ে, পায়ে নাগরা পরে, লাঠি নিয়ে ডাক-হাঁক করে বেড়াত, আর বুক চাপড়ে বলত, "শির লেনে সেকতা—দেনে ভি সেকতা—হামলোক ছত্রী হ্যায়।" অহঙ্কার করতে এতটুকু বাধত না। আবার নানা জাতের অন্য পাইক বরকন্দাজদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলা-মেশা করতেও এতটুকু ঠেকত না। গ্রামের যে বাগ্দী হাড়ী লাঠিয়ালেরা আগেকার কালে ছত্রীদের বাড়িতেই পাইক-চাকরের কাজ করত, তাদেরই বংশধরদের সঙ্গে ছত্রীদের বংশধরেরাও কর্মজীবনে মিশে প্রায় একাকার হয়ে গেল। অবশ্য বাগ্দী হাড়ীরা তাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণামটা করত, আর জলটা ছুঁত না। কিন্তু গাঁজার কল্কে, তামাকের কল্কে চলত হাতে হাতে।

শুধু সিংহ-রায়দের দু-বাড়ি কোনরকমে মান বাঁচিয়ে চলত। তারা কারও বাঁধা-মাইনের চাকরি করত না! তারাও অবশ্য ওই বৃত্তিই নিয়েছিল, কিন্তু তাদের ছিল ঠিকের কাজ। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় টাকা ঠিকে করে কাজ করে আসত। আরও একটা কাজ তারা করত। গিরবরজার লাল ঘোড়ার কারবার। এককালে চাকলায় লাল ঘোড়ার খ্যাতি খুব প্রসার লাভ করেছিল। সামান্য বিরোধেই লাল ঘোড়া ছাড়াটা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সিংহ-রায়দের দু-বাড়ির অসমসাহসী কারবারীরা এক ঘোড়া ছাড়তে নিতেন পাঁচ টাকা, দু-ঘোড়ার জন্যে দশ টাকা, তিন ঘোড়ায় পনেরো, চার ঘোড়ায় কুড়ি। অর্থাৎ, কারও ঘরে আগুন দিতে হলে ঘরের কোণ-পিছু পাঁচ টাকা ছিল পারিশ্রমিক। এক কোণে আগুন দিতে পাঁচ, দু-কোণে দশ, তিন কোণে পনেরো, চার কোণে অর্থাৎ বেড়া-আগুনের জন্য কুড়ি টাকা রেট। সিংহ-রায়েরা আগুন দিয়েও কিন্তু ধর্ম বাঁচাত। আগুন দেওয়ার পর আগুন জ্বলে উঠবামাত্র চীৎকার করে উঠত, "উঠড়ে। দোড়ড়ে। লাল ঘোড়া।" অর্থাৎ উঠ্ রে, দৌড়ে আয় রে, আগুন!

এই চীৎকার করাটা হল ছত্রীদের একটা বিশেষত্ব। ছত্রীদের দৃষ্টান্তে আরও অনেকে—হাড়ী ডোম বাগদীদের দু-দশজন, সৎজাতিরও দু-একজন, মুসলমানদেরও দশ-বিশজন লাঠির কাজ এবং লাল ঘোড়ার কারবারও করত, কিন্তু তারা সকলেই এ চীৎকারটুকু করত না। ছত্রীদের এটা ছিল ধর্ম। এ চীৎকার না করলেই তারা ধর্মে পতিত হত। অসতর্ক ব্যক্তিকে আক্রমণ করা তাদের ধর্মবিরুদ্ধ।

দিদিয়ার সেই আক্ষেপ সেদিন নরসিংয়ের বুকের মধ্যে শেলের মত বিঁধেছিল। সেই কবে কোন্ ছেলেবেলায় চৈত্র মাসের চাঁদনির রাতে শোনা কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে নরসিংয়ের। দিদিয়ার চোখ দিয়ে জল পড়েছিল—চাঁদের আলোয় গালের উপর সে জলের দাগ চক্-চক্ করে উঠেছিল মধ্যে মধ্যে; নরসিংয়ের মনে হয়, সে যেন এই একটু আগে কাঁদতে দেখেছে তাকে। দিদিয়া তাকে বলেছিল—ভাইয়া নরসিং, তুই যেন এ কাজ করিস না। লিখা-পড়ি শিখবি, মানুষের মত মানুষ হবি। কেমন?

নরসিং কথা বলে উত্তর দিতে পারে নাই, উপুড় হয়ে শুয়ে সকলকে লুকিয়ে সে কেঁদেছিল, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল—হ্যাঁ। সে তাই করবে।

পরের দিন সে কুস্তির এবং লাঠির আখড়ায় যায় নাই। তার জেঠামশাই

—এ অঞ্চলের বিখ্যাত শূরবীর মাধব সিং এসে ডাকলে—নরসিং! আখড়ামে কেঁও নেহি গিয়া রে? তবিয়ত কুছ খারাপ হুয়া?

মাধব সিং কোন মতেই বাংলা বলত না। ছত্রীত্ব-গৌরবে সে বলত মেঠো ভুল হিন্দী। ভুলই হোক আর মেঠোই হোক, তাতে তার লজ্জা ছিল না। হিন্দী হলেই হল। তবে দু-দশটা আদব-কায়দার ভাষা তার জানা ছিল। সে কখনও বলত না—আপকা ঘর কাঁহা? বলত—জনাবকে দৌলতখানা কাঁহা? নিজের ঘরকে বলত গরিবখানা। জেঠা মাধব সিংকে মনে হলে আজও নরসিংয়ের বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। দুর্দান্ত মানুষ, বিশাল চেহারা, তার উপর মধ্যে মধ্যে জেঠার মাথা গরম হত। তালু কামিয়ে তার উপর ঘৃতকুমারীর শাঁস চাপাত। চোখ হয়ে উঠত রাঙা জবাফুলের মত। প্রথম কয়েক দিন থম ধরে থাকত। কথা কম বলত। কোন কোন বার অল্পেই যেত, সুস্থ হয়ে উঠত। কোন কোন বার একেবারে ক্ষেপে উঠত। মনে আছে নরসিংয়ের—কোমরে কেবলমাত্র কৌপীন এঁটে প্রকাণ্ড লাঠিগাছটা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় পাঁয়তাড়া ভেঁজে বেড়াত, আর হাঁকত—আও রে কোন্ হ্যায় মর্দানা। আও রে! তার পরই হা-রা-রা হাঁকে লাঠি ঘুরিয়ে সামনের বাড়ির চালের উপর লাঠির আঘাত করত। সামনে কোন বাড়ি-ঘর না পেলে পথের ধারে গাছগুলির উপর চালাত তার লাঠি। আর অট্টহাসি হাসত—হা-হা-হা-হা।

জেঠার প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা নরসিংয়ের মুখ দিয়ে ফুটল না, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কপালে বুকে হাত দিয়ে জেঠা বলেছিল—বরফ কা মাফিক হিম হ্যায়? অাঁ? আরে, তব কেঁও নেহি গিয়া? এও বাতাও!

নরসিং এবার মৃদু কণ্ঠে বলেছিল—পড়ছিলাম।

—কেয়া? ইস্ ওয়াক্ত পড় রহা? আ! লিখা-পঢ়ি? কেঁও? তুম কা গমস্তা হও গে? উল্লু কাঁহাকা!

মাধব সিং আচমকা তাকে দুই হাতে আলগোছে তুলে সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়েছিল। বাড়ি-ঘর খুঁজে কখানা বই-কাগজ যা সে সামনে পেয়েছিল, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু নরসিংয়ের ভাগ্য ভাল যে সেগুলো তার বই নয়।

সেই দিন রাত্রেই নরসিং ঘর থেকে পালিয়েছিল। পালিয়ে এসেছিল এই ইমামবাজারে। ইমামবাজারের পাশে আকুলি গ্রামে একঘর ছত্রী আছে—এই আকুলি গ্রাম হল তার মামার বাড়ি। মামার বাড়িতে এসে সে উঠেছিল।

সেই তার জীবনে প্রথম মামার বাড়িতে পদার্পণ। গিরবরজার ছত্রীরা বিয়ে করে বউ নিয়ে আসে—সে বউ আর কখনও গিরবরজার সীমানা থেকে বাইরে যেতে পায় না। এই তাদের সেই পুরনো কাল থেকে নিয়ম। কালে কালে অবস্থার পরিবর্তনে ছত্রীদের অনেক ব্যবস্থার ওলট-পালট হয়েছে, কিন্তু মেয়েদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। পুকুর কাটানোর কল্যাণে মেয়েদের বাড়ির পাতকুয়োর তোলা-জলে স্নানের পরিবর্তে পুকুরঘাটে স্নানের রেওয়াজ হয়েছে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এখন মেয়েরা বাসনও মাজে, ঘুঁটেও দেয়, গ্রামের পথে বেরিয়ে এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে ওপাড়া পর্যন্তও যায়, এমন কি বাগ্দীপাড়ায় শাক-মাছ কিনতেও যায়; কিন্তু তার বেশী নয়, গ্রামের সীমানার বাইরে তাদের বেরুবার হুকুম নাই। নরসিংয়ের মায়েরও সেই নিয়মে কখনও বাপের বাড়ি আসা ঘটে নাই, তবে সে শুনেছিল, রামনগরে রেশমের কুঠি আছে, কুঠির চিমনি দেখা যায় দু-ক্রোশ দূর থেকে; সেই রামনগরের নদী পার হয়ে ওপারে সড়ক চলে গিয়েছে ইমামবাজার পর্যন্ত; ইমামবাজার ঢুকবার মুখেই আকুলিয়া গ্রাম। আকুলিয়ার মোড়েই সরকারী ডাকবাংলো। ডাক-বাংলোর পরেই আছে পুরনো একটা নীলকুঠির ভাঙা বাড়ি, সেই ভাঙা বাড়ির পাশেই আকুলিয়ার ছত্রীদের বাড়ি। ধরণী রায়—তার মামা।

আজও স্পষ্ট মনে আছে নরসিংহের। দুপুরবেলা সে এসে দাঁড়িয়েছিল মামার বাড়ির দরজায়। বগলে পুঁটুলির মধ্যে ছিল দুখানা কাপড় আর তার বই কখানা। ইমামবাজারে বড় ইংরেজী ইস্কুল আছে। সেই ইস্কুলে পড়বে, এই সংকল্প নিয়ে বাড়ি থেকে সে বেরিয়েছিল। তার মামার ছেলে-পুলে নাই, মামা তাকে খুব ভালবাসে। কতবার এসেছে তাদের বাড়ি।

মামা বাড়িতে ছিল না। মামী উনোনশালে বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিল। নরসিং তাতে বিস্মিত হয় নাই—গিরবরজাতেও মেয়েরা তামাক খেত। মামী তাকে দেখে লজ্জিত হয়ে পাশে হুঁকোটা নামিয়ে প্রশ্ন করেছিল—কে গো তুমি?

মামী কখনও গিরবজায় যায় নাই, নরসিংকে চেনবার কথা নয়।

নরসিং বলেছিল, আমার বাড়ি গিরবরজায়। আমি নরসিং। বাবু ধরণী রায় আমার মামা।

বসন্তকালের দু-পহর বেলা। সকালবেলাটা ঠাণ্ডা থাকলেও দুপুর-রোদ

বেশ চন্‌চনে হয়ে উঠেছে। তার উপর ইঞ্জিনটা হয়েছে গরম। রেডিয়েটারের খোলা মুখ থেকে এখনও ধোঁয়া বার হচ্ছে। নদীর বালি ঠেলে যখন উপরে উঠেছিল, তখনই আর একবার ঠাণ্ডা জল দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নদীর ওপর থেকেই নরসিংয়ের মন কেমন হয়ে গিয়েছে। পুরনো আমলের গল্পের ঘোর ধরে গিয়েছে যেন। ইমামবাজারে প্রথম বাবুদের শখের থিয়েটার দেখে তার মনে যেমন ঘোর ধরেছিল—তেমনি ঘোর। জল নেওয়ার কথা আর তার মনেই হয় নাই। রামটা ছেলেমানুষ, তার উপর একেবারে বুদ্ধিহীন। নেহাত সে তার সম্বন্ধী, আর অবস্থা বড়ই খারাপ হয়েছে ওদের, তার উপর স্ত্রী মরবার সময় হাতে ধরে তাকে বলে গিয়েছে 'রামকে দেখো', তাই সে রামকে রেখেছে। বেহুঁশ ছোক্‌রা। দোষ নিতাইয়ের। নিতাইয়ের ভুল হওয়া উচিত হয় নাই। পুকুরে গিয়ে এতক্ষণ ধরে তারা করছে কি? পুকুর খুঁড়ে জল তুলছে নাকি?

পিছনে একখানা গরুর গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটা একটানা ক্যাঁ শব্দ—উঠে থেমে যাচ্ছে শব্দটা, একটি নির্দিষ্ট সময় পরেই আবার সেই একটানা শব্দ আরম্ভ হচ্ছে—ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ। দুপুরবেলা মাঠের মধ্যে দূর থেকে শব্দটা শুনলে মন কেমন ঝিমিয়ে আসে। নরসিং পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলে একটা টাপর-দেওয়া গাড়ি আসছে। যাত্রী চলেছে। নরসিং ব্যস্ত হয়ে উঠল। গাড়িখানা এসে আটকে যাবে। মাঠ দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলে নরসিং পড়বে ঝঞ্ঝাটে। ধুলো খেতে হবে খানিকটা। হর্ন দিয়ে—তেমন গোঁয়ার গাড়োয়ান হলে ধমক দিয়ে, গালিগালাজ করে মাঠে নামিয়ে পথ খোলসা করে নিতে হবে। নরসিং হর্ন দিতে আরম্ভ করলে, নিতাই এবং রামকে সে সংকেত জানাসে। হর্ন দেওয়ার ভঙ্গির মধ্যে তার অসহিষ্ণুতা সুপরিস্ফুট। ক্রমশ হর্নের শব্দ উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে আরম্ভ হল।

—এই নিতাই! হারামজাদা শূয়ার-কি বাচ্চা! ওরে—উল্লুক—ক—রা—মা—!

রামা—আকারের লম্বা টানটা তার শেষ হল না, পিছনে একটা হুড়মুড় শব্দে সে চমকে উঠল। চকিত হয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে সে দেখল, পিছনের গরুর গাড়িটা মাঠের পথের পাশের মাটির বাঁধের উপর থেকে উল্টে পড়ে গিয়েছে। একটা গরু দড়ি ছিঁড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে, অন্যটা উল্টে-যাওয়া গাড়িটার চাপে মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। গাড়োয়ানটা

বোধ হয় আগেই লাফ দিয়ে পড়েছিল এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ত্রস্ত-চকিত স্বরে একবার বলছে—এই যা, মলো মলো! আর একবার পলায়নপর গরুটাকে হেঁকে বলছে—হ্-হ্-হ্! এই—হ্-হ্!

লাফ দিয়ে নেমে এল নরসিং। প্রথমেই গাড়োয়ানটার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে—হ্-হ্ করবি পরে। গাড়ি তোল্ আগে। পকেট থেকে ছুরি বার করে চাপা-পড়া গরুটার দড়ির বাঁধন কেটে দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে গাড়ির জোয়ালটাকে তুলে ধরলে। গরুটা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। নরসিং ধমক দিয়ে গাড়োয়ানটাকে বললে—সোওয়ারীর কি হল দেখ্। সোওয়ারী ছিল গাড়িতে?

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলে নরসিং—মানুষ দেখা যায় না, শুধু তামাকের বোঝা। পিছন দিকে এসে সে উঁকি মারলে। তামাকের বোঝার নীচে থেকে কাপড়ের খানিকটা বেরিয়ে আছে দেখা যাচ্ছে।

তামাকের বোঝা ঠেলে টেনে বার করলে নরসিং। একজন নয়, দুজন। একজন প্রৌঢ় আর একটি বিধবা যুবতী মেয়ে। তামাকের বোঝা চাপা পড়ে দুজনেই হাঁপাচ্ছে, আঘাতও অল্প-অল্প লেগেছে, টাপরের বাখারির খোঁচায় মেয়েটির কপাল কেটে গিয়েছে। প্রৌঢ়ের কাঁধে খোঁচা লেগেছে।

জল চাই। নিতাই ও রামের জন্য নরসিং মাঠের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। ওই দুজনে নবাবী চালে আসছে। নরসিং হাঁকলে—জলদি। এ—ই! জলদি।

চার

মেয়েটির রূপ আছে, সুন্দরী মেয়ে। সব চেয়ে সুন্দর তার গায়ের রঙ আর চুল। গায়ের রঙ তার যত ফরসা, চুলের রঙ তত ঘন কালো। দুপুরের রৌদ্রে তার মুখখানি সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠেছে, শুভ্র স্বচ্ছ ত্বকের নীচে রক্তোচ্ছ্বাস যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। রাঙা টক্‌টকে মুখের মধ্যে চোখের পাতাগুলি এবং ভ্রূ দুটিও ঘন কালো; ছোট কপালটিকে ঘিরে ঘন কালো রুক্ষ চুলের রাশি ফেঁপে-ফুলে রয়েছে, তাতেই মেয়েটিকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। তেমনি তাকে মানিয়েছে সাদা থান-কাপড়ে; নিরাভরণ বৈধব্যেই যেন তাকে সব চেয়ে ভাল দেখায়। মেয়েটি অল্পেই উঠে বসল। উঠে গায়ের কাপড় সংবৃত করে মাথায় অল্প ঘোমটা টেনে দিয়ে নিতান্ত নিরাসক্তের মত বসে রইল। সঙ্গী

প্রৌঢ়ের জন্য কোন আকুলতাই তার দেখা গেল না। সে উঠে বসতেই নরসিং প্রৌঢ়ের কাছে এল। নিতাই তার মুখে জল দিচ্ছিল। লোকটি মাটির উপর তখনও পড়ে ছিল। চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে আর ক্রমাগত কাশছে লোকটি। নাকে, মুখে, চোখে তামাকের গুঁড়ো ঢুকেছে বেচারার। কালো বেঁটে মোটা লোক, কাপড়-চোপড় পরার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারা যায়, এদেশী মানুষ নয়। নরসিং এক-নজরেই চিনলে—লোকটি হয় ভকত-টকত অর্থাৎ মাড়োয়ারী, নয় তো সাহু-টাহু অর্থাৎ হিন্দুস্থানী বেনিয়া কেউ হবে; তামাকের ব্যবসা করে। লোক সে হরেক রকমের দেখেছে তার গাড়ির কল্যাণে। নিতাইয়ের হাত থেকে জলের টিনটা নিয়ে বেশ খানিকটা জল দিয়ে তার মুখ ধুইয়ে দিয়ে বললে—উঠুন—উঠে বসুন।

লোকটি কোন সাড়া দিলে না, তেমনিভাবেই পড়ে রইল। নরসিং আবার বললে—উঠুন। শুনছেন?

নিতাই বললে—ভূঁটে প্যাটে মার এক খোঁচা, এখুনি কোঁক করে কোলা ব্যাঙের মতন লাফিয়ে উঠে বসবে। না হয় তো কাতুকুতু দাও। ন্যাকামি করে পড়ে আছে বেটা।

বাম হি-হি করে হাসতে শুরু করে দিলে। মেয়েটি মুখে কাপড় দিয়ে ঘুরে বসল। নরসিং লোকটির হাত ধরে টেনে তুলে বেশ যত্ন করে বসিয়ে দিলে, বললে, লাগে নাই তো বেশী, এমন করছেন কেন? উঠে বসুন।

উঠে বসেই লোকটি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।—অ রে বাপ রে বাপ, হামারা জান চলা গয়া রে বাবা, মর গেইলো রে বাবা! হায় ভগোয়ান!

নরসিংয়ের ইচ্ছা হল একটি চড় কষিয়ে দেয় লোকটির গালের উপর। এই দুপুর রৌদ্রে নিজের গাড়ি ফেলে লোকটার ন্যাকামি শোনা তার কাছে অসহ্য বোধ হচ্ছিল ক্রমশ। তবুও ভদ্রতা রক্ষার জন্যই সে চুপ করে রইল, হাজার হলেও গাড়ি উল্টে তামাকের বোঝা চাপা পড়ে খানিকটা চোট পেয়েছে লোকটা।

পরক্ষণেই কিন্তু লোকটা উঠে দাঁড়াল, গাড়োয়ানটার দিকে হাত বাড়িয়ে এক মুহূর্তে কান্না থামিয়ে গর্জন করে উঠল—হারামজাদে উল্লুকে বাচ্চে—তুম হারামজাদে হামারা জান মার দেতা! তার পর আর সাধারণ গালিগালাজে তার কুলিয়ে উঠল না, আরম্ভ করলে অশ্রাব্য, অশ্লীল গালাগাল। তার পর আরম্ভ করলে শাসন—তোরা ছাল উতার লেবে হামি, হাড্ডি তোড় দিবে; ফাটকমে ভেজবে হামি শালাকো।

তার পরই অকস্মাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল আরও উগ্র এবং উচ্চ কণ্ঠে—আরে হারামজাদী কুত্তী বে-শরমী কাঁহাকা, তু হাসছিস? কেনে হাসছিস? কাহে? কাহে? বলতে বলতে সে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

মুহূর্তে পাংশু হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, ত্রস্তভাবে সে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। নরসিং আর আত্মসংবরণ করতে পারলে না, খপ করে সে পিছন থেকে লোকটির হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে টেনে আটকে দিয়ে বলে উঠল—এই-য়ো!

সে ঝাঁকানি এবং ধমক খেয়ে লোকটি চমকে উঠল—এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না; নরসিংয়ের মুখের দিকে সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। নরসিং বললে, কি রকম লোক মশাই আপনি? এই একেবারে হাউ-মাউ করে কেঁদে সারা, আর এই একেবারে গাড়োয়ানের ওপর বীর-বিক্রম, এই মেয়েলোককে মারতে ছুটছেন! আপনার মাথা-টাথা খারাপ নাকি!

নিতাই বলে উঠল—পিঠের চামড়া তুলবার, হাড় ভাঙবার আর আইন নাই, বুঝলেন। সে তুমি যে হবে সেই হও—রাজাই হও আর মহারাজাই হও। আর মেয়েলোকের গায়ে হাত তুললে তোমাকেই যেতে হবে ফাটকে, হ্যাঁ।

নরসিংয়ের রাগ খানিকটা বেড়ে গেল, অকারণে যেন বেড়ে গেল, সে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললে—গাড়োয়ান তোমাকে ইচ্ছে করে ফেলে দেয় নাই। আর মেয়েটিই বা কি দোষ করলে তোমার কাছে?

রাম হি-হি করে হেসে উঠল, মেয়েটির সে মুখ-ঘুরিয়ে-হাসি সে দেখছিল, বললে—পচা কুমড়োর মত ওই ভুঁড়ি-নাচ দেখলে কেউ না হেসে থাকতে পারে? হাসির বেগ সামলাতে না পেরে সে এবার বসে পড়ল।

নরসিং এবার তাকেও ধমক দিয়ে উঠল—রাম!

লোকটি এতক্ষণে কথা বললে। শান্ত ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে বললে, হামারা হাত ছোড় দিজিয়ে। তার সে কথা বলার ভঙ্গিতে ও কণ্ঠস্বরে নরসিং আশ্চর্য হয়ে গেল। কে বলবে যে, এই লোকটাই কয়েক মুহূর্ত আগে সঙের মত হাত-পা ছুঁড়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত চীৎকার করছিল!

লোকটি আবার বললে, আপনি হামার জান বাঁচাইয়েছেন। আপনাকে সাথ হামি তকরার করবে না। লেকেন হাত ছোড়িয়ে দিন।

নরসিংয়ের হাত আলগা হয়ে গেল আপনা থেকে। লোকটি টেনে নিলে নিজের হাত।

লোকটি বললে—গাড়োয়ানের বাত শুনেন তো হামার পাশ। বিচার

করেন তো। আঙুল বাড়িয়ে গাড়োয়ানটাকে দেখিয়ে সে বললে, উকে হামি বারণ করলাম দফে দফে, বারণ করলাম—মাঠকে ভেতর মত্ যাও, গাড়ি খাড়া রাখো মোটরকে পিছে। মোটর চলা যায়গা তো গাড়ি চালাও। নেহি শুনা হামার বাত। বোলা কি—ধূলা হোগা। আওর উসকা এক বাত—'দেখেন তো, দেখেন তো, মাঠের ভিতর কেমন মজা করে যাব। দেখেন তো।' ফিন হাম মানা কিয়া। মেরে বাত নেহি শুনা। হটসে গাড়ি ঘুমা দিয়া মাঠের উধার—গরু চড় গেয়া নালাকে বাঁধ পর। আপ হর্ন দিয়া; ডরকে মারে গরু মার দিয়া লাফ! বাস্, উলট্ গিয়া গাড়ি। কথা শেষ করে সে নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তার পর বললে—আর আপ বোলিয়ে তো উসকা কসুর হ্যায় কি নেহি?

নরসিং, রাম, নিতাই তিনজনকেই স্তব্ধ হয়ে থাকতে হল এবার। গাড়োয়ানের অপরাধ এর পর স্বীকার না করে উপায় কি?

লোকটি এবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলে—তুচ্ছতায়, ঘৃণায় সে হাসি মর্মান্তিক। এবং সে হাসিও সাধারণ লোকে হাসতে পারে না। হেসে সে বললে—আউর ওই মেইয়া লোকটির বাত শুনবেন? উসকে হামি কিনে আনছি মোশা। আঢ়াই শও রুপেয়া দিয়া ওকরা বাপকে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল তিনজনে।

লোকটি বললে—মাইয়া লোকটাকে পুকুর-ঘাটসে পাকড়কে লিয়ে গিয়েছিল চার আদমী—দোঠো মুসলমান, এক আদমী বগ্‌দী, এক আদমী হাড়ী। কেস হুয়া। উ চার আদমীকে জেল হো গেয়া। লেকেন কেসমে বাপকে দেনা হো গেয়া। গাঁওমে পতিত হুয়া। হাম দিয়া আঢ়াই শও রুপেয়া উসকো বাপকো। উ বেটিকো দিয়া হামার সাথ—হামারা বাড়িমে ঝিকে কাম করবে। আবার সে একটু থামলে, তার পর প্রশ্ন করলে, বোলিয়ে তো—ওকরা হাসনে কা একতিয়ার হ্যায়?

নরসিং অবাক হয়ে গেল। সে শুধু ফিরে তাকালে ওই মেয়েটির দিকে। মেয়েটি যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। মাটির দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, মাথার ঘোমটা কখন দুপুরের বাতাসে উড়ে খসে পড়েছে, কিন্তু সে বোধও তার নাই।

লোকটি আবার হাসলে। তার পর বললে—ই গাড়ি কিসকা হ্যায়? আপ তো ডেরাইবর হ্যায়।

নরসিং ওই প্রশ্নে একটু সচেতন হয়ে উঠল এবং ওই প্রশ্নে একটু বিরক্তও

হল। গাড়ি কিসকা হ্যায়? সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে—হাঁ, ড্রাইভ আমি নিজেই করি। লেকেন গাড়ি হামারা হ্যায়।

নিতাই পরিষ্কার করে দিলে কথাটা—ট্যাক্সি হ্যায়। সিংজীই মালিক হ্যায়, নিজেই ড্রাইভ করতা হ্যায়।

—ট্যাক্সি?

—হাঁ—হাঁ—ভাড়াকে মোটরগাড়ি।

হাসলে লোকটি—জানতা হ্যায় হাম। লেকেন ইধার কাঁহা যায়গা ট্যাক্সি?

নরসিং গম্ভীরভাবেই বললে—বাড়ি যাতা হ্যায়, গিরবরজা গাঁও জানতা আপ?

—হাঁ হাঁ।

—ওহি হামরা গাঁও।

—হাঁ, আমি শুনিয়েছি কি ছত্রী লোগের এক লেড়কা ইমামবাজারমে ট্যাক্সি কিয়া হ্যায়। হামারা নাম আপ নেহি শুনা? শুখনরাম সাহু, শহর শ্যামপুরমে হামারা গদি। তামাকু চাউলকে কারবার। গিরবরজামে হামারা তিন চার খরিদ্দার খাতক হ্যায়।

নামটা নরসিংয়ের পরিচিত, লোকটা মস্তবড় ব্যবসাদার। কিন্তু ওই উদ্ধত ভঙ্গি নরসিংয়ের ভাল লাগল না। সে বললে—না। কই, আপনার নাম আমি শুনি নাই কখনও। সঙ্গে সঙ্গে সে মোটরের দিকে অগ্রসর হল। বললে—নিতাই, জল দে রেডিয়েটারে। বেলা অনেক হয়ে গেল।

—আর শুনো—শুনো—কি নাম তুমার?

নরসিং কথার উত্তর দিলে না। নিতাই কিন্তু লোকটির দিকে ফিরে না তাকিয়ে পারলে না।

—শ্যামপুর পৌঁছা দেগা হাম-লোগনকে?

হেসে নিতাই বললে—কত ভাড়া দেবেন?

—তুমলোক বোলো—কেতনা লেগা?

এবার নরসিং বললে—লোকটাকে জব্দ করবার জন্যেই—পঞ্চাশ টাকা।

—পচাশ? ভ্রূকুঞ্চিত করে লোকটি বললে—পনরো মাইল রাস্তা যানেকা লিয়ে পচাশ রুপেয়া?

নরসিং বললে—গাড়োয়ানটাকে পাশের গাঁয়ে পাঠিয়ে একখানা গরুর গাড়ি দেখ; নে রে নিতাই, মার হ্যাণ্ডেল।

—রোখো! পচাশ রুপেয়াই দেবে হামি। লোকটা অগ্রসর হয়ে এসে গাড়ির দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়াল।

পঞ্চাশ টাকা! নিতাই নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নরসিং বললে—দে দরজা খুলে।

লোকটা বিচিত্র লোক। গাড়িতে উঠেই সিগারেট বার করলে। নরসিংকে দিয়ে বললে—লেও ভাইয়া।

নরসিং মাথা নেড়ে বললে—না থাক্।

লোকটা পিছনের সিট থেকে উঠে নরসিংয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বললে—কেয়া ভাই—হামার পরে গোসা করিয়েছে তুম্‌হি? না—কেয়া? কি কসুর করলাম ভাইয়া?

নিতাই বুঝেছিল ব্যাপারটা—সে বলে উঠল—কি আপনি তুমি তুমি করছেন বলুন তো? ট্যাক্সি চালাই বলে আমরা কি ছোটলোক নাকি?

—আরে রাম-রাম-রাম! রাম কহো ভাইয়া। ইসকো লিয়ে গোসা কিয়া! আরে ভেইয়া বোলিয়ে তো—আপনা লোগসে হামারা কেতনা উমর বেশী হুয়া? আরে দেখিয়ে তো মাথা হামারা—একদম সব সাদা হোইয়ে গেলো। হামি দাদা—আপলোক ভাই। বলে সে হা-হা করে হেসে উঠল।

নিতাই এবার হেসে ফেললে, বললে—তা যদি বলেন, তবে কথা নাই।

রাম হি-হি করে হেসেই চলেছিল—সে নিতাইয়ের কানে কানে বললে—লোকটার কানের চুল দেখ মাইরি—যেন রামছাগলের দাড়ি! সে শুধু লক্ষ্য করছিল—লোকটার কোথায় কি হাস্যকর কুশ্রীতা আছে।

নরসিংয়ের পিঠে হাত দিয়ে শুখনরাম আবার বললে—লেও ভেইয়া—পিয়ো সিগরেট! এবার সে নরসিংয়ের মুখে গুজে দিলে সিগারেট।

সঙ্গে সঙ্গে নিতাই ক্ষেত্রটাকে লঘু করে তুললে বেশ একটি সরস রসিকতা করে। বললে—দাদা লও—সাওজী আমাদের ঠাকুরদাদা। "ঠাকুরদাদা, পেয়ারা খায়।" না কি সাওজী?

সাওজী খুশী হয়ে উঠল—বহুত আচ্ছা—পিয়ো, তুম্‌ভি সিগরেট পিয়ো।

রাম হঠাৎ প্রচণ্ডবেগে হি-হি করে হেসে উঠল—বললে—ওই মেয়েলোকটি আমাদের ঠাকরন-দিদি—না কি সাওজী?

হাড়ে বাতাস লাগে। বিধাতা মুখপোড়ার দেখা পাই তো একবার জিজ্ঞাসা করি—তোর করণটা কি? সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে ডাকত বাউড়ী ঝিটাকে—বলি ওলো ও হারামজাদী,—ও গতরখাকী! বলি আর আসবি কখন? তার পর পড়ত নরসিংয়ের উপর—আর তুমি তো বাবা নবাবজাদা, বাদশাহের ভাগ্নে, তোমাকে তো কিছু বলবার জো নাই আমার! পড় বাবা পড়, পড়ে হাকিম হবে—আমীর হবে—আঁটকুড়ো মামাকে পিণ্ডি দেবে—মামা বত্রিশটা দাঁত বার করে সোনার রথে চড়ে সগ্‌গে যাবে।

বলে হনহন করে গিয়ে গরুগুলোকে বাইরে বার করত। ফেরবার পথে আবার বলত, দিব্যি দিয়ে রাখছি তোমাকে, আমাকে যেন পিণ্ড দিও না তুমি।

মামার গলার শব্দ শোনা যেত এই সময়, মামা ফিরত প্রাতঃকৃত্য সেরে। মামী আবার ঘুরে পড়ত মামার উপর। গাঁজার সরঞ্জাম, আয়না-চিরুনি, কাপড় বার করে দিত আর বলেই চলত—এ পোড়া দেহ পাত হলেই বাঁচি, আমার খেয়ে সুখ নাই, ঘুমিয়ে শান্তি নাই, খেটে-খেটে আমার পরমায়ু কমে গেল। দেহের সুখ-অসুখ নাই, মনের ভাল-মন্দ নাই, বারো মাস সেই বাঁদীগিরি।

মামা বলত—থাক্ থাক্, আমি নিজেই সব নিচ্ছি, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

—না না না। এত 'ছেন্দায়' কাজ নাই।

—না। আমার কাজ তোমাকে করতে হবে না। আমার হাত-পা আছে। আমি অক্ষম নই।

—ভাল হবে না বলছি। আমি মাথা খুঁড়ব। বলতে বলতে মামী সব জিনিসপত্র এনে নামিয়ে দিত। মামা জিনিসপত্রগুলিকে সরিয়ে দিয়ে বলত—নেই লেগা হাম। নেই লেগা। বলে জিনিসগুলিকে উঠিয়ে নিয়ে যেত—যেখানে ছিল সেইখানে।

মামী চীৎকার করত—যদি না নাও তো আমার মরা মুখ দেখ; তা হলে মাথা খাও।

মামা আবার জিনিসগুলি নিয়ে বসত যথাস্থানে।

মামা চলে গেলেই ঘরের দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে আবার এক দফা শুয়ে পড়ত। কোনদিন মরা বাপের জন্য কাঁদত। কোনদিন নিজের মন্দ ভাগ্যের জন্য কাঁদত। কোনদিন নিজেই মাথা টিপত আর কাতরাত।—ও বাবা, ও মা! তার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে শুরু হত।

ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়ে মামী উঠে বসে কিছুক্ষণ হাই তুলত, আড়মোড়া ভাঙত তার পর আরম্ভ করত ভাঁড়ার ও রান্নার কাজ। এর মধ্যেই বেজে যেত সাড়ে ন'টা, দশটা।

সভয়ে নরসিং বলত—ইস্কুলের বেলা হল মামী।

মামী বলত—তার মামী কি করবে বাবা?

নরসিং একটু ভেবে বলত—চারটি মুড়ি দাও আমাকে।

মামী বলত—মুড়ি এখন দু-দিন ভাজতে নাই, পান্তাভাত আছে, খাও তো খাও।

পরদিন নরসিং পান্তা ভাতই চাইত, কিন্তু মামী বলত—পান্তা ক'টা যদি তোমাকেই দোব, তবে ঝিয়ের পাতে দোব কি আমি? মুড়ি দিচ্ছি গেলো, গিলে যাও।

রাত্রে ভাত খেত মামার সঙ্গে। তখন ইচ্ছে হত রাক্ষসের মত খায় সে, কিন্তু মামীব ভয়ে ভাত সে দ্বিতীয়বার চাইতে পারত না।

দেড় মাস। দেড় মাস সে মামার বাড়িতে ছিল। দেড় মাসের মধ্যেই নিজেই বুঝতে পারলে, সে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইস্কুল দু-মাইল পথ, এই পথটা হাঁটতে সে দু-তিনবার বসত—পথের ধারের গাছতলায়। দেড় মাস পর হঠাৎ সেদিন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বেধে গেল। মামা কেমন করে জেনে ফেলেছিল—নরসিংয়ের দিনে ভাত না পাওয়ার কথা।

মামী স্পষ্ট বলে দিলে মুখের উপর—আমি পারব না, পরের ছেলের জন্যে দশটায় ভাত রাঁধতে আমি পারব না।

মামী হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল যেন। সে নরসিংকে বলে উঠল—মর্—মরে আমার পেটে আয়—আমি তখন—

মামী কথা শেষ করতে পায় নাই। মামা চীৎকার করে উঠেছিল জানোয়ারের মত। নরসিংও সে চীৎকারে আঁতকে উঠেছিল। মামী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার পরেই সে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল দিয়েছিল।

মামা কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ উঠে নরসিংয়ের হাত ধরে বলেছিল —চল—আও হামারা সাথ!

টেনে—প্রায় টানতে টানতে নরসিংকে নিয়ে গিয়ে মামা উঠেছিল—ইমাম-বাজারের রাধাশ্যামবাবুর বাড়ি। বাবুদের কয়লার ব্যবসা আছে, ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কণ্ট্রাক্টরি করে, জমিদারিও কিছু আছে, বাবুরা বড়লোক। শুধু বড়লোকই

নয়, অন্নদান করে বাবুরা। দু-তিনটি ছাত্র বাবুদের বাড়িতে খেয়ে ইস্কুলে পড়ে। ধরণী রায় ডাকবাংলোর অনেক দিনের কীপার; ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের ওভারসিয়ার ইঞ্জিনিয়ার তাকে ভালোওবাসে এবং তাদের হুকুম নিয়ে অনেক দিন থেকেই কণ্ট্রাক্টর হিসাবে বাবুদের বাড়িতেও যাওয়া-আসা করে, এই দাবিতে ধরণী রায় নরসিংকে নিয়ে এসে বাবুর সামনে নমস্কার করে দাঁড়াল—এই আমার ভাগ্নে। ইস্কুলে পড়ছে। ওকে চারটি করে ভাত আপনাকে দিতে হবে।

নরসিং সবিস্ময়ে চারিদিক দেখছিল। গিরবরজার বাইরে তার জীবনের পরিচয় খুব বেশী নয়, তবে পাঁচমতি বার-কয়েক গিয়েছিল—পাঁচমতির ধন-ঐশ্বর্য, জাঁক-জমক সে দেখেছে; সে ধন-ঐশ্বর্যের কাছে এ বাড়ির ঐশ্বর্য কিছু নয়, তবুও ছোটখাটোর মধ্যে হালকা অথচ ঝরঝরে তকতকে ব্যবস্থা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। পাঁচমতির বাবুদের আস্তাবলে ঘোড়া আছে, পিলখানায় হাতি আছে, একটা লম্বা বারান্দায় পালকি ঝুলানো আছে, সহিস মাহুত বেহারা সর্দার, সে অনেক ব্যাপার! এখানে কাঠের তাকের উপর রাখা আছে চারখানা চকচকে দু-চাকার গাড়ি। দুজন হাফপ্যাণ্ট-পরা ছোকরা ন্যাকড়া দিয়ে আরও দুখানা গাড়ি বারান্দায় পরিষ্কার করছে। হঠাৎ ভট্-ভট্ শব্দ করে একখানা জবরদস্ত দু-চাকার গাড়ি এসে দাঁড়াল। মোটা চাকা—অনেক কলকব্জা—পিছনের দিকে একটা নল থেকে ভক-ভক করে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে এল। গাড়ি থেকে নামল —একেবারে ফিটফাট সায়েবী-পোশাক-পরা—একজন অল্পবয়সী বাবু। নেমেই টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে খট-খট করে এসে ঘরে ঢুকল।

মামা ধরণী রায় খুব সম্ভ্রমভাবে নমস্কার করে বললে—এই আমাদের মেজ হুজুর চলে এসেছেন। আর ভাবনা নাই!

—বল কি রায়! আমার জন্যে কোন্ দুর্ভাবনায় তোমার ঘুম হচ্ছিল না! নাও একটা সিগারেট খাও। তার পর ধীরে সুস্থে শোনা যাবে তোমার দুর্ভাবনার কথা।—বলে মেজবাবু কৌটো খুলে একটা সিগারেট বার করে দিলে। মেজবাবুর কথার ধরনের মত কথার ধরন নরসিং এর আগে কখনও শোনে নাই। অদ্ভুত লাগছিল তার মেজবাবুকে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী তার মনকে আকর্ষণ করছিল ওই কলকব্জাওয়ালা দু-চাকার গাড়িটা, ইচ্ছা হচ্ছিল ওটাকে সে একবার নেড়ে দেখে। একবার ছোঁয়। শুধু ছুঁয়ে দেখা।

মেজবাবুর সেই মোটরসাইকেলটা তার জীবনে এমন রঙ ধরিয়েছিল যে, সে রঙ এখনও ফিকে হল না। তার বড় ইচ্ছা ছিল—ঠিক মেজবাবুর মত

চোখে একটা নীল চশমা এঁটে ঐ গাড়িটাতে চেপে পায়ের চাপে সেই পাদানির মত হ্যাণ্ডেলটাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়িটাকে ছেড়ে দেয়। উড়ে চলে গাড়িটাতে চেপে। তার মনে হত গাড়িটা রাস্তার উপর দিয়ে চলে না—শূন্যলোক দিয়ে উড়ে যায়। রাস্তার বাঁকের মুখে প্রায় কাত হয়ে, প্রায় মাটি ছুঁয়ে চলে যায় সকলের দৃষ্টির বাইরে। সে আর তার হল না। কোথায় যে চলে গেল গাড়িখানা, তার পাত্তা আর নরসিং পায় নাই। মেজবাবুর মৃত্যুর পর গাড়িখানা কিনেছিল তার এক বন্ধু সার্কেল-ডেপুটি। সে বদলি হয়ে চলে গেল। তারপরও খোঁজ করেছিল নরসিং—কিনবার জন্য অবশ্য নয়, এমনি খোঁজ করেছিল ওই শখে—ওই মায়ায় খোঁজ করেছিল। জেনেছিল সার্কেল-ডেপুটি গাড়িখানাকে বিক্রি করেছে একজন আবগারীর সায়েবকে।

মেজবাবুর জিনিস—জিনিসটাকে রাখবার জন্য সবাই অনুরোধ করেছিল বড়বাবুকে। কিন্তু বড়বাবু সে লোকই নয়। হিসেব-নিকেশ-লাভ-লোকসান না দেখে বড়বাবু কিছুই করে না। কিন্তু সব হিসেব বাঁকা। সহজ নিয়মে হিসেব বড়বাবু করে না।

মেজবাবুর ছিল দরাজ মেজাজ; মামা ধরণী রায়ের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলে—বেশ তো, এ আর এমন কি কথা! থাকবে তোমার ভাগ্নে! পড়ুক।

বড়বাবু চুরুট টানছিল—এতক্ষণে বললে—তোমাদের ওভারসিয়ারবাবু কবে আসবেন হে? খরচপত্র করে পাথরকুচিগুলো জমা করলাম, আর সেগুলো এক কথায়—'নেব না' বলে দিলেন তিনি। ওভারসিয়ারবাবু এলে তুমি বলবে তাঁকে, বুঝলে!

তেরশ ছাব্বিশ সালের বাইশে ফাল্গুন—ওই দিনটা মনে আছে নরসিংয়ের; ইমামবাজারে রাধাশ্যামবাবুর বাড়িতে সে ঢুকেছিল।

নিতাই তাকে সজাগ করে দিলে। সিংজী!

—হুঁ।

ধুলোর নীচে বেজায় 'গচকা'—আরও স্পীড কমিয়ে দ্যান। তাছাড়া—

আশেপাশে সে তাকিয়ে দেখল। দেখে বললে—মাঠ দিয়ে ভাঙুন বরং। গচকাও বাঁচবে আর গাড়িগুলাকেও 'পাস' করে যাওয়া হবে। শালা গাড়ির 'রহট' লেগে গিয়েছে রে বাবা!

গাড়ির স্পীড কমানো সত্যই দরকার, পুরু ধুলোর নীচে কোথায় খানা-খন্দর আছে বুঝবার উপায় নাই। এ রাস্তায় উঠেই সে কথা নরসিংয়ের মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন কথাটা সে ভুলে গিয়েছে। তা ছাড়া গাড়িতে প্যাসেঞ্জার চড়লেই কেমন একটা জোরে যাবার তাগিদ আপনা থেকেই মনের মধ্যে এসে পড়ে। প্যাসেঞ্জার গাড়িতে বসলেই তার তাঁবেদারি করতে হয়, 'রখো' বললেই রুখতে হবে, 'জলদি কর' বললেই স্পীড বাড়াতে হবে। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে পারলেই খালাস—টাকাটাও পকেটে এসে যায়। ওই পাঁচমতির কায়স্থবাবুদের দালানগুলোর চিলেকোঠার মাথাগুলি দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সেই অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন যে এই তাগিদটা তার হুঁশিয়ারি-বোধকে ছাপিয়ে উঠেছে সেটা তার খেয়াল ছিল না। গাড়িটা বড় ঝাঁকানি খাচ্ছে, 'বডিটা' দুলছে, স্প্রিংয়ে মধ্যে মধ্যে শব্দ উঠছে। তা ছাড়া সামনে চলেছে সারিবন্দী গরুর গাড়ি। সামনে আসছে আবার একটা নদীর ঘাট। এই ছোট গ্রাম্য রাস্তাটা ওই নদীর ঘাটে নবাবী আমলের পুরনো বড় সড়কের সঙ্গে মিশেছে। নদীর ঘাটটায় মস্ত একটা বাজার। বড় বড় গাছের ছায়ার তলায় গরুর গাড়িগুলি রেখে যাত্রীরা ওখানে খাওয়া-দাওয়া করে।

নদী পার হয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে শ্যামনগর, শ্যামনগর থেকে শহর মুর্শিদাবাদ। এপার থেকে রাস্তাটা চলে গিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা পার হয়ে বর্ধমান। নরসিং যে রাস্তাটায় আসছে সেটা আসছে রামনগরের ঘাট থেকে। মধ্যে মধ্যে আশপাশ থেকে দু-চারটে গ্রামের পথ এসে মিলেছে। সারিবন্দী মানুষ চলেছে, অধিকাংশই হাটুরের দল—কাঁধে ভার নিয়ে মাথায় বোঝা নিয়ে চলেছে—পাঁচমতির হাটে সারিবন্দী গাড়ি চলেছে—কতক গাড়িতে চলেছে মাল—কলাই, পেঁয়াজ, সরষে, আলু; দেশান্তরে নিয়ে চলেছে—বিক্রি করে ধান কিনে আনবে। কতক গাড়িতে চলেছে যাত্রী। মামলা-মকদ্দমার যাত্রীই বেশী, শ্যামপুর আদালত, মুর্শিদাবাদ আদালত চলেছে সব। এ ছাড়াও যাত্রী আছে বইকি। মানুষের কাজের কি অন্ত আছে।

রাস্তাটার চেহারা হয়েছে অদ্ভুত। বিস্তীর্ণ মাঠের চারিদিক পরিষ্কার—শুধু মাঝখানে একটা ধুলোর বিরাট কুণ্ডলী চলে গিয়েছে—রেলের ইঞ্জিনের পিছনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত।

নরসিং সজাগ হয়ে উঠল এবার।

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এবার যেন মানুষের রাজ্য এল। মানুষ চলছে, পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে, হোক গরুর গাড়ি—গাড়ি চলছে—গরুর খুরে, গাড়ির চাকার ধুলো উড়ছে—শুধু উড়ছে নয়—চলছে ; উড়ে চলেছে—গাড়ির টাপরে—চাকায়—গরুর খুরে—মানুষের গায়ে লেগে চলেছে, এখান থেকে ওখান।

নিতাই বললে—ডাইনে ওই দেখুন—ওই জায়গাটায় ধানের গাড়ি যাবার পথ ছিল—কাটা রয়েছে—পগার। ওইখানে—

—হুঁ।

পিছনে তাকিয়ে দেখল নরসিং, সাহুজী খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছে। মেয়েটি কখন জেগেছে, সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পথের ওই ধুলোর কুণ্ডলীর দিকে।

নরসিংয়ের হঠাৎ মনে হল—গাড়ির চাকায় লেগে দু-এক টুকরো মাটি যেমন চলেছে এদেশ থেকে ওদেশে—মেয়েটিও চলেছে ঠিক তেমনি ভাবে।

নরসিং গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিলে ; ক্লাচে পা দিয়ে ষ্টীয়ারিংয়ের গোল মাথাটা পাক দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে, সামনের চাকা দুটো মোড় ফিরে—ধীরে ধীরে মাঠের ভিতরে এগিয়ে গেল। নিতাই ভাল বলেছিল—মাঠের পথ অনেক ভাল।

পাঁচ

নদীর ঘাট পার হয়ে পাঁচমতি গ্রামখানাকে পাশে রেখে রাস্তা চলেছে শ্যামনগর। এবার রাস্তা অনেক ভাল। পুরনো বাদশাহী সড়ক, দুখানা গাড়ি পাশাপাশি চললেও দু-পাশে খানিকটা করে পথ পড়ে থাকে সংকীর্ণ ফুটপাথের মত। স্থানে স্থানে তিনখানা গাড়ি চলবার মত প্রশস্ত। আগে আরও প্রশস্ত ছিল। এখন দু'পাশের ধানজমির মালিকেরা পথ কেটে কেটে জমির অন্তর্গত করে নিয়েছে। চাষীদের ওই একটা রোগ। সেকালে, মনে পড়ে নরসিংয়ের, এক চাষী তাদের গ্রামের ছোট পথটার পাশ কেটে রাস্তাটা এমন ছোট করে দিয়েছিল যে, গরুর গাড়ি যাওয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ; চাষীকে ডেকে শাসন করেছিল তার জেঠা মাধব সিং ; বলেছিল—তু শালা ছিঁচকে চোর। আধা হাত, আধা হাত হর-বরিষ কাটিয়ে লেও। নজর যে

আসে না। আরে শালা মরদ হো, তুমারা হিম্মৎ হ্যায় তো লাঠিকে জোরসে লে লেও যেতনা ইচ্ছা হোয় তুমারা—দেখে একদফে! চাষীকে দিয়ে সেই বছরই মাধব সিং সে রাস্তা ঠিক করে নিয়েছিল। এখানে কে রাজা, কে গোসাঁই! ডিস্ট্রিক-বোর্ডের ওভারসিয়ার বাইসিক্‌ল্ হাঁকিয়ে আসে যায়—চোখে তার এসব পড়ে না তা নয়; চোখে পড়ে, হাঁকডাকও করে; শেষ পর্যন্ত পকেটে কিছু পুরে নিয়ে যায়।

রাস্তা শ্যামনগরের দিকে যত অগ্রসর হয়েছে অবস্থাও তত ভাল হয়েছে। মেটে সড়ক হলেও রাস্তা বেশ সমতল। কিন্তু গাড়ি এবং যাত্রীর ভিড়ও বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি আসছে শ্যামনগর থেকে। এখানে বলে 'কেরাচি গাড়ি'। শ্যামনগর থেকে পাঁচমতি পর্যন্ত প্রতি শেয়ারে আট আনা ভাড়া। অধিকাংশই মামলা-মকদ্দমার যাত্রী। বিকেলের দিকে 'কেরাচি গাড়ি'র সংখ্যা বাড়বে। পাঁচমতি পর্যন্ত যাবে, রাত্রে সেখানে থাকবে, পরদিন আটটায় যাত্রী নিয়ে আবার ছুটবে শ্যামনগর।

—আব তো রাস্তা ভাল আসিয়ে গেলো, জোরসে চালাইয়ে দাও ভাইয়া। পিছন থেকে তাগিদ দিলে শুখনরাম।

পিছন ফিরে তাকালে নরসিং।

—জোরসে—জোরসে। স্পীড বাঢ়াইয়ে দিন। শুখনরাম আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

এ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিলে নরসিং। শুখনরামকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের সীটের অপর যাত্রীটিকেও দেখবার ইচ্ছা হল। এ ইচ্ছা হয়। কিন্তু যাত্রী যাত্রিনী হলে মুখ ফিরিয়ে দেখার বিপদ আছে। সঙ্গের পুরুষেরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। লোকের রাগকে সে ভয় করে না, কিন্তু বদনামকে ভয় আছে। প্যাসেঞ্জার কমে যায়। মেয়েছেলে নিয়ে এমন ড্রাইভারের গাড়িতে উঠতে চায় না লোকে। এ ক্ষেত্রে সামনে-পিছনে গাড়ি এবং পথিক দেখবার জন্য যে আয়নাটা আছে, নরসিং সেটাকে একটু ঘুরিয়ে দেয়। পিছনের রাস্তার বদলে তখন গাড়ির ভিতরটা দেখা যায়। আয়নাটা ঘুরিয়ে দিলে সে।

নিতাই একটু হাসলে। এর গূঢ় অর্থ নিতাইয়ের কাছে অজ্ঞাত নয়।

আয়নায় মেয়েটির মুখ ভেসে উঠেছে। মেয়েটি হাসছে বলে মনে হল। অতি মৃদু হাসি। আয়নার মধ্যেই মেয়েটির চোখে চোখ পড়ল, আয়নার দিকে তাকিয়েছে মেয়েটি। চোখ নামিয়ে নিলে সে। আবার তাকালে। এবার

একটু ঘোমটা বাড়িয়ে দিলে। মেয়েটির মুখের হাসিটুকু আশ্চর্য! ঠোঁটের কোল ছাড়া আর কোথাও এতটুকু চিহ্ন নাই, চোখের কোণে না, নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত বাঁকা দাগে পর্যন্ত না।

—বাঁয়ে—বাঁয়ে। বাঁয়া রাস্তাসে। শুখনরাম হাঁকলে।

শ্যামনগরের প্রবেশমুখে রাস্তাটা তিনটে রাস্তায় বিভক্ত হয়েছে। একটা সোজা চলে গিয়েছে, একটা ডাইনে, একটা বাঁয়ে।

এ রাস্তাটার উপর মাল-বোঝাই গরুর গাড়ির ভিড় বেশী। ধানের কারবার, কলাই, লঙ্কা, পেঁয়াজ, আলুর আড়ত, জ্বালানী কাঠের আড়ত, দু-একটা কয়লার ডিপো। তারই মধ্যে শুখনরামের গদি। ধান, চাল, তামাকের ব্যবসা। পাকা বাড়ি আপাদমস্তক শিক দিয়ে ঘেরা। বারান্দায় তক্তপোশের উপর তোশক এবং চাদর পেতে মালিকের বসবার জায়গা। মালিকের বসবার জায়গায় বসে আছে শুখনরামের চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে।

শুখনরাম বললে—ব্যস রোখো, রোখো।

শুখনরাম নামল। সর্বাগ্রে সে হুকুম দিলে—ছোট পেটিয়াটা আগে নামাও। তামাকের ছোট একটি পেটি। ওটাকে সে সঙ্গে নিয়েছিল। শুখন ছেলেকে বললে—একদম উপরে নিয়ে ঠিক জায়গায় রাখা হয় যেন—নিজে দেখবি।

ছেলে বললে—উ জেনানী?

শুখন ধমকে উঠল মেয়েটাকে—এই, উতারো। এই হরামজাদী কুত্তী!

আয়নার ভিতর দিয়ে নরসিং তখনও তাকিয়ে ছিল মেয়েটির দিকে। মেয়েটিও মধ্যে মধ্যে তাকে দেখছিল; ধমক খেয়ে চমকে উঠল সে। তার পর আত্মসংবরণ করে ধীরে ধীরে নেমে গেল।

শুখন বললে—ভিতরে নিয়ে যা। ঝি। নতুন ঝি একঠো নিয়ে এলাম। নরসিং নেমে এসে দাঁড়াল।—ভাড়া?

শুখন বললে—ভাড়া লেও। লেকিন বহুত বেলা হইয়েছে, খানাপিনা করো—আস্নান করো।

নরসিং কি ভাবলে। তার পর বললে—আমরা আজ কাল দুটো দিন এখানে থাকতে চাই। একটু জায়গা দেবেন থাকতে?

শুখন নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকালে, তার পর একজন কর্মচারীকে সে বললে—একঠো কামরা দে দেও সিংবাবুকো।

নিতাই বললে—পুকুর কোথা খোঁজ লেন, গাড়িখানাকে ধুতে হবে তো!

রাম হাঁ করে সব দেখছে। অবাক হয়ে গিয়েছে সে। ভয়ও পেয়েছে সে। শুখনরামের ভুঁড়ি দেখে, কানের চুল দেখে, সে হি-হি করে হেসেছে।

সন্ধ্যার সময় নরসিং এসে বসেছিল—সেই তে-মাথার মোড়ে। নিতাই এবং রামও সঙ্গে আছে। তে-মাথার মোড়ের পাশে একটা গাছের তলায় এক পাইট মদ এবং খানিকটা মাংস নিয়ে বসেছে। নরসিং গম্ভীরভাবে সমস্ত দেখছে, নিতাই মধ্যে মধ্যে মদের গেলাস পূর্ণ করে এগিয়ে দিচ্ছে। নরসিং গেলাস খালি করে নিতাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে। মধ্যে মধ্যে বলছে—রাম!

রামের কাছে আছে মাংসের পাত্রটা। সে-ই মাংস পরিবেশন করছে; হাড়ীর ছেলে নিতাই মাংসটা ছুঁয়ে নেড়ে সিংজীর হাতে তুলে দিতে চায় না। বলে, আপনারা ছত্রী, বামুনের নীচেই আপনারা।

খানিকটা মাংস রাম দাদাবাবুর হাতে তুলে দিলে।

নরসিং বললে—নিতাইকে দে মাংস।

নিতাই বললে—পাকিয়েছে ভাল মাংসটা। ঝাল একটুকুন বেশী। তা—। হেসে বললে, এ মুখে ঝাল ভাল লাগে।

নরসিং কোন উত্তর দিলে না।

নিতাই তার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—সিংজী!

নরসিং তার দিকে ফিরে চাইলে।

—কি ভাবছেন বলেন তো আপনি?

নরসিং আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে বাদশাহী সড়কের উপর প্রসারিত করে দিলে। ছ্যাকরা গাড়ি চলেছে, টাপর ছাওয়া গাড়ি চলেছে, মানুষের সারি চলেছে। ছ্যাকরা গাড়ি আসছে, টাপর-ছাওয়া গাড়ি আসছে, মানুষ আসছে গায়ে হেঁটে।

মদের নেশায় নরসিংয়ের মনে খানিকটা ভাবের ছোঁয়াচ লেগেছে। তার মনে পড়ছে ছেলেবেলায় সে রোজ সকালে ভাঁড়ার ঘরের দোরে বসে পিঁপড়ের সারি দেখত। বাড়ির যেখানে যত পিঁপড়ে সব সারি বেঁধে এসে ঢুকত ভাঁড়ার ঘরে, আবার বেরিয়ে যেত ছোট ছোট এক একটি দানা মুখে নিয়ে। ও ব্যাটাদের বুদ্ধি নাই, থাকলে উঠোন থেকে ভাঁড়ার-ঘর পর্যন্ত যদি কেউ একটা পিঁপড়ের মোটর সার্ভিস খুলত—তবে খুব ভাল সার্ভিস চলত।

নিতাই আবার ডাকলে—সিংজী। নরসিং বললে—গাড়ি গোন্, গাড়ি গোন্, যা বলছি তাই কর্।

রাম ছ্যাকরা গাড়ি গুনছে। নিতাইয়ের গণনাশক্তি মন্থর, সে গুনছে টাপর-দেওয়া গরুর গাড়ি। পথের লোক গুনবার দরকার নাই।

নিতাই একটা সিগারেট সংজীকে দিয়ে নিজে একটা নিলে, দেশলাই জ্বালিয়ে সিংজীকে এগিয়ে দিলে আগুন, নিজে ধরালে, বাক্সটা ছুঁড়ে দিলে রামকে। তার পর হঠাৎ বললে—একটি কথা আপনাকে বলব আমি।

নরসিং তার দিকে ফিরে তাকালে।

—অভয় দিচ্ছেন তো?

নরসিং প্রসন্নভাবে একটু হাসলে।

নিতাই বললে—রাম, গরুর গাড়িসুদ্ধ গুনবি। সিংজীর সঙ্গে ঝগড়া আছে আমার।

নরসিং আরও একটু হাসলে।

নিতাই বললে—হাসবেন না। নালিশ আছে আমার। সাংঘাতিক নালিশ। হ্যাঁ। সে বলে দিচ্ছি আমি—হ্যাঁ। 'না' বললে শুনছি না আমি।

গম্ভীর ভাবেই এবার নরসিং বললে সর্বশক্তিমান প্রভুর মত—বল্। কি নালিশ তোর শুনি।

নিতাই বললে--বলব?

—ব—ল্। বলছি তো।

রাম বড় হয়েছে কিনা।

নরসিং বললে—বড় হল্চে ওটা।

নিতাই সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করার মত ঘাড় নেড়ে বললে—একশ বার। হাকিমের মত কথা। ফ্যাক—ফ্যাক—ফ্যাক। হেসেই আছে।

নরসিং বললে—তুই ওকে মদ দেবার কথা বলছিস, কিন্তু বেলেল্লাগিরি করবে ও।

—খুন করে ফেলব। কি রে করবি, বেলেল্লাগিরি?

রাম মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে জানালে, না, বেলেল্লাগিরি সে করবে না।

নিতাই চট করে এক গেলাস মদ ঢেলে নরসিংকে এগিয়ে দিয়ে বললে—দেন, পেসাদ করে দেন।

নরসিং মদের গেলাসটা হাতে নিয়ে একটু ভাবলে, তারপর বললে—নে, তাই নে। মদ তো খাবিই, আজ হোক আর কাল হোক। যার তার কাছে খাবি, তার চেয়ে আমার কাছে খা। নে। মদের গেলাসে ছোট একটি চুমুক দিয়ে গেলাসটা বাড়িয়ে ধরলে—নে নে। লজ্জা নাই এতে। নে।

সলজ্জ ভাবেই রাম এগিয়ে এসে গেলাসটা হাতে নিলে এবং একটু মুখ ঘুরিয়ে গেলাসটা মুখে তুললে। কিন্তু বাধা দিয়ে নিতাই প্রায় গর্জন করে উঠল, এইয়ো! এই রামা! তর সইছে না উল্লুক কাঁহাকা। লেও, আগাড়ি গুরুজীকে পাঁওকে ধূলা লেও, প্রণাম কর্ বাঁদর।

লজ্জায় জিভ কাটলে রাম। এ বড়ই কসুর হয়ে গিয়েছে। সে প্রণাম করলে নরসিংকে, পায়ের ধুলো নিলে। নরসিং বললে—খবরদার, মদ খাবি কিন্তু মাতলামি করবি না।

পাঁইট-বোতল; দু-জনের জায়গায় তিন-জন খানেওয়ালা জুটেছে, দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল, অথচ নেশা এখনও জমে নাই। সংসারটা নিতাইয়ের কাছে এখনও উদাস মনে হচ্ছে না। সেই বললে, গুরুজী! আর এক পাঁট আনি।

নরসিংয়েরও এখনও জমে নাই। মেঠো পথে গাড়ি চালিয়ে এসে শরীরের অবসাদ এখনও যায় নাই। সে রামের দিকে তাকিয়ে তাকে ভাল করে দেখে নিলে। নাঃ, রামা ঠিক আছে। ছোঁড়াটা সিদ্ধি খেয়ে হাসে, মদ খেয়ে গম্ভীর হয়েছে। হাজার হোক ছত্রীর বাচ্চা!

—গুরুজী!

—হাঁ—আর এক পাঁট চাই।

—নিয়ে আসি। নিতাই উঠল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে নরসিং বললে, চল্ সবাই যাব। দোকানে বসে খাব। বোস্, হিসেবটা করে নিই। রামা, তোর ঘোড়ার গাড়ি কখানা?

—ঘোড়ার গাড়ি? কখানা? রাম শঙ্কিত হল, মদ খাওয়ার পর আর তার গুনতে মনে নেই।

নরসিং আবার প্রশ্ন করলে—গুনতে ভুলে গিয়েছিস বুঝি?

—আটখানা পর্যন্ত গুনেছি।

—গরুর গাড়ি?

নিতাই জবাব দিল, সে অ্যানেক। চলছেই—চলছেই—কুড়ি-পঁচিশখানা তো খুব।

এতেই নরসিংয়ের হবে। এর চেয়ে সঠিক হিসেব সে কল্পনা করতে পারে না। চার আটে বত্রিশ, কুড়ি তুগুণে চল্লিশ। বত্রিশ আর চল্লিশে—বাহাত্তোর। হুঁ। নিতাইয়ের দিকে চেয়ে নরসিং বললে—চলবে। বুঝলি রে নিতাই, চলবে।

নিতাই হাসলে পাকা সমঝদারের মত। হেসে বললে, সে আমি বুঝেছি। তে-মাথায় এসে যখন গাড়ি গুনতে বলেছেন—তখুনি বুঝেছি। না বললেও বুঝে নিয়েছি। পাঁচমতি পর্যন্ত সার্‌বিস ?

নরসিং বললে—চল্ এবার দোকানে যাই। শহরের সার্ভিসের বাস ট্যাক্সি সব এতক্ষণ এসে গিয়েছে। ড্রাইভারেরা সব ওখানেই আসবে। চল্!

নিতাই হেসে বললে—পেরথমে আমি কি মনে করেছিলাম জানেন ?

নরসিং ভাবতে ভাবতেই চলেছে, এ সব কথায় কোন আসক্তি নাই তার, কোন আকর্ষণ সে অনুভব করছে না। ভাবছে সে অনেক কথা। আট মাইল পথ, যাওয়া-আসা এক ট্রিপ ষোল মাইল। এক গ্যালন তেল। ঘোড়ার গাড়ির শেয়ার আট আনা। প্রথমে আট আনার চেয়ে বেশী ভাড়া করলে চলবে না। ন-আনাও চলতে পারে। মোটরে চড়ার ইজ্জৎ, তাড়াতাড়ি যাওয়া, আরামের জন্য এক আনা দেবে না লোকে ? এতক্ষণেই মনে হল, না, দেবে না। প্যাসেঞ্জারদের অধিকাংশই কোর্ট-প্যাসেঞ্জার; জমিদারের গোমস্তা, মহাজনের কর্মচারী, চাষী রায়ত, দেনদার গৃহস্থ। জনকতক কোর্টের কেরানীও আছে। বাড়িতে খেয়ে তারা ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে। আধ পয়সায় বিড়ি কেনে, দু-পয়সার বেগুনি ফুলুরি কিনে ঠোঙায় নিয়ে চায়ের সঙ্গে খায়। তারা কখনও এক আনা বেশী দেবে না। দেবে যখন নিরুপায় হবে, যখন ঘোড়ার গাড়ি আর থাকবে না, তখন দেবে। ঘোড়ার গাড়িগুলোর সঙ্গে প্রথমে একবার লাগবে রেষারেষি। ওরা শেয়ারের দাম নামাবে। আট আনা থেকে সাত আনা—ছ-আনা। চার আনাতেও নামতে পারে। তখন ?

মনে পড়ে গেল মেজবাবুকে।

মেজবাবুই প্রথম মোটর-বাস কিনে ইমামবাজার থেকে জংশন স্টেশন পর্যন্ত সার্ভিস খুলেছিলেন। ছোট রেলের সঙ্গে কম্পিটিশন দিয়ে বাস চালিয়েছিলেন। এই যাত্রী গণনা করার পদ্ধতি তাঁরই কাছে শিখেছিল নরসিং।

পনেরো দিন নরসিং স্টেশনে গিয়ে প্রত্যেক ট্রেনের যাত্রীসংখ্যা গুনে আসত। রেল-কোম্পানীও বাস সার্ভিসকে জব্দ করবার জন্য ভাড়া কমিয়েছিল, মেজবাবুও কমিয়েছিলেন। দরকার হয়, সেও ভাড়া কমাবে।

নিতাই অনেকক্ষণ থেকে কথা বলবার জন্য উসখুস করছে। সে বললে—গুরুজী!

—হুঁ।

খুব সরস করে নিতাই মৃদুস্বরে বললে—পেরথমে আমি কি ভেবেছিলাম জানেন? ভেবেছিলাম, মেয়েটার ওপর আপনার টান পড়ে গিয়েছে। সেই টানে বোধ হয় থেকে গেলেন।

নরসিং এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। মুহূর্তে তার মন ঘুরে গেল, মনে পড়ে গেল মেয়েটিকে। মেয়েটির মুখের আশ্চর্য হাসিটুকু চোখের উপর ভেসে উঠল। তার বিপত্নীক জীবনের উত্তাপ মুহূর্তে যেন আগ্নেয়গিরির গর্ভের অবরুদ্ধ উত্তাপের মত অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেয়ে তাকে চঞ্চল অস্থির করে তুললে। নিতাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বললে—বোতলটা দেখি।

নিতাই বললে—না, কিনলেন তো নাই। চলুন, দোকানে চলুন।

রাম এবার এগিয়ে এল। নরসিংকে শুনিয়ে নিতাইকে সে বললে—কাল আমি ঠিক সাওজীর বাড়িতে ঢুকে পড়ব। মেয়েটাকে বলব—রাত্তিরে দরজা খুলে চলে এস। মোটর রেডী করে রাখব। বাস্। মার পাড়ি! রামের সাহস বেড়ে গিয়েছে আজ, মাথা চনচন করছে। দাদাবাবুর জন্য সে জান দিতে পারে আজ। আস্ফালন করে সেই কথাটা সে জানিয়েও দিলে জান যায়—সে ভি আচ্ছা।

শহরের ভেতরে এসে পড়েছে তারা। নরসিং বললে, মেলা বকিস না রাম। চুপসে চল্।

ব্যবসা আছে শহরটাতে। রবি ফসলের আড়ত। এ অঞ্চলের রবি ফসল এইখানে এসে জমা হয়, এখান থেকে চালান যায় দেশ-দেশান্তরে। বড় বড় গদির সামনে অনেকটা পরিমাণে খোলা জমি, সেই খোলা জমিতে গরুর গাড়ির ভিড় জমে গিয়েছে। গাড়ির মুখ থেকে পিছন পর্যন্ত বস্তা বোঝাই। দোকানে পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলছে।

তারা এসে পড়ল মোটর-বাসের ডিপোয়। এখানেও একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনে একটা সেড্। সেই সেডের মধ্যে মোটর-বাস রেখেছে

পাঁচখানা। দুখানা ট্যাক্সি। এগুলো যায় সদর শহর পর্যন্ত। খুব লাভের সার্ভিস এটা। মোটরের দোকানটা নেহাত ছোট। আসল দোকান ওদের শহরে। এখানে কিছু পেট্রোল মোবিল রাখে মাত্র। বাকি যা দরকার হয় আনিয়ে নেয় শহরের দোকান থেকে। বৈকালে তে-মাথায় যাবার আগে সে এখানে এসে দোকানের কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে গিয়েছে। ফ্যানবেল্টিংয়ের দরকারও ছিল, তারটা পুরনো হয়েছে, সেই উপলক্ষ্য করে দোকানটা দেখে গিয়েছে বেশ ভাল করে। এখনও সে আবার একবার দাঁড়াল।

নিতাইয়ের মন ছুটছে মদের দোকানের দিকে। সে তাগিদ দিয়ে বললে —বাজে দোকান, কিছু মেলে না। চলুন চলুন। ওদিকে আবার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

নরসিং অগ্রসর হল।

মদের দোকানে শেষ আসরের ভিড় জমে গিয়েছে। দোকান বন্ধ হবে। নাকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ভদ্রবেশী খরিদ্দার আসছে। অনেকে অবশ্য বেপরোয়া, ঢাকাঢাকির ধার ধারে না। গোমস্তা আমমোক্তারদের দেখলেই চেনা যায়। পকেটে ক্লিপ-আঁটা পেন্সিল, কারও বা সস্তা ফাউণ্টেন পেন, কাগজে নোটবুকে মোটা পকেট, কথাবার্তার মধ্যে আইনের ধারা চলেছে। নরসিং খুঁজছিল জামায় কাপড়ে কালি, গ্রিজ, মোবিলের দাগ—দোকানের মদের গন্ধেও নিশ্বাস নিয়ে খুঁজছিল—মোবিল পেট্রোল মেশানো অতিপরিচিত বিচিত্র গন্ধ। ব্যাকব্রাস করা লম্বা রুক্ষ চুল, কঠিন মুখ, পাকানো গোঁফ খুঁজছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে ঠিক খুঁজে বার করল সে পাঁচজনকে। আলাপ করবার পথ সহজ। প্রশ্ন করলে—সকালে মোটর কখন ছাড়ে বলুন তো ?

—সাড়ে সাতটা।

—ঠিক সাড়ে সাতটা ?

—টাইম সাতটা পঁচিশ, তবে হয় সাড়ে সাতটা—পৌনে আটটা—শহরে ঘুরে প্যাসেঞ্জার নিতে সময় লাগে তো ?

—এখানে ফ্যানবেল্ট পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারেন ?

—ফ্যানবেল্ট ? সবিস্ময়ে লোকটি তাকালে তার দিকে। ফ্যানবেল্ট নিয়ে আপনি কি করবেন ?

—আমি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি এখানে। নরসিং বললে—ইমামবাজার থেকে ভাড়া নিয়ে এসেছি।

—বসুন বসুন।

—আপনারাও তো মোটর সার্ভিসে কাজ করেন? হাসলে নরসিং।

বসলে সকলে জমিয়ে। রসিদ মিঁয়া, জাফর সেখ, রামেশ্বরপ্রসাদ, জীবন, তারক এরা ড্রাইভার। পাগলা, ন্যাড়া, ন্যাপলা, ফটকে, হাফিজ এরা ক্লীনার। ক্রীশ্চান জোসেফ, সে এস-ডি-ও'র ড্রাইভার। জোসেফ রজনী দাস। সব চেয়ে তার জোসেফকেই ভাল লাগল। রসিদ জাফরদের সঙ্গে জোসেফের পার্থক্য থাকারই কথা। বাস-ট্যাক্সির ড্রাইভারে আর প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভারে তফাত থাকবেই। তার উপর জোসেফ এস-ডি-ও'র ড্রাইভার, চারজন এস-ডি-ও পার করলে জোসেফ। মধ্যে একজন এস-ডি-ও ড্রাইভার সঙ্গে এনেছিলেন—তখন সে ডি-এস-পি'র কাছে কাজ করেছিল। জোসেফ খুব ভদ্র, মিষ্টি হাসিমুখ—অথচ গম্ভীর। গেলাসের মদ সে অল্প অল্প করে খাচ্ছিল; রসিদ জাফর এদের কিন্তু একটা গেলাস বড় জোর দু-চুমুক। রসিদ তারক এরা দুজন মদ খেলেই মারপিট করতে চায়, ওদের কয়েকটা কথা শুনেই এবং হাতকাটা খাকী শার্টের হাতা না থাকা সত্ত্বেও—আস্তিন গুটানোর ভঙ্গিতে কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত হাতের উপর হাত বুলোনো দেখেই নরসিং সেটা বুঝতে পারলে। জাফর গুম হয়ে বসে আছে। পথের জনতার দিকে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। লোক চলছে—জাফর দেখছে—কিন্তু দৃষ্টির নিরাসক্তির মধ্যেও স্পষ্ট একটা সন্ধানের লোলুপতা রয়েছে। সে খুঁজছে স্ত্রীলোক। সে কথা বুঝতে নরসিংয়ের এতটুকু বিলম্ব হল না। রামেশ্বর সব চেয়ে ভয়ানক। ঠোঁটের একটা দিক অনবরত টানা ওর অভ্যাস। একটা ধারালো ছুরি দিয়ে নখ কাটছে। ওটা ও চালাতে অভ্যস্ত—এতে নরসিংয়ের সন্দেহ রইল না। জীবনটা ক্রমাগত অশ্লীল-অশ্রাব্য কথা বলে চলেছে।

রামেশ্বর নরসিংকে বলল—তাসের বাজি খেলবেন? চলিয়ে না?

লোকটা শুধু ছুরিবাজ নয়—জুয়াড়ীও। নরসিং উঠে পড়ল, না। আচ্ছা, রামরাম। সেলাম।

বেরিয়ে এল সে দোকান থেকে। জোসেফ সঙ্গে এসে বললে—ভাল করেছেন। লোক ভাল নয় রামেশ্বর। আপনি বিদেশী—

হেসে নরসিং বললে—বিদেশী নই! গিদ্বরবজার সিং আমি। এখানে হাঁক দিলে আমারও বিশ আদমী বেরিয়ে আসবে।

—গির্‌বরজা? গির্‌বরজার সিং আপনারা?

—হাঁ। নরসিং একবার দুই হাতের তালু দিয়ে গোঁফের দুই প্রান্ত মুছে—উপরের দিকে ঠেলে দিলে।

জোসেফ বললে—আমাদের বাড়ি ছিল এক সময় গির্‌বরজা।

—গির্‌বরজা বাড়ি ছিল? আশ্চর্য হয়ে গেল নরসিং।

আমার ঠাকুরদার বাবা এখানে এসে ক্রীশ্চান হয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল প্রাণকৃষ্ণ দাস। একটু চুপ করে থেকে সে হেসে বললে—তিনি জাতে ছিলেন হাড়ী।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নরসিং। তাদের গাঁয়ের হাড়ীদের মনে পড়ে গেল। তাদের গাঁয়ের হাড়ীর ছেলে এই জোসেফ।

জোসেফ সিগারেট বার করে নরসিংকে দিল। নরসিং বাঁ হাতে জোসেফের ডান হাতখানা চেপে ধরলে। তার মনে হল জোসেফ তার পরমাত্মীয়। হঠাৎ সে বললে—আচ্ছা বল দেখি—বলুন দেখি—এখান থেকে পাঁচমতি পর্যন্ত যদি সার্ভিস খুলি--তো চলবে কিনা?

--পাঁচমতি? শ্যামনগর থেকে পাঁচমতি?

—হাঁ।

হঠাৎ আপনার এ ঝোঁক হল কেন? আপনাদের ইমামবাজার থেকে জংশন হয়ে সদর পর্যন্ত সার্ভিস তো খুব ভাল।

নরসিং চুপ করে রইল।

জোসেফ বললে—রাস্তা তো মোটে আট মাইল—এইটুকু পথ—। ভাবতে লাগল জোসেফ।

নরসিং দাঁড়াল থমকে। বললে—এইখান থেকে ভাগব আমি। ভেবে দেখবেন। কাল আবার দেখা করব।

জোসেফ প্রশ্ন করলে—রয়েছেন কোথায়?

—শুখনরাম সাহুর গদ্দিতে।

—শুখনরাম সাহু?

—হাঁ।

জোসেফ একটু চুপ করে রইল, তারপর বললে—আচ্ছা, কাল কথা হবে। আচ্ছা, নমস্কার।

রাম বললে—দেখুন কোথা থেকে আপন লোক বেরিয়ে গেল।

নরসিং আবার ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছে।

নিতাইও যেন কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলে—হাড়ীর ছেলে?

উত্তর দিলে না নরসিং।

আট মাইল পথ মাত্র। সার্ভিসে অসুবিধা আছে। আট মাইল পথ লোকে হাঁটতে পারে, ঘোড়া গরু একটানে চলতে পারে। পথ যত দূর হয়—তত ওরা অপারগ হয়—কলের কদর তত বাড়ে। আট মাইল পথে ঘোড়ার গাড়ির লাগে দেড় ঘণ্টা। ন-টার সময় পাঁচমতি ছাড়লে সাড়ে দশটায় শ্যামনগর। মোটরে আধ ঘণ্টা। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি যদি ভাড়া চার আনায় নামায় তবে চার আনা পয়সার জন্যই লোকে ওই দেড় ঘণ্টা আগেই যাবে। তার চোখের উপর ভেসে উঠল বাদশাহী সড়ক। কত দূরে চলে গিয়েছে। এই সড়কে বর্ধমান জেলার দিকে গেলে রেললাইন পাওয়া যায় তিরিশ মাইল দূরে। কত যাত্রী, কত গাড়ি, কত মাল আসছে, যাচ্ছে। বিরাম নাই। তার যদি কলমের জোর থাকত তবে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডকে কলমের খোঁচায় ঘায়েল করে—এ রাস্তা মেরামত করতে বাধ্য করত। আর থাকত যদি টাকা, চারখানা বাস কিনবার পয়সা—তবে শ্যামনগর থেকে পাঁচমতি হয়ে বর্ধমান পর্যন্ত সার্ভিস খুলত। সার্ভিস খুলবার কত লাইন পড়ে আছে। পথ নাই। রেল-কোম্পানী মাঠের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করে লাইন নিয়ে গিয়েছে হরিদ্বার পর্যন্ত, দিল্লী লাহোর পেশোয়ার পর্যন্ত, বোম্বাই পর্যন্ত, মাদ্রাজ পর্যন্ত, সবশেষে হঠাৎ ভূগোলে পড়া কুমারিকা অন্তরীপ রামেশ্বর তীর্থের কথা মনে পড়ল—রামেশ্বর পর্যন্ত রেললাইন নিয়ে গিয়েছে। হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক চলেছে। পথ থাকলে, টাকা থাকলে সে খুলত অমনি সার্ভিস শ্যামনগর থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে বোম্বাই।

নিতাই বললে—সিংজী! এ লোকটা কিন্তু খুব চালবাজ বটে। হাড়ী থেকে খ্রীষ্টান হয়েছে কিনা, চালটা খুব মেরে গেল।

নরসিং বললে—না। ছোকরা লোক ভাল। ওর কাছে অনেক কাজ পাওয়া যাবে।

নিতাই বললে—বলুক মশায় ও। খুলে দেন সারবিস্ আপনি। হ্যাঁ।

নরসিং বললে—হাঁ, সার্ভিস আমি খুলব। যা থাকে কপালে।

—কপাল আপনার ভালই। ভেবে দেখেন আপনি! রোজকার-পাতি বন্ধ করে বাড়ি যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পথে ভাড়া মিলে গেল। বিশ মাইল পথ বড় জোর—ভাড়া পঞ্চাশ টাকা এসে গেল। এ আপনার মা-লক্ষ্মী ডেকে এনে আপনাকে লাইন দেখিয়ে দিলেন।

কথাটা নরসিংয়ের মনে ধরল। নিতাই খুব ভাল বলেছে। কথাটা সে এমন ভাবে ভেবে দেখে নাই। ওখানকার এস-ডি-ও'র উপর নিষ্ফল ক্ষোভে সে স্থির করেছিল, আর সে এই ছোট কাজ করবে না। ছোট কাজ, যে কাজে এমনি ভাবে লাঞ্ছিত হতে হয় সে ছোট কাজ ছাড়া আর কি? সে ভেবেছিল, গাড়িখানা বেচে দিয়ে পূর্বের মজুত আর এই গাড়ির টাকা নিয়ে বাড়িতে গিয়ে জমি কিনবে কিছু, আর করবে মহাজনি। সুদের ব্যবসা। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়েছিল তার দিদিয়াকে। মা মরে গিয়েছে, জেঠারা মরেছে, দিদিয়া বুড়ী আজও বেঁচে আছে, তাকে মোটর গাড়িটা দেখাবে, তাকে একবার চড়াবে গাড়িতে—এই বলেই সে গাড়িখানা নিয়ে চলেছিল গিব্‌বরজা; আরও দেখাতে ইচ্ছে ছিল তার ক্ষ্যাপা মাধবজেঠাকে, গ্রামের লোককেও দেখাতে ইচ্ছে ছিল। মোটরখানাই তো তার কীর্তি! তাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ কল্পনা করে সে মনে মনে খুশী হয়েছিল।

পথে হঠাৎ ওই শুখনরামের গাড়ি উল্টে গেল। শুখনরামকে অক্ষমতার লজ্জায় লজ্জিত করবার জন্যই সে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হেঁকেছিল। শুখনরাম তাই দিয়ে তাকে নিয়ে এল। পথে আসতে আসতে তার চোখ খুলে গেল।

লক্ষ্মীমন্ত শুখনরাম। সেই মেয়ে। ঠোঁটের কোলে তার সেই আশ্চর্য সূক্ষ্ম হাসি। এই হয়তো তার ভাগ্যলক্ষ্মী। ছেলেবেলায় দিদিয়ার কাছে গল্পে সে ভাগ্যলক্ষ্মীর কথা শুনেছে। রাজার ভাগ্যলক্ষ্মী, সর্বাঙ্গে তাঁর মণি-মুক্তার আভরণ ঝলমল করছে, পরনে তাঁর সোনার সুতায় বোনা কাপড়, বিপদে সম্পদে রাজাকে এসে দেখা দিতেন। সে মোটর চালায়, সকাল ইস্তক রাত্রি পর্যন্ত দুনিয়া তার চারপাশে পাক খায়, গরমে হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত ঝলসে যায়, পেট্রোলের গন্ধে কলিজা ভরে যায়, শীতের দিনের দরজা জানালা বন্ধ কেরোসিনের ধোঁয়ায় ভরা চোর-কুঠরির মত, তার ভাগ্যলক্ষ্মী যদি ওই মেয়েটি হয়—তবে সেও তার জোর নসিব বলতে হবে। খুলবে সে সার্ভিস, শ্যামনগর-পাঁচমতি ট্যাক্সি-সার্ভিস। তারপর দেখা যাবে। ছোট নদীটা পার হয়ে বাদশাহী সড়ক ধরে—

বাজারের এ পথটা শেষ হল একটা চৌমাথায়। বাঁ দিকে তাদের পথ। এ পথটা অন্ধকার। কাঠের আড়তে, কয়লার ডিপোতে কেরোসিনের ডিবিয়া জ্বলছে, দোকানে হ্যারিকেন।

নরসিং বললে—বাতি কিনে নে নিতাই। ঢুটো।

ছয়

মদের নেশার উপর কল্পনার উত্তেজনায় নরসিংয়ের ঘুম এল না। চিন্তার আগুন মাথার মধ্যে যেন আজ রাবণের চিতার মত অ-স্তিমিত এবং অনির্বাণ হয়ে উঠেছে।

রাম এবং নিতাই দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মদ খেয়ে নিতাইয়ের অবস্থাটা হয়—পুকুর থেকে বেরিয়ে নদীতে-পড়া মাছের মত; সব আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে সে অতিমাত্রায় সহজ এবং সুস্থ হয়ে ওঠে। ক্ষুধা খোলে, তৃপ্তির সঙ্গে খায়, তার পরই বিছানাটি পেড়ে একটি বিড়ি ধরিয়ে "কালী দুর্গা শিবো হরি, জয়ো জয়ো মুকুন্দ মুরারি, জয় বাবা বুড়ো শিব, জয়ো মাতা মঙ্গলচণ্ডী" বলে শুয়ে পড়ে। মিনিটখানেক পরেই মৃদু নাসিকা-ধ্বনির আভাস পাওয়া যায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসে। তারও মিনিটখানেক পর সশব্দ হয়ে ওঠে রীতিমত। ট্যাক্সি নিয়ে ভাড়ায় গিয়ে অনেক সময় অনেক রাত্রিই পথে কাটাতে হয়, সেখানে গাছতলায় শিকড়ে মাথা দিয়ে মাটির উপরে শুয়েও ঠিক এমনি ঘুম ঘুমায় সে। মদ না পেলেই সে আরামের বিছানায় শুয়েও চার প্রহর রাত্রির অন্তত আড়াই প্রহর জেগে থাকে, পাশ ফেরে আর মৃদুস্বরে ডাকে—ঘুমুলেন নাকি সিংজী? রামা রে!

রামাটা সাধারণতই ঘুমকাতুরে। আজ কিন্তু প্রথমটা সে অন্য রকম শুরু করেছিল। নেশায় বকতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত অকস্মাৎ লজ্জাবতী লতা যেমন স্পর্শ পেলে প্রায় মুহূর্তের মধ্যে এলিয়ে যায়, ভেঙে পড়ে—তেমনি ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। বকছিল, সহসা এক সময় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চুপ করলে; তার পর দু-চারটি কথা বললে মৃদুস্বরে, তার পরই চুপ করে গিয়েছে হাঁ করে ঘুমুচ্ছে।

দুটো বাতির একটা জ্বলছে। প্রায় আধখানা পুড়ে এসেছে।

মদের নেশায় বড় বড় চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, স্থিরদৃষ্টিতে চোখ চেয়ে নরসিং বসে আছে। তাদেরই গ্রামের হাড়ীর ছেলে এই জোসেফ। আজকে বলতে পারে সে কথা! লোকটার কথাবার্তা চালচলন রীতিমত ভদ্রলোকের মত। আর সে হল গিরবরজার সিংবাড়ির ছেলে। তার পূর্বপুরুষ ওই শুদের ছায়া মাড়াতে ঘৃণা করত। তাদের উচ্ছিষ্ট ওরা প্রসাদ বলে খেত। ওরা সিংবাড়ির নোংরা ময়লা পরিষ্কার করত। ভাবতে ভাবতে নরসিং রীতিমত হিংস্র হয়ে উঠল। এই ঘরের মধ্যে সে হিংস্রতা বিচিত্র রূপে তার মনে আত্মপ্রকাশ করলে। হঠাৎ তার মনে হল—হাঁ করে রামা ঘুমুচ্ছে, ওর গলাটা টিপে ধরলে কি হয়? তার জীবনের একটা পোষ্য, তার স্ত্রীর ভাই। স্ত্রী মরে গিয়েছে, ওর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি?

তার স্ত্রী ছিল তার মামীর ভাইঝি।

মামীকে প্রথম জীবনে সে ভয় করত, তার পর তার উপর নরসিংয়ের বিজাতীয় আক্রোশ জন্মেছিল। খানিকটা সেই আক্রোশের বশেই সে মামীর ভাইঝিকে বিয়ে করেছিল।

বাবুদের বাড়িতে ভাতের বন্দোবস্ত করে তাকে তার মামা ইমামবাজারে রেখে এল। ওদিকে তার মামী গোপনে লোক পাঠিয়ে নিয়ে এল তার ভাইঝিকে। তার এই রোগা শরীরে সে আর একা পারছে না, একজন সাহায্য করবার লোক চাই, সেবা করবার লোক চাই।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মামীর উপর খানিকটা আক্রোশ, খানিকটা বাবুদের বাড়ির মেজবাবুর দৃষ্টান্তে তার মনে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল অত্যন্ত ক্রুর একটি বাসনা।

মেজবাবু ছিল ঝড়। তাকে সে যত ভালবাসে, তত ঘৃণা করে, তত ভয় করে। মেজবাবুর কথা মনে হলেই সে মনে মনে বলে—সেলাম হুজুর। সঙ্গে সঙ্গেই অকারণে রাম অথবা নিতাইকে কঠিন আক্রোশে গাল দিয়ে ওঠে, শূয়ার কি বাচ্চা কোথাকার!

নিতাই বলে, কি? রাম ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে মুখের দিকে। নরসিং গভীর মনোযোগ দেয় হাতের কাগজের উপর। কখনও বা নিতাইকে উত্তর দেয়, কিছু না।

মেজবাবু ছিল ঝড়।

বছর দেড়েক পরে হঠাৎ একদিন এল সেই মোটর-বাইকে চেপে।

ইমামবাজারে নতুন করে কয়লার ডিপো খোলা হবে; কয়লার ব্যবসার ভার মেজবাবুর উপর; কয়লার ব্যবসা বাড়ানো হবে। কলকাতা আপিস থেকে ব্যবস্থা করে দু-তিন গাড়ি কয়লাও পাঠানো হয়ে গিয়েছে। 'বিলটি', অর্থাৎ রেল-রসিদ সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেজবাবু। মেজবাবু মোটর-বাইক থেকে নেমে মাথার টুপিটা এমন কায়দা করে ছুঁড়ে দিলে যে, চাকার মত পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে টেবিলটার উপরেই চুপ করে গিয়ে বসে গেল। তার পর হাঁকলে, গাড়িটা ওঠা রে।

সন্ধ্যাবেলা নরসিংয়ের ডাক পড়ল। ইজিচেয়ারে মেজবাবু বসে আছে। এক হাতে বিলিতি মদের গ্লাস অন্য হাতে সিগারেট, মদের গ্লাসটা বাঁ হাতে ছিল। আজও নরসিং যখন মদ খায় তখন বাঁ হাতে ধরে মদের গ্লাস, ডান হাতে থাকে সিগারেট। বড়বাবু তাকিয়ার উপর বুক দিয়ে শুয়েছিল; তার গ্লাসটা সামনে নামানো ছিল। আশ্চর্য; দু-ভাই একসঙ্গে বসে মদ খেত।

মেজবাবু বললে, তোকে আর পড়তে হবে না; কয়লার ডিপোতে থাকবি তুই। বুঝলি?

সেদিনও নরসিং মনে মনে পড়ার স্বপ্ন দেখত। লেখাপড়া যেমন করে হোক শিখবে, মানুষ হবে। দিদিয়া যে বলত, মানুষের মনের মধ্যে অজগরের মাথার মণির মত যে 'মতি'—গজমতির চেয়েও যা দুর্লভ, যা হারিয়ে গিবুবরজার সিংদের এই দুর্দশা, তাকেই সে ফিরিয়ে আনবে। যে 'মতি' অন্ধকারের মধ্যে চাঁদের মত আলো দিয়ে পথ দেখায়, যে 'মতি' হাতে থাকলে জল দু-ভাগ হয়ে পথ দেয়, দিদিয়া বলেছে সে 'মতি' ফিরে পাওয়া যায়—লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে। লেখাপড়াটা অবশ্য তার কাছে অত্যন্ত কঠিন ঠেকছে, এখনও পর্যন্ত কিছুতেই বইগুলোর ভিতরের জিনিসগুলি আয়ত্তে আনতে পারছে না। পড়ে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বলে প্রাণপণে চীৎকার করে সে মুখস্থ করতে চায়। তার পড়ার চীৎকারে পাড়ার লোকে বিরক্ত হয়; অনেকে তিরস্কার করে, সে তা অম্লানবদনে সহ্য করে। কিন্তু আজকের মুখস্থ কাল ভুলে যায়, এই তার দুঃখ। তবু সে আশা ছাড়ে নাই। দেড় বৎসর বাবুদের বাড়িতে রয়েছে, এর মধ্যে ছ-মাস অন্তর তিনটে পরীক্ষা হয়েছে, কোনটাতেই সে পাস করতে পারেনি। চতুর্থ বারের পরীক্ষায় পাস করবার জন্য এবার সে উঠে-পড়ে লেগেছে। ভেবেছিল মেজবাবু এলে তাঁকে সে ধরবে, তিনি বলে দেবেন তাঁদের ইংরাজী-নবিস্ কেরানীবাবুকে—সে লেখাপড়ার একটু-আধটু বুঝিয়ে

দেবে। কিন্তু, মেজবাবুর মুখে উল্টো কথা—পড়া ছেড়ে চাকরি করার কথা শুনে তার বুকের ভিতরটা চমকে উঠল।

মেজবাবু গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বললে—বুঝলি? এক চুমুকে গ্লাসের প্রায় অর্ধেকটা শেষ হয়ে গেল। সেদিনের ছবি স্পষ্ট ভাসছে নরসিংয়ের চোখের উপর। চুমুক দিয়ে মেজবাবু মুখ দিয়ে খানিকটা নিশ্বাস ছাড়লে; বিস্বাদের কটুতা এবং গন্ধের উগ্রতা খানিকটা বেরিয়ে যায় এতে।

বড়বাবু বললে—একটু একটু সিপ কর। এভাবে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ো না।

মেজবাবু সিগারেটে টান দিয়ে বললে—সাপের ছুঁচো খাওয়ার মত একটু একটু করে গেলা, আমার পোষায় না।

বড়বাবু হেসে বললে—সাপে ইঁদুর খায়, ছুঁচো খায় না।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মেজবাবু বললে—এক্সকিউজ্ মি। ওটা আমার ইচ্ছাকৃত ভুল। ইঁদুরের গায়ের গন্ধ নাই। এ বস্তুটার গন্ধের সঙ্গে মিল রাখবার জন্যে ছুঁচো বলেছি। এবং সাপে যখন একবার কোন জিনিস ধরে তখন নাকি ওগরাতে পারে না। ছুঁচো হলেও খেতে হয়। এও তাই! ওয়াইন—উয়োম্যান্—

বড়বাবু বাধা দিয়ে বললে—স্টপ। চোখের ইঙ্গিতে বড়বাবু নরসিংকে দেখিয়ে দিলে।

—আই সি! নরসিংয়ের দিকে তাকিয়ে মেজবাবু গ্লাসে চুমুক দিয়ে বাকীটা শেষ করে বললে—এখানে নতুন করে কয়লার ডিপো হচ্ছে, সেই ডিপোতে তোর চাকরি হল। বুঝলি?

নরসিংয়ের হৃৎস্পন্দন আবার সভয়ে দ্রুতগতি চলতে আরম্ভ করলে।

আবার মেজবাবু বললে—বুঝেছিস?

সহজ কথা, তবু নরসিং নির্বোধের মত প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে? ঐ ভঙ্গির মধ্যেই নিহিত ছিল তার অতি দুর্বল এবং ভীত চিত্তের অস্বীকারের ভাব।

মেজবাবু কিন্তু এটা ভাবতে পারে না, তার কথা কেউ, অন্তত তার অনুগৃহীতের মধ্যে কেউ, অস্বীকার করতে পারে, এটা তার কল্পনারও অতীত। সে এটাকে সম্মতি ধরে নিয়েই বললে—হ্যাঁ। কাল সকালেই যাবি আমার সঙ্গে। কাজকর্ম আমি বুঝিয়ে দেব। প্রথম কিছুদিন আরও একজন ওয়াকিবহাল লোক থাকবে, সে ডিপো চালু করে দেবে। ভয় নাই তোর।

নরসিং এবার সাহস সঞ্চয় করে বললে—পড়ার কি হবে?

—পড়া ? মেজবাবুর কপাল ভ্রূ খানিকটা কুঁচকে উঠল, ঠোঁটের এক পাশ ঈষৎ বেঁকে খানিকটা ধারাল হাসি বেরিয়ে এল।

বড়বাবু প্রশ্ন করলে—তুই পড়বি ? তিনটে পরীক্ষার একটাতেও তুই পাস করতে পারিসনি। তোকে পড়ার জন্যে ভাত—

হাতের ইশারা করে বড়বাবুকে থামিয়ে দিয়ে মেজবাবু বললে—দেখ্, বাঁদরকে শেখালে সে কসরত করে বাজি দেখাতে পারে, কিন্তু গাধাকে ঠেঙিয়ে মারলেও মোট বওয়া ছাড়া গাধাকে দিয়ে আর কিছু হয় না।

নরসিংহের মনে হল, জেঠা মাধব সিংয়ের লাঠির চেয়েও মেজবাবুর কথা ভয়ানক।

মেজবাবু বললে—লেখাপড়ায় তুই গাধা। ও তোর হবে না। শেষ পর্যন্ত চাপরাসীগিরি করবি। মোট বইতে হবে তোকে। তার চেয়ে ডিপোর কাজ শেখ্। এর পর গলার স্বর পালটে গেল মেজবাবুর, বললে—যা, যা বললাম তাই করতে হবে।

অসহায়ের মত নরসিং চলে এল।

উপায় ছিল না। গিরবরজার বাড়িতে শুধু জেঠা মাধব সিং নয়, বাবা পর্যন্ত তার মুখ দেখবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। ধরণী রায় হতে পারে তার মামা, কিন্তু মানে অনেক ছোট। বাড়ি থেকে পালিয়ে সে তার বাড়ি ভাত খায় পোষ্য হয়, তারপর সে বাবুদের বাড়ি বিনা মেহনতে নিমক খায়, দেনো ভাত খায়; তার মুখ কি দেখতে হয়—না, আছে ?

নরসিং শুনেছে মাধব সিং বলে—মর্ গেয়া, উ বাচ্চাঠো মর্ গেয়া।

বাবা চুপ করে থাকে।

গিরবরজার সিং-বাড়ির অমূল্য ধন 'মতি' ফিরিয়ে আনতে এসে মাঝপথে যাদুকরের মন্ত্রের চোটে সে জানোয়ার বনে গেল।

তবু মেজবাবুকে সেলাম। হাজার সেলাম। দুনিয়ায় রোজগারের পথ মেজবাবুই খুলে দিয়েছে। ডিপোর চাকরি—বেশ চাকরি। মণ—আধ মণ—দশ সের—পাঁচ সের—আড়াই সের বাটখারা নিয়ে কারবার। কয়লা বিক্রি করা—খসড়া খাতা লেখা—মজুরটাকে দিয়ে চালনায় কয়লা চেলে নিয়ে ধুলো গুঁড়ো বার করে রাখা—আর বসে থাকা। পাঁচ আনা মণ দাম। মণ-করা এক সের মারতে পারলে একটা আধলা বেরিয়ে আসে। সমস্ত রোজগারটাই গোড়ায় উদ্যোগ করে করত নিতাইয়ের বাবা। ভাগ দিতে চাইলেও নিত না নরসিং।

তার পর—কেমন করে কবে থেকে যে সে নিতে আরম্ভ করলে, সে নরসিংয়ের মনে নাই। পেতলের বাটিতে তেল তো তেল—ঘি রাখলেও কিছুদিন পর সবুজ রঙের কলঙ্ক জন্মায়, পেতলের বাটি থেকে জন্মায়—কিন্তু ঘিয়েও লাগে। কয়লার ডিপোটা পেতলের বাটির চেয়েও খারাপ, লোহার বাটি। কয়লার ডিপোর পাশে কয়লা ছিটকে পড়ত, কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে আসত ছোট জাতের গরীবগুনার মেয়েরা। গিবুবরজার এ জাতের মেয়েদের সঙ্গে এখানকার এদের কোন তফাত নাই। ওখানে আগে সিংরা রাত্রে মদ খেয়ে ঝোঁক চাপলে চলে যেত ওদের পাড়ায়। দরজায় লাথি মেরে ডাক দিত। ঘুমন্ত দম্পতির ঘুম ভেঙে যেত; দরজা ভাঙার ভয়ে বেরিয়ে আসত পুরুষটি—এবং দূরে অন্ধকারে কোন স্থানে সিংমশায়ের নির্গমন-সময়ের অপেক্ষা করত; ঘুমিয়ে যেত সেইখানেই। কখনও আলো ফুটলে ঘুম ভাঙত, কখনও রাত্রেই ঘুম ভাঙত স্ত্রীর আহ্বানে। এখন আর অবশ্য সেদিন নাই। তবুও রেওয়াজটা আছে—দু-পক্ষই অভ্যাস ভুলতে পারে নাই; সিং-বাড়ির জোয়ান ছেলেরা শিস দিয়ে বেড়াবার অজুহাতে ওদের নাড়া দিয়ে আসে, মেয়েদেরও দেখা যায় গাছের আড়ালে, গলির মুখে। মাঠে মেয়েরা কাঠ ভাঙতে যায়, সিং-বাড়ির ছেলেরা ভাবুকের মত মাঠের ধারে বসে থাকে। এখানেও ঠিক তাই। আগে এখানকার বাবুরাও সিংদের মত দরজায় লাথি মারত। চাপরাসীদের এসে খবর দিয়ে নিয়ে যেত বাবুদের বার-বাড়িতে। এখনও চাপরাসীদের এ সব কাজ করতে হয়। এখানকার মেয়েরাও এখন গোপনে গাছতলায়, গলির মুখে দেখা করে। স্টেশনে, ডিপোয়, বাজারে নানা কাজের ছুতোয় যায়—তার প্রধান উদ্দেশ্য এইটা।

নিতাইয়ের বাপ নোটন, সে ওদের সঙ্গে রসিকতা করত। প্রথম প্রথম ভাল লাগত না নরসিংয়ের। তারপর ক্রমে ক্রমে বেশ লাগতে লাগল।

একদিন ভট্ ভট্ শব্দ করে ফটফটিয়ায় চেপে এল মেজবাবু। কাল রাত্রে বাড়ি এসেছে। হিসাবপত্র ঠিক করে, ডিপো যতখানি পরিষ্কার করা চলে, পরিষ্কার করে নরসিং বসে ছিল। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

মেজবাবু নামল। নেমেই বললে, বাঃ।

খুশী হল নরসিং। পরিষ্কার করার ফল পেলে সে হাতে হাতে।

মেজবাবু বললে, ওটা কে রে নোটনা? বেশ দেখতে তো! বাঃ!

নোটনা বললে, কুঞ্জ ডোমের বেটার বউ।

—ডাক্ ওটাকে।

হেসে নোটন বললে, আজ্ঞে ওটা ভারী ভীতু। নতুন বউ।

মেজবাবু এবার পিছন ফিরে কয়লার দিকে ফিরল, বেশ ভাল করে চারিপাশ ঘুরে দেখল। তারপর হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার হাত খপ করে ধরে বললে, পুলিসে দে এটাকে। কয়লা চুরি করেছে। টেনে মেয়েটাকে নিয়ে সে ডিপোর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মেয়েটার সঙ্গে ছিল আর দুটো মেয়ে, তারা হাসতে লাগল। নোটনও হাসতে আরম্ভ করলে। মেয়ে দুটো বললে, বাবুর কাছে আজ ফি জনায় এক টাকা করে লোব। হ্যাঁ।

নরসিং প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেল, তারপর অকস্মাৎ মনে হল—পায়ের ডগা থেকে মাথা পর্যন্ত কি যেন সন্ সন্ করে চলছে। কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে, চোখ দপ্ দপ্ করছে। বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করছে না, কিন্তু যেন দুলছে। নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে, বৈশাখী সন্ধ্যার বাতাসের মত।

বেরিয়ে এল মেজবাবু।

নোট-কেস থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে নরসিংয়ের হাতে দিয়ে বললে, নে। নোটনকে দিলে একখানা পাঁচ টাকার নোট।

নোটন মৃদুস্বরে বললে, সঙ্গের মেয়ে দুটো বলছে, দু-টাকা লেবে।

দুটো টাকা ফেলে দিয়ে মেজবাবু ফটফটিয়ার প্যাডেলে ধাক্কা দিয়ে চড়ে বসল। দেখতে দেখতে উড়ে চলে গেল যেন। নরসিংয়ের মাথার মধ্যে, সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলে উঠল মুহূর্তে। মেয়েটা চলে গেল। নরসিংয়ের স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গেল। সে আপসোস করে ঘরে ঢুকতেই পায়ে কিছু একটা ঠেকল; সেটা মেজবাবুর কাঁধে ঝুলানো থাকে, গরম চা ঠাণ্ডা হয় না, ঠাণ্ডা জল গরম হয় না বাইরের উত্তাপে; কিন্তু ওটা থেকে গন্ধ উঠছে অন্য জিনিসের। বিলাতী মদের।

নরসিং খপ করে সেটাকে খুলে ঢক্ঢক্ করে মুখে ঢেলে দিলে।

সেদিনটা নরসিংয়ের চিরদিন মনে থাকবে। চিরদিন!

নরসিং দাঁতে দাঁত ঘষে প্রায় চীৎকার করে গর্জন করে উঠল—শূয়ারকি বাচ্চা! হারামজাদা!

রাম নিতাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে; রামটা গোঙাচ্ছে, নিতাইটার কশ বেয়ে বীভৎসভাবে লালা গড়াচ্ছে। নরসিং চঞ্চল হয়ে খানিকটা নড়ে চড়ে বসল। তারপর উঠে ঘরের কোণে যে বোতল দুটো ছিল, বোতল দুটো নেড়েচেড়ে

দেখলে। একেবারে খালি ; এক ফোঁটাও পড়ে নাই। গ্লাসের জল খানিকটা সে বোতলে ঢেলে তাই খানিকটা খেলে।

মামীর ভাইঝিটাকে এর আগে সে অনেকবার দেখেছে। ওই রামার মতই দেখতে ছিল সে। কিন্তু সে ছিল যেন কাদায় গড়া মানুষ। যত ভীরু তত ছিল তার সহ্যগুণ। হঠাৎ এইবার তার চোখে সে যেন নতুন চেহারা নিয়ে দাঁড়াল।

মামীর উপর আক্রোশে, মেজবাবুর দৃষ্টান্তে সে মনে মনে···

আবার সে চেঁচিয়ে গর্জে উঠল—রামা, শূয়ারকি বাচ্চা!

উঠে দাঁড়িয়ে নিতাইয়ের পিঠে লাথি মারলে। নিতাই একটা শব্দ করলে শুধু একবার ; অর্থহীনভাবে চোখ মেলে একবার তাকালে ; তারপর পাশ ফিরে শুলে।

নরসিং বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

শুখনরামের গদির সামনে পাকা ইঁদারা ; একেবারে লোহার হুক দিয়ে আঁটা, শেকলে ঝুলানো বালতি রয়েছে ইঁদারার পাড়ের উপর। বালতিটা ফেলে দিলে ইঁদারার জলে। সশব্দে গিয়ে পড়ল বালতিটা। সবল বাহুর টানে বালতিটা টেনে তুলে, বালতির জল সে হড়-হড় করে মাথায় ঢাললে।

—জান্‌কী জান্‌কী, আমার পাপ তুই ক্ষমা করিস। জান্‌কী. তার সোনার জানকি!

খানিকক্ষণ সে পায়চারি করে ফিরল রাস্তার উপর। তার পর সে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বাতিটা নিভে গিয়েছে, ঘর অন্ধকার। অন্ধকারেই ঠাওর করে সে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর আবার সে উঠল। দেশলাই জ্বেলে নতুন বাতিটা দেখে নিয়ে সেটাকে জ্বেলে নিলে।

যো হো গেয়া—সো হো গেয়া, যানে দো। ফিন্ শুরু করো।

শ্যামনগর-পাঁচমতিয়া সার্ভিস। আট মাইল পথ। সে কাগজ পেন্সিল বার করে বসল এবার। আট মাইল পথ ; সকালে এগারটা পর্যন্ত দু-বার যাবে, দু-বার আসবে। রাত্রে দু-বার যাওয়া, দু-বার আসা। আটবার। আট আটে চৌষট্টি মাইল। গাড়িটা পুরনো, রাস্তা খারাপ। গ্যালনে ষোল মাইল ধরাই ভাল। চৌষট্টি মাইলে চার গ্যালন তেল। আঠার আনা গ্যালন হিসাবে—সাড়ে চার টাকা। মোবিল হাফ গ্যালন—দু-টাকা।

টায়ার বছরে একটা হিসেবে চারটে ; চার পঁচিশ—একশ। টিউব চারটে ; চার আটে—বত্রিশ। এ-ছাড়া বৎসরে একশ টাকা মেরামতি খরচ।

কাক-কোকিল ডাকছে। থাক্ হিসেব। হিসেব কষে দেখে কাজ করতে গেলে আর খোলা হয় না সার্ভিস। চোখে সে যে হিসেব রাস্তায় বসে দেখে এসেছে সেইটাই বড় হিসেব।

শ্যামনগর-পাঁচমতিয়া সার্ভিস। ভাড়া—সীট্-পিছু আট আনা।

সাত

—পাঁচমতি বাবু পাঁচমতি, খালি মোটর ; আট আনা সীট। শুধু আট আনা। ট্যাক্সি মোটর বাবু। যাবেন বাবু, যাবেন ?

চৌরাস্তার মোড়ে রাম দাঁড়িয়ে হাঁকছিল। নরসিং গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল—মোটর একসেসেরিজ সাপ্লাইয়ের দোকানে ; তেল ভরে নিয়ে এল সে। নিতাই সঙ্গে গিয়েছিল। নরসিং এসেই ধমক দিলে।

—হাঁকিস না উল্লুক।

—হাঁকব না ? বিস্মিত হল রাম।

—না। এখনও সার্ভিসের লাইসেন্স মেলে নাই। কেস হয়ে যাবে।

—তবে ?

নরসিং বললে—ঘোড়ার গাড়ির আড্ডায় নজর রাখ। প্যাসেঞ্জার এলেই ডেকে আস্তে বল্। দেখতে দেখতে চারজন প্যাসেঞ্জার জুটে গেল। ঘোড়ার গাড়ির শেয়ারও আট আনা, মোটরের শেয়ারও আট আনা। মোটর ছেড়ে লোকে ঘোড়ার গাড়িতে যাবে কেন ? নরসিং ষ্টীয়ারিংয়ে বাঁ হাতটা রেখে অলসভাবে সিগারেট টানছিল। দৃষ্টি ছিল তার ঘোড়ার গাড়ির আড্ডার উপর। দিদিয়ার ভাঁড়ার-ঘরের সামনে সকালবেলায় উঠে গিয়ে সে বসত, জলখাবার খেত—মুড়ি, ছোলা ভিজে আর গুড়। তার সঙ্গে থাকত জেঠা মাধব সিংয়ের পাতের প্রসাদ একখানা রুটি। পিঁপড়ে বেড়াত ঘুরে ভাঁড়ার-ঘরের সামনে। রুটির টুকরোটা ছিঁড়ে সে ফেলে দিত। দেখতে দেখতে জুটে যেত রুটির টুকরোটার চারি প্রান্তে পিঁপড়ের ঝাঁক! রুটির টুকরোটা টেনে নিয়ে যেত গর্তের দিকে! হঠাৎ এসে যেত একদল ডেয়ো পিঁপড়ে।

প্রায় লাফিয়ে পড়ত টুকরোটার উপর। ছোট পিঁপড়েগুলো চঞ্চল হয়ে প্রথমটা ছুটকে পড়ত, তার পর তারা আসত আরও দলে ভারী হয়ে, এসে টানত অন্য প্রান্ত ধরে। অবশেষে আক্রমণ করত ডেয়ো পিঁপড়েদের।

ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানরা এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ট্যাক্সিটার দিকে তাকিয়ে কি বলাবলি করছে!

নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল পুরনো আমলের কথা। সে চোখে দেখে নাই, জেঠা মাধব সিংয়ের কাছে শুনেছে। মাধব সিংয়ের ছেলেবেলাকার কথা। তখন ওই জোসেফদের পূর্বপুরুষেরা পাঁচমতি থেকে শ্যামনগর পর্যন্ত যাত্রী বয়ে নিয়ে যেত। ডুলি ছিল ওদের, এক ডুলি চার বেহারা; পাঁচমতি থেকে চলত শ্যামনগর, শ্যামনগর থেকে শহর মুর্শিদাবাদ। মাধব সিং বলে—একদিন এল কেরাঞ্চি গাড়ি। দুই ঘোড়া, ভিতরে বসবার গদি, খপ্‌ খপ্‌ করে জোড়া ঘোড়া চলে জোর কদমে, ডুলিতে লাগল দু-ঘণ্টা, কেরাঞ্চি এক ঘণ্টাকে অন্দর পঁহুছে দিলে। বাস্—বাতিল হয়ে গেল ডুল।

কেরাঞ্চির নসিবে আগুন ধরাতে সে নিয়ে এসেছে তার 'ট্যাক্সি কার'কে —তার জবরদস্ত থাকে। বহুত আরামদার গদি, মজবুত স্প্রীং; হাওয়া গাড়ি —হাওয়ার মত জোরসে ছুটতে পারে,—সে যখন এসেছে কেরাঞ্চিকে তখন যেতে হবে বইকি। হাড্ডিসার—চোখে-পিঁচুটি জানোয়ারগুলোকে দেখে তার মায়া হয়, ঘেন্নাও হয়। ছেড়ে দে, ওগুলোকে ছেড়ে দে!

একজন কেউ আসছে। হাতে চামড়ার কাগজ রাখা ব্যাগ—কি বলে যেন? অ্যাটাচি কেস! হ্যাঁ, অ্যাটাচি হাতে আসছে; পরনে শৌখিন জামা কাপড়!

নরসিং বললে—নিতাই মার্ হ্যাণ্ডেল।

—আর একটু দেখবেন না?

—হয়ে গিয়েছে, নে। নরসিং জানে ওই লোকটা মোটরে জরুর যাবে। কেবল একটা খোঁচ আছে। লোকটা পুরা গাড়ি ভাড়া করে চাল মেরেও যেতে পারে।

—কি বাবু? পাঁচমতি যাবেন? আয়েন বাবু—আমার ঘোড়া ভাল।

—আমি হুজুর, এখুনি ছাড়ব। এদিকে হুজুর। ভাল গাড়ি।

নরসিং গাড়িখানা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়াল।—মোটরে যাবেন স্যার? আট আনা ভাড়া।

—মোটর? ট্যাক্সি?

—হ্যাঁ স্যার। আসুন স্যার। দুটো সীটের দাম দিলে সামনেটা গোটা পাবেন।

—লোক বসেছে যে একজন?

—আপনি একটু ভেতরে যান তো দাদা। পিছনটা চারজনেরই সীট। হ্যাঁ, চারজনের। দেখুন না সামনের সীটের চেয়ে কতখানি চওড়া। সামনেটা যদি তিনজনের হয় তবে ওটা চারজনের কিনা আপনারাই বিচার করুন। বসুন স্যার, বসুন। গীয়ারের হাতলের মাথাটা বাঁ হাতে চেপে ধরে সে পায়ে চাপ দিলে অ্যাকসিলারেটারের উপর। গর্জন করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে নরসিংয়ের গাড়ি ছুটল। শহরের ভিতরের রাস্তা অতিক্রম করে গাড়ি এসে পৌঁছে গেল তে-মাথায়; এইখান থেকে পাঁচমতির সড়ক শুরু। বাঁদিকে একটা মন্দির। নরসিং প্রণাম করলে—যে দেবতাই থাক, প্রণাম তোমাকে। কিছুটা দূরে একটা মসজিদের মিনারের আধখানা দেখা যাচ্ছে—সেলাম আল্লাহতয়লা খোদাতয়লা। তোমাকেও প্রণাম। নরসিং আরম্ভ করলে নতুন কারবার, নতুন পথে পা বাড়াবে, গাড়ি ছুটালে। তোমরা মঙ্গল করো। হঠাৎ মনে পড়ল জোসেফকে। জোসেফের গির্জার গড়—তোমাকেও প্রণাম।

—আবে, উল্লুক বেকুবের দল, গরুর গাড়ির সারি নিয়ে আমিরী চালে হুঁকা টানতে টানতে চলেছে দেখ, চলেছে আবার রাস্তার মাঝখান জুড়ে। হঠাও, হঠাও—হঠাও গাড়ি। গাড়ির গতি মন্থর করে সে হর্ন দিতে আরম্ভ করলে —ভোঁপ—ভোঁপ—ভোঁপ। তার পর দিলে ইলেকট্রিক হর্নে হাত। তীব্র চীৎকারে হর্নটা বেজে উঠল। হঠাও। হঠাও। জলদি করো। হঠ যাও।

নিতাই প্রশ্ন করলে—দড়িটা বার করব নাকি?

—না। নয়া জায়গা।

গাড়িগুলো সরে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সরছে। গাড়ির প্যাসেঞ্জারদেরও মোটরে চড়ার নেশা লেগেছে। নরসিংয়ের পাশের বাবুটি বলজে, উল্লুকদের চাবুক মারা উচিত।

মনে পড়েছে মেজবাবুকে। মেজবাবু চাবুক চালাতেন। দুরন্ত মেজবাবু কাউকে ভয় করতেন না, কিছুকে ভয় ছিল না তাঁর!

মোটর-বাস কিনে নিয়ে এলেন। সোনালী রঙের বাসখানা বাহারের বাস ছিল। কলকাতা থেকে রহমত ড্রাইভার এল, বাস চালিয়ে এসেছিলেন

মেজবাবু, রহমত ছিল পাশে বসে। প্রথম গেলেন সদর, সেখান থেকে বাস লাইসেন্স করিয়ে এনে পরের দিন বাস সার্ভিস খোলা হল। সেদিন তিনটে ট্রিপের দুটো ট্রিপে বাস ট্রেন মিস্ করলে।

মেজবাবু রেগে আগুন হয়ে গেলেন। রহমত—এ কেয়া বাত?

রহমত ছিল বাঙালী মুসলমান, সে বললে—কি করব হুজুর। যাবার পথ চাই তো! গরুর গাড়ির এলাকা আপনাদের. এক এক দফায় দশ-বিশখানা গাড়ি সারবন্দী চলবে, মাঝখান চেপে চলবে। রাস্তা না ছাড়লে আমি যাই কি করে? রাস্তায় তখন মাল-বওয়া গরুর গাড়ি চলত। গাড়োয়ানেরা ছিল ইমামবাজারেরই পাশের গ্রামের পেশাদার গাড়োয়ান। তাদের স্বভাবই ছিল ওই। রাস্তা তারা কিছুতেই ছাড়বে না।

মেজবাবু বললেন—আচ্ছা, কাল থেকে আমি যাব।

পরের দিন থেকে মেজবাবু বসলেন বাঁ ধার ঘেঁষে. হাতে নিলেন চাবুক।

ফিরে এসে রহমত বললে, বাপ রে বাপ! কাম ছেড়ে দোব আমি!

নরসিং তখনও কাজ করছে কয়লার ডিপোয়। সে বললে. কি হল?

—কি হল? মেজবাবু এক ধারসে চাবুক চালিয়ে গেলেন।

নরসিং হেসেছিল। রহমত মেজবাবুকে জানে না।

রহমত বললে—মেজবাবু বরাবর থাকবেন না। তখন যদি সকলে মিলে বাস আটকায়, আমার জান মেরে দেবে।

—মেজবাবু না থাকে, মেজবাবুর নাম থাকবে। নরসিং আবার হেসেছিল। রহমত কিন্তু শুনলে না, বললে মেজবাবুকে। মেজবাবু হা-হা করে হাসলেন। —এ কলকাতা নয় রহমত, গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা এখানে দাঙ্গা করে না। যে চাবুক চালালাম তার সাঁই সাঁই শব্দ আর পিঠের জ্বালা ভুলতে লাগবে ছ'বছর। তা ছাড়া ঘণ্টায় ষাট মাইল ছুটবে তোমার গাড়ি—তার ধাক্কার ভয় নাই?

—হুজুর, সামনে একখানা গরুর গাড়ি খাড়া করে দিলেই তো হল। গাড়ি তো লাফিয়ে পার হওয়া যাবে না বাবু!

—মুসলমাসের বাচ্চা তুমি, লড়তে পারবে না?

—লড়তে পারি হুজুর। কিন্তু একা আমি কি করব?

—আচ্ছা। তোমার সঙ্গে জবরদস্ত লোক দোব আমি। ডাকলেন নরসিংকে। নরসিং তখন কাঁচা বাঁশের মত সোজা লম্বা হয়ে উঠেছে। আর

সঙ্গে দিলেন নিতাইকে। নরসিং কণ্ডাক্টর, নিতাই ক্লীনার। বললেন—এদের নিয়ে পারবে তুমি ?

—হ্যাঁ, হুজুর। এরা। এরা থাকলে তবু সাহস থাকবে।

মেজবাবু তাদের নিয়ে আরও ক-দিন চললেন বাসের সঙ্গে। নিতাইকে এবং নরসিংকে দু-ধারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হাঁক—হঠাও! হঠাও! হঠাও!

রহমত হাজাব হলেও পাকা লোক। সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল। রহমত বলত—মানুষে আর মেঘে কোন তফাত নাই রে ভাই। যে মেঘ পানি ঢালে, গলে গলে ঝরে পড়ে, সেই মেঘ হঠাৎ একসময় চড়াক্ করে বিজলী হেনে দেয়। কখন যে চিড় খাবে, বিজলী হানবে—সে তাক করা সোজা নয়।

আটকালে তারা গাড়ি। সামনে গরুর গাড়ি রেখে দিয়েছিল। নরসিং আর নিতাই হাঁকলে—হঠাও!

তারা দমলে না। বললে—আয় নেমে আয়।

নরসিং এবং নিতাই নামছিল। মেজবাবু তার আগেই নামলেন। মৃদুস্বরে বললেন—ডাণ্ডা বের কর্। বলে গট্ গট্ করে এগিয়ে গেলেন। গাড়িতে লাথি মেরে বললেন, হঠাও!

তারা গর্জে উঠল।—চাবুক মারার শোধ নোব আজ। চাবুক চালানো বার করব।

মেজবাবু বাঁ হাত পকেটে পুরে, ডান হাতে চাবুক নাচিয়ে বললেন—চাবুকের সঙ্গে আজ পিস্তল চালাব।

নরসিং এবং নিতাই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে ডাণ্ডা হাতে। মেজবাবু বললেন, বে-এখ্তিয়ারী কাজ করলেই চাবুক খেতে হবে।

একজন বললে—কিসের বে-এখ্তিয়ারী ? রাস্তা—সরকারী রাস্তা। এতে সবারই চলবার এখ্তিয়ার আছে।

—আছে। মেজবাবু হাসলেন। তার পর বললেন—কে আগে চলবে, কে পরে চলবে তারও একটা এখ্তিয়ার আছে!

—যে বড়লোক সেই আগে চলবে নাকি ?

হা-হা করে হেসে উঠলেন মেজবাবু—সে হাসিতে হাওয়াও চককে ওঠে। হেসে বললেন—উল্লুক একটা তুই।

লোকটা থতমত খেয়ে গেল। অন্য একজন বললে—গাল দেবেন না মশায়।

মেজবাবু বললেন—গাল কি তোকে দিই, না, মানুষকে দিই? গাল দিই মানুষের বে-আক্কেলকে—বেকুফিকে।

—কেনে? কি বে-আক্কেলী কথা বলেছি?

—বড়লোকের আগে যাওয়ার এখ্তিয়ার নাই—যে সে কথা বলে সে বেকুফ, বে-আক্কেল। আগে যাবে সেই, যার সব চেয়ে জোরে যাবায় তাকত আছে। গরুর চেয়ে ঘোড়ার জরুর আগে যাওয়ার এখ্তিয়ার আছে। আবার ঘোড়ার চেয়েও মোটরের এখ্তিয়ার আগে যাওয়ার। যে যত জোর চলবে তার তত আগে যাবার এখ্তিয়ার, যে আস্তে চলবে তাদের সরে পথ দিতে হবে জলদি যানেওয়ালাকে। হঠাও—গাড়ি হঠাও।

আশ্চর্য! তারা সরিয়ে নিলে গাড়ি।

মেজবাবু গাড়িতে চেপে বললেন—গাড়িতে প্যাসেঞ্জার রয়েছে। কারও আছে মামলা, কারও হয়তো আপনার জনের অসুখ, ওষুধ আনতে চলেছে। আর তোমরা মাঝখানে গাড়ির সারি চালিয়ে—'সখী আমার মনের ব্যথা তুমি বুঝলে না' বলে গান ধরে চলবে আপন মনে—তা হবে না। তোমার সখী মনের কথা বুঝল না বলে মন উদাস হয়ে থাকে তো পথের এক পাশে গাড়ি রেখে, গাছতলায় বসে মনের দুঃখে গাঁজা খাও, মদ খাও, কাঁদো হাসো নাচো—কিছু বলব না আমরা।

তারাও হেসে উঠল কথা শুনে।

মেজবাবু বললেন—না হয় তো আমার গাড়ির আগে ছুটে চল।

একজন বললে—তা আজ্ঞে, আমাদের গাড়ি তো বেমক্কা পড়তে পারে, গরু অনেক সময় বেকায়দা হয়ে যায়।

—নিশ্চয়। সে সময় আমার গাড়ি দাঁড়াবে। আমার লোকজন নেমে তোমার গাড়ি নিরাপদে পাশে সরিয়ে দিতে সাহায্য করবে। তোরাই বল্ না, আজ আট দিন এই কাণ্ড চলেছে, চাবুক আমি চালিয়েছি, কিন্তু এমন কোন গাড়ির গাড়োয়ানের উপর আমি চাবুক চালিয়েচি? চালিয়ে থাকি, আমি কসুর মানব—মাফ চাইব।

তারা চুপ করে রইল।

হঠাৎ একজন বললে—আমাদের কিন্তু একদিন গাড়িতে চাপতে দিতে হবে।

মেজবাবু বললেন—খুব খুশি হব আমি। চাপ একদিন গাড়িতে। তা

ছাড়া বলে দিচ্ছি আমি ড্রাইভারকে—হঠাৎ কারও কোন অসুখ হয় পথে, গাড়ি ভেঙে যায়—মানুষকে গাড়িতে তুলে নেবে। পৌঁছে দেবে ইমামবাজার বিনা ভাড়ায়।

তারা বললে—সেলাম বাবু। প্রণাম বাবু।

মেজবাবু বললেন—চল রহমত।

রহমত গাড়ি ছাড়বার আগে একটা সেলাম দিয়ে বললে—সেলাম হুজুর আপনাকে।

গাড়ি পাচমতি ঢুকছে।

পাঁচমতি গিরবরজার মা-লক্ষ্মীর কৃপায় ধনে দৌলতে ঝলমল করছে। বড় বড় বাড়ি, ধানী জমিদারের বাস। উকিল, মোক্তার, আদালতের আমলার বাস। শ্যামনগরের মত না হলেও বেশ বড় জায়গা। দু-তিনজন জমিদারের মোটর আছে, কয়েকজনের ঘোড়ার গাড়ি আছে, কয়েক বাড়িতে হাতি আছে। দোকান পশার হাট বাজার। নিতাই বললে, বেশ জায়গা গুরুজী।

একটা চায়ের স্টলের সামনে গাড়ি থামালে নরসিং।—নে, আর একদফা চা খেয়ে নে। রামা, জোরে জোরে হাঁক্—শ্যামনগর খালি মোটর যাচ্ছে, আট আনা সীট!

চায়ের স্টলের দোকানদারের কাছে বসল সে।—আপনার দোকান? আপনার নামটি কি দাদা? চিমড়ে পাক-দেওয়া চেহারা লোকটির, দেখেই বুঝতে পারা যায়, চিমড়ে শরীর হলেও ভয়ানক শক্ত শরীর; একটা চোখ টেরা। মাথায় ঢেউ-খেলানো চুলে চেরা সিঁথি। লোকটার মেজাজও অদ্ভুত খারাপ। মনে হল, সে তাকালে নিতাইয়ের দিকে, কিন্তু তাকালে সে নরসিংয়ের দিকেই। টেরা চোখের চাউনির দিক্ নির্ণয়ের হদিস জানা আছে নরসিংয়ের। রামার বোন তার স্ত্রী ছিল টেরা। মনটা কেমন হয়ে গেল নরসিংয়ের। তাকে মনে পড়ে গেল।

লোকটা বললে, আমার নাম নিয়ে তোমার কাম কি হে বাবু? চা খাবে চা খাও। পয়সা দাও—চলে যাও, বাস। পয়সা ফেলে মোয়া খাও, আমি কি তোমার পর?

নিতাই বললে, ও বাবা! এ যে একেবারে মিলিটারি।

রামা খি-খি করে হাসতে আরম্ভ করে দিয়েছে—লোকটার চাউনি দেখ্

মাইরি। হি-হি-হি-হি! চায়ে চুমুক দিয়ে বিষম খেলে—খক-খক করে কেশে সারা হল—তবু তার হাসির নিবৃত্তি নাই।

লোকটা উত্তর দিলে নিতাইয়ের কথায়—তুম বি মিলিটারী—হাম বি মিলিটারী। তুম বি ভাল, হাম বি ভাল। তুমি ধর লাঠি—হামি ধরি ডাণ্ডা। তুমি বল ভাই—তো আমি বলি দাদা। বাবা, স্বরেশ দাসকে পেটে মুখে এক বাত। কোই কো বান্দা নেহি হাম। এ বাবা পাঁচমতি। এতনা বড় পাজী জায়গা আর নাই। যত ক-টি বড় লোক—উকিল মোক্তার—সব এক এক চীজ। একচুল এদিক ওদিক হয়েছে কি বাস্, মামলা এক নম্বর—কি মারপিট। হিঁয়া চালাকি মৎ কর। ত্রিশ বছর বয়স হল—চল্লিশ নম্বর ফৌজদারী মামলার আসামী করেছে আমাকে, আমিও করেছি বিশ-ত্রিশ নম্বর। সে করেও ঠিক আছি বাবা।

নরসিংয়ের ভারি ভাল লাগে স্বরেশকে।—বস্থন বন্ধু বস্থন। চটছেন কেন? আমরা হলাম বিদেশী লোক। এসেছি আপনার এখানে। বন্ধু বলেছি—

বাস্, বাস্। আপনি আমাকে বন্ধু বলেছেন; আমিও বলছি বন্ধু—মিতা—দোস্ত। বস্থন, আরাম করুন। চা খান। সিগারেট খান। দিনে যদি থাকেন তবে আমার বাড়িতে খান। আমি জাতিতে বৈষ্ণব।

—এই তো। এই তো ভাই বন্ধু। হয়ে গেল মিতালি।

স্বরেশের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আপনারা কোথায় যাবেন?

—যাব না, এলাম।

—এলেন? মোটর নিয়ে, কার মোটর?

—মোটর আমার নিজের। ট্যাক্সি। পাঁচমতি থেকে শ্যামনগর সার্ভিস খুলবার মতলব আছে।

—বলেন কি? জয় নিতাই রাধেশ্যাম। বহুত আচ্ছা। তা খুব চলবে আপনার। কেরাঞ্চিওয়ালারা বেশ কামায়। তবে খুব হুঁশিয়ার। এখানকার মোক্তার উকিল আমলারা বড় পাজী। একটু থেমে বলে, ভাল লোকও আছে দু-চারজন। এই যে এই যে—হরিনারায়ণবাবু মাস্টার, ভাল লোক। মাস্টার-মশায়—

খদ্দর-পরা অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক হাসিমুখে দাঁড়ালেন।—কি সংবাদ স্বরেশ?

—এই ইনি এসেছেন ট্যাক্সি গাড়ি নিয়ে। পাঁচমতি-শ্যামনগর সার্ভিস খুলছেন। তা আপনি তো রোজকার খদ্দের একজন।

—হ্যাঁ। তা,—তা, বেশ তো।।

—চলুন গাড়িতে। চলুন।

—সুরেশের টেরা চোখ জ্বলজ্বল করছে।

—শ্যামনগর। শ্যামনগর। ট্যাক্সি কার ?

সুরেশ হাঁকলে, এই চলে যায়। হর্ন—হর্ন দাও হে।

ভোঁ—ভোঁ—ভোঁপ্, ভোঁপ্।

মাস্টার মশায় ডাকলেন, ও অরবিন্দবাবু

—কি ? মোটর কোথাকার মশায় ?

—আসুন। আসুন। ট্যাক্সি। সার্ভিস খুলেচে শ্যামনগর-পাঁচমতি।

—ভাড়া ?

—ভাড়া ওই আট আনা সীট।

—বহুত আচ্ছা। ফইজুর মড়া ঘোড়া আর ভাঙা গাড়ি নিয়ে আর চলছিল না বাবা। আরে নবগোপাল—প্রতুল! এদিকে—এদিকে। ট্যাক্সি—চলে এস।

হরিনারাণ বললে নরসিংকে—আপনি এক কাজ করবেন, আমাদের সব যাবার সময় বাঁধা আছে, এক এক ট্রিপের প্যাসেঞ্জারদের নাম লিখে রাখবেন, টাইম বাঁধা করে নেবেন। বাস্—ঠিক সময়ে এসে আমরা চেপে বসব।

নরসিংয়ের গাড়ি আবার ছুটল শ্যামনগর।

পাঁচমতি—শ্যামনগর!

বাদশাহী সড়কের উপর পহেলা ট্রিপের দাগ এখনও মিলায় নাই। তার উপরে পড়ল দ্বিতীয় ট্রিপের রবার টায়ারের বরফি। কাটা ছকের ছাপ।

রামা এখনও হাসছে।—দাদাবাবু, লোকটার চোখ দুটো কি রকম! হি-হি-হি-হি!

নরসিংয়ের মনে পড়ছে রামার বোনকে। তার স্ত্রীকে। ভাসা পালকের মত স্বভাব রামার। নিজের বোনকে—মার পেটের বোনকে মনে পড়ে না।

নিতাই হাঁকলে—গুরুজী!

হুঁশিয়ার করছে নিতাই। অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে যেত। হাসলে নরসিং। চোখের জল এসে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল সামনেটা।

ঝাপসা হবে না? জান্‌কীকে মনে পড়ছে যে! জান্‌কী বলে বাড়ির লোকে ডাকত। জান্‌কী! জান্‌কী ছিল তার নাম। চোখ দুটি ছিল টেরা। বারো-তের বছরের হিলহিলে লম্বা জান্‌কী হঠাৎ তার মনের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

মামী নিয়ে এসেছিল ভাইঝি আর ভাইপোকে; মামা তার বোনের ছেলেকে এনেছে যখন, তখন সেই বা আনবে না কেন? মতলব ছিল, মামার ভালবাসাটা পড়বে গিয়ে তাদের উপর। নরসিং যখন বিদায় হয়েছে, তখন এইটাই বড় সুযোগ। নরসিং কিন্তু থুথু ফেলেছিল। আরে সীতারাম! মামার আছে কি, তাই নেবে? একখানা খড়ে ছাওয়া ঘর আর ক'বিঘে জমি? তার জন্য নরসিং ঘর ছাড়ে নাই। তবু প্রথম প্রথম তার আক্রোশ হয়েছিল এদের দু-জনের উপর। মধ্যে মধ্যে মামা তাকে নিমন্ত্রণ করত। সে আসত মামার বাড়ি। আসত শুধু মামার জন্য। তাছাড়া তার জেঠা মাধব সিং বলেছিল—উসকে বদন্ হাম নেই দেখেগা। পরের ঘরে ভাত ভিক্ষে করে খায়?

বাবা কোন কথাই বলত না। কিন্তু একবারও খোঁজ নেয় নাই। নরসিং বাবুদের ঘরে বইগুলোর দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে মাথা কুটে মরত। তাকে উদ্ধার করতে হবে—দিদিয়ার গল্পের সেই গিরবরজার ছত্রীদের হারানো মতিকে।

সে রবিবার দিন যেত মামার বাড়ি। তখন জান্‌কী ছোট। টেরা চোখে কার দিকে সে চাইত নরসিং বুঝতে পারত না। ভারী যত্ন করত তাকে। সোমবার যখন সে চলে আসত, বলত—আবার কবে আসবে? কাদার মত স্বভাব ছিল তার। লেপটে লেগে থাকতে চাইত।

বলত—তোমার মত রামকে লিখাপড়া শিখবার বন্দোবস্ত করে দিয়ো তুমি। তোমার পুরোনো কেতাবগুলি দিয়ো। রেখে দিব। বড় হয়ে রাম সিং পড়বে।

প্রথম প্রথম নরসিং জান্‌কীকে কিছু বলতো না। সে জান্‌কীকে রূঢ় ভাষায় বলত, ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো। কুকুরের বাচ্চার মত পায়ের কাছে এসে লেজ নাড়তে হবে না—ভাগো।

তারপর তাকে প্রহার দিতে শুরু করলো।

সেদিন রবিবার। পরের দিন সোমবারে রথযাত্রা। ইমামবাজারে রথের মেলা।

জানকী এসে হেসে বলেছিল—রথের মেলাতে আমাকে রাম সিংকে কি দিবে তুমি নরসিং ভাই ?

অসহ্য মনে হয়েছিল নরসিংয়ের। সে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিল —আবদার! যাও আবদার কর গিয়ে তোমার পিসীর কাছে।

রামটা আজন্ম ওই 'গাধার মত উল্লুক'। খুব যে বোকা, তাকে নরসিং ওই কথা বলে—'গাধাকে মাফিক উল্লু'। জানকীকে মারলে সে খি-খি করে হাসত।

জানকী কেঁদে উঠেছিল, চড়টা জোরেই পড়েছিল। 'নেকড়ানী' ঠিক এই সময়টিতেই ঘরে ঢুকেছিল—কোথাও গিয়েছিল। 'নেকড়ানী'—নেকড়ে বাঘিনী। 'নেকড়ানী' থমকে দাঁড়িয়ে ভ্রূ-কুঁচকে তাদের দিকে চেয়ে রইল; মনে হল, চোখের তারা দুটো যেন সদ্য-আগুনে পোড়ানো রাঙা গুলতি-বাঁটুল—ধনুকে লাগিয়ে টান দিয়ে ধরেছে—লক্ষ্য করছে নরসিংকে। নরসিং মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জানকী, রাম—তারাও পিসীকে দেখছিল। পিসীর ওই গুলতি-বাঁটুল জোড়া ধনুকের মত চাউনি এবং ভ্রূভঙ্গি দেখে তারাও ভয় পেয়েছিল—রামার খি-খি হাসি তখন বন্ধ। হনুমান। শিকারীর হাতের বাঁটুল জোড়া ধনুক দেখে গাছের মাথার হনুমানগুলোর যেমন সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে যায়—তখন তার অবস্থাটাও তেমনি। বাঁচালে জানকী। পিসীর ঠোঁট নড়বার আগেই সে কাঁদতে কাঁদতে বললে—পায়ে হুঁচোট লাগল।

এবার বাঁটুল ছাড়লে মামী। নেকড়ানীর মতই দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, চোখ ছিল কোথা? চোখ? হারামজাদী—টেরা-চোখী?

—ছুটে আসতে গিয়ে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মামী বললে, হারামজাদী নাচনেওয়ালী, এত নাচনা কিসের লাগল তোর? ছুটলি কেনে তুই? বলতে বলতে সে আক্রোশভরে এসে ধাঁ করে বসিয়ে দিলে এক চড় জানকীর গালে। নেকড়ানী মারলে তার থাবা।

নরসিংয়ের ইচ্ছে হয়েছিল চীৎকার করে উঠতে। কিন্তু পারে নাই। আশ্চর্য—গোটা জীবনেই সে পারে নাই নেকড়ানীর প্রতি ভয়টাকে মুছে ফেলতে। কতবার সে ভেবেছে—কিসের ভয়? মামার খায় না সে আর। সে গিরবরজার সিংরায় বংশের ছেলে—মামা ধরণী সিং সিংরায়দের চেয়ে ইজ্জতে অনেক ছোট, মামী আরও ছোট ঘরের মেয়ে। তার পায়ের ধুলো পড়লে তাদের কৃতার্থ হয়ে যাওয়ার কথা—কেন ভয় করবে সে?

চাকরি করে যেদিন সে মাইনে পেলে, সেদিন পাঁচটা টাকা নিয়ে সে গিয়েছিল মামার বাড়ি। সেদিন ভেবেছিল—পাঁচ টাকা দিয়ে সে প্রণাম করবে মামাকে। মামীকে সে প্রণামই করবে না! মাইনে বলবে—পঁচিশ টাকা। মামীর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠবে। মামী বলবে—কি বাবা? মামী এত ছোট হল? মামাকে দিলে পাঁচটাকা, আর মামীকে মনেই পড়ল না!

সে বলবে—গিরবরজার সিংরায় আমরা। আমরা ছোট জাতকে প্রণাম করি না। সে মামীর বাপ তুলে, জাত তুলে গাল দেবে। বহুত বহুত কড়া কথা শুনিয়ে দেবে! কিন্তু আশ্চর্যের কথা—মামীকেই সে প্রণাম করলে আগে টাকা দিয়ে। চারটে টাকা দিয়ে ফেললে।

মামী খুশী হল। সে বললে, বসো বেটা। বেঁচে থাক। বহুত রোজগার কর। মামী বলে মনে রাখিয়ো। একঠো বেটা নাই আমার যে আখেরে আমাকে দেখবে। একঠো বেটী নাই যে জামাই আসবে একটা—সে পেটের বাচ্ছার মত যতন করবে। তুমি ছাড়া কে আছে আমার!

তার পর মামী ডাকলে—জান্‌কী! জান্‌কী! আরে হারামজাদী বদমাশ! দেখ্, বেটা, দেখ্। ভাইয়ের বেটীকে আনলাম কি আমার সুখ দুখ দেখবে। হারামজাদীকে করন দেখ্! কোথায় গেল পাত্তা নাই।

মামী বকতে বকতে উঠে গেল। উঠে গিয়েছিল—নরসিংয়ের জন্য মিঠাই কিনবার ব্যবস্থা করতে। সেই সময় বাড়ি ঢুকল জান্‌কী। বিকেল বেলা পুকুরে গা ধুয়ে এল সে—গায়ে ভিজে কাপড় সেঁটে লেগে গিয়েছে।

নরসিংয়ের বুকের ভিতরটায় হঠাৎ মোটরের ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছিল। কিশোরী জান্‌কীর দেহে তখন যৌবনের রঙ ধরতে আরম্ভ করেছে। এতদিন চোখে পড়ে নাই। আজ হঠাৎ সেটা পড়ে গেল। নরসিংয়ের হয়তো এতদিন চোখ ছিল না; চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে তার মেজবাবু। সেদিন ডিপোর ঘরের স্মৃতি মনে পড়ল। বুকের মধ্যে আগুন ধরে গেল!

মেজবাবু বলতেন—এই ঘটনার ঠিক দু-দিন আগে মেজবাবু বলেছিলেন, স্বকর্ণে শুনেছিল নরসিং; মেজবাবু বলেছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে—ঘাটে সাবান মাজছিল দুপুরবেলায়, আমি নামলুম ঘাটে পা ধুতে। এক হাত ঘোমটা দিলে—সরে দাঁড়াল এক পাশে। কুড়িটা টাকা আলগা করে রুমালে বেঁধে বুক-পকেটে রেখেছিলাম, ঝম করে ফেলে দিলাম ঘাটে, যেন পড়ে গেল পকেট থেকে! উঠে চলে এলাম। থাকল পড়ে ঘাটের জলে। পাঁচ

মিনিট পর ফের গেলাম। দেখলাম রুমাল নাই। উঠে আসবার সময় বলে এলাম, হাত ভরে দোব টাকায়। সন্ধ্যেবেলা থেকো ঘাটে।

হা-হা করে হেসেছিলেন মেজবাবু। বলেছিলেন, বিশে না হয় পঞ্চাশ, পঞ্চাশে না হয় একশ, শয়ে না হয় হাজার। তাতেও না হয়, একটু তাকে থাকতে হবে। যখন একলা নির্জনে পাবে, জোরসে টেনে নাও। বাস্, চুপ হয়ে যাবে। আবার হাসি—হা-হা-হা-হা!

শয়তান! মেজবাবু শয়তান! শয়তানের সে হাসি মধ্যে মধ্যে আজও কানের পাশে বাজে।

জান্‌কী, তুই—তুই বাঁচিয়ে দিয়েছিস নরসিংকে। নইলে নরসিংয়ের দুনিয়া হয়ে যেত মেজবাবুর দুনিয়া। শয়তানের দুনিয়া!

মনের আগুনের আঁচে অধীর হয়ে মেজবাবুর ওই মন্তরের মায়ায় নরসিং তাকে টাকা দিয়ে লোভ দেখাতে চেয়েছিল। আশ্চর্য—ছোটবেলার কাদার মত নিরীহ বোকা মেয়ে, তার টেরা চোখে বিজলী খেলে গেল সেদিন। নরসিং ক'টা টাকা হাতে নিয়ে লুফছিল। বাড়িতে আর কেউ ছিল না তখন। জান্‌কী আগুন-ছড়ানো টেরা-দৃষ্টিতে চেয়ে বারকয়েক শুধু থুথু ফেলল—থু! থু! থু! থু!

নরসিং এবারে আর আত্মসংবরণ করতে পারলে না, মেজবাবুর মন্তর মনে পড়ল তার, সে জান্‌কীকে টেনে বুকে চেপে ধরলে।

সঙ্গে সঙ্গে জানকী তার হাতের ভারী রুপোর কাঁকনি দিয়ে মারলে নরসিংয়ের ভ্রূর উপর। কেটে গেল ভ্রূটা। দরদর করে রক্ত ঝরে নরসিংয়ের মুখ ভাসিয়ে জান্‌কীর মুখের উপর ঝরে পড়ল।

শ্যামনগর এসে গিয়েছে।

ডান হাতে স্টিয়ারিংয়ে পাক দিয়ে গাড়িটার মুখ পাশের রাস্তায় বেঁকিয়ে দিলে নরসিং। বাঁ হাতখানা আপনি গিয়ে পড়েছিল ভ্রূর উপরে একটা কাটা দাগের উপর। জান্‌কী তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

পালিয়ে এসেছিল নরসিং। ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ করেছিল সমস্ত রাত্রি। পরের দিন রাম এসেছিল। গাধার মত উল্লুক রামা। কোনদিন তার বুদ্ধি ছিল না—কোনদিন হবেও না। এসে তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বলেছিল—দিদি বললে—এক টাকার আফিং কিনে দিতে। টাকাটা সে নিয়েছিল। বলেছিল—বলিস আমি নিয়ে যাব সন্ধ্যের সময়।

সন্ধ্যেয় গিয়ে মামীকে বলেছিল—মামী, জান্‌কীকে আমি বিয়ে করব। দেবে ?

রাজপুতের মেয়ে জান্‌কী—বড় হয়ে হয়ে উঠল সোজা তলোয়ারের মত লম্বা—সেকালের রাজপুতের তলোয়ারের মত ঝকমকে ধারালো হয়ে উঠছিল মনে, মেজাজে। আশ্চর্য ! ছোটবেলার সেই কাদার মত মেয়ে !

মদ খেলে সে কিছু বলত না। মদ তো খায় রাজপুত মরদ। মদ যদি না খাবে তো রক্ত চন-চন করবে কিসে ? কিন্তু ব্যভিচারের কথা যদি ঘুণাক্ষরে তার কানে যেত তবে সে তলোয়ারের ধারের দিকটার মত ধারালো হয়ে দাঁড়িয়ে বলত—খবরদার ! কখনও ছোঁবে না তুমি আমাকে। কখনও না।

ভয় পেত নরসিং।

জান্‌কী বলত—আমাতে তোমার মন না ওঠে, দিল্ না ভরে, আর একটা দুটো তিনটে শাদি কর তুমি। কিন্তু এ কাজ—এ পাপ করে আমাকে ছুঁতে পাবে না তুমি।

জান্‌কী, তোকে হাজারো লাখো আশীর্বাদ ! অক্ষয় স্বর্গে বাস হবে তোর।

জান্‌কীর দৌলতেই তার এ সমস্ত কিছু। সে-ই বলছিল ট্যাক্সি করতে। সেলাম মেজবাবু, তোমাকেও সেলাম ! তুমি শয়তানই হও আর যাই হও, তোমাকেও সেলাম। তুমিই বলেছিলে—নরসিং, রহমতের কাছে ড্রাইভিংটা শিখে নে দেখি। রহমতটাকে জবাব দোব আমি। মুখের উপর উত্তর করে ও আমার।

রহমতের কাছে সে ড্রাইভিং শিখেছিল। এ ইচ্ছাটা তার বুকের ভেতর আগে থেকেই জেগেছিল। গাড়িখানা ছুটে চলে, হু-হু করে যেন উড়ে যায়, ইঞ্জিনটা গোঁ-গোঁ শব্দ করে, গরম হাওয়ায় সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে, হোই দূর-দূরান্তের ছোট জিনিসটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে কাছে চলে আসে, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল দূর চলে আসে পায়ের তলায়। নেশা—অদ্ভুত নেশা। মদের নেশায় দুনিয়াটা টলে। এতে তার পায়ের তলা দিয়ে ছুটে পিছনে চলে যায়। চল—চল—চল। কোই রোখনেওয়ালা হ্যায় ? নেহি হ্যায়। চল—চল—চল। পাশ দিয়ে পিছনের দিকে ছুটে চলে যায়—গাছপালা, রাস্তার ধারের যা কিছু—সব কিছু, আর দূরে পাশে ঘুরপাক খেয়ে ঘোরে সমস্ত কিছু। এত বড় দুনিয়া—এতটুকু—এইটুকু ছোট হয়ে গেল। চল—চল—চল।

নিতাই বললে—স্পীড্ কমান সিংজী। এই মোড়েই তো সব নামবেন। নরসিংয়ের সংবিৎ ফিরে এল। অ্যাকসিলারেটর থেকে পা তুলে নিলে। জোসেফ দাঁড়িয়ে আছে—মোড়ের মাথায়।

আট

জোসেফ দাঁড়িয়েছিল বাজারের চৌমাথার ধারে। নরসিংয়ের মোটর থামতেই সে একটু হেসে নমস্কার করে বললে—আরম্ভ করে দিয়েছেন?

জোসেফের নমস্কারটা নরসিংয়ের ভাল লাগল না! গিরবরজার হাড়ীর ছেলে! সিংরায়দের অদৃষ্ট, লক্ষ্মী ছাড়ার পরিণাম! জোসেফের দোষ কি? তবুও সে প্রতিনমস্কার না করে পারল না। হোক সে গিরবরজায় হাড়ীর ছেলে, তার হাড়ীত্বের একবিন্দু ছাপ আর কোথাও নাই যে, তাকে সেই বলে অবহেলা করা যায়। আচারে-আচরণে, কথায়-বার্তায়, ধারায়-ধরনে সে সর্বাংশে এমন যোগ্যতা অর্জন করেছে যে, তাকে নমস্কার না করলে জোসেফের অপমান হবে না, জোসেফ ছোট হবে না, নরসিং নিজেই ছোট হয়ে যাবে, নিজেরই বার বার মনে হবে—এটা অভদ্রতা হল, নমস্কার না করাটা ঠিক হল না। সে একটা ম্লান হাসি হেসে প্রতিনমস্কার করলে।

নিতাই অল্প দূরে দাঁড়িয়ে রামার সঙ্গে কথা বলছিল। ওই জোসেফকে নিয়ে কথা। কাল রাত্রি থেকেই সে জোসেফের উপর বিরূপ হয়ে রয়েছে। সে রামকে মৃদুস্বরে বললে—বেটা হাড়ী খেরেস্তান হয়ে যেন রাজা হয়েছে! সাপের পাঁচ-পা দেখেছে। একবারে যেন লাটসাহেব বনে গিয়েছে।

জোসেফ এগিয়ে এল গাড়ির কাছে। নরসিংয়ের পাশের দরজাটার উপর কনুই রেখে হেঁট হয়ে গাড়িতে উপবিষ্ট নরসিংয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেটের প্যাকেট বার করে ধরলে—খান।

ভাল সিগারেট, গোল্ডফ্লেক। নরসিংয়ের গোল্ডফ্লেক না-খাওয়া নয়। মেজ-বাবুর দৌলতে অনেক ভাল সিগারেট খেয়েছে। গোল্ডফ্লেক, ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ, থ্রি কাস্‌ল্। মেজবাবুর চাকরটা দিত। দিলদরিয়া মেজবাবু গাড়িতে হামেশাই সিগারেটের টিন ফেলে যেতেন। অধিকাংশ সময়েই আর খোঁজ করতেন না। খোঁজ করলে কিন্তু একটি সিগারেট কম হলেই তিনি ক্ষেপে

যেতেন। এই খোঁজের একটা সময় ছিল। সেই সময়টা পার হলেই নরসিং সিগারেটের টিনটা পকেটে করে একবার মেজবাবুর কাছে অকারণে ঘুরে আসত, দেখত মেজবাবু নতুন টিন খুলে সিগারেট টানছেন। সেও ফিরে, খানিকটা এসে সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে হাপরের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গ্যারেজের দিকে চলে যেত। ভারী মিঠা সিগারেট এটা। নরসিং নিজেও কখনও কখনও দু-চার প্যাকেট কিনে খেয়েছে শখ করে। চার আনা প্যাকেট। একটা সিগারেট দেড় পয়সার উপর দাম। এ সিগারেট কি তার মত ট্যাক্সি ড্রাইভারের খাওয়া পোষায় ?

গোল্ডফ্লেকের লোভ সে সামলাতে পারলে না। সিগারেট টেনে নিয়ে মুখে পুরে দেশলাই জ্বাললে; আগে সে জ্বলন্ত কাঠিটা ধরলে জোসেফের সামনে, তার পর নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। ব্যাপারটা হল—ওর এই সিগারেট দেখার আগ্রহের মধ্য দিয়েই সে যেন বলতে চাচ্ছিল—মনটা ঠিক তোমার দিকে দিতে আমি অনিচ্ছুক।

জোসেফ বললে—সিগারেটটা ভাল।

নরসিং হেসে বললে—না-খাওয়া নয়। ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ—

বাধা দিয়ে জোসেফ বললে—স্টেট এক্সপ্রেসটা বড় নরম।

—হ্যাঁ। কিন্তু গন্ধ ভাল। তারপর থ্রি কাস্‌ল্‌। হাসলে নরসিং।

জোসেফ বললে—আমার সাহেব এটাই খেতে ভালবাসেন। খানসামাটার সঙ্গে আমার হাফ প্রাইসে বন্দোবস্ত। স্টক বেশী থাকলে প্রায়ই দেয়। কম পড়লে তখন খোলা প্যাকেট থেকে একটা-আধটা করে সরিয়ে চার-পাঁচ দিনে এক প্যাকেট পাই।

নরসিং একটু হাসলে। তার পর বললে—আমাদের বিড়িই ভাল, বুঝলেন না। যেমন কলি তেমন চলি, সময় বুঝে চলতে হয়, যেমন মানুষ তেমনি চাল হওয়াই ভাল। এক পয়সায় আটটা।

জোসেফ হাসলে। বললে—এটা আমাদের উপরি। মাসে মাইনে তিরিশ টাকা; কামাই করলে এক টাকা তো কাটবেই—মধ্যে মধ্যে হাকিমের মেজাজ চড়লে দেড় টাকাও কাটে। তার ওপর ফাইন আছে।

নিতাই এগিয়ে এসে দরজার হ্যাণ্ডেল খুলে বললে—এই আসুন বাবু, এই আসুন।

জোসেফ গম্ভীরমুখে মৃদুস্বরে বললে—আজ আর ট্রিপ দেবেন না।

—ট্রিপ দোব না? কেন?

কোচোয়ানেরা জোট পাকিয়ে আমার সাহেবের কাছে গিয়েছে। লাইসেন্স না নিয়ে আর ট্রিপ দেবেন না।

নরসিং বললে—হুঁ। সে এটা অনুমান করেছিল। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার এই কাজে। এ কাজের হাল-হদিস, আইন-কানুন সে সবই জানে; মোটর সার্ভিসের জন্য সরকারের হুকুম চাই, ডিষ্ট্রিক-বোর্ডের হুকুম চাই, পুলিস-সাহেব গাড়ি দেখে পাস করবে—তবে হবে। তার উপর কথায় কথায় মামলা। বেশী যাত্রী চাপিয়েছে অমনি মামলা হয়ে গেল—দাও ফাইন। কোন কিছুর সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা লাগা দূরের কথা, ছোঁয়াছুঁয়ি হল তো—মামলা; দাও ফাইন। বেলাইনে যদি গাড়ি চালালে তো দাও কৈফিয়ৎ। যদি মনের মত না হল—হয়ে গেল মামলা। গাড়ির আলো যদি কোনরকমে হঠাৎ বিগড়ে গেল তো হয়ে গেল মামলা। পুলিস রুখতে বললে রুখতে-রুখতে যদি এগিয়ে এসে পড়ল পাঁচ হাত তো নিয়ে নিলে নম্বর, দু'দিন পরেই সমন—তার পর মামলা, নির্ঘাত ফাইন হবে মামলায়। সরকারী বাদশাহী সড়ক; গাড়ি তার নিজের; লোকে চাপবে তাদের গাঁটের পয়সা দিয়ে কিন্তু তাতেও চাই লইসেন্স—হুকুমনানা! নরসিংয়ের মগজটা গরম হয়ে উঠল। মাথার শিরা-গুলোয় যেন গুণ-দেওয়া ধনুকের ছিলার মত টান ধরে গেল। প্রতি পায়ে আইন—প্রতি পায়ে আইন! জিঞ্জির দিয়ে তামাম মুলুকের মানুষগুলোর পা বেঁধে রেখেছে। নরসিংয়ের দু-পাশের রগের দুটো শিরা মোটা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। গিরবরজার ছত্রীদের এটা বংশগত বৈশিষ্ট্য। রাগ হলেই মাথার দিকে রক্ত ছোটে। সে অবশ্য সকল মানুষেরই ছোটে, কিন্তু গিরবরজার ছত্রীদের রক্ত ছোটে যেন বেশী পরিমাণে। সেই জন্য রাগ হলে তারা সামলাতে পারে না, দাঙ্গা বাঁধিয়ে বসে, খুনখারাপি হয়ে যায়, পরকে মারে, নিজেরা মরে, পরের হাতেও মরে, আবার অবরুদ্ধ ক্রোধে মাথার শিরা ফেটে গিয়েও মরে, অজ্ঞান হয়ে যায়, নাক দিয়ে ঝুঁকিয়ে রক্ত গড়িয়ে মাটি বিছানা ভিজে যায়।

নিতাই নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তা হলে সিংজী?

নরসিং বললে—এক লোটা জল নিয়ে আয় তো।

নিতাই ডাকলে—রাম! এ রে রামা!

রামা একদল গেঁয়ো-যাত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের হালচাল লক্ষ্য

করছে। মোটরে যেতে প্রলুব্ধ করবার কথা ভাবছে। রাজী ওরা চট করে হয় না। পায়ে হেঁটে বিশ মাইল চল্লিশ মাইল চলে যায়; মাথায় বোঝা, কাঁধে বাঁক নিয়ে পুরুষানুক্রমে হেঁটেই চলে ওরা।

নরসিং বিরক্ত হয়ে বললে—তুই নিয়ে আয়।

জোসেফ বললে—একটা কথা বলব?

নরসিং মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল।

চলুন না আমার বাড়ি। একটু চা খাবেন। ওখানে বসেই বরং দরখাস্ত লিখে সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাব। আমার দ্বারা যতটুকু হয় করব। হাজার হলেও আমার মনিব তো! এখানে সাহেব একটা রেকমেণ্ড করে দিলে চলে যাবেন সদর শহরে। পুলিসের কাছে পাশ করিয়ে—ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের পারমিশন নিয়ে কালই আবার ফিরে আসবেন।

নিতাই জল নিয়ে এল নরসিং কোন উত্তর দেবার পূর্বেই। জলের ঘটিটা নিয়ে খানিকটা জল ঢক ঢক করে খেয়ে বাকীটায় মুখ কান ঘাড়টা ধুয়ে ফেললে, খানিকটা জল মাথার উপর দিয়ে ভিজিয়ে নিলে। তার পর বললে —চলুন, তাই চলুন।

যেমনি অদৃশ্য রাসায়নিক কালির লেখা ফুটে ওঠে আগুনের উত্তাপ পেলে, তেমনি ভাবে পুরানো ছত্রীরা নতুন কালের ছেলেদের মধ্যে জেগে ওঠে ওই রক্তগরমের মধ্য দিয়ে, ঠাণ্ডা জলে নরসিংয়ের মাথার গরম রক্ত ঠাণ্ডা হতেই সে একালের মানুষ হয়ে উঠল। মামীর কঠোর তিরস্কারে ত্রস্ত হয়ে যে নরসিং বড় হয়েছে, শ্যামবাজারের বাবুদের বাড়ির দয়ার অন্নে, সংস্কারের বাঁধনের মধ্যে থেকে যে নরসিং পথ খুঁজে নিয়েছে, মেজবাবুকে সেলাম বাজিয়ে বকশিশ নিয়ে যে নরসিং খুশী হয়েছে, ড্রাইভার রহমতকে তোয়াজ করে যে নরসিং ড্রাইভিং শিখেছে—সেই নরসিং। যে নরসিং এই গতকাল তামাকওয়ালাকে প্রথমটা ধমক দিয়ে শাসন করার পর তারই কাছে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পেয়ে তাকেই সসম্মানে ভেতরে বসিয়ে শ্যামনগর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে ড্রাইভ করে—সেই নরসিং।

গিব্বরজার হাড়ীর ছেলের বাড়ি। কিন্তু 'শূয়ার খুপরি' নয়। গিব্বরজার ছত্রীরা হাড়ী ডোম বাউরীদের ঘরগুলোকে 'শূয়ার খুপরি'ই বলে থাকে। কথাটার মধ্যে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা আছে তাই কথাটা কটু এবং অন্যায় শোনায়,

অন্যথায় কথাটা সত্য। ছোট একখানা খড়ো ঘর। জানালা নাই, অন্ধকূপের মত অন্ধকার, ভিতরে-ভ্যাপসা গন্ধ। এক কোণে থাকে হেঁসেল, এক কোণে থাকে ছাগল, এক কোণে থাকে হাঁস-মুরগী, এক কোণে থাকে দু-চারটে মাটির হাঁড়িতে কিছু চাল ডাল কিছু পেঁয়াজ; চালের কাঠ থেকে ঝুলানো শিকেতে ঝোলে ক্ষেতের বা বাড়ির উৎপন্ন দুটো-একটা কুমড়ো; মাচায় তোলা থাকে কাটকুটো ঘুঁটে। রাত্রিতে তারই মধ্যে তারা শোয়। ঘরের বাইরে বাঁশের খুঁটি দেওয়া একটা চালা। চালার এক পাশে হয় রান্না, এক পাশে বসে তাদের দিনের আসর।

জোসেফ গিরবরজার হাড়ীর ছেলে, দু-পুরুষ আগে তার প্রপিতামহ এসে এখানে খেরেস্তান হয়েছে। তাকে মদের দোকানে দেখে যেমন চিনতে পারে নি নরসিং গিরবরজার হাড়ীর ছেলে বলে, তেমনিই ঠিক চিনতে পারলে না তাদের বাড়িতে এসে তাদের বাড়িটাকে হাড়ীর ছেলের বাড়ি বলে। পাকা দালান-কোঠা নয়, মেটে বাড়িই, কিন্তু মেঝে পাকা, দাওয়া পাকা, লম্বা বাংলো ধরনের সারি সারি তিনখানি ঘর, তক-তক ঝক-ঝক করছে। ধবধবে চুনের কলি দেওয়া দেওয়াল, প্রতি ঘরে বেশ মাঝারি আকারের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। দরজায় দরজায় খেরেস্তানী কায়দায় সাহেব লোকের—বাবুলোকের মত পর্দা ঝুলছে। বাইরের বাঁধানো বারান্দায় খান-দুই চেয়ার, গোটা-চারেক মোড়া সাজানো রয়েছে। উঠানটা মাটির, কিন্তু চারিপাশে বাঁধানো নর্দমা। উঠানের এক পাশে তারের জালের একটা বড় বাক্সে কতকগুলি মুরগীর বাচ্চা কিলবিল করছে, পাখা ঝাড়ছে, বড় বড় মুরগীগুলো উঠানে নর্দমায় খুঁটে খুঁটে খেয়ে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা হাঁসও রয়েছে। নর্দমায় রাত্রের বাসী খাবার খাচ্ছে। এদিকে খানিকটা জায়গায় মাত্র গোটা চারেক বেলফুলের গাছ। শীতের সময় তারই মধ্যে গাঁদা এবং মোরগ ফুল লাগানো হয়েছিল, সেগুলি এই বৈশাখ মাসে শুকিয়ে গিয়েছে, এখনও সেগুলো তুলে ফেলেনি। বেলফুলের ঝাড় কয়েকটা ফুলে ভরে আছে। ঘরের চালের উপর একটা লাউয়ের লতা উঠেছে, কচি লতা, লাউডগা সাপের মাথার মত লতার ডগাগুলো বেঁকে যেন মুখ তুলে রয়েছে। অন্য পাশ থেকে উঠেছে একটা কুমড়ো লতা। দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। বাঃ! দিল খুশী হয়ে উঠল।

জোসেফ বারান্দায় উঠে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—আসুন, বসুন সিংজী।

নরসিং উঠে এল, আবার একবার সব মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে বললে—বাঃ! ভারী চমৎকার আপনার বাড়ি!

জোসেফ হেসে বললে—কি করব, গরীব মানুষ, নিজেরাই খেটেখুটে সব করে নিয়েছি। বসুন। তারপর ডাকলে—কই, মা কই?

বেরিয়ে এল জোসেফের মা। মোটাসোটা প্রৌঢ়া, পরিচ্ছন্ন কাপড় প'রে সাদাসিধে বাঙালী গেরস্ত ঘরের মেয়ের মতই; কোনখানে খেরেস্তানীর ছাপ নাই। নরসিংকে নমস্কার করে বললে—আপনি আমাদের গিরবরজার সিংরায় বাড়ির ছেলে? আমার কত ভাগ্যি যে আপনি আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।

নরসিং একটু হাসলে।

জোসেফ ডাকলে রাম এবং নিতাইকে—আপনারা আসুন, বসুন।

রামটা অকারণ লজ্জায় ছোট ছেলের মত মুচকে মুচকে হাসছিল। নিতাই অবাক হয়ে দেখছিল সব। সে হঠাৎ রামকে মৃদুস্বরে বললে—এ শালাদের ভেতরে গুড় আছে বুঝলি রামা।

নরসিং ডাকলে—আয় রে, বোস্।

রামা উঠে গিয়ে ভাবছিল, কোথায় বসবে, চেয়ারে অথবা মোড়ায়। নিতাই নিজে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল, একটা মোড়া রামার দিকে ঠেলে বললে—বোস্ না রে।

জোসেফ মাকে বললে—একটু চা তৈরী করতে হবে যে।

জোসেফের মা একটু অপ্রস্তুতের মত বললে—চা খাবেন? প্রশ্ন করল সে।

—খাবেন বইকি। আমি নিয়ে এলাম।

জোসেফের মায়ের প্রশ্নটা নরসিংয়ের মনের ঠিক জায়গায় গিয়ে ঘা দিয়েছিল; মনটা মুহূর্তের জন্য বিদ্রোহ করে উঠল। খেরেস্তানের, মুসলমানের দোকানে চা সে খেয়েছে, কিন্তু এরা যে এককালে গিরবরজার হাড়ী ছিল! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দরখাস্তও লেখাতে হবে। এস, ডি, ও-র কাছে নিয়ে যেতে হবে এই জোসেফের সঙ্গেই। শ্যামনগর-পাঁচমতি সার্ভিস খুলতে হলে জোসেফের অনেক সাহায্য চাই। সঙ্গে সঙ্গে সে হেসে বললে—খাব বইকি। তার পর জোসেফের দিকে চেয়ে বললে—আপনি কিন্তু দরখাস্তটা লিখে দিন। আর আজই ওটা যাতে সাহেব রেকমেণ্ড করে দেন তার ব্যবস্থা করতে হবে

—হ্যাঁ। আমার বোন আসুক, তার হাতের লেখাটা ভাল। তাকে দিয়েই লেখাব।

—আপনার বোন ?

—হ্যাঁ। এখানকার মেয়েদের মাইনর স্কুলে চাকরি করে। এখন মর্নিং ইস্কুল, এই এল বলে। জোসেফের কণ্ঠস্বর একটু উদাস হয়ে উঠল—বড় ভাল মেয়ে, ম্যাট্রিক পাস করলে, আর পড়াতে পারলাম না। কি করবে ? মিশনারী ইস্কুল—আমরা ক্রিশ্চান, চাকরির সুবিধে হল, ঢুকে পড়ল চাকরিতে।

নর সিং একথার কি জবাব দেবে ? সে স্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু এখানে াসতে যে সে অস্বস্তি অনুভব করছিল মুহূর্তপূর্ব পর্যন্ত, সেটুকু এক মুহূর্তে দূর ়য়ে গেল। নিতাই রামের হাতে একটা চিমটি কাটলে। রামা একবার 'উঃ' ়রে উঠল, কিন্তু তার পরমুহূর্তেই খুক্ খুক্ করে হাসতে আরম্ভ করলে।

জোসেফ পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরলে। খান ততক্ষণ। ়গারেট ধরিয়ে অকস্মাৎ প্রশ্ন করলে—কাল বললেন শুখনরামের গদিতে ়য়েছেন। ওখানে উঠলেন কেমন করে ?

নরসিং তার মুখের দিকে তাকালে, মনে পড়ে গেল গত রাত্রের মদের ়াকানের কথা। শুখনরামের গদিতে উঠেছে শুনে জোসেফ কিছুক্ষণ চুপ ়র ছিল, তার পরে বলেছিল, কাল হবে কথা। নরসিংয়ের ভ্রূ দুটো কুঁচকে ়ল, সে বললে—কেন বলুন তো ? ওকেই কাল ভাড়া এনেছি।

নিতাই বললে—বেটা ভুঁড়ের মেলাই টাকা, না মশাই ? তার পর সে কর্ণবিস্তার দাঁত মেলে বললে—আমরাও ছাড়ি নাই; পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দায় করেছি।

রামের মনে পড়ে গেল শুখনরামের থলথলে ভুঁড়িটা কেমন ভাবে মোটরের কিতে ঝাঁকিতে দোল খাচ্ছিল। সে হি-হি করে হাসতে আরম্ভ করলে।

জোসেফ গম্ভীর ভাবে বললে—লোকটা ভাল নয়। পাঁচ-সাত বার কটার বাড়ি সার্চ হয়েছে।

—বাড়ি সার্চ হয়েছে ? কেন ?

—লোকটা গাঁজা চরস আমদানি করে লুকিয়ে লুকিয়ে।

নরসিং কোন জবাব দিলে না; তার বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় উঠল, বোধ করি অপরিসীম বিস্ময়ই তার হেতু।

জোসেফ বললে—বাইরে থেকে চরস আফিং গাঁজা আনে পেশোয়ারী

পাঠান পাঞ্জাবীরা, শুখনরাম এখানে তামাকের ব্যবসার সঙ্গে এ ব্যবসা চালায়। হঠাৎ হেসে বললে—তা না হলে অত বড় ব্যবসাদার নিজে দেহাত যায়! বুঝলেন ব্যাপারটা? এখানে ওখানে গাঁয়ে দেহাতে যে সব এজেণ্ট আছে তাদের কাছে এ ব্যবসায় মধ্যে মধ্যে নিজে না গেলে চলবে কেন? এসব কি কর্মচারী দিয়ে চলে?

নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল ছোট্ট একটা তামাকের পেটি। গাড়ির দরুনে তামাক পড়ে থাকল ভাঙা গাড়ির সঙ্গে মাঠে। ওই ছোট্ট পেটিটা সে নিয়ে এল কেন? মনে পড়ল গদির সামনে গাড়ি থেকে নেমেই শুখনরাম হুকুম দিলে, ছোটা পোটিয়াঠো উতারো আগাড়ি। তার পর ছেলেকে বলেছিল—একদম উপরমে লে যাও, মেরা কামরামে ঠিকসে রাখনা।

—কি ছিল সেটাতে?

জোসেফ বললে—তা ছাড়া লোকটা মধ্যে মধ্যে মেয়ে কিনে আনে দেহাত থেকে। গরীব ঘরের মেয়ে—বিয়ে হয় না বদনামী হয়েছে বলে, কি বিধবা, মা বাপে পুষতে পারছে না এমন মেয়ে—লোকটা বুঝে-শুঝে কায়দামাফিক কথাটা পেড়ে মা-বাপকে টাকা ধরে দেয়; নিয়ে আসে। কিছুদিন রাখে বাড়িতে। ওই সব পাঞ্জাবী পেশোয়ারী যারা আসে, তাদের খুশী করে ওদের দিয়ে। মধ্যে মধ্যে টাকা নিয়ে বেচেও দেয়।

নরসিং এবার চমকে উঠল। কথাটা মিথ্যে মনে হল না। জোসেফের খবর পাকা খবর। সেই মেয়েটিকে মনে পড়ে গেল। সুন্দরী মেয়েটি, সব চেয়ে সুন্দর তার গায়ের রঙ আর চুল। মনে পড়ে গেল শুখনরামের সেই বীভৎস ভঙ্গিতে কুৎসিৎ কদর্য গালাগাল: "আরে হারামজাদী কুত্তি বেশরমী কাঁহাকা! কেনে হাসছিস? কাহে? কাহে?...আরে মশা, ওই মেইয়া লোকটার বাত শুনবেন?...আড়াই শও রুপাইয়া দেকে উসকে হামি কিনিয়ে আনলাম মশা। উসকে পোখোরকে ঘাটসে পাকাড়কে লিয়ে গিয়েসিল চারো জোয়ান—দোঠো মুসলমান, এক আদমী বাগ্দী, এক হাড়ী।"

চঞ্চল হয়ে উঠল নরসিং।

নিতাই বলে উঠল—ওরে শালা!

রাম ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল প্রায়। তার গলা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। কাল যখন মোটরখানা গদির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন গদির ঐশ্বর্যের পট-ভূমিতে ওই শুখনরামকে দেখে, তার গম্ভীর আদেশদৃপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে সে একবার

ভয় পেয়েছিল। সে দেখাটা যেন অন্ধকারে কোন দুশমনের চেহারা—আবছা চেহারা! আর এই মুহূর্তে সে দুশমনের চেহারাটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জোসেফের মা এসে দাঁড়াল। রজনী!

জোসেফ বললে—হয়েছে?

—হ্যাঁ। কোথায় দেব?

—এই যে আমি ঠিক করে দিই। হেসে নরসিংয়ের দিকে চেয়ে জোসেফ রজনী দাস বললে—একটা টেবিল পাতি?—চা দেবার জন্যে?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ।

হঠাৎ নরসিং ক্ষেপে উঠেছে মনে মনে। দুনিয়ার সব কিছুকে ভেঙেচুরে দেবার ইচ্ছে হচ্ছে তার। হারামজাদে শুখনরাম, সুদখোর মুনাফাখোর বানিয়া—

লম্বা একখানি ভাঁজা টেবিল এনে সাট করে পেতে ফেলল জোসেফ। তার উপর পেতে দিল একখানা রঙিন চাদর। জোসেফের মা চায়ের কাপ এনে নামিয়ে দিলে। বললে—বলতে ভরসা হয় না, কিছু খাবার দেব? মিষ্টি? মিষ্টিতে তো দোষ নাই।

জোসেফ হেসে বললে—মায়ের সেকালের ধাঁচ এখনও গেল না। আরও বেশী একটু হেসে বললে—আমরা সব ভাইবেরাদার মা, এক কাজ করি, এক সঙ্গে উঠি বসি। তা ছাড়া—। সকৌতুকে নরসিংয়ের দিকে চেয়ে বললে—কান্ মদের দোকানে আমাদের দেখ নি তুমি।

নরসিং চুপ করে রইল।

জোসেফই প্লেটে করে মিষ্টি এনে নামিয়ে দিলে। তারপর একটা খাতা পেন্সিল এনে বসল, বললে—আপনার নাম, বাবার নাম, গ্রাম তো জানি—বলুন দেখি, দরখাস্তটা লিখে ফেলি। মেরীর আসবার সময় হয়েছে।

নরসিংয়ের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ও-জেলার সদর শহরে এস, ডি, ও-র সঙ্গে যে কাণ্ডটা তার হয়ে গিয়েছে—সেই কাণ্ডটার কথা! আগে সে বাজারে ট্যাক্সি সার্ভিস চালাত এ কথা জানালেই একটা এনকোয়ারি হবেই। তার ড্রাইভিং লাইসেন্স ও-জেলার। কিন্তু তার উপায়ই বা কি?

জোসেফ আবার তাগিদ দিলে—বলুন?

নরসিং বললে—থাক, এ—বেলাটা। বরং, খানিকটা কথা বলতে হবে আপনার সঙ্গে। আজ বেলা হল।

ঠিক এই মুহূর্তে এসে ঢুকল একটি মেয়ে। আবলুসের মত কালো রঙ, নিতাইয়ের চেয়েও কালো। ধবধবে কাপড় জামায় হয়তো তাকে বেশী কালো দেখাচ্ছে। কিন্তু ভারী ভাল লাগল।

জোসেফ বলল—এই যে মেরী। ইনি আমাদের গিবৃবরজার সিংরায় বাড়ির ছেলে।

মেরী মৃদু হেসে বলল—নমস্কার।

প্রতিনমস্কার করলে নরসিং।

নিতাই অবাক হয়ে গেল। একেবারে অবিকল স্কুলের দিদিমণি!

জোসেফের সঙ্গে সে দিব্যি কথা বলতে পারে, ইয়ার্কি করতে পারে, মদ খেয়ে গালিগালাজ, এমন কি মারামারি করতে পারে। সহজে পাঞ্জা ধরেও বলতে পারে—চলে আও লড়ো পাঞ্জা। কিন্তু জোসেফের বোনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে কিছুতেই 'আপনি' না বলে পারবে না।

রামা কিছুতেই হাসতে পারছে না, মেয়েটার এত কালো রঙ তবু সে হাসতে পারছে না।

মেরী নীলিমা দাস। জোসেফ রজনী পরিচয় করিয়ে দিলে। মেয়েটি কথা বলে কম। অল্প কয়েকটি কথা বললে সে। বেশ হাসিমুখে কথা বললে—কথাগুলিও বেশ মিষ্টি লাগল নরসিংয়ের। শুধু মিষ্টি নয়—কথাগুলি যেন একটু ভারী ভারী মনে হল। এ ধরনের ভারী কথা বেশ একটু মানী লোকেরাই বলে থাকে। ওই কালো মেয়েটি বয়সে জোসেফের চেয়ে ছোট, জাতে এক সময় হাড়ী ছিল ওর পূর্বপুরুষ, তবুও আশ্চর্যের কথা—এ ধরনের কথা মেয়েটির মুখে বেমানান বলে মনে হল না। সে হাসিমুখে বেশ সহজভাবে বললে—ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরদাদা বলতেন গিবৃবরজার গল্প। সিংরায়দের সিংদের কথা। ভারী ভাল লাগত আমাদের। রাজা-রাজড়ার গল্পের চেয়েও ভাল লাগত। সে আরও একটু মিষ্টি হাসি হেসে চুপ করলে।

নরসিং গম্ভীরভাবে বসে ছিল, মেয়েটি আসার পর থেকেই সে একটু বেশী গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সে একটু চুপ করে থেকে বললে—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

নীলিমাও এককাপ চা নিয়ে বসেছিল, সে চায়ের মধ্যে চামচ ডুবিয়ে নাড়াতে নাড়াতে বললে—আবার আপনারা সব করবেন—এই তো আপনি নতুন পথ ধরেছেন।

নরসিং বললে—এতে কি আর সেদিন ফিরে আসে?

এবার সে একটু ম্লান হাসি হাসলে।

সে আর এখন মোটর-ড্রাইভার নরসিং নয়, গিরবরজার ছত্রী সিংরায় বাড়ীর ছাওয়াল সে, কথা বলতে গিয়ে মনে পড়েছে গিরবরজার একটি গল্প—খুব বেশীকালের কথা নয়, কোম্পানীর আমলের কথা। তখন সবে গিরবরজার ছত্রীদের জ্বালানো আগুনের আঁচে অস্থির হয়ে মা-লক্ষ্মী গিরবরজা ছেড়েছেন, লাগাম-ছেঁড়া পাগলা লালঘোড়া নিয়ে ঘোড়দৌড়ের খেলা খেলছে ছত্রীরা, মনের ভেতরে ঘর-আলো-করা মতি তখন তারা হারিয়েছে, কিন্তু মাথার পাগড়ির শিরপুছ বাতাসে পিছনের দিকে হেলে না পড়লে তাদের চমক ভাঙে, মনে হয়—একি! মাথাটা নুয়ে পড়ল নাকি? সেই সময়ের কথা। পাশের গ্রামে এক সদ্গোপ অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছিল। ছত্রীরা সদ্গোপদের বলত—চাষা। বড় বড় সিংরায়রা বলত,—চাষো। হালে বলদে, ধানে মরাইয়ে, ক্ষেতে খামারে, জলকর ফলকরে, বাগ-বাগিচায় লোকটা দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠল।

লোকে বলত—লক্ষ্মীর সংসার। হঠাৎ লোকটার মাথায় ভর করলে বেওকুফির শয়তানি। সে নীলামে কিনলে সিংরায়দের কতকটা আবাদী জমি। দখল নিয়ে দাঙ্গা হল। জখম হয়ে পড়ে গেল দু-তিন লাঠিয়াল ক্ষেতের চষা মাটির উপর, দুশমনের রক্ত শুষে নিলে ছত্রীদের ক্ষেত। হটে যেতে হল সদ্গোপকে। তার পর হল মামলা। মামলা গিরবরজার ছত্রীরা করলে না, করলে সদ্গোপ। ছত্রীরা হল আসামী। শিরপেচ বেঁধে গোঁফে চাড়া দিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। পিছনে হেলে রইল পাগড়ির শিরপুছ। সদ্গোপের বরাত, আর ছত্রীদের মাথায় দেবতা বাবা ভিখারী মহাদেওজীর কৃপা—হঠাৎ সদ্গোপটা মরে গেল মামলার মধ্যেই। এর পর একদিন এক সওয়ারী অর্থাৎ পাল্কি এসে নামল সিংরায়দের অন্দরের দরজায়। নামল এক বিধবা ছোট এক ছেলের হাত ধরে। ওই সদ্গোপের বিধবা সে। মামলাটা মিটিয়ে নিতে এসেছে। তবে হ্যাঁ, মেয়েটি মেয়ের মত মেয়ে বটে। রূপ তো ছিলই, তার উপর লছমীর প্রসাদ পেয়েছে সে তখন। কপালের উপর চুলের সীমানা বরাবর মাথার ঘোমটা তুলে দিয়ে সিংরায়ের সঙ্গে কথা বললে। কথার ভার ধার কি! প্যাচ কি! জেদ না, জোর না, আইন না, তুললে সে ন্যায়-অন্যায়ের সওয়াল; বললে—ফৌজদারী মামলা আমি তুলে নিচ্ছি কালই। আপনারা ছত্রী, ব্রাহ্মণের নীচেই আপনারা, চিরকাল আপনাদের আমরা প্রণাম করে এসেছি,

রাজা বলে এসেছি। আমার স্বামী ফৌজদারী করেছিল তার জন্য আমি কসুর মানছি। কিন্তু বিচার আপনাকে করতে হবে! এই আমার নাবালক বাচ্ছা। এর বাপ টাকা দিয়ে নীলামে জমি কিনেছে। সে নীলামে তার যোগসাজস থাকে, কোন কারচুপি থাকে বাজোয়াপ্ত করুন তার দাবি। কিন্তু যদি সে কসুর না করে থাকে, তার টাকা যদি হকের হয় তবে তার দাবি কায়েম করবার ভার আপনকে নিতে হবে। আবার প্রণাম করে সে চলে গেল ছেলের হাত ধরে পালকিতে সওয়ার হয়ে। যোল কাহার হুম-হুম করে যে শোর তুলতে পারলে না, গিবৃবরজা গাঁয়ে ওই মেয়েটির মিষ্টি অথচ জোরালো কথা ক'টি সেই শোর তুলে দিয়ে গেল। গিবৃবরজার সিংরায় বাড়ির ঘরের কোণে কোণে যেন সেই কথার ধ্বনি বাজতে লাগল। জমে রইল সে কথা।

সিংরায় গেল তার পর সদ্‌গোপের বাড়ি। ছেড়ে দিয়ে এল জমি। ছেলের হাতে দিল একটি মিঠাইয়ের ঠোঙা আর বললে, যাও বেটা, তুমারা জমি দখল তুমি লে লেও। হামার দাবি ছুট গিয়া।

মেয়েটি বেরিয়ে আবার তাকে প্রণাম করলে, আসন দিয়ে বসালে, তরিবত করে ফল কেটে সাজিয়ে নামিয়ে দিলে সামনে। পান দিলে, আর দিলে এক মোহর প্রণামী। বললে—শুধু তো এতেই অপনাকে আমি রেহাই দিতে পারব না; আমার আরও আরজি আছে। আমার বাচ্ছা বড় না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে দেখতে হবে। নজর রাখতে হবে।

গিবৃবরজার ছত্রী সিংরায় পান চিবিয়ে মুখ লাল করে ফিরে এল। লোকে বাহবা দিলে মেয়েটাকে। হাঁ, একটা রানীর মত মেয়ে! আচ্ছা বুদ্ধি, সিং-রায়কে বুদ্ধির খেল দেখিয়ে দিলে!

হা-হা করে হাসল সিংরায়। ঠিক কথা, মেয়েলোকের সম্বল হল বুদ্ধি, —পাতলা ছুরির মত তার ধার, মিহি কাঠে কাটাই ওর ধরম। পুরুষ হল মর্দানা, তার ধরম হল পৌরুষ। সে হল তলোয়ারের মত। পাতলা ছুরি তলোয়ারের গায়ের ময়লা সাফ করে চিরদিন। মাটি লাগলে চেঁছে ফেলে, রক্ত-মাংস লেগে থাকলে সাফা করে দেয়। আমার গায়ে বে-ধরমীর ময়লা লেগেছিল, পাতলা ছুরি সাফা করে দিলে। এতে আর শরমটা কোথায়? নরসিং নিজে তলোয়ার ব্যবহার করে নাই, তার আমলে তার বাপ-দাদাদের মধ্যেও তলোয়ার ব্যবহারের রেওয়াজ উঠে গিয়েছিল। কিন্তু সে বলিদান দেখেছে। ছেত্তাদারের কোমরে থাকে ধারালো ছুরি, প্রতিবার বলিদানের পরই সে

ও ছুরি দিয়ে খাঁড়ার রক্ত-মাংস মেশানো মাটি সত্যিই চেঁচে ফেলে দেয়। যাক সে কথা।

সিংরায়ের কথাটা প্রমাণ হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। লছমীর প্রসাদ পাওয়া, পাতলা ছুরির মত ধারালো-বুদ্ধি যে মেয়ে, সে সওয়ালে হারিয়ে দিয়েছিল সিংরায়কে, যে যোল বেহারার পাল্‌কি হাঁকিয়ে এসেছিল একদিন গিরবরজা— সে মেয়ে একদিন চার বেহারার ডুলি চেপে এসে উঠল সিংরায়ের বাপের কাটানো পুকুরের পাড়ে আম-বাগিচার মধ্যে যে এক বাড়ি তৈরি করেছিল আরামখানা নামে, সেই আরামখানায়। তলোয়ারের চেয়ে পাতলা ধার ছুরি তলোয়ারের তাঁবেদারিন হয়ে রইল এর পর চিরদিন।

কথাটা স্মরণ করে নরসিং আজ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। বললে— আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি।

জোসেফ বললে—ও বেলায় কখন আসছেন?

—ওবেলা?

—হ্যাঁ, দরখাস্তটা লিখতে হবে, কি সব কথা বলবেন বললেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। দুই হাতের তালু দিয়ে গোঁফের দুই প্রান্ত উপরের দিকে তুলে দিয়ে নরসিং বললে, আসব। ভেবে হিসাব করে দেখি দাঁড়ান।

—আবার খটকা লাগল?—হাসল জোসেফ।

—খটকা? নরসিং হাসল।

সমস্ত দুপুরটা ভাবলে নরসিং। অনেক ভাবনা। রামা রান্না করলে। খাওয়া-দাওয়া সেরে মন ঠিক করলে। বিকেলবেলা সুখনরাম গদিতে এসে বসতেই সে গেল সেখানে; একটা চাকর একটা গেলাসে সিদ্ধির ঠাণ্ডাই এনে ধরলে সুখনরামের সামনে। সুখন মদ খায় না, সিদ্ধি, তার পর এক কল্কে চরস, তার পর গাঁজা। সুখন নরসিংকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বললে—কেয়া সিংজী অ্যাঁ? আজ পাঁচমতি তো চার পাঁচ খেপ দিলে। সার্ভিস খুলবেন?

নরসিং বললে—খুলি যদি আপনি সুদ্ধ নামেন ব্যবসাতে।

—হামি? হা-হা করে হাসলে সুখন। আরে সীয়ারাম। সিংজী, উ কেরেয়া খাটাকে কাম হামি পারবে না। হামারা বহুত কাম—ওহি কাম হামি দেখতে পারছি না ভাই।

নরসিং মুখটা এগিয়ে এনে বললে—আপনার সুবিধে হবে মোটর সার্ভিস

থাকলে, পাঁচমতি থেকে শ্যামনগর আপনার মাল আসবে মোটরের মধ্যে।

শুখনরাম চকিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালে, কিন্তু কোন কথা বললে না।

নরসিং বললে—ছোট পেটির মাল আপনার।

শুখনরাম এবার ঘাড় বেঁকিয়ে একটু ঝুঁকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে নরসিংয়ের দিকে এগিয়ে এল। সে দৃষ্টি দেখে নরসিং একটু শঙ্কিত হল; চেয়ার টেবিলে বসে কথা বলতে বলতে মেজবাবু হঠাৎ টেবিলের ওপর কনুই রেখে ঝুঁকে পড়তেন; চোখের দৃষ্টি ছোট হয়ে আসত; তখন বুঝতে হত মেজবাবুর মেজাজে রাগের পাকে জট পাকাচ্ছে; কিন্তু রাগটা প্রকাশ করবার উপায় নাই। শুখনরাম আবার উঠে খাড়া হয়ে বসল। তার পর হঠাৎ নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাঁকে-ডাকে কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। খাতার পর খাতা আসতে লাগল তার সামনে। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই শুখন বললে—হামার এখুন অনেক কাম মশায়, আপনার কথা শুনব থোড়া বাদ!

সন্ধ্যার পর শুখনরাম নিজেই তাকে ডাকলে। ডাকলে একেবারে বাড়ির ভিতরে। একটা চাকর গাঁজা মলছে। একটা তার গা টিপছে। শুখন বললে—বলেন মশা, আপনার বাত।

নরসিং বললে—আমি তো বলেছি। এখন বলেন আপনি।

—কে আপনাকে কি বলিয়েছে ওহি বাত হামি পুছছি।

হাসলে নরসিং।—বলবে কে শেঠজী! আমি গিরবরজার সিংরায়-বাড়ির ছেলে। শ্যামনগরে কে কি করে, কি দিয়ে ভাত খায় আমি জানি না!

অনেকক্ষণ পর শুখনরাম বললে—বাস্, হামাকে কি করতে হোবে বলেন।

—কি করতে হবে? প্রথম সার্ভিস লাইন খুলতে সাহায্য করতে হবে। দু'শ-চার'শ টাকা ধার দিতে পারে। আমি গাড়ি বন্ধক রাখব অবিশ্যি। আর বিপদে-আপদে দেখবেন—এই আর কি!

—বাস্। ঠিক হ্যায়। হামার বাত হামি দেই দিলাম। বাস্। এই পর্যন্ত—আউর কিছু না। উ সব গাড়িকে বেবসামে হামি নামবে না। উ রাস্তামে সার্বিস—টাকাকে বরবাদ। গাড়ি তো তিন রোজমে লক্কড় ঝক্কড় হইয়ে যাবে। লেকেন—গাড়ির বন্ধক লিয়ে টাকা আপনাকে হামি দেবো।

—দেখুন, ঠিক তো?

—ঠিক—ঠিক—ঠিক।

—আচ্ছা, রাম রাম। এখন তা হলে আমি সব ঠিকঠাক করি। গাড়িটাকে পাস করবার আগে খানিকটা মেরামত করা দরকার। মেরামত সে নিজেই করবে। ডাক্তারি পড়তে গেলে ছাত্ররা যেমন মড়া কেটে চিরে চিরে মানুষের শরীরে সব দেখে শেখে, রহমতের কাছে সে তেমনিভাবেই গাড়ির সব চিনেছে। কতকগুলো পার্টস দরকার শুধু। শুখনরামের কাছে টাকা ধার নিয়ে কলকাতা থেকে সে সব কিনে আনবে। কলকাতা তাজ্জবকে শহর! দিদিয়া বলত বাগদাদের গল্প। বাগদাদের মত আজব শহর। মনে পড়ে রাত্রে রঙ ধরা চোখে কসবীদের পাড়ার ঝলমলে আলোয় আলো করা রাস্তার কথা। এক দিন ফূর্তি করে আসবে সেখানে। হঠাৎ নরসিং চমকে উঠল। সিঁড়ির বাঁকের মুখে কোণে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে! ঘোমটা দিয়ে, সাদা থান পরনে, বেরিয়ে আছে শুধু দুটি নিরাভরণ হাত। নরসিংয়ের বুকের রক্ত তোলপাড় করে উঠল। পিছনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে সে খপ করে তার মাথার ঘোমটাটি খুলে দিলে।

সেই মেয়ে! গাড়ির চাকায় লেগে দেশান্তরে এসে পড়া মাটির টুকরোর মত শেঠের বাড়ির সিঁড়ির কোণে পড়ে আছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে মেয়েটি তার দিকে চাইলে। নরসিং মৃদুস্বরে বলল—তোমাকে বেচে দেবে পাঞ্জাবীর কাছে কি পেশোয়ারীর কাছে।

মেয়েটির মুখ সাদা হয়ে গেল ভয়ে।

নরসিং বললে—পার তো আজ রাত্রে বাইরে আমরা যেখানে থাকি সেখানে এস।

নয়

নিতাইয়ের নেশাটা আজ ভাল জমে নাই। নেশা না জমলে নিতাইয়ের ঘুম আসে না। নরসিং বলে—নেশাটি পুরো হলেই হারামজাদে নদীর দহের মাছ! অথৈ জলে আরামসে থির হয়ে যেন অঙ্গ এলিয়ে দিলে। আর নেশা না হলেই শুয়ারকি বাচ্চে ডাঙার মাছ। ঝটপট-ছটফট—উল্লুক কাঁহাকা!

নিতাই দাঁত বার করে হাসে, খুশীমনে হাসিমুখে স্বীকার করে নেয়

সিংজীর কথা। বলে—গা-গতরের 'বেথা' না মরলে ঘুম আর আসে কখনও? আপুনিই বলুন ক্যানে? তা ছাড়া, নিতাই আরও খানিকটা দন্তবিকাশ করে বলে—অল্প খেয়ে মাথা চনচন করে, তাগদ যেন বেড়ে যায়, মারামারি করতে ইচ্ছে হয়; হা-রে-রে করে ছুটে বেড়াতে আমোদ লাগে। ঘুম পালায় যেন নদী পেরিয়ে ভূতের মত। এর পর গলা নামিয়ে বেশ মিষ্টি মোলায়েম স্বরে বলে—আর পুরো নেশা হল, তামাম দুনিয়া দুলতে লাগল, মাটিতে পডলাম যেন মায়ের কোলে শুয়ে দোল খেতে লাগলাম, কানের কাছে চেঁচান না ক্যানে, চোখ আরও মিটিমিটি করে বুজে আসবে, মনে হবে—শালা বর্গী এল বুঝি! বাস, তারপর একবার নাক যদি ডাকল তো রাত ফরসা।

নেশা না জমায় নিতাইয়ের ঘুম আসে নাই; বিছানায় খানিকটা এপাশ-ওপাশ করে সে উঠে বাইরে এসে ঘুরছিল।

নরসিংও জেগে আছে। সে ভাবছে। অনেক কথা। নিতাই গল্প করতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু নরসিং উত্তর দেয় নাই। শেষে সে বিরক্ত হয়ে বলেছে, মাথায় জল দিয়ে বাইরে খানিকটা হাওয়া লাগিয়ে আয়।

দিব্যি ফুটফুটে জ্যোৎস্না। শুখনরামের বাড়িটা নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নার মধ্যে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে নিতাইয়ের মনে হল, কেয়াবাৎ! বাড়িটার বাহার যেন জ্যোৎস্নার মধ্যে বেড়ে গিয়েছে!

বেটা ভূড়িডবাম আচ্ছা বাড়িটা হাঁকিয়েছে, পেল্লায় কাণ্ড! আষ্টেপৃষ্ঠে শিক দিয়ে কাঠ দিয়ে যেন একটা সিন্দুক বানিয়েছে। মাছি গলবার ফাঁক নাই। দরজাগুলোয় ডবল পাল্লা, সামনে লোহার শিক-ঘেরা পাল্লা—পিছনে ইয়া পুরু শালকাঠের দরজা। দাওয়ার খিলেনগুলো শিকের ফ্রেম এঁটে বন্ধ। উপরের বারান্দার রেলিং আর মাথায় ঝিলমিলির মাঝখানটা পর্যন্ত ফাঁক রাখে নাই; সমস্ত কাঠ দিয়ে বন্ধ। হঠাৎ তার মনে হল—দিনের বেলা যেন এগুলো খোলা ছিল। হ্যাঁ, খোলাই তো ছিল। স্থূল বুদ্ধিতেও অনেক গবেষণা করেও সে ব্যাপারটার কিনারা করতে পারলে না। যাঃ বাবা, নেশা লাগল না কি?

সে চমকে উঠল—এ কি? আরে বাপ রে বাপ! তার সর্বাঙ্গে পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত একটা চমকের সিরসিরে প্রবাহ ছুটে গেল। সে পা টিপে টিপে ঘরে এসে ঢুকল, চাপা গলায় ডাকলে—সিংজী!

নরসিং অত্যন্ত বিরক্ত হল। মেজাজ তার ভাল নাই। মাথা যেন গরম হয়ে রয়েছে। 'শ্যামনগর পাঁচমতি' সার্ভিসের ভাবনা. লাইসেন্স চাই।

শুখনরাম সাহায্য করবে বলেছে। কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নাই ; শুখনরাম সব পারে। তবে নরসিং বড় কায়দা করে ধরেছে শুখনকে। এখন ভয় হচ্ছে জোসেফকে। জোসেফকে পাশ কাটিয়ে শুখনরামের সঙ্গে দোস্তি করার জন্য একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে। সে আবার এস. ডি. ও-র ড্রাইভার। সাহেবের কান না ভারী করে দেয়! 'গরজু' মিটমিটে ডাইন কাঁহাকা! গরজ কত! বলে, আরম্ভ করুন আপনি, আমারও ইচ্ছে আছে একখানা গাড়ি কিনে ওই লাইনে সার্ভিস চালাব। হাড়ীর ছেলে খেরেস্তান হয়ে হুঁশিয়ার হয়েছে। তবে লোকটা মোটের উপর ভাল। তাছাড়া আজ মদের দোকানেও একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, আর একটু হলেই একহাত বেধে যেত। এইটা একটা খারাবি হয়ে গেল। ক'জন ড্রাইভার কণ্ডাক্টারের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা এখানকার ড্রাইভারদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে গিয়ে তাসে বসেছিল নরসিং। রামেশ্বর, জাফর, রসিদ আর সে। মদের বোতল নিয়ে, মদের দোকানের পাশেই ডিম, আলুর দম, মাংসের দোকানে। মস্ত একখানা খড়ের চালা, সামনেটায় নড়বড়ে টেবিলের উপর চায়ের ব্যবস্থা। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বড় একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে জল ফুটছে; টেবিলের উপর ময়লা কাপ আর মাটির ভাঁড় সাজানো থাকে। চালার ভিতরে কয়েকখানা ভাঙা চেয়ার, কয়েকখানা বেঞ্চি ; চেয়ার এবং বেঞ্চিগুলোর মাঝখানে উঁচু লম্বা টেবিল। সকাল থেকে চায়ের খরিদ্দারেরা জমিয়ে রাখে দোকানটি, সন্ধ্যে থেকে চায়ের আসরে মন্দা পড়ে ; উনুনে কড়াই চড়ে। মাংসের কালিয়া, ডিমের কোর্মা, আলুর দমের লোভনীয় গন্ধ উঠতে থাকে। পরোটা ভাজা হয়। দোকানে আসর দুটো—একটা সামনে, একটা পিছনে। চালাটার পিছনে পাঁচিলের ওপাশে একটা আড্ডা, বারোমেসে বাঁধা খরিদ্দারের আসর। দু-চার জন কোর্টের টাউট আছে, রামেশ্বরদের একদল আছে, আরও আছে পাঁচমিশেলী একটা দল—কাপড়ের দোকানের কর্মচারী, ধানচালের দালাল, রঙমিস্ত্রী, হারমোনিয়ম-মেরামতওয়ালা, এমনি ধরনের পাঁচ কারবারের পাঁচটি লোক তারা এক পাশে আলাদা আলাদা মদ মাংস ডিম খায়, গোলমাল বড় করে না, চুপচাপ খেয়ে উঠে চলে যায়। বড় জোর স্ফূর্তি বেশি জমলে হঠাৎ দু-চার কলি গান গেয়ে ওঠে।

রামেশ্বরদের আড্ডা আলাদা। ওদের প্রথম আড্ডা বসে মদের দোকানে

তারপর বোতল নিয়ে রেস্টুরেন্টের এই ভিতরের দিকে এসে বসে। পাকা বন্দোবস্ত, আপন আপন বসবার আসন পর্যন্ত ওরা কিনে রেখেছে। রামেশ্বর, জাফর, রসিদ এদের তিনখানা ক্যাম্বিশের ইজিচেয়ার কেনা আছে! ক্লীনার ন্যাপলা, ফটকে, হাফিজ এদের আছে তিনটে টুল, সাজার অর্থাৎ চাঁদা করে কেনা আছে আরও একটা ইজিচেয়ার, একটা ছোট টেবিল—আসলে সেটা চওড়া টুল, আর একখানা বেঞ্চি। চওড়া টুল অর্থাৎ টেবিলখানাকে মাঝখানে রেখে রামেশ্বরেরা ইজিচেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে। টেবিলের উপর পড়ে তাস। তে-তাসের খেলা চলে। নিঃশব্দে নির্দিষ্ট তাসখানা সকলকে দু-তিনবার দেখিয়ে টেবিলের উপর ফেলে দেয় তাস তিনখানা। নির্দিষ্ট তাসখানাকে চিনে তার উপর দান ধরতে হবে।

জোসেফ আজ মদের দোকানে আসে নাই। দোকানে গিয়েই নরসিং খবর পেলে সন্ধ্যাবেলাতেই জোসেফ দুটো বোতল কিনে নিয়ে বাড়ি গিয়েছে। নরসিং বুঝলে জোসেফ তাদের প্রতীক্ষা করছে বাড়িতে বসে। হুঁশিয়ার শয়তান লোকটা, নরসিংয়ের বাড়া ভাতে ভাগ বসাতে চায়। হেসে নরসিং বসে গেল দোকানে। ওদিকে আর মাড়াচ্ছে না সে। রামকে পাঠালে ডিম আর মাংস কিনে আনতে। রামেশ্বর এগিয়ে এসে বললে, রাম রাম সিং ভাই!

নরসিং হেসে বলে—রাম রাম!

রামেশ্বরের পিছনে এসে দাঁড়াল রসিদ।—সেলাম ভাই।

—সেলাম।

রামেশ্বর হঠাৎ তার হাত ধরে বললে—সব শুনেছি। পাঁচমতি সার্ভিস খুলে দিলেন?

নরসিং গম্ভীরভাবে বললে—দেখি; চেষ্টা তো করছি।

হাত ধরে টেনে রামেশ্বর বললে—আসুন।

—কোথায়?

রসিদ বললে—আমাদের একটি আড্ডা আছে।

—চলুন, নিরিবিলি কথা হবে সেখানে। দোস্তি হবে।

রামেশ্বর বললে—শালা জোসেফটা আজ আসে নাই। ভাল হয়েছে। চলুন।

নরসিং একটু ভাবলে। যদি হাঙ্গামা বাধে! সে একবার নিতাইয়ের দিকে তাকালে। বেটা ডোমের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে, গায়ের জামা খুলে কাঁধে ফেলেছে, মনে হচ্ছে একটা দুর্দান্ত মহিষ দাঁড়িয়ে

আছে। এই মুহূর্তে রাম এসে দোকানে ঢুকল। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ছোঁড়ার লাঠির হাতও ভাল। নরসিং উঠে দাঁড়াল, চলুন।

জাফর দাঁড়িয়ে ছিল জানালার ধারে। রসিদ গিয়ে তাকে ধাক্কা দিলে—চল্ বে।

জাফর নিঃশব্দে তার দিকে ফিরে তাকালে একবার, তারপর বললে—আসছি।

রামেশ্বর হেসে উঠল, বললে—নজরমে কুছ আগেয়া? যানে দে উসকো।

নরসিং নিতাইকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললে—মাল খাবি না বেশী।

—খাব না?

—না। খাব বাড়িতে গিয়ে। খবরদার। অচেনা লোক, বিদেশ বিভূঁই।

মন্দ লাগে না আসরটা। হ্যাঁ, আরামে আছে, তোয়াজ করবার মত ব্যবস্থা আছে। মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল নরসিংয়ের। সে একখানা ইজিচেয়ারে বসে বললে—বেশ জায়গা।

নিতাই দাঁত বার করে বলে উঠল—কেয়াবাৎ হ্যায়! গুরুজী আমাদেরও চেয়ার কিনে ফেলুন।

হারমোনিয়ম-ওয়ালাটার চুলের বাহার দেখে রাম মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। বাহবা, বাহবা। থাকে থাকে ঢেউ-খেলানো চুল টোপরের মত মনে হচ্ছে! সে নিজে চুলের উপর আঙুল দিয়ে ঢেউ-খেলানো থাক তুলতে চেষ্টা করতে লাগল।

রামেশ্বর বললে—জোসেফ শালার সঙ্গে দহরম-মহরম করবেন না। শালা এস. ডি. ও-র ড্রাইভার, শালা গোয়েন্দা হ্যায়।

—হ্যাঁ, উ হামার মালুম হো গেয়া।

রসিদ মদের গেলাস ভরে টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বললে—আজ তো ক'টা ট্রিপ দিলেন, কি রকম মালুম হল?

—খুব ভাল। নিতাই বলে উঠল।

হারামজাদা ডোম, বে-আক্কেল—বেকুফ কাঁহাকা! শূয়ারকি বাচ্চার ঘটে যদি এক তিল বুদ্ধি থাকে! মনে মনে চটে উঠল নরসিং, কিন্তু এখানে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করা চলে না। সে হেসে বললে—প্যাসেঞ্জার ভাল হয়, কিন্তু রাস্তার যা হাল তাতে তিন মাসেই গাড়ি খতম। আর—। একটু থেমে বললে—প্যাসেঞ্জার ভাল হলেও ঘোড়ারগাড়িওয়ালারা ছাড়বে না। ভাড়া

নামাবে! তিন-চার আনায় নামাবে। তাহলে তো আধেলা মুনাফাও থাকবে না। আবার একটু থেমে বললে—সুবিধে বুঝছি না। ভাবছি!

তারপর নিঃশব্দে মদ্যপান চলে।

নরসিং হঠাৎ তুললে শুখনরামের কথা।

রামেশ্বর বললে—বাপ রে বাপ! উ তো একঠো ঘড়িয়াল হ্যায়।

রসিদ বললে—শালা জেনানীর কারবার করে। দেহাতসে জেনানী কিনে আনে—চালান ভেজে কলকাত্তা। উঃ, পরসাদ-ভাই, দু-মাহিনা হল একঠো যা ভেজলো। উঃ! শালা জাফর তো গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলে, হামভি যায়গা কলকাত্তা, শিয়ালদহসে উসকো ছিনা লেকে ভাগেগা। শালা!

রামেশ্বর তাস বার করলে।

রসিদ বললে—জোসেফের বহিনটাকে দেখিয়েছিস ভাই পরসাদ? জাফর তো বলে, কেরেস্তান হয়ে ওকে আমি বিয়ে করব। তা মেয়েটা কালোতে খুবসুরাত আছে।

নরসিং বললে—থাক্ ও সব কথা।

—আপনি দেখেন নি?

—দেখেছি।

—আ—। হেসে উঠল রসিদ। নজর গির গেয়া?

—কি সব যা-তা বলছেন? ভদ্রলোকের মেয়ে. আমাদের ভাইবেরাদারের বহিন, লেখা-পড়া শিখেছে—

—ইয়া—। হা-হা-হা। দরদ আগেয়া! রসিদ বীভৎস উল্লাসে হাসতে লাগল। নিতাইও হাসতে লাগল, রামাও হাসছে। নরসিং হঠাৎ উঠে দাঁড়াল নিতাইয়ের মাথার চুলের মুঠো ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললে—হাসছিস ক্যানে উল্লুক? তোর বহিনকে নিয়ে যদি এমনি তামাশা করে?

রামেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আরে ভাইয়া, ই কেয়া হোতা হ্যায়! ছোড়দো উ বাত। বৈঠ্ যাইয়ে। এ রস্সিদ—ঢালো ঢালো।

রসিদ আবার গেলাস ভরতে লাগল। রামেশ্বর তাস বাঁটতে লাগল আপন মনে। গ্লাস শেষ হতেই সে বললে—আসুন দু-হাত খেলা যাক। নসিব আপনাদের দেখি। পাঁচমতি সার্ভিস ভাল চললে আপনার জিত।

তাস খেলতে লাগল সে। ঠোঁটের একটা দিক ঘন ঘন নাড়তে আরম্ভ করেছে। ঐ পাশের নাকের পেটিটা সঙ্গে সঙ্গে নড়ছে। নেশা জমে আসছে

রামেশ্বরের।

নরসিং স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রামেশ্বরের হাতের দিকে। লোকটা পাকা জুয়াড়ী। তাস তিনখানা পাশাপাশি ফেলে দিয়ে বললে—ধরুন দান।

নিতাই ঝপ করে একটা সিকি ধরলে একখানা তাসের উপর! উল্লুক বুড়বক মরেছে। সে বিষয়ে নরসিং নিঃসন্দেহ।

রসিদ ঝপ করে ফেললে অন্য একখানি তাসের উপর পুরা আধুলির একটা দান। রামেশ্বর বললে—আপনি?

নরসিং ভাবলে একটু। সে রসিদের দানের পাশেই ধরলে তার দান পুরা টাকা।

রামেশ্বর তাস উল্টালে। সব ফাঁক। যেখানায় কেউ বাজি ধরে নাই সেইখানাই বাজির তাস। সে দান টেনে নিলে। ফের ফেলল তাস। রসিদ এবার ঝপ করে ফেললে এক টাকা। নরসিং তার দিকে তাকালে একবার। রসিদ এবার ঠিক তাসখানার উপর বাজি ধরেছে। প্রত্যাশা করেছে গতবার ঠকার পর এবার নরসিং তার তাসে বাজি ধরবে না।

নিতাই এক সিকিতেই দমে গিয়েছে!

নরসিং পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে ধরলে রসিদ যে তাসে বাজি ধরেছিল সেই তাসেই।

রামেশ্বর তাকালে রসিদের মুখের দিকে। কি ইশারা হয়ে গেল।

নরসিং বললে—উঠান তাস।

রসিদ ঝুঁকে পড়ল টেবিলের উপর—ফিন হামারা তাসমে বাজি লাগায়া?

নরসিং হেসে বললে—হ্যাঁ, আপনার সনেই নসিব জড়ালাম। কই, উঠান তাস।

—সবুর। রসিদ আর একটু ঝুঁকে এসে বলল—এক বাত।

নরসিং বললে—তাস ঢাকা পড়েছে। খাড়া হয়ে বলুন কি বলছেন?

উত্তরে আর একটু ঝুঁকে বুকের আড়ালে গোটা টেবিলটাকে ঢেকে দিয়ে রসিদ বললে—আমার নসিবের ভাগ দেনে হোগা। জোসেফের বগিন—। দাঁত মেলে সে হাসতে লাগল। নরসিংয়ের দরদের পরিচয় সে পূর্বেই পেয়েছিল তাই ওই জায়গায় খোঁচা দিতে চাইল।

নরসিং দু-হাতে এবার রসিদের দুই কাঁধে ঠেলা দিয়ে সজোরে বসিয়ে

দিলে, কিন্তু ততক্ষণে টেবিলের উপরের তাস টাকা ছটকে পড়েছে, বাজিটা ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে! রামেশ্বর চীৎকার করে উঠল—উল্লুক কাঁহাকা! বাজি বরবাদ করে দিলে।

নরসিং পাঁচ টাকার নোটখানি তুলে নিয়ে বললে—বাজির টাকা দিতে হবে, বাজি আমি মেরেছিলাম।

রামেশ্বর চাকু ছুরিটা বার করে বললে—বস্থন। বরবাদ গিয়াছে ফের ফেলছি তাস। এমন যায়।

—উঁহু। বাজির টাকা না দেন, গত বাজির টাকাটা, নিতাইয়ের সিকিটা ফেরত দেন। আমি উঠব।

রসিদ উঠে দাঁড়াল।—ইয়ে আপকা আবদার হ্যায়, না, কেয়া?

—আবদার নয়—দাবি। নিকলান টাকা।

চাকু ছুরিটা হাতে নিয়ে রামেশ্বরও উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে নরসিং তার হাত চেপে ধরলে। ছ-ফিটের কাছাকাছি লম্বা নরসিং, তার হাতখানাও সেই অনুপাতে লম্বা। বললে—দেখছেন কতখানি লম্বা আমি? আপনার চাকুর ফলা ছোট, আমার কলিজার সন্ধানও পাবে না।

নিতাইও উঠে দাঁড়িয়েছে নরসিংয়ের পাশে। কালো মহিষের মত চেহারা, তার উপর ছাতিখানা তার উঁচু হয়ে উঠেছে—হাতাহাতি মারামারির সম্ভাবনা। হারমোনিয়ম-ওয়ালার চুলের মোহ কেটে গিয়েছে রামার, সেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রসিদ আস্তিন গুটিয়েছে, ন্যাপলা ফটিকেও উঠে দাঁড়িয়েছে। হাফিজ বসে ছিল। সেই সর্বাগ্রে গম্ভীরভাবে বলে উঠল—পরসাদ সাহেব অন্যায় আপনাদের। বাজি সিংজী মেরেছিল, রসিদ তাই অন্যায় করে ভেঙে দিলে।

হাফিজের কথায়, মুহূর্তে ফেটে পড়ার মত ব্যাপারটা শিথিল হয়ে ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ল—বার্স্ট হাওয়ার বদলে, পাংচার হওয়া মোটরের চাকর মত চুপসে গেল। সকলেই তাকালে হাফিজের মুখের দিকে। রামেশ্বর বললে—ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন; বস্থন। নরসিং হাত ছেড়ে দিলে, কিন্তু বসল না, আসর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলে—নিতাই, রামা, আয়। বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে হাফিজকে বললে—সেলাম ভাই দোস্ত। চললাম।

চলে এল ওখান থেকে! কিন্তু মদের বোতলটা উঠিয়ে আনতে ভুল হয়ে গেল। ওদিকে তখন মদের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন অচেনা জায়গা,

মদের দোকানের খিড়কির দরজাটা জানা নাই; নিতাই কপাল চাপড়াতে লাগল। নরসিং খারাপ মেজাজ নিয়ে বসে আছে। মদের জন্যই যে তার মেজাজ খারাপ হয়েছে তা ঠিক নয়, জোসেফের বোন মেরী বেচারীকে খামকা অপমান করলে; সে অপমানের নিমিত্ত হয় সে-ই। জোসেফ কালই ওদের সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল। খামকা লোকগুলোর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল; হয়তো ওরা এর পর শত্রুতা করতে আরম্ভ করবে। তার ভরসা শুখনরাম। শয়তান বদমাস শুখনরাম! সবাই এক কথা বলছে। ও আবার শেষ পর্যন্ত কি করবে কে জানে? নরসিংয়ের একমাত্র অস্ত্র—শুখনরামের গোপন আবগারী মাল আমদানির সন্ধান পেয়েছে। তার গাড়িতে সে মাল এনে পৌছে দেবে। কিন্তু শয়তান যদি শেষ পর্যন্ত ওকেই ধরিয়ে দেয়? কিছু বিচিত্র নয়, শুখনরাম সব পারে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠেছে নরসিংয়ের। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময়টিতেই নিতাই সন্তর্পণে এসে ঘরে ঢুকল, চাপা গলায় ডাকলে —গুরুজী!

নরসিং চমকে উঠল চিন্তায় বাধা পেয়ে, রূঢ়দৃষ্টিতে ফিরে তাকালে সে নিতাইয়ের দিকে।

—উঠে আসুন। তাজ্জব ব্যাপার!

—কি?

—আসুন না উঠে। চুপি চুপি। মজা দেখবেন আসুন।

নিতাই তাকে নিয়ে রাস্তায় একটা গাছতলায় দাঁড়াল।—ওই দেখুন।

নরসিংয়ের বড় বড় চোখ দুটো বিস্ময়ে উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে আগুনে পোড়ানো ভাঁটার মত হয়ে উঠল!

সাদা কাপড় পরা, মাথা পর্যন্ত ঢাকা! স্ত্রীলোক, হ্যাঁ, স্ত্রীলোক! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গাছ-কোমর বেঁধে কাপড় পরেছে। মেথর-ঢোকা গলির মধ্যে শেঠজীর বাড়ির পাঁচিলের মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। লাফিয়ে পড়বে। বিদ্যুচ্চমকের মত একটা কথা নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল। আজই সন্ধ্যার আগে শুখনরামের সিঁড়ির কোণে দেখা হয়েছিল, সে আসতে বলেছিল। বুকের ভিতর যেন মোটরের ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেল তার। ছুটে সে এগিয়ে গেল। অদ্ভুত সাহস, আশ্চর্য মেয়ে! নরসিং তাকে মাটিতে পড়তে দিলে না, তার

দীর্ঘ মজবুত হাত দুখানা মেলে দিয়ে মেয়েটাকে সে লুফে নিলে।

মেয়েটা চমকে উঠল, তার পরই কিন্তু চাঁদের আলোয় নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে দু-হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে খিল খিল করে হেসে উঠল।

নিতাই ব্যাপারটা বুঝে হঠাৎ সেই পথের ধুলোর উপরেই একটা ডিগবাজি খেয়ে নিলে।—শালা! ই মেয়ে গাছ চালিয়ে দেবে রে বাবা!

ফট্‌কির গ্রামের লোকেও ঠিক এই কথা বলে। ফট্‌কি মেয়েটার ডাক নাম। ভাল নাম একটা আছে, কিন্তু সে গ্রামের লোক কেউ জানে না। ফুটফুটে মেয়ে, স্ফটিকের মত উজ্জ্বল লাবণ্যময় দেহবর্ণ দেখে ছেলেবেলায় ফটিক থেকে স্ত্রীবাচ্যে ফট্‌কি বলে ডাকত। সে নাম পরিবর্তন করার কোন হেতু ঘটে নাই। বাল্যের লাবণ্য গ্রামের ধূলায় মাটিতে দারিদ্র্যের স্পর্শে মলিন হয় নাই, সূর্যের উত্তাপেও রঙ তামাটে হয় নাই। বরং বিপরীতই হয়েছে। রঙ তার দিন দিন উজ্জ্বল হয়েই উঠেছে।

ছেলেবেলায় তার মা তাকে নাচিয়ে আদর করত—'রাঙা মাটির ছবি দেখলে তোরা পাগল হবি'। তিন চার বৎসর বয়স হতেই রঙীন ফেরানা পরে পাড়ায় বেড়াতে বার হলেই লোকে তাকে কোলে তুলে আদর করত। বাঃ ভারি ফুটফুটে মেয়ে! কি নাম তোমার?

—ফট্‌কি।

—বা-বা-বা! ফুট্‌কুট্‌ ফুট্‌ ফটিকমণি!

পাড়া-ঘরের ছেলের মায়েরা বলত—বউ করতে হয় তো এমনি। হ্যাঁ গো ফটিক, আমার বেটার বউ হবে?

ফটিক হেসে ঘাড় নেড়ে বলত—হব।

আর একটু বয়স বাড়ল, পাড়ার ছেলেমেয়েরা মিলে খেলার বয়স হল—তখন ছেলের দলেরা ঝগড়া বাধাতে আরম্ভ করল ফট্‌কির স্বামিত্ব নিয়ে। ফট্‌কিব পক্ষপাত ছিল না, সে দাঁড়িয়ে নির্বিকারচিত্তে দেখত তাদের ঝগড়া; তার পর পুরাকালে বীর্যশুল্কার মত যেদিন যে বিজয়ী হত তার খেলাঘরেই বউ সেজে বসত।

আর একটু বয়স হল, ফট্‌কি তখন ফেরানী ছেড়ে কাপড় পরতে আরম্ভ করেছে, তখন ছেলেরা তার নাম দিলে 'ফটিকজল'। ফট্‌কি মুখ টিপে টিপে হাসত; স্বাদ বুঝবার বয়স তখনও নয়, কিন্তু গন্ধটা মিষ্টি লাগত।

এই সময়েই হল তার বিয়ে। দশ বছরের মেয়ে, আঠারো বছরের বর।

"অতি বড় ঘরন্তি না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর"—প্রবাদ বাক্যটা ফলে গেল ফটিকির কপালে, বছর পার না হতেই ফটকি বিধবা হল ; সব মনে পড়ে ফটকির। বর মরে যাওয়ার সংবাদে ফটকির দুঃখ হয় নাই, সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। আঠারো বছরের জোয়ান চাষীর ছেলে, তাকে দেখে তার ভয় হয়। এক বৎসরের মধ্যে বার তিনেক সে এসেছিল ফটকির বাপের বাড়ি, প্রতিবার ফট্‌কি কেঁদেছিল ; এখন তার মধ্যে মধ্যে তাকে মনে পড়ে দুঃখ হয়! আর সেই লম্বাচওড়া দেহ, চওড়া ছাতি মনে পড়লে কিছুক্ষণের জন্য ফটকি নিঝুম হয়ে বসে থাকে।

আরও বছর দুয়েক গেল। দুনিয়ায় হঠাৎ রঙ লেগেছে মনে হল ফট্‌কির। মা-বাপ সাবধান করত তাকে, বাইরে যেতে বারণ হল ; যেতে হলে মায়ের সঙ্গে যেতে হবে। একা বাইরে বার হলেই দু-পাশের বেটাছেলের চোখ তার উপরে এসে পড়ে ; ফট্‌কি সংকুচিত হয়, অস্বস্তি অনুভব করে—বুকের ভিতরটা গুরুগুরু করতে থাকে। একলা দেখে অল্পবয়সীরা হেসে তাকে হাসাতে চেষ্টা করে ; মুখ নামিয়ে চলে যায় ফট্‌কি। তারা গান গায়, ছড়া কাটে। একটা ছেলে মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে পারত। সে ছড়া বাঁধলে একটা নয় দু-চারটে!—

ফটিক জল, ফটিক জল, ও হায়, তেষ্টাতে ছাতি ফাটছে।
নাইকো খাওয়া নাইকো ঘুম, বড় দুঃখেতে দিন কাটছে।

আরও একটা মনে আছে—

ফটিক জল একবার মুখটি তোলো
মুচকি হেসে একটি কথা বলো।
ওগো একটু ফিরে চাও—আমার মাথা খাও।

মরণ! ফট্‌কির হাসি পেত। হাসতে তার ইচ্ছা হত। কিন্তু ভয়, একটা আতঙ্ক তার বুকের ভিতরের সেই অদ্ভুত শিহরণকে বন্ধ করে দিত। দুটোর ধাক্কায় সে কেমন হয়ে যেত। দুনিয়া হয়ে উঠত তেতো, কিছু ভাল লাগত না। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হত, ছুতোনায় ঝগড়া—সে উপোস করে কাঠের মত হয়ে থাকত। তখন সে সব বুঝেছে। বুকের ভিতরের অস্বস্তিটা আগে ছিল ধোঁয়ার মত, এখন সে যেন আগুনের মত জ্বলে উঠল। সত্যিই ফট্‌কির মনে হত শরীর তার জ্বলছে। পুকুরের জলে নেমে সে আর উঠতে চাইত না, শুধু মাটির উপর শুয়ে থাকতে ভাল লাগত। রাত্রে মা-বাবার ঘরের

ঠিক পাশের ঘরেই সে শুয়ে থাকত, ঘরে এসে খিল দিয়েই সে বিছানা তুলে ফেলে দিত। ঘুম হত না। জানালায় মধ্যে মধ্যে ঠুক্‌ঠাক শব্দ উঠত, ঢেলা লাগত জানালায়। কখনও শিসের শব্দ উঠত। কখনও চাপা মিহিগলায় গান শোনা যেত।

হঠাৎ একদিন মনে হল, কোঠা-ঘরের জানালায় কে যেন উঠে বসেছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা কোঠাঘর। পাশাপাশি দুখানা কুঠরি, দক্ষিণের কুঠরিতে শোয় মা আর বাবা, উত্তর দিকের কুঠরিতে ফট্‌কি। উত্তর দিকের জানালাটা খোলা বারণ। ও জানালাটায় বাবার নজর চলে না। শব্দ শুনে ফট্‌কি উঠে বসল, বুকের ভিতরটা যেন ঢেঁকি দিয়ে কুটছে। চীৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে হয়েছিল তার প্রথমে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, না। সে স্থির চোখে চেয়ে রইল জানালাটার দিকে। শব্দ হল—একটা কিছু যেন ভেঙে গেল। কি ভাঙল? কাঠের গরাদে? সঙ্গে সঙ্গে চাষীর ঘরের অসমান জানালার জোড়ের ফাঁকের ভেতর একটা শিক চালিয়ে ঠেলে জানালার শিখটা খুলে ফেললে বাইরে থেকে। একটা মুখ ঢুকল গরাদের ভাঙা জানালা দিয়ে। গাঁয়ের বড় মোড়লের ছেলে। এতক্ষণে তার যেন চেতনা হল, সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলে, খিল খুলে সে দরজা টানল, কিন্তু দরজা বাইরে থেকে শেকল বন্ধ। মা-বাবা তার দরজায় বাইরে থেকে শেকল দিয়ে বন্ধ করে রাখে। পিছন থেকে এসে জোরে জড়িয়ে ধরে ফেললে বড় মোড়লের ছেলে। সে প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করলে, ডাকলে—বাবা, বাবা গো!

মোড়লের ছেলে বাঘের মত চেঁচিয়ে উঠল—খুন করে ফেলাব।

ও-ঘরে বাবার শব্দ পাওয়া গেল, সে ভুত দেখে ভয় পাওয়া লোকের মত বু বু করছে, মা চেঁচিয়ে উঠল স্পষ্ট ভাষায়—মেলে গো, খুন করলে গো!

ফট্‌কি তখন স্তব্ধ। মোড়লের ছেলে আবার চীৎকার করে উঠল—দুয়োর ভেঙে গিয়ে কেটে ফেলাব। হ্যাঁ।

মা-বাবা চুপ হয়ে গেল।

মোড়লের ছেলে আবার ওই ভাঙা জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেল, জানালা দিয়ে গলে লাফিয়ে পড়ল মাটির উপর। ফট্‌কি তখন অজ্ঞানের মত পড়ে।

সেদিনটা ফট্‌কির চিরকাল মনে থাকবে।

পর দিন বাবা মা তাকে গালাগালি করলে। বললে—তুই জলে ডুবে মর্,

বিষ খেয়ে মর্, গলায় দড়ি দে।

সে কি করবে? সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মা-বাপের মুখের দিকে।

—কে? লোকটা কে বল্?

সে বললে—বড় মোড়লের ছেলে।

বাপ বললে—নালিশ করব আমি।

মা বললে—চেঁচিয়ে পাড়া গোল করো না। কেলেঙ্কারির সীমা থাকবে না। জাতে পতিত করবে। চাষার খেঁটে কোথাকার!

বাপ গেল বড় মোড়লের কাছে। কি হল কে জানে! তবে বাবা ফিরে এল বড় মোড়লের কাছে জমি-বন্দক দেওয়া বন্দকী দলিলখানা হাতে করে। বললে—যা হয়েছে তা হয়েছে, মোড়ল বলেছে আর হবে না!

ফট্‌কি সমস্ত দিন যেন মাটির পুতুলের মত বসে রইল! রাত্রে মা বাবা সে—সকলে এক ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা হল। মা বাবা ঘুমিয়ে গেল, তার কিন্তু ঘুম এল না, একটা আতঙ্ক যেন তাকে অস্থির করে তুলেছে। রাত্রি বাডছে। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কও বাড়ছে। পেঁচা ডেকে গেল, সে চমকে উঠল। মনে হল, কে শিস দিয়ে গেল! ডাকপাখি ডাকছে, ফট্‌কির মনে হচ্ছে কেউ কুক দিচ্ছে। চাষীর ঘর, ইঁদুর বেড়াচ্ছে, শব্দ উঠছে, ফট্‌কির মনে হচ্ছে ওপাশের ঘরের জানালায় কেউ উঠে জানালা খুলছে। ঘুম এল তার শেষরাত্রে। তাও কিছুক্ষণের মধ্যেই দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে সে গোঙাতে লাগল, মনে হল, কে এসে তাকে আক্রমণ করেছে। মা তাকে জাগিয়ে তুললে। কিন্তু লজ্জায় বলতে পারলে না, কি দুঃস্বপ্ন সে দেখেছিল।

দিন কয়েক পরই আবার একদিন সন্ধ্যার সময়। গোয়ালে সে গরু বাঁধছিল। হঠাৎ বড় মোড়লের ছেলে গোয়ালে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে।—চেঁচিয়ো না। চেঁচালে আমার কচু, তোমারই কলঙ্ক।

ফট্‌কি চেঁচালে না।

পরের দিন আবারও সে গোয়ালঘরে ঠিক সময়ে এসে ঢুকল।

একদিন বাইরে থেকে আর কয়েকজন ছোকরা এসে শেকল দিলে ঘরে। মোড়লের ছেলে ফট্‌কিকে নিয়ে মাচায় উঠল, কাস্তে দিয়ে চালের বাখারি কেটে ফট্‌কিকে নিয়ে চাল ফুঁড়ে উঠে ওপাশে লাফিয়ে পড়ল।

মোড়লের ছেলেকে চিরদিন মনে থাকবে তার। তার বুকে সে বাঘিনীর

সাহস জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য, দিনে ফট্‌কি সে সাহস খুঁজে পায় না। রাত্রির অন্ধকার যত ঘনাতে থাকে ফট্‌কির সাহসও তত জাগতে থাকে, কয়লার আঁচের মত। সন্ধ্যা থেকে সে ধোঁয়ায়, প্রথম প্রহরে সে থমথম করে, চৌকিদার হাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলেই সে যেন ধক ধক করে জ্বলে। সমস্ত বাধা বিঘ্ন পুড়িয়ে ছাই করে সে তখন বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ মরে গেল মোড়লের ছেলে। যেমন মানুষ তেমনি মরণ। প্রকাণ্ড উঁচু গাছে উঠেছিল কচি পাতা কাটবার জন্য। শখের লড়াইয়ে-মেড়া ছিল তার, সেই মেড়াকে খাওয়াবার জন্য লকলকে কচি ডাল এবং পাতা কাটতে উঠল। সেই গাছের ডগা থেকে পড়ল নীচে ঘাড় গুঁজে। বীভৎস সে মূর্তি।

তার পর সেই ছড়া-বাঁধা ছেলেটা।

ফট্‌কির মা-বাপ তখন নিশ্চিন্ত হয়েছে। মোড়লের ছেলে মরেছে। ফট্‌কি ম্রিয়মাণ হয়েছে খানিকটা। ফট্‌কিকে তার আলাদা ঘরেই শুতে দিয়ে তারা তাদের ঘরে শুচ্ছে। মেয়েটা যদি শুয়ে একটু-আধটু কাঁদে কাঁদুক, তা ছাড়া মা মেয়ে বাপ এক ঘরে শোয়াও ভাল দেখায় না।

ছেলেটা একদিন একলা পেয়ে বললে—ফটিকজল!

ফট্‌কির বুকে পাক খেয়ে উঠল আগুন, সে চারিদিক চেয়ে দেখে নিয়ে বললে, রাত্রে জানালার ধারে এস। শিস দিয়ো। চৌকিদার চলে যাওয়ার পর।

রাত্রে চৌকিদার হাঁক দিয়ে গেল। উঠে বসল ফট্‌কি। আস্তে আস্তে এসে সেই মোড়লের ছেলের ভাঙা জানালাটার ধারে বসল। সেটা আবার মেরামত হয়েছিল, কিন্তু আজই আবার ফট্‌কি সেটাকে ভেঙে আলগা করে ঠেকিয়ে রেখেছে। একটুক্ষণ বসে থেকে সে জানালার খিলটা খুললে। আরও একটুক্ষণ অপেক্ষা করে জানালাটা একটু ফাঁক করে দেখলে। তার পর সম্পূর্ণ জানালাটা খুলে ফেললে। অধীর অস্থির হয়ে উঠেছিল সে।

তার নারী-জীবনের দেহগত স্বাভাবিক ক্ষুধা বৈধব্যের বাঁধে বাঁধা পড়েছিল সমাজ ও শাস্ত্রের নির্দেশ। সে বাঁধের গায়ে রাত্রির অন্ধকারে সরীসৃপের মত বিষনিশ্বাস দিয়ে নির্গমন-পথ সৃষ্টি করে গিয়েছে বড় মোড়লের ছেলে। অভ্যাস এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় রাত্রির অন্ধকারে সে ক্ষুধার্ত ধারা উতলা এবং মত্ত হয়ে উঠেছে। ভালমন্দ পাপপুণ্য সব তার কাছে এখন তুচ্ছ।

অধীরতার মধ্যে সে আর চুপ করে থাকতে পারলে না। ভাঙা জানালাটা দিয়ে নীচের দূরত্বটা একবার দেখে নিলে। মনে পড়ল মোড়লের ছেলের সঙ্গে

গোয়ালের চাল থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ার কথা। পড়বে লাফিয়ে? কিন্তু জানালাটা অপরিসর বলে লাফিয়ে পড়ার তেমন সুবিধা নাই। উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় তার মস্তিষ্ক মন—সমস্ত কিছু তখন প্রচণ্ড কামনায় একাগ্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে! হঠাৎ সে উঠল, উঠে আলনা থেকে কাপড় নিয়ে জানালার মাঝের মোটা বাজুতে বেঁধে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিলে। তার পর তাই ধরে সে ভাঙা জানালা দিয়ে গলে বাইরে এসে ঝুলে পড়ল, দেওয়ালের গায়ে পা রেখে ধীরে ধীরে সে নেমে এল নীচে। তার পর সেই ছেলেটা এল।

ফট্‌কির সর্বাঙ্গ তখন যেন জ্বরগ্রস্তের মত তপ্ত হয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরটা জ্বলন্ত হাপরের মত মনে হল, হাঁপাচ্ছে—নিশ্বাস পড়ছে আগুনের মত গরম। সে বললে—চল গাঁয়ের বাইরে। বড় মোড়লের আমবাগানে। সমস্ত রাত্রি সেখানে প্রেতিনীর মত নৃত্য করলে সে। সত্যই সে নাচলে, গান গাইলে। শেষরাত্রে ফিরে সে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে আবার ওই কাপড় বেয়ে উপরে উঠে গেল।

ছড়া-গাইয়ে ছেলেটা আর আসে নাই। তার কথা মনে হলে দিনের বেলা ফট্‌কি মুখ মচকে ব্যঙ্গের হাসি হাসে। রাত্রের বেলায় মনে হলে মাটির উপর থুথু ফেলে।

মানুষের অভাব কোথায়?

পরের দিন রাত্রেই নতুন লোক এল আশ্চর্যভাবে। ফট্‌কি কাপড় বেয়ে নীচে নেমে দাঁড়িয়েছিল। সে এল না। ফট্‌কি ভাবছিল। হঠাৎ এল একজন। গ্রামে হাঁক মেরে চৌকিদার ফিরছিল। সে এসে খপ করে হাত ধরলে।

ফট্‌কি বললে—হাত ছাড়।

—না।

খালি হাতটা দিয়ে সটান এক চড় বসিয়ে দিল ফট্‌কি তার গালে। বাগ্দী ছোঁড়াটা সঙ্গে সঙ্গে আর এক গাল পেতে বললে—ই গালেও মার!

ফট্‌কি আর না হেসে থাকতে পারলে না। বললে—মরণ!

তার পর এল গ্রামের জমিদার। ঘাটের পথে যেতে পথের মাঝখানে পড়ে কাছারি। হঠাৎ একদিন সে দেখলে কাছারিতে জমিদার এসেছে। ভাল লাগল জমিদারকে। দিনে ফট্‌কি আর এক ফট্‌কি। মুখ নামিয়ে ঘোমটা টেনে সে পার হয়ে গেল কাছারির সামনেটা, কিন্তু রাত্রে নিজেই গিয়ে হাজির হল কাছারির পাশে। জমিদার কোন্ ঘরে থাকে তার অজানা নয়।

নগদী গমস্তা গাঁয়ের লোক বলে—পুকুরের ধারের ছোট কুঠরিটা হল বাবু-কামরা। বাবু-কামরার জানালায় গিয়ে সে টোকা দিল। দু-বার, তিন বার, চার বার। জানালা খুলে বাবু ডাকলে—কে? সামনেই ছিল সে, একটু পাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল দেওয়াল ঘেঁষে। চাপা গলায় বললে—খুলুন।

জমিদারকেও তার ভাল লেগেছিল। কিন্তু কথাটা প্রকাশ করে দিলে চৌকিদারটা। সেই ছিল আবার জমিদারের নগদী। সে কথা মনে হলে হাসে ফট্‌কি। হারামজাদার চাকরি গেল। জমিদারের কাছে একটি নূতন আস্বাদ পেলে সে।

কথাটা প্রচার হলেও গ্রামে কেউ উচ্চবাচ্য করলে না। বাপ মা পর্যন্ত। বাপ নূতন জমি বন্দোবস্ত পেল বিনা সেলামীতে। দু-একজন তাকে ধরলে সুদ-খাজনা মাফের সুপারিশের জন্য।

জমিদার চলে গেল। ওই চৌকিদার বাগ্‌দী ছোঁড়া এবার আক্রোশ মেটাতে একদিন তাকে ঘাট থেকে দিনে-দুপুরে তুলে নিয়ে গেল আরও তিনজন সঙ্গী জুটিয়ে। দু-জন মুসলমান, একজন হাড়ী। কিছুক্ষণ দেরি হলে হয়তো তার সন্ধান করা কষ্টকর হয়ে উঠত, ফট্‌কির জন্যে ব্যাকুল তরুণের গ্রামে অভাব ছিল না। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। উদ্ধার করে চৌকিদারটাকে আর তার সঙ্গীদের বেঁধে নিয়ে এল। ফলে ব্যাপারটা চাপা পড়ল না। মামলা হল।

মামলায় অনেক কথা জেরা হল, ঘাঁটাঘাঁটি হল, কিন্তু দিনের বেলায় ফট্‌কির মুখ দেখে বিচারক সব কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। জেল হয়ে গেল তাদের। কিন্তু এবার সমাজকে ঠেকান গেল না। সমাজে তার বাপ পতিত হল।

এই সময় এল শুখনরাম। সে আড়াইশ টাকা দিলে তার বাপকে। জরিমানা দিয়ে বাপ সমাজে উঠল। কথা দিলে—ফট্‌কিকে সে ঘরে রাখবে না, নবদ্বীপ কি কোথাও পাঠিয়ে দেবে। নবদ্বীপের বদলে বাবা একদিন রাত্রে শুখনরামের তামাকের গাড়িতে তাকে তুলে দিলে। শুখনরাম তাকে নিয়ে এল। ফট্‌কি আপত্তি করে নাই। শুখনরামকে দেখে তার সর্বাঙ্গ সংকুচিত হয়ে ওঠে, কিন্তু তার অনেক টাকা, অনেক সম্পদ, অনেক সম্মান। তাই আস্বাদ করবার জন্য সে এসেছে। একই রাত্রে শুখনরাম এবং শুখনরামের ছেলে, দু-জনের কাছেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। প্রথম ছেলে। বাপ তখনও অন্দরে আসে নাই। তার পর বাপ। শুখনরামকে দেখে তার

কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রথমে ইচ্ছে হল না, সে ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। মনে হল, এ কি অত্যাচার! মনে হল, কি মনে হল সে তা বুঝতে পারলে না। শরীর মন দুই-ই ঘিনঘিন করে উঠল। কিন্তু কি করবে সে?

আজ সিঁড়ির কোণে নরসিংয়ের সঙ্গে দেখা। নরসিংয়ের ডাক তার মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। পাঞ্জাবীদের কাছে তাকে শুখনরাম বিক্রি করবে শুনে সে প্রথমটা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পরেই তার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠেছিল। ভয়! কিসের ভয়! চলবে দেশ থেকে দেশান্তরে? স্ফটিকের মালার মত আজ এর গলায় কাল তার গলায়। তবে ওই মোটরওয়ালা কি বলে সেটা তাকে শুনতে হবে। ওকে দেখে ফট্কির নেশা লাগছে।

সন্ধ্যাবেলা থেকেই সে জ্বর হয়েছে বলে শুয়ে ছিল। জ্বর শুনে তার আজ ডাক পড়ে নাই। গভীর রাত্রে সে উঠে এসেছে।

ফট্কিকে লুফে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকে মোমবাতি জ্বাললে সে। রাম: ঘুমচ্ছিল ফট্কি হেসে বললে—ও কে?

—আমার শালা।

—তোমার পরিবারের ভাই? আপন ভাই?

—হ্যাঁ।

হেসে ফট্কি লুটিয়ে বললে—বলে দেবে না নিজের বোনকে আমার কথা?

চমকে উঠল নরসিং। মনে পড়ে গেল জানকীর কাছে প্রতিজ্ঞার কথা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নরসিং বললে—বউ আমার বেঁচে নাই। তুমি বসো।

ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ফট্কি দু-হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুলের মালার মত বুকের উপর নিজেকে এলিয়ে দিলে। ফুলের মালা, কিন্তু আগুনের ফুল—নরসিংয়ের সর্বাঙ্গে উন্মত্ত জ্বালা ধরিয়ে দিলে; কিন্তু সে ছত্রীর ছেলে—প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে রইল। শুধু তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে। বড় মায়া হচ্ছে মেয়েটির উপর। শুধু মায়া—সুন্দর পাখি, ছোট্ট একটি হরিণ দেখে যেমন মায়া হয় তেমনি ধরনের মায়া। তার বেশী কিছু নয়। সমস্ত রাত্রি মেয়েটা আদরিণীর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু নরসিং শুধু তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলে মাত্র। আর আফসোসও করলে, কেন তারে সে হট করে একটা ঝোঁকের মাথায় আসতে বলেছিল সিঁড়ির কোণে! জানকীর কাছে দেওয়া কসম মনে পড়ছে তার।

মোটর-ড্রাইভার হলেও সে ছত্রীর ছেলে। কসম তাকে রাখতেই হবে। কঠোর সংযমে সে নিজেকে বাঁধলে। এ বিষয়ে তার অভ্যাসও আছে। মেয়েদের নিয়ে সে আমোদ করে, মাখামাখি করে কিন্তু ব্যভিচার করে না। ফট্‌কি বকে গেল অনর্গল। সে বলে গেল তার জীবনের বথা। নরসিং ভাবলে আর ফট্‌কির কথা শুনলে।

গভীর রাত্রের অন্ধকারে ফট্‌কির লজ্জা নাই, ভয় নাই; পিশাচী বল সে পিশাচী, প্রেতিনী বল সে প্রেতিনী—অকুণ্ঠ মুখরতার সঙ্গে সে সব বলে গেল। ভোরের শুকতারা দেখা দিল আকাশে। নিতাই বাইরে থেকে ডাকলে—গুরুজী ভুল্‌কো তারা উঠেছে আকাশে।

নরসিং সস্নেহে বললে—চল, তোমাকে তুলে দিই বারান্দায়। রাত শেষ হয়ে এল।

তাকে বুকের উপর রেখে উপভোগ না করে কেউ বিদায় দেয় এ ফট্‌কির কাছে নূতন। সে এক মুহূর্তে কেমন হয়ে গেল। নরসিংয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে সে হঠাৎ কেঁদে ফেললে।

নরসিং সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে; মুখে তার বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল।

ফট্‌কি বললে—আমাকে নিয়ে তুমি পালিয়ে চল এখান থেকে।

নরসিং আবার তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—আজ তুমি যাও, আমি ভেবে দেখি। কাল—কাল তোমাকে জানাব।

ফট্‌কি বললে—না না। তোমাকে ছেড়ে—না না।

নরসিং বললে—না নয়। কাল, কাল। আজ যাও তুমি। আর বেরিয়ে আসতে হলে চোরের মত নয়; কাল ভেবে দেখে যা হয় ব্যবস্থা করব আমি।

দশ

ওই মুখরা মেয়েটার সংস্পর্শে এসে নরসিং যেন কেমন হয়ে গেল। অতি মাত্রায় বিষণ্ণ এবং স্তব্ধ গম্ভীর।

জানকীর কাছে তার গায়ে হাত দিয়ে কসম খেয়েছিল। জানকী তাকে শপথ করিয়েছিল—যদি ইচ্ছে হয় তুমি আরও একটা ছুটো বিয়ে কর। কিন্তু

ওই সব খারাপ মেয়েকে নিয়ে পাপ করতে পাবে না তুমি। নরসিং কসম খেয়েছিল। সে শপথ সে বিচিত্র উপায়ে রক্ষা করে। মধ্যে মধ্যে তার জীবনে স্বৈরিণী নারী আকস্মিকভাবে আসে! মদ খেয়ে দিল্ যখন দরিয়ার মত উথলে ওঠে তখন নিকটে যে এসে দাঁড়ায় তাকে সে টেনে নেয়; খুশীমেজাজের ঢেউয়ের সাপটাকে বারকয়েক লোফালুফি করে আবার তাকে কৌতুকভরে কিনারায় ডাঙার উপর ফেলে দিয়ে সরে যায়। কিন্তু এমনভাবে গম্ভীর কখনও হয় না। নেশার ঝড়ের হাওয়া যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সমানে উতলাও থাকে। হা-হা করে হাসে। অশ্লীল কৌতুক রসিকতায় মতোয়ারা হয়ে থাকে। নেশা কাটলে স্বাভাবিক অবস্থা। অনুশোচনা নাই আবার আফসোসও করে না। সহজ মানুষ সকালে উঠে চা খেয়ে আপনার কাজে লেগে যায়। মোটরে স্টার্ট দিয়ে ইঞ্জিনে রেস দিয়ে লতিয়ে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দেয়।

গাড়ি ছোটে—নরসিং মধ্যে মধ্যে বিগত রাত্রির ঘটনা নিয়ে ইঙ্গিতে রসিকতা করে নিতাইয়ের সঙ্গে। কখনও কখনও নিতাই অনুযোগ করে—আর গুরুজী! আপনার কথা আপনাকেই ভাল। সিদ্ধপুরুষমশাই আপনি দিষ্টিভোজনেই খুশী!

নরসিং হা-হা করে হাসে। বলে—ভাগ্ বেটা, হাড়ী কোথাকার। অনেক সময় গম্ভীর হয়ে যায়, বলে—ওরে, যে ছত্রীর বাতের ঠিক নাই তার জাতের ঠিক নাই। সে কখনও ছত্রী নয়।

পথে দ্রুতধাবমান গাড়িতে বসে দু-পাশের রাহীদের মধ্যে হঠাৎ কোন সুন্দরী তরুণীকে দেখে ঠিক তারই কয়েক মুহূর্ত পরেই সে হেসে ইশারা করে নিতাইকে ডাকে—নিতাই।

সেই মানুষের পক্ষে এটা একটা প্রত্যক্ষ পরিবর্তন। নিতাই কিন্তু একটু খুশী হয়ে উঠল, গুরুজীর মনে মেয়েটা রঙ ধরিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে।

নিতাই তাকে প্রায়ই অনুরোধ করে—এইবার সাদী করে ফেলান গুরুজী। রাম তার দাদাবাবুর জন্যে আন্তরিক দুঃখ অনুভব করে। মাঝে মাঝে সেও অনুরোধ জানায়।

গির্‌বরজা থেকে তার বাপও কয়েকবার পত্র দিয়েছে।

নরসিংয়ের কিন্তু ভাল লাগে না। কেন ভাল লাগে না তার কারণটা খুব স্পষ্ট নয় তার কাছে। জানকীকে সে খুবই ভালবাসত তাতে কোনই সন্দেহ নাই, তবে তার জন্যে যে সে আজীবন অবিবাহিত থাকতে চায় তাও ঠিক নয়।

সে বলে—দূর, দূর! যেমন তেমন একটা পরিবার হলেই হল নাকি?

ইমামবাজারে, রেলজংশনে, সদর শহরে শিক্ষিত ভদ্রবাড়ির মেয়েদের দেখে তার মনে হয়, তাদের গিবৃবরজায় কি ও-অঞ্চলে তাদের জাতের মধ্যে এমন মেয়ে একটিও পাওয়া যায় না। তার আফসোস হয়।

আসলে তার রুচি তার অজ্ঞাতসারে পালটে গিয়েছে। এই রুচির পরিবর্তন তাকে নারীসঙ্গভোগে তার এই বিচিত্র অর্ধ নির্লিপ্ত পদ্ধতির অভ্যাস গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

কাল রাত্রে ফ্‌টকির আবির্ভাবে তার অভ্যাস সত্যিই নাড়া খেয়েছে। ফট্‌কির রূপ, তার দেহের কোমলতা, জরোত্তপ্তার মত উষ্ণ স্পর্শ নরসিংয়ের নূতন রুচিতে—মুগ্ধ দৃষ্টিতেও মোহের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে, তার দেহের প্রতি জীবকোষে-কোষে উচ্ছ্বাস তুলতে চেয়েছে। নরসিং বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করেছে—মনের মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব উঠেছিল।

মনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল জান্‌কী। বাইরে ছিল ফট্‌কি। দু-জনের মধ্যে যেন একটা লড়াই চলেছে। এখনও সে লড়াই চলেছে।

নরসিং হঠাৎ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। আশ্চর্য—জান্‌কী তো নয়—জান্‌কীর জায়গায় যে দাঁড়িয়ে আছে, সে যে নীলিমা—জোসেফের বোন মেরী নীলিমা।

সে চঞ্চল হয়ে উঠল।

অল্প দূরে বসে নিতাই অলসভাবে বিড়ি টানছিল, সে চকিত হয়ে নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—গুরুজী?

নরসিং এবার তার দিকে ফিরে তাকালে।

—কিছু বলছেন?

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নরসিং উঠে দাঁড়াল। বললে—ওঠ। গাড়িখানাকে খুলে ফেলতে হবে। কি কি পার্টস বদলাতে হবে ভাল করে দেখে নোঃ।

—সব পাবেন এখানে?

—না পেলে কলকাতা যাব।

নিতাই উদার লোক, সে বললে—এবার রামকে নিয়ে যান। ওকে কলকাতাটা দেখিয়ে নিয়ে আসুন। হঠাৎ হি-হি করে হেসে বলে উঠল—ছেড়ে দেবেন একদিন হাড়কাটা গলির ভেতর সন্‌জেবেলা।

এখানকার মোটর পার্টস সাপ্লাইয়ের দোকানটা নেহাত বাজে। প্রায়

—না।

—কাহে?

—লাইসেন্স হুয়া নেই।

—ও-হোঃ! ঠিক বাত। একটু চুপ করে থেকে রামেশ্বর হেসে বললে—আজ সামকো আইয়েগা তো?

—না। সংক্ষেপে জবাব দিয়ে নরসিং টেবিলের ওপর নিজের জিনিসের ফর্দটা রেখে সেইটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে।

রামেশ্বরও ঝুঁকে পড়ল টেবিলের এক কোণে হাত রেখে।—কি ওটা? পার্টস কিনবেন বুঝি?

ফর্দটা গুটিয়ে নিয়ে নরসিং বললে—হ্যাঁ।

মৃদুস্বরে রামেশ্বর বললে—আমাকে দেখাবেন। খোড়াগুড়ি কিছু আমি দিতে পারব।

নরসিং তার দিকে চেয়ে হাসলে। সে জানে। হাজার কড়া হিসাবের মধ্যেও ড্রাইভারেরা কিছু কিছু পার্টস চুরি করে। ইমামবাজারে বাবুদের বাড়িতে যখন ড্রাইভারি করত—তখন এ কাজ সেও করেছে। কিন্তু এই লোকটির কাছে জিনিস কিনতে তার ইচ্ছা হল না। প্রথম দিন থেকেই লোকটাকে তার ভাল লাগেনি। তার ওপর কাল যা ওর পরিচয় নরসিং পেয়েছে তাতে ওর ওপর দিল্ পর্যন্ত চটে গিয়েছে। নরসিং কোন উত্তর দিলে না।

রামেশ্বর নরসিংয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে—সস্তা হবে।

নরসিং এবার বললে—দেখি। এখানকার যা গতিক তাতে কলকাতাই হয়তো যেতে হবে।

রামেশ্বর একটু চুপ করে হেসে বললে—আচ্ছা, রাম রাম। বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। খালি মোটর-বাসটায় বসে স্টার্ট দিয়ে সেখানাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভারের সীটের পাশে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে পাগলা হেঁকে উঠল—চল্ রে আমার ময়ূরপঙ্খী লা—খ্রিষ্টানপাড়ার দীঘির ঘাটে চল্! খ্রিষ্টানপাড়া দীঘির পাড়ে যাবি—নীল জল খাবি রে মানিক, সাধ মিটিয়ে নীল জল খাবি। নীল জল—নীল জল, নীল জল খেতে চলল ময়ূরপঙ্খী।

পিছন থেকে দোকানের বাবুটি চীৎকার করে উঠল—এই, এই, এই! কিন্তু মোটর-বাসখানা বেরিয়ে চলে গেল, বোধ হয় শুনতে পেল না। বাবুটি

দোকানের চাকরটাকে বললে—এরা একটা হাঙ্গামা না করে ছাড়বে না। বার বার বারণ করে দিয়েছে ক্রীশ্চান পাড়ার দীঘিতে যাবি না। জোসেফ এস-ডি-ওর ড্রাইভার—তার ওপর পাদরীসাহেবেরা সুদ্ধ যদি জানতে পারে তবে খ্রি ওয়ার্ল্ড—তিন ভুবন দেখিয়ে দেবে।

চাকরটা বললে—কিছুদিন তো যায় না ওদিকে। আজ আবার দেখছি হঠাৎ ভূত চেপে গিয়েছে ঘাড়ে।

নরসিংয়ের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। নীলিমাকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছে আগে থেকেই, ব্যাপারটা নিয়ে খানিকটা জানাজানিও হয়েছিল, হয়তো জোসেফ সার্ভিসের আপিসে জানিয়েছিল। এস-ডি-ওর কানে তুলবে, পাদরীসাহেবদের জানাবে—একথা বলেছিল। যার ফলে রামেশ্বর-পাগলার দল ওদিকে আর যাচ্ছিল না। আজ যে গেল সেটা নরসিংকে খোঁচা দিয়ে তার ওপর আক্রোশবশেই—নীল ফুল হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল ক্রীশ্চানপাড়ার দীঘির ঘাটে।

শয়তান! ভাইবেরাদারের মা-বহিনের ইজ্জত যে রাখতে জানে না—সে পুরা শয়তান।

বাবুটি এসে ঘরে ঢুকল। বললে—ফর্দটা রেখে যান। আজই আমি হেড অফিসে বাসের মারফতে পাঠিয়ে দোব; দু-তিন দিনের মধ্যে মাল পেয়ে যাবেন।

নরসিং বললে—আগে দাম করে আমাকে দিতে হবে। টাকা বুঝে যদি শাদসাদ দিতে হয়—দিয়ে অর্ডার দোব। নরসিংয়ের মনের কথা হল—সে এখানকার দাম দেখে কলকাতা যাওয়ার কথা বিবেচনা করবে। কলকাতায় তার জানাশুনা দোকান আছে, লোক আছে, যাদের মারফৎ—নামে সেকেণ্ড হাণ্ড কাজে প্রায় নূতন জিনিস—সস্তাদরে মেলে। দামের তফাতটা সে হিসেব করে দেখবে। তেমন বেশী তফাত না হলে সে কলকাতা যেতে চায় না। এখানে জিনিস কিনে একটা কারবারের সম্বন্ধ পাতাতে চায়। এদের সঙ্গে মুখ রাখতেই হবে না রাখলে চলবে না। মনে পড়ে ইমামবাজারের জেলার সদর শহরের সব চেয়ে বড় মোটর সার্ভিসের মালিক—মোটর পার্টসের দোকানের মালিক বুধাবাবুর কথা। বুধাবাবু এক মুঠোয় রাখেন জেলার হাকিমদের—অন্য মুঠোয় রাখেন শহরের গুণ্ডা বদমায়েশদের; বড় বড় বাবুলোক—যাদের মোটর আছে তারাও থাকে তাঁর হাকিম-ধরে-রাখা মুঠোর

মধ্যে। ফলে যত ড্রাইভার ট্যাক্সিওয়ালা ক্লীনার কণ্ডাক্টার বুধাবাবুর কাছে সার্কাসের পোষমানা বাঘের মত থাকে। দাঁত নখ বার করতে চেষ্টা করলেই বুধাবাবু হুঁশিয়ারির সঙ্গে আন্দাজ করে কখন চালান হাকিমী মুঠোর ঘুষি, কখন মারেন গুণ্ডাধরা মুঠোর রদ্দা। কখনও দুই মুঠোই চালিয়ে দেন একসঙ্গে। এখানকার দোকানের মালিক থাকে জেলার সদর শহরে। তাকে নরসিং জানে না—কিন্তু এটুকু সে জানে যে, এসব কারবারের কারবারীরা সবাই প্রায় বুধাবাবু। খানিকটা কম—আর খানিকটা বেশী। বড় ভাই আর ছোট ভাই। সহোদর নয়, মাসতুতো ভাই। এদের স্বপক্ষে আনতে না পারলে সার্ভিস চালানো কঠিন হবে। হাকিম মুঠোর মধ্যে থাকলে লাইসেন্স মঞ্জুরীতে প্যাঁচ কষবে। হয়তো নিজেরাই দিয়ে দেবে একখানা গাড়ি। কিংবা গুণ্ডা দিয়ে ছুতোনাতা করে একটা হুজ্জত বাধিয়ে দেবে। কাজ কি? বিশ ত্রিশ কি আরও পাঁচ দশ টাকা যদি বেশীই লাগে তো লাগুক। হাল-চাল যখন খারাপ তখন ও টাকাটাকে গুনগারি মনে করলে চলবে না। মালিকের সঙ্গে আলাপটা বেশ জমিয়ে নিতে হবে প্রথম থেকেই। মালিক অবশ্যই বড়লোক—তার সঙ্গে নরসিংয়ের ঠিক দোস্তি হওয়া সম্ভবপর নয়, কিন্তু তা বলে ওদের বাস সার্ভিসের ড্রাইভারদেরও সমান নয় সে। সে একখানা ট্যাক্সির মালিক—দোকানের খরিদ্দার—সুতরাং তাদের চেয়ে বেশী খাতির তার প্রাপ্য এবং সে তা পাবেও। তাছাড়া এ জেলায় তার আরও একটা খাতির আছে। গিরবাজার ছত্রীবাড়ির ছেলে সে। মালিকের সঙ্গে আলাপ জমে গেলে ওই রামেশ্বরোয়া পর্যন্ত খানিকটা কায়দায় আসবে। মন সে স্থির করে ফেললে এই মুহূর্তে। তাই যাবে সে। আজই। সে উঠে পড়ল। নিতাইকে গাড়িটা সাফ করবার জন্য—মেরামতের জন্য খুলে ফেলতে বলেছে। সে আবার কতটা কি করে ফেলেছে এর মধ্যে কে জানে?

—আচ্ছা নমস্কার, বাবুসাহেব! বেরিয়ে পড়ল সে। এতক্ষণ পরে সে সহজ হয়ে উঠল। শীতকালের ভোরে মোটরের ইঞ্জিন যেমন ঠাণ্ডা মেরে যায়, কিছুতেই স্টার্ট নেয় না—তেমনি অবস্থা গিয়েছে তার এতক্ষণ। এইবার স্টার্ট নিয়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে হনহন করে চলল সে।

আটটা বাজে। শহরের বাজার হাট এরই মধ্যে জমে উঠেছে। চায়ের দোকানগুলোর আসর জমে উঠে এবার ভাঙতে শুরু করেছে। একটা দোকানে সে ঢুকল। দোকানটার সামনেই চৌমাথা; একটু দূরে মিউনিসিপ্যালিটির

বাজার। বাজারের আধ রশি পূর্বদিকে ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা। বাজারের সামনে গাড়িগুলো এসে দাঁড়িয়েছে। দু-তিনখানা চৌমাথা পর্যন্ত এগিয়ে এসে ভাড়া খুঁজছে। নরসিংয়ের চায়ের তৃষ্ণাটা প্রবল নয়, গাড়োয়ানদের হালচাল দেখবার জন্য সে দোকানটায় ঢুকল। চারখানা গরম সিঙাড়া আর এক কাপ চা নিয়ে সে বসল। আজ ওদের হাঁকডাক খুব জোর।

—পাঁচমতি বাবু, পাঁচমতি। ভাড়া এক আনা কমল বাবু আজ থেকে। সাত আনা সীট। সাত আনা।

একজন পানওয়ালা মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললে—কি রে সোভান! একদিনে ঘোল খেয়ে গেলি? কমিয়ে দিলি এক আনা? সোভন বেশ আস্ফালন করেই উত্তর দিলে—হাঁ। দরকার হোবে তো আউর ভি কমাবে। দু-আনা সীট চালাবে। হাঁ।

—তার পর?

—তার পর শালা ভাগু।

সোভানের পিছনের গাড়ির কোচোয়ান বলে উঠল—সাবাড় করে দিব শালাকে শেষ পর্যন্ত। বারোখানা গাড়িতে কম-সে-কম তিরিশ আদমি আমরা আছি—যাবে ফাঁসি এক আদমি! বাস্‌। লোকটার মুখের দিকে চেয়ে নরসিংয়ের মনে হল—লোকটা সত্যিই খুন করতে পারে।

সোভন বললে—হাঁ। তা না তো কি? মোটর সারবিস করে আমাদের অত বড় রুটির পথটা মেরে দিলে। শহরের মাঠ থেকে শ্যামনগর—পঁচিশ তিরিশখানা গাড়ি খাটত, ঘোড়ার গাড়ির সার লেগে যেত। এক একখানা গাড়ির চারটে করে ঘোড়া লাগত। একটা খেপ মারলে কম-সে-কম—চারটে টাকা রোজগার। সোকালে একবার যাও—দিন—এসো—বিকেলে একবার যাও—এসো—বাস্‌। চারটে টিরিপে চার-চারে ষোল টাকা—শালা সিবিল সারজেনের ফি। সে পথ মেরে দিলে। তা বলি—লে রে বাবা লে। তোদেরই রাজত্বি কোম্পানির থাকল—আংরেজের কল আনল শহরের শেঠজী, আমুক। মেরে দিলে গরীবের রুটি। দিক। আঠারো-উনিশখানা গাড়ি পেটের দায়ে ভাগল। আমরা শালা দশ-বারোখানা কোনও রকমে দিন গুজরান করছিলাম—আবার এল মোটর! দিব শালাকে এবার জানে মেরে।

নরসিং দোকান থেকে বেরিয়ে এল। তাকে দেখে সোভান থমকে গেল। পাশের সেই কোচোয়ানকে ইশারা করে দেখিয়ে দিল। নরসিং দেখলে, কিন্তু

ভ্রূক্ষেপ করলে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে চলে এল।

দুনিয়ার যত গোলমাল ওই পেটের রুটি নিয়ে। ওরা যে চটে উঠেছে—খুন করবে বলছে, তার জন্যে নরসিং ওদের ওপর খুব রাগ করতে পারলে না। কিন্তু সে-ই বা কি করবে? তারও রুটি চাই। তা ছাড়া দুনিয়ার হালই এই। ওই ইমামবাজার থেকে রেলজংশন পর্যন্ত সে-আমলে কারবার ছিল গরুর গাড়ির। টাপরবাঁধা পঞ্চাশখানা গরুর গাড়ি হাজির থাকত জংশন ইষ্টিশানে। তার পর হল ঘোড়ার গাড়ী। তারপর পড়ল রেল-লাইন, ঘোড়ার গাড়িকে পালাতে হল। তার পর হয়েছে মোটর-বাস। মোটরের ক্ষমতা আছে—সে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে, টিকে আছে। রাস্তা ভাল হলে ট্রেনের চেয়ে জোরে ছুটতে পারে সে, ভাল মোটর হলে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের চেয়েও আরাম দিতে পারে সে। ইমামবাজারের বাবুদের একবার শখ হয়েছিল কলকাতায় প্রাইভেট ট্যাক্সির কারবার করবার। ট্যাক্সির মিটার থাকত না। বড় বড় লোকেরা দিন ঠিক করে ভাড়া নিত। আমেরিকা থেকে টুরিস্ট আসার ধুম পড়েছিল তখন। তাদের এন্তার পয়সা—দিলদরিয়া মেজাজ—মোটা মোটা ভাড়া দিত তারা। তাদের জন্যে বাবুরা একখানা মাস্টার বুইক গাড়ি কিনেছিল। সে গাড়ি নরসিং চালিয়েছে। তার আরাম কি—ভেতরের কায়দা কি! তারই জোরে মোটর টিকে আছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মোটরের সঙ্গে পাল্লায় হার মেনে যদি ঘোড়ার গাড়িকে পালাতে হয় তবে পালাতে হবে তার আর সে কি করবে! আর তাকে না হয় ডাণ্ডা মেরে খুনই করে ফেললি—কিন্তু তাতে নরসিংই মরবে, মোটর মরবে না। নরসিংকে খুন করার খবর রটবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে মোটরের কারবারীদের চোখ পড়বে এই পথের উপর। একখানার জায়গায় দু-চারখানা ট্যাক্সি এসে জুটবে। তবে হ্যাঁ, ওদেরও এটা রুটির ঘর—তাতে ভাগীদার জুটলে এদের দুঃখ হবারই কথা, কেউ-কেউ যদি ক্ষেপেই ওঠে তাতেও দোষ দিতে পারে না নরসিং। উঠুক ক্ষেপে—সে ক্ষ্যাপামির ধাক্কা সইতে হবে তাকে। তার জন্য ভয় পেলে চলবে না। ভয় পেলেই হার নির্ঘাত। সে জানে নরসিং। তবে মগজ গরম করলে হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ চালিয়ে নিতে হবে। ডাণ্ডা চালালে ডাণ্ডা রুখতে হবে, উল্টে ডাণ্ডা চালালে চলবে না। ছত্রীর ছেলে সে, তার বংশে অবশ্য ডাণ্ডা খেয়ে কেউ চুপ করে থাকে না; এক ডাণ্ডা খেলে দু-ডাণ্ডা চালানোই তাদের স্বভাব। কিন্তু গিরবরজায় যা চলে বাইরের দুনিয়ার তা

আর চলে না ; গিরবরজা থেকে বেরিয়ে এসে অনেক ঘাটের জল খেয়ে অনেক নতুন আক্কেল তার হয়েছে। পারলে সে কোচোয়ানদের সঙ্গে একটা আপোস করবে। আপোস না হয়, চলুক লড়াই। কি করবে সে? ওদেরও রুটি চাই—তারও রুটি চাই। রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ির ঝগড়াতেই তো তুনিয়া সরগরম হয়ে রয়েছে সেই আদ্যিকাল থেকে।

গাড়িখানার সামনের সীটে শুয়ে নিতাইটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। গাছের ছায়ায় গাড়িখানাকে রেখে মিঠা ঝিরঝিরে সকালের হাওয়ায় সারারাত্রি জেগে, আরাম করছে উল্লুক। পরিষ্কার করা, কি কলকব্জা খুলে রাখা দূরে থাক্, বনেটটা উল্টে সেটা আর বন্ধ করবার খেয়াল পর্যন্ত হয় নাই! অন্য দিন হলে নরসিংয়ের রাগ হত। কিন্তু আজ মেজাজটাও অন্য রকম হয়ে রয়েছে, তার উপর সদর শহরে যাওয়ার মতলব করে ফিরেছে। গাড়িখানা খুলে ফেললে অনেক অসুবিধা হত, আবার এক বেলার ফেরে পড়তে হত। এতে তার সুবিধাই হয়েছে। কিন্তু রামা কই? সেটা গেল কোথায়?

রাম দাদাবাবুর জন্য বেরিয়েছে। সকালে উঠেই সে নিতাইয়ের কাছে গতরাত্রির তাজ্জবের গল্প আগাগোড়া শুনেছে। নিতাই তার উপর চড়া চড়া রঙ চড়িয়েছিল। বলেছিল, বেহুঁশ হয়ে ঘুমুসি উল্লুক বুড়বক্ কাঁহাকা—দেখতে পেলি না—সে কি তাজ্জবের কাণ্ড। শালা আকাশ থেকে নেমে এল এক পরী! আমি দেখালাম গুরুজীকে পরী নামছে। বাস্, গুরুজী গিয়ে তুই হাত পেতে লুফে নিলে। পরী একেবারে তু-হাতে জড়িয়ে ধরলে গুরুজীর গলা। ভোরবেলা বলে—যাব না আমি, থাকব তোমার কাছে। কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলে। গুরুজী অনেক বুঝিয়ে বললে—আজকের মত যাও। কাল সব ঠিক করব। তবে যায়।

রামের চোখ তুটো বড় হয়ে উঠেছিল, হাঁ করে শুনছিল কথা, নিতাইয়ের কথা শেষ হলে তার বাস্তবজ্ঞানের সাধ্যমত বিচার করে পরী নেমে আসাটা নিতান্তই অসম্ভব—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে অনুমান করলে, নিতাই তাকে ঠাট্টা করছে। সে বিজ্ঞ রসিকের মত বললে—ভাগ্।

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে হাত দিয়ে শপথ করলে—মাইরি বলছি, তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি। এরও উপর গুরুত্ব আরোপ করবার জন্য সে বললে—মা-কালীর দিব্যি, ওপর থেকে নেমে এল আর গুরুজী হাত পেতে

লুফে নিলে!

মা-কালীর শপথে রামের সকল অবিশ্বাস সংকুচিত হয়ে গেল। বাস্তব বিচারবুদ্ধি পঙ্গু হয়ে গেল, সে স্তব্ধ হয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চেয়ে রইল।

নিতাই বললে—হ্যাঁ, পরী বটে।

রামা প্রশ্ন করলে—আজ আবার আসবে?

—কথা তো বটে। তারপর নিতাই হাসতে হাসতে বললে—পরীকে অবিশ্যি তুইও দেখেছিস। চল, ওই গাড়িতে বসে সব বলব।

সমস্ত কথা শুনে রাম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। নিতাই বললে, কি, তুই যে ভিজে-দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে গেলি রে! এ কথারও কোন জবাব দিলে না রাম। নিতাইয়ের মনে কিন্তু এখনও রঙ ধরে রয়েছে, সে বললে—মেয়েটা কিন্তুক গুরুজীর মনে রঙ ধরাচ্ছে। সে হাসতে লাগল।

রাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। নিতাইয়ের গল্পের প্রথম দিকটায় ওই শান্ত সুন্দর নরম মেয়েটার অকল্পিত দুঃসাহসিক অভিসারের কথা শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষের দিকটার বিবরণ শুনে সে স্তিমিত হয়ে পড়ল। তার দিদির মৃত্যুর পর নরসিংয়ের নারী সম্পর্কে এই রহস্যময় নিরাসক্তি তাকে অত্যন্ত দুঃখ দেয়। নরসিং তার কাছে প্রায় দেবতা। ছেলেবেলায় তাদের মা মরেছিল, বাপ ছিল দরিদ্র। তার পিসীমা—ধরণী রায়ের স্ত্রী, তাদের ভাইবোনকে নিয়ে এসেছিল নরসিংকে উচ্ছেদ করবার জন্য। পিসি বার বার তাকে বলত—পিসের কাছে যাবি, পিসের কথা শুনবি, মেজাজ দেখে আদর করবি, কোলে চাপবি। বুঝেছিস?

হাঁ করে তাকিয়ে থাকত রাম! সে কথাটা বুঝতে পারত না।

পিসি বুঝিয়ে বলত--তোকে যখন আদর করবে তখন বলবি, তুমি নরসিংকে বেশী ভালবাস। বুঝলি?

পিসি হিংসার বীজ বপন করতে চেয়েছিল, সে বীজ থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে বার হলে সে হয়তো বিষবৃক্ষেই পরিণত হত। কিন্তু সে বীজ অঙ্কুরিত হতে পায় নি, ধরণী রায় নরসিংকে ইমামবাড়ারের বাবুদের বাড়িতে রেখে এল। শিশু রাম এমন কোন হেতুই পেলে না যার জন্য সে নরসিংকে হিংসা করতে পারে! নরসিং এ বাড়ির সকল আদর কেড়ে চলে গেল যখন, তখন নরসিং দাদাকে বেশী ভালবাস, বেশী আদর কর--এ বলে পিসের কাছে অভিযোগ

করবার কোন কারণই দেখতে পেল না। বরং উল্টো হল। বয়স্ক ছেলেদের অনুকরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে সে নরসিংয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। অন্যদিকে পিসিই হয়ে উঠল ভয়ের মানুষ, সকল বিদ্রূপতা জমে উঠল তার বিরুদ্ধে। পিসিরও দোষ নাই। বন্ধ্যাজীবনের অভ্যাসে জানকী এবং রামের অস্তিত্ব তার কাছে উপদ্রবের সামিল হয়ে উঠল। শিশুকে তার ভাল লাগত না এ নয়, কিন্তু তারা কলরব করলে সে তার মাথায় গিয়ে লাগত, কাঁদলে তো সে প্রায় ক্ষেপে যেত, ছুটোছুটি করলে অসহ্য মনে হত, খেলার সামগ্রী—ভাঙা খোলা ঘুটিং নুড়িপাথর ঘাম-পাতা আগাছার ফল বাখারির টুকরো ঘরে এনে জমা করত, ঘরদোর ময়লা করত, সে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না নরসিংয়ের মামী—রামের পিসি। আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল প্রথম দিনই। মায়ের মতই স্নেহে রামকে নিজের ছেলের মত আপন করে নেবার আগ্রহে পিসি রামকে নিজের কাছে নিয়ে রাত্রে শুয়েছিল। জানকীর বিছানা করেছিল পাশেই একটু তফাতে। রাম ঘুমিয়ে গিয়েছিল, পিসি শুতে এল একটু রাত্রে। বিছানায় বসে কিন্তু তার গা ঘিনঘিন ক'রে উঠল। হাতের কেরোসিনের ডিবের আলোটা পড়েছিল রামের মুখের উপর। পিসির চোখে পড়ল রামের মুখের এক পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। অসন্তুষ্ট মনে মুখ বিকৃত ক'রে খানিকটা ভেবে সে রামের দিকে পিছন ফিরে শুল। মধ্যরাত্রে রাম ঘুমের ঘোরে কুণ্ডলী পাকিয়ে মোড়া হাঁটু দুটো পিসির পিঠে প্রায় গুঁজে দিলে। ধড়মড় করে উঠে পিসি ঠেলে সরিয়ে দিলে রামকে। কিন্তু আধঘণ্টা পরে আবার তাই। আবার সরিয়ে দিলে পিসি। আবার মিনিট দশেকের মধ্যে রাম হাঁটুর গুঁতো দিয়ে ফিরে শুল। এবার পিসির আর সহ্য হল না। সে উঠে শিয়রের পাখা নিয়ে রামের অবাধ্য হাঁটু দুটোর উপর বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে। রাম চীৎকার করে কেঁদে জেগে উঠে বসল। পিসি আরও ঘা কয়েক পিঠে বসিয়ে দিয়ে বললে—চিল্লাবি তো তোর খাল তুলে দিব।

থেমে গেল রাম ভয়ে, সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল পিসির দিকে। পিসি বললে—ভাগ ভাগ্ আমার বিছানা থেকে। ভাগ্।

রাম বুঝতে পারলে না—এই রাত্রে বিছানা ছেড়ে সে কোথায় ভাগ্‌বে! পাশের বিছানায় দিদি জানকী উঠে বসেছিল এই চীৎকার-ঝঙ্কারে, ভয়-বিহ্বল চোখে তাকিয়ে সে সব দেখেছিল। পিসি হঠাৎ উঠে গিয়ে তার পিঠে দু ঘা

পাখার ডাঁট চালিয়ে বললে—হারামজাদী ট্যারা চোখ নিয়ে বসে দেখছে দেখ। নিয়ে যা ভাইকে, নিয়ে যা বলছি। তার পর কপাল চাপড়ে বললে—আমার নসিব। বে-তরিবৎ বে-আক্কেল বে-সরমী দুটো বান্দরের বাচ্চা আমার কপালে জুটেছে! নিয়ে যা ভাইকে তোর বিছানায়, তোর ভায়ের হাঁটুর গুঁতো তুই খাবি না তো কি আমি খাব?

সেই রাত্রেই পিসিকে তার ভয় হয়ে গেল। বাঘ তখনও পর্যন্ত রাম দেখে নাই, দেখেছিল ক্ষ্যাপাকুকুর; দাত বের করে গোঁ-গোঁ শব্দ করে রাস্তার লোককে তেড়ে কামড়াতে সে নিজের চোখে দেখেছিল। পিসিকে দেখে তার তেমনি ভয় হত। পিসে ধরণী রায় গাঁজা খেয়ে ভাম হয়ে থাকত, ডাকবাংলায় বসে শনের দড়ি পাকাত, সে উপেক্ষাও করত না, আশ্রয়ও দিত না। পিসি মারলে পিসে সান্ত্বনা দিত, কিন্তু পিসিকে কিছু বলত না।

এরই মধ্যে শনিবার রবিবার আসত নরসিং। তার মামীকে বলত—নেকড়ানী। পিসির এই নামকরণের মধ্যেই রাম পেয়েছিল পিসির প্রতি নরসিংয়ের বিরূপতার পরিচয়। ওইটাই তাকে এবং জানকীকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। নরসিং বয়সে বড়, তা ছাড়া তার বড় বড় চোখ দুটোতে ছিল উগ্র দৃষ্টি, দেখে তারা বুঝতে পারত ওর তেজ আছে। নরসিংয়ের মামী রামের পিসি মধ্যে মধ্যে বলত—নরসিং ওয়ার আঁখ দেখো না, যেন গিলে খাবে। খুনখারাপি করা যে ওদের ঝাড়ের অভ্যেস। পিসির মুখে এই কথা শুনে নরসিংয়ের প্রতি ভক্তি তাদের বেড়ে গিয়েছিল। তারা ভাই বোন নরসিংকে দলপতি করে পিসির বিরুদ্ধে তাদের তিনজনকে একদলে মনে করত।

দিদি জানকী বেশী ভক্তি করত নরসিংকে—রামকে বলত—নরসিং ভাই বহুত এলেমদার লোক হবে। লিখাপঢ়ি শিখছে। কলম চালাবে, তলব পাবে মোটা।

নরসিংকে মধ্যে মধ্যে বলত—তুমার পুরানো কিতাবগুলি দিয়ো নরসিং ভাই, রামসিং পড়বে। পিসি ব্যবস্থা করেছিল রাম ঘরের গরুগুলোকে মাঠে ঘাস খাইয়ে নিয়ে আসবে, পিসের কাছে শনের দড়ি পাকানো শিখবে, ক্ষেত-খামার জমি-জেরাত যেটুকু আছে সে-সব দেখবে, জোয়ান বয়স হলেই পিসের ওই ইজ্জৎদার কাজ—ডাকবাংলার জমাদারদের কাম করবে। লোকে বলে—ডাকবাংলার নালী। ধরণী রায় ডাকবাংলার জমাদার! রায়ের স্ত্রী বলে—জামাদার সাহেব! রামের তাতে দুঃখ ছিল না। সে তাই গরু ঠেঙিয়ে

মাঠে মাঠে ঘুরত। সন্ধ্যাবেলা পিসে 'অ—আ—ক—খ' পড়াত। এমনি ভাবেই দিন কাটছিল, হঠাৎ কি হল। রাম আজ কিছু বুঝতে পারে না, তবে কিছু হয়েছিল। নরসিং এল সেদিন নতুন চাকরির তলব নিয়ে নেকড়ানীকে টাকা দিয়ে প্রণাম করতে। তার পর কখন চলে গেল। পরের দিন দিদি জান্‌কী তাকে পাঠালে নরসিংয়ের কাছে, বললে-- তুহার নরসিং দাদার কাছে যাবি। বলবি—দিদি বললে, গোটা রুপেয়ার আফিন্ কিনে দাও।

নরসিং তার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে বললে—বলবি সন্ধ্যের সময় আমি নিয়ে যাব।

সন্ধ্যের সময় গিয়ে নেকড়ানীকে বললে—মামী, জান্‌কীকে আমি বিয়ে করতে চাই। দেবে বিয়ে আমার সঙ্গে?

রাম কথাটা শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্ধকার মাঠে একলা আপন মনে নেচেছিল। কেয়াবাৎ হো! জয় ভগোয়ান, জয় শিরিরামজী!

নরসিংদাদা এবার তার সত্যিকার দাদা হল। এইটুকুতেই সে খুশী হয়েছিল। তার পর যখন নরসিং জান্‌কীকে নিয়ে ইমামবাজারে বাসা করলে এবং রামকেও সেখানে নিয়ে এল তখন সে খুশী হয়ে প্রায় পাগল হয়ে গেল। নরসিং তখনও কয়লার ডিপোতে কাজ করে। সে রামকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলে। রাম এই ব্যাপারটিতে তখন দাদাবাবুর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল। দিদি জান্‌কী বলত—বান্দর, মুরুখ কাঁহাকা! লিখাপঢ়ি শিখবি না তো কি কাম করবি? দেখ তো তোর দাদাবাবুকে। লিখাপঢ়ি শিখলে তবে না কয়লার হিসাব লিখে।

তার পর দাদাবাবু হল বাবুদের মোটর-ড্রাইভার। দাদাবাবু যখন ওই গাড়িটার সেই গোল চাক্কিটা ধরে বুনো শূয়োরের মত গোঙানি আওয়াজ ছেড়ে ছুটন্ত গাড়িখানাকে যেদিকে খুশি চালাত—দাদাবাবুর কেরামতি দেখে, এলেম দেখে অবাক হয়ে যেত! এখনও মনে হলে সে হাসে। সেও শিখেছে চালাতে, ওই গোল চাক্কিটা - স্টীয়ারিংটা ধরে সেও এখন ইচ্ছামত জোরে গাড়িটাকে ছাড়তে পারে।

তার পর বাবুদের মেজবাবু মারা গেল। নরসিং মাথায় হাত দিয়ে বসল। জান্‌কী তাকে বললে—তুমি নিজে গাড়ি করো। সে বার করে দিলে পাঁচশ টাকা। নরসিংয়ের তলব আর উপরি-পাওনার টাকা থেকে সে জমিয়েছিল

টাকাটা। নরসিং বুধাবাবুর কাছে কিনলে এই পুরনো গাড়িটা। জবরদস্ত পুরনো মডেলের গাড়ি।

রাম হল তখন কণ্ডাক্টার, টিকিট বেচে পয়সা নিত। নরসিংয়ের কাছে সে যেন কেনা-গোলাম হয়ে গেল। জোয়ান সে পুরো হয় নি, তবু ঘরে বসে দিদির আর দাদাবাবুর ভাত খেতে তার কেমন যেন লাগত। মোটরগাড়ির কণ্ডাক্টার হয়ে তার মনে হল, সে অনেক ইজ্জতের মানুষ হয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে মনে হত পিসির বাড়িতে থাকলে সে আজও মাঠে গরু চরিয়ে বেড়াত। দাদাবাবুর কাছে তলব নিয়ে সেও গিয়েছিল পিসির বাড়ি। নেকড়ানীকে টাকা দিয়ে সেও প্রণাম করেছিল। নেকড়ানী তাকে অনেক আদর করেছিল সেদিন। সেদিনটা সে কখনও ভুলবে না। ওই দিনটা তার সবচেয়ে বড় ইজ্জতের দিন, খাতিরের দিন। নেকড়ানীর সব গালিগালাজ অনাদর অবহেলার শোধ উঠে গিয়েছে ওই দিনে। আর সব চেয়ে দুঃখের দিন তার দিদির মৃত্যুর দিন। দিদি জানকী সন্তান-প্রসব করতে গিয়ে মরে গেল। আরে বাপ রে! দাদাবাবুর সেদিন কি চোখ!

দিদি মরে গেল। দাদাবাবু পাথরের মত সহ্য করলে—রাম ভেবেছিল—দাদাবাবু আবার সাদী করবে, নতুন বউ আসবে, সে বহুথারও তো ভাই আছে—সে হয়তো এসে গাড়ির কণ্ডাক্টার হবে। তবু দাদাবাবুকে পরণাম, হাজার হাজার পরণাম, দাদাবাবু তাকে কাম শিখিয়েছে—মানুষ করে দিয়েছে, কাম সে খুঁজে নেবে। দিদির মৃত্যু আজ বছর পার হয়ে গেল, তবু দাদাবাবু বিয়ে করলে না। দিদি জানকী নাই তবু দাদাবাবুর স্নেহ এতটুকু কমে নাই। তাই তো দাদাবাবু যখন মেয়েলোককে নিয়ে শুধু খেলা করে বিদায় দেন তখন তার দুঃখ হয়, ভয় হয়, দাদাবাবু সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

আজ নিতাই যখন বললে—মেয়েটা গুরুজীর মনে রঙ ধরাচ্ছে, তখন রামা কেমন অবাক হয়ে গেল। প্রথমেই খানিকটা দমে গেল। তবে এইবার দাদাবাবু বিয়ে করবে, নতুন বউ আসবে। যদি বউয়ের সঙ্গে বউয়ের ভাই আসে? এসে সে কি ফিরে যাবে? কিছুক্ষণ পরে মনে হল, ভাই যদি আসে তো আসুক। দাদাবাবুর ঘর হোক, সংসার হোক, ছেলেপুলে হোক। সে কাজ শিখেছে, জোয়ান বয়স, দুনিয়াতে কাজের কি অভাব।

নিতাই বনেটটা খুলে ভিতরটা দেখছিল। বললে—বসে ভাব লেগে গেল নাকি তোর? আয়—আয়। গুরুজী মোটরের দোকানে গিয়েছে পার্টসের

অর্ডার দিতে। বেবাক খুলে পুরনো রদ্দি যা আছে; পাল্টানোর হুকুম হয়ে গিয়েছে। আয়।

রাম নিতাইয়ের সঙ্গে কাজে লাগতেই যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল সাওজীর ছাদের আল্সের মাথার ওপর সেই মেয়ের মুখ। তার নেশা লেগে গেল। মেয়েটাকে কোনরকমে ইশারা করে ডাকবে সে, সাওজীর বাড়ি থেকে কোনরকমে বেরিয়ে আসতে বলবে। তার পর সে তার সঙ্গে দিদি সম্বন্ধ পাতাবে। বলবে—আজ থেকে তুমি ভাই আমার দিদি। বলবে—দিদি, তোমাকে ভাই দাদাবাবুর মনটিকে ভিজাতে হবে, ভুলাতে হবে। দাদাবাবুর কেমন আমাদের মন কত উঁচু দিল্, সে কথা তাকে বলবে। সে একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল; সেখান থেকে ফট্‌কির মুখ বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। এ ফট্‌কি দিনের ফট্‌কি। এ আর এক রকম মানুষ। বেড়ালের চোখ, বাঘের চোখ রাত্রে জলজল করে জলে, হাপরের আগুনের আঁচে লোহার টুকরো যেমন রাঙা টলটলে হয়ে বাহারের চেহারা ধরে, পদ্মপাতার উপরের জলের টোপার মত একটু দোলাতেই নাচে, রাত্রের স্পর্শ পেলেই ফট্‌কি তাই জলন্ত বাঘ-বেড়ালের চোখের মত জলজলে হয়ে ওঠে, হাপরের আঁচে গলন্ত লোহার দানার মত রাঙা টলটলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। আবার দিনের আলোর ছটা পেলেই বাঘের, বেড়ালের চোখের তারা যেমন গুটিয়ে লম্বা কালো দাঁড়ির মত ঠাণ্ডা ভালমানুষটির চেহারা নেয়, ঠাণ্ডা হলেই যেমন গলন্ত টলটলে লোহা শক্ত খটখটে কালো চেহারা নেয়—দিনের বেলায় ফট্‌কির চেহারাও তেমনি পাল্টে গিয়েছে, কপালের ওপর চুলের সীমানা পর্যন্ত ঘোমটা টেনে নীচের দিকে চোখ রেখে সে কাজ করে চলেছে। রাম নিতাইকে ডেকে ইশারা করে তাকে দেখালে।

নিতাই হাসলে, বললে—আয়, এখন কাজ কর্, রাত্রে দেখবি। আসবে, ঠিক আসবে।

রামের কিন্তু কাজের চেয়েও ওই দিকে মন টানছিল বেশী। গোপনে কাজ করার মধ্যে একটা নেশা আছে। সেই নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে তখন। সে বললে—ব'স্, আমি আসছি। ওর সঙ্গে 'দিদি' পাতিয়ে আসি।

নিতাই তাকে বারণ করলে—যাস্ নে। দাদাবাবু বকবে। কাজ রয়েছে, জরুরী কাজ।

রাম এ কথাও শুনলে না। সে তো দাদাবাবুর জন্যই চলেছে। যদিই

বকাবকি করে দাদাবাবু, সে তা সহ্য করবে। আর কাজ? কাজ তো হবেই। দু-দণ্ড আগে আর পরে। সে চলে গেল। নিতাই একটা বিড়ি ধরিয়ে এসে বসল সামনের সীটে। সারারাত্রি জাগরণের ফলে চোখ জ্বলছিল। চৈত্র মাসের সকালে গাছতলায় মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। সে শুয়ে পড়ল। তার পর ঘুম। সে ঘুম ভাঙল নরসিংয়ের ডাকে। রামা শূয়ার এখনও ফেরে নাই।

কাজকর্ম কিছু হয় নাই, এর জন্য নরসিং আজ বিরক্ত হল না। ভালই হয়েছে। গাড়ি খুলে রাখলে আজ আর সদর শহরে যাওয়া হত না। কাজের কথা না তুলে সে জিজ্ঞাসা করলে -রামা কই?

নিতাই একটু মাথা চুলকে বললে—গেল যে কোথা! বললে, এই আসছি। তার ভয় হচ্ছিল বেকুফ উল্লুক রামা আবার বাড়ির আশেপাশে ঘুর ঘুর করতে গিয়ে ধরা পড়ল নাকি? নইলে এতক্ষণ ফিরছে না কেন?

নরসিং বিরক্ত হল এবার, সে বেশ বুঝতে পারলে নিতাই তার কাছে আসল কথাটা লুকোচ্ছে। বিরক্ত হয়ে সে ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলে— কোথায় গেল বলতে ঢোক গিলছিস কেন?

নিতাই এবার না বলে পারলে না; বললে— ছাদে সে কাপড় মেলে দিচ্ছিল, তাকে দেখে—

—কে?

—কাল রাত্রের সেই।—হাসলে নিতাই।

ভুরু কুঁচকে নরসিং দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। কিছুক্ষণ আগে ওই ঘোড়ার গাড়ির কোচওয়ানদের কথা শুনে তার মনে হয়েছিল রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ির ঝগড়াতেই তো দুনিয়া সরগরম হয়ে রয়েছে সেই আদ্যিকাল থেকে। এখন মনে হল—রুটির ঝগড়ার সঙ্গে সমানে চলছে মেয়েলোকের মন নিয়ে কাড়াকাড়ির ঝগড়া। রামা ছুটেছে মেয়েটার মনের জন্য? জোয়ান হয়ে উঠেছে ছোঁড়াটা। নরসিং বললে—ওকে কড়কে দিতে হবে। এই বার রোগে ধরেছে শূয়ারকে।

নিতাই বললে, না না গুরুজী, সে বলে গেল—'দিদি' পাতিয়ে আসি ওর সঙ্গে, ব'স্ তুই। মুহূর্তে নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল জান্‌কীকে। তার মনের চিন্তা সব যেন এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইল।

নিতাই তাকে ডাকল—সিংজী! তার স্তব্ধ মূর্তি দেখে তাকে 'গুরুজী'

বলে ডাকতে তার ভরসা হল না।

নরসিং বললে—হ্যাঁ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে সচেতন হয়ে উঠল।

নিতাই প্রশ্ন করলে—কি রকম দাম দেখছেন এখানে? সব জিনিস মিলবে?

নরসিং বললে—ওদের হেড অফিসে যাব। গাড়ি খুলে ফেলিস নাই ভাল হয়েছে। সে গাড়িতে উঠে বসল। স্টিয়ারিংটার ওপর মাথা রেখে বললে—রামাটা—

নিতাই বললে—দেখব নাকি?

নরসিং চুপ করে রইল। মনের মধ্যে এখনও সব এলোমেলো হয়ে চলেছে।

নিতাই আবার বললে—সিংজী!

নরসিং বললে—হারামজাদা রামেশ্বর-পাগলা এরা আজ জোসেফদের পাড়ায় একটা গোলমাল করতে গিয়েছে। জোসেফের বোনের নাম নিয়ে নীল জল, নীল জল বলতে বলতে ওদের পাড়ার দীঘির পাড়ে গিয়েছে বাস ধুতে। বাইসাইকেল চড়ে কে আসছে? জোসেফ নয়?

নিতাই বললে—হ্যাঁ, সেই নবাবই বটে। নিতাই কিছুতেই ভুলতে পারে না—হাড়ীর ছেলে—তারই স্বজাতি স্বশ্রেণীর লোক হয়ে জোসেফ একটা মাতব্বর হয়েছে।

জোসেফ এসে তাদের গাড়ির কাছেই নামল। নেমে হেসে নমস্কার করে বললে—নমস্কার! ভাবি নাই আপনাকে ধরতে পারব। আজ গাড়ি বার করেন নাই?

নরসিং বললে—না, লাইসেন্স না হলে কি করে বার করব গাড়ি? আপনি বারণ করলেন কাল।

—ভাল হয়েছে। আমার গাড়ি'বিগড়েছে। গোটা দিন লাগবে সারতে। এ-দিকে সাহেবকে আজ সদর শহরে যাবার জরুরী তাগিদ এসেছে। সাহেব বলছিলেন বাসে সীট দেখতে। আমি বললাম একখানা ট্যাক্সি আছে। এসেছে এখানে ভাড়া নিয়ে। চলে যান সাহেবকে নিয়ে। যা ভাড়া দেয় নিয়ে নেবেন। লাইসেন্সের সুবিধে হবে।

নরসিং সজাগ হয়ে উঠে বসল। নিতাইকে বললে—স্টার্ট দে।

নিতাই বললে—রামাকে একবার দেখি।

নরসিং বললে—সে থাক্। স্টার্ট দে তুই।

জোসেফ বললে-একটু অপেক্ষা করুন। আমি আসছি বাড়ি

থেকে। নীলির কি দু'একটা বরাত আছে, শহরে কিনতে হবে। আমি আসবার সময় ফেলে এসেছি কাগজের টুকরাটা।

সে বাইসাইকেল হাঁকিয়ে চলে গেল।

নরসিংয়ের মনে হল—ভালই হল। জোসেফ বাড়ি গেল—যদি রামেশ্বররা বদমাইশি শুরু করে থাকে, তাহলে জোসেফ তার ব্যবস্থা করতে পারবে।

নিতাই বললে—যাই বলেন গুরুজী, হাড়ীর ছেলের এত বাড় ভাল নয়।

নরসিং বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে।

নিতাই বললে—হলেই বা খ্রীষ্টান। আপনাদের গাঁয়ের হাড়ীর ছেলে তো! আপনার সঙ্গে কথা কয় যেন ইয়ারকি মারে। বলে আবার—নমস্কার!

নরসিং কোন উত্তর দিলে না। সে ভাবছিল। অনেকক্ষণ ভেবেও সে জোসেফ এবং নীলিমার ব্যবহারকে উদ্ধত বা অপমানজনক মনে করতে পারলে না। জোসেফ তার অনেক উপকার করছে, নীলিমা মেয়েটি বড় ভাল। হোক হাড়ীর মেয়ে। ভদ্রলোকের মেয়ে আজ ওর কাছে হার মেনে যায়।

জোসেফ ফিরে এল। তার সঙ্গে নীলিমা। বাইসাইকেল ধরে হেঁটে নীলিমাকে সঙ্গে করে এল জোসেফ। চোখ মুখ তার থমথমে হয়ে উঠেছে। বললে—ভাগ্যে গিয়েছিলাম আমি। রামেশ্বর আর পাগলা আমাদের পাড়ায় দীঘিতে বাস ধুতে এসে—। সে থেমে গেল।

নরসিং বললে—হাঁ, আমার সামনে দিয়েই গেল চীৎকার করতে করতে, ক্রীশ্চান দীঘির জল খেতে চলল গাড়ি।

—হ্যাঁ। সেখানে উপদ্রব আরম্ভ করেছিল। নীলি ইস্কুলে পড়ায় তার জন্যে ওদের ভীষণ রাগ। যা-তা বলে, রাস্তায় ঘাটে শিষ দেয়। ওর অপরাধ ও ক্রীশ্চান—আর আমি মোটর-ড্রাইভার—আমার বোন। দিনকতক বন্ধ হয়েছিল। আজ দেখি আবার শুরু করেছে, তাই ওকে নিয়ে এলাম সঙ্গে করে, ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসে নিয়ে যাব আপনাকে।

নরসিং বললে—কেন? উনি উঠুন না গাড়িতে। ওঁকে ইস্কুলে নামিয়ে দিয়ে আমরা চলে যাব। নীলিমার দিকে চেয়ে সে খুব মিষ্টি করেই বললে—উঠুন গাড়িতে।

নীলিমা দাদার দিকে চাইলে। জোসেফ বললে—উঠে পড়।

নরসিং হেসে বললে—আপনাদের বাড়ি গেলে ভাড়া দিয়ে দেবেন। ভাল করে চা খাইয়ে দেবেন। সত্যি, আপনাদের বাড়ির চা চমৎকার।

এগারো

নসিবের গতিক হল তাজ্জবের কাণ্ড। নসিবের খেয়ালের মত খামখেয়াল দুনিয়ায় আর হয় না। অত্যন্ত সহজে, যাকে বলে—ধাঁ করে, হয়ে গেল নরসিংয়ের সার্ভিস লাইনের হুকুম। এখানকার এস-ডি-ও করে দিলেন। ইমামবাজারের সার্ভিস উঠে গেল সেখানকার এস-ডি-ওর জবরদস্তিতে; শ্যামনগর এসে সেই ভয়টাই ছিল সব চেয়ে বড় ভয়। এন্‌কোয়ারি হলে সেখানকার রিপোর্ট আসবে—কি রিপোর্ট আসবে সে নরসিং জানত। সেই কারণে সে ঠিক করেছিল শুখনরামের নামে সার্ভিস লাইনের দরখাস্ত করবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা। এখানকার এস-ডি-ও বিনা এন্‌কোয়ারিতেই লাইসেন্স করে দিলেন। বেঁচে থাক জোসেফভাই; সে-ই দিয়েছে সাহেবের ভাড়া জুটিয়ে। সাহেব গাড়ির ফুটবোর্ডে পা দিয়েই তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—তুমি আগে ইমামবাজারে থাকতে না? ইমামবাজারের সুধাংশুবাবুদের বাস্ সার্ভিসে ড্রাইভার ছিলে না?

সুধাংশুবাবু ইমামবাজারের মেজবাবু।

নরসিং এবার সায়েবকে চিনতে পারলে। ইনি যে সেই 'গুপ্তি' সায়েব। ইমামবাজার অঞ্চলে সার্কেল-অফিসার ছিলেন। ছিপ ছিপে শরীর, অল্পবয়সী ফুটফুটে চেহারার গুপ্ত সায়েব মাসে অন্তত দু-বার করে ইমামবাজারে আসতেন। মেজবাবুর সঙ্গে দোস্তি হয়েছিল। সে দোস্তি গলায় গলায় হয়ে উঠল একদিন। নরসিংয়ের মোটর-বাসেই ঘটেছিল ব্যাপারটা। মনে আছে নরসিংয়ের।

হোলির দিন। মেজবাবুর হঠাৎ ঝোঁক উঠল—খুব ধুমধাম করে হোলি খেলবেন এবার। সকালেও কোন কথা ছিল না। জংশন থেকে ন'টার ট্রিপ দিয়ে ফিরবামাত্র হুকুম এল মেজবাবুর, গাড়ি লে আও। বাস নিয়ে নরসিং বাবুদের বৈঠকখানার সামনে এসে দাঁড়াল। আরে বাপ রে বাপ! বিলকুল সব লালে লাল হো গেয়া। মাথায় মুখে আবীর মেখে খুনখারাবি রঙে জামা কাপড় রাঙিয়ে মেজবাবু বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; বালতি বালতি রঙ, পিচকারী, আবীর আর সঙ্গে বেতের বোনা সোডা-কেরিয়ারে বোতল। বাবুদের চোখ লালচে। গ্রামের যাত্রার দলের কয়েকজন গাইয়ে ছেলে নিয়ে ঢোল বাঁশী হারমোনিয়াম বাজিয়েরা এক পাশে বসে আছে।

বাস্ নিয়ে দাঁড়াবামাত্র মেজবাবু বললেন—নেমে আয়।

নামবামাত্র নরসিংকে আবীর রঙে রাঙিয়ে দিলে একজন। মেজবাবু হুকুম দিলেন—যা, ও ঘরে যা। সে ঘরে মেজবাবুর চাকর তাকে কাচের গেলাসে আধ গেলাস ঢেলে দিলে বিলিতী মদ! 'রম্'; রম্ মদটার নাম।

তার পর বার হল মেজবাবুর হোলির হল্লা।

লাগাও গান।

যাত্রার ছেলেরা গান ধরলে—"কেন রঙ দিলি ঢঙ করে? সাদা কাপড় রাঙিয়ে দিলি পিচকারি মেরে।"

বাবুরা চেঁচাতে লাগল—ইয়া! ইয়া! হোলি হ্যায়!

গাড়ি চলতে লাগল। দু-পাশে চলতে লাগল পিচকারির মুখে রাঙা ফোয়ারা। গোটা গাঁ মাতিয়ে—থানা, সব্‌রেজেস্ট্রি অফিস, বাজার পার হয়ে গাড়ি চলেছিল বাবুদের বাগানের দিকে, পথে বাইসিক্লে যাচ্ছিলেন—গুপ্ত সায়েব।

হো-হো-হো-হো করে মেজবাবু স্ফূর্তিতে নেচে উঠলেন—মিল গিয়া বাবা নয়া আদমী মিল গিয়া। রোখো, রোখো গাড়ি।

বাস্। গাড়ি থেকে নেমে গুপ্ত সায়েবকে আবীরের রঙে লাল বানিয়ে দিয়ে তাকে টেনে তুললেন গাড়িতে। বাইসিক্লটা তুলে দিলেন গাড়ির ছাদে। হুকুম হল—চল ডাকবাংলো। গুপ্ত সায়েব ইমামবাজারে এসে ডাকবাংলোতেই ছিলেন। ডাকবাংলোয় একদফা মজলিশ হল। পূর্ণিমার রাত্রে ময়ূরাক্ষী নদীর বালুচরে হোলি হবে। রাত্রি আটটায় গাড়ি ছাড়ল।

কোঁচানো কাপড়ে, গিলে-করা পাঞ্জাবিতে, সাবান দেওয়া খসখসে চুলে, এসেন্স আতরের খুশবয় ছড়িয়ে উঠলেন মেজবাবু আর ওই গুপ্ত সায়েব। আর যারা, তারা কায়দায় এঁদের মত দুরস্ত নয়। আর উঠল খাবার। লুচির ঝুড়ি, মাংসের ডেকচি, কাটলেটের ট্রে, বোতলে ভরা সোডা-কেরিয়ার—ছটা খোপে ছটা বোতল। হোলির জন্যে পুরো একটা কাঠের বাক্স ভরে বোতল এনেছিলেন মেজবাবু। অধিকাংশই ওই রম্। দুটো বড় বোতল ছিল সাদা ঘোড়া-মার্কা হুইস্কি। আর চড়ল হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা।

মেজবাবু তারই একটা বোতল খুলে গেলাসে ঢেলে ধরলেন গুপ্ত সায়েবের মুখের কাছে।

সায়েব হাতজোড় করলেন প্রথমটা।

মেজবাবু বললেন—এক চুমুক অন্তত।

এক চুমুক, দু চুমুক, তিন চুমুক—গেলাস খালি। হোলি হ্যায়, হোলি হ্যায়! মেজবাবু ঢাললেন দোসরা গেলাস।

সাদা ধোয়া ফিনফিনে মসলিনের মত 'চাঁদনী' গায়ে জড়িয়ে বালুচর যেন দাঁড়িয়ে ছিল নাগরের অপেক্ষায়, পিয়ারীর মত চুপ করে, অনড় হয়ে। গাড়ি থেকে বাবুরা লাফিয়ে পড়ল বালুচরের উপর। সে কি মাতামাতি! শেষ পর্যন্ত গড়াগড়ি। নদীর ওপার থেকে আনা হয়েছিল চার-পাঁচটি মেয়ে, মেজবাবু দিনের বেলায়ই বাইসিক্লে লোক পাঠিয়েছিলেন; তারাও শুয়ে পড়েছিল। ঠিক ছিলেন শুধু তিনজন। মেজবাবু, রজনীবাবু আর এই গুপ্ত সায়েব। রজনীবাবু মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে বলেছিলেন, মরল নাকি শালীরা?

আকাশের দিকে চেয়ে গুপ্ত সায়েব বলেছিলেন, মরুক। ওরা পূণ্যবতী। এ মরণ স্বরগ সমান।

মেজবাবু হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে গান ধরেছিলেন—"এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বরগ সমান।" গুপ্ত সায়েব উঠে নাচতে শুরু করলেন। হাঁ, সেদিন গুপ্ত সায়েবের নাচবার এক্তিয়ার ছিল। কি ছিপছিপে চেহারা! ভারি ভাল লেগেছিল নরসিংয়ের।

গুপ্ত সায়েব তার পর গান গেয়েছিলেন—সে গান আজও মনে আছে নরসিংয়ের।—"হেসে নাও দু-দিন বৈ তো নয়। কে জানে কার কখন সন্ধ্যে হয়!"

মেজবাবু নাম দিয়েছিলেন সেই দিন—তুমি বাবা 'গুপ্তি' সায়েব। গুপ্তি যেমন লাঠির খাপের মধ্যে লুকানো থাকে তেমনি চাঁদ তুমি লুকিয়ে থাক।

সেদিনও নরসিংয়ের রাজপুত রক্তে দোলা লাগত এই সবে। সেদিন তারও মনে হয়েছিল—এর চেয়ে ঠিক কথা আর হয় না। সাচ্ বাত হ্যায়। এর চেয়ে সুখ আর দুনিয়ায় কি আছে? এই দোলে—হোলির পর নরসিং গোপনে দু-চারজন বন্ধু নিয়ে গভীর রাত্রে বাবুদের অগোচরে বাস্ নিয়ে ওই বালুচরে এসে ওই খেলা খেলেছে। কিন্তু সেসব পাল্টে গিয়েছে আজ। জান্‌কী—না, একা জান্‌কী নয়, এই ট্যাক্সিটাও আছে জান্‌কীর সঙ্গে। বাবুদের বাস্ ছিল—বাবুদের বাস্, বাবুদের পেট্রোল; আর এ ট্যাক্সিটা তার নিজের। পেট্রোল যাবে নিজের, ট্যাক্সিতে ধুলো লাগবে, টায়ার ক্ষয় হবে—তার নিজের যাবে। মাইনের টাকা, উপরি আয় খরচ করতে মায়া হত না। এখন নিজের ব্যবসার

টাকা খরচ করতে মায়া লাগে। তা ছাড়া তখন ছিল অল্প বয়স, গিরবরজার ছত্রী বংশে জন্মে রক্তের মধ্যে যে তেজ, যে নেশা ছিল—তখনও পর্যন্ত তা বেঁচে ছিল। আজ আর সে বেঁচে নাই। যদিই থাকে সে সামান্য। গিরবরজার বর্কআন্দাজ গিরিধারী সিংয়ের বংশের ছেলেরা লক্ষ্মী হারিয়ে পুরুষে পুরুষে ছোট কাজ-কাম করে পাল্টে যেমন আজ দারোয়ান আর চাষীতে দাঁড়িয়েছে—সেও তেমনি মোটর-ড্রাইভারি করতে করতে পাল্টে পাল্টে আজকের এই খাঁটি মোটর-ড্রাইভার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্টীয়ারিং থেকে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে নরসিং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

যাক। তামাম দুনিয়া পাল্টাচ্ছে—সে পাল্টাচ্ছে তার জন্য নরসিংয়ের দুঃখ নাই। রাজা ফকির হয়, ফকির রাজা হয় দুনিয়ায়। নরসিং কোন রাজাকে ফকির হতে দেখে নাই, কিন্তু জমিদারকে জমিদারি হারাতে দেখেছে, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে যে লোক মাথায় করে তামাক বেচে বেড়াত তাকে শেঠ হতে দেখেছে।

ভুখনরাম আজ শেঠ, তার তিনমহলা বাড়ি।

তবু তার ভাগ্য ভাল যে হঠাৎ এইভাবে 'গুপ্তি' সায়েবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গুপ্তি সায়েবের এখন আর সে চেহারা নাই। মোটা হয়েছেন গুপ্তি সায়েব। রঙ ময়লা হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে। গলার আওয়াজ ভারী হয়েছে। আগের মত আর প্রাণ খুলে হাসেন না। অল্পস্বল্প হাসেন, আওয়াজ হয় না, চোখে দেখে বুঝতে হয় সায়েব হাসছেন। পাক্কা সায়েব হয়েছেন—সে এক নজরেই বুঝে নিয়েছে নরসিং।

খুব খাতিরের সঙ্গে সেলাম করে সে বলেছিল, হুজুর, আপনি ভাল আছেন?

--হ্যাঁ।

সায়েব গাড়িতে উঠে শহরে যাওয়ার পথে অনেক খবর নিলেন। মেজবাবুর মৃত্যু-সংবাদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সুধাংশুবাবু যে বেশীদিন বাঁচবেন না এ আমি জানতাম। এত অত্যাচার কি মানুষের দেহে সহ্য হয়!

তার পর আবার বললেন—আর তিনি যে অল্প বয়সেই গিয়েছেন এও তাঁর পক্ষে ভাল হয়েছে। বেশী বয়স পর্যন্ত বাঁচলে হয়তো সবই নাশ করে

ফেলতেন। নিজেও দুর্দান্ত মাতাল হয়ে পথে-ঘাটে পড়ে থাকতেন। কেলেঙ্কারি হত। লোকে ঘেন্না করত।

আবার একটু পরে বললেন—এমন মানুষ আর হয় না।

নরসিং কোন কথার জবাব দিলে না। সে জানে জবাব দেওয়ার চেয়ে চুপ করে থাকা ভাল। এ জাতকে সে চেনে, কিন্তু ওরা যে কিসে তুষ্ট হয় কিসে রুষ্ট হয় সে নরসিংয়ের বুদ্ধির অগম্য। অনেক সময় সায় দিলেও এরা চটে।

গুপ্তি সায়েব আবার বললেন—ট্যাক্সি তোমার নিজের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

—কতদিন কিনেছ গাড়ি?

—অনেকদিন হল হুজুর। মেজবাবু মারা গেলেন—তার পর বাবুরা বছর দেড়েক রেখেছিলেন বাসের কারবার। তার পর তুলে দিলেন। তখনই আমি—। তা আজ হল পাঁচ-ছ বছর।

সায়েব প্রশ্ন করলেন—এতদিন কোথায় সার্ভিস ছিল তোমার? ওখানেই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওখানকার সার্ভিস এখন আর ভাল চলছে না বুঝি?

নরসিং চুপ করে রইল। সত্য কথা বলা উচিত হবে কি না বুঝতে পারলে না।

—ওখানে এখন কখানা গাড়ি চলে? অনেকগুলো, না?

—আজ্ঞে।

—কখানা গাড়ি ওখানে চলে?

নরসিং সত্য কথা বলে ফেললে।—আজ্ঞে গাড়ি একখানাই ছিল। আমারই গাড়িখানা।

—তবে?

—তবে—। আজ্ঞে—। নরসিং ঘামতে লাগল।

—ট্রেনের সঙ্গে কম্পিটিশনে সুবিধে হচ্ছে না বুঝি? অনেকগুলো গাড়ি দিয়েছে বুঝি রেল-কোম্পানি? শুনেছিলাম বটে শাটল্ ট্রেন দিয়েছে ওখানে। ইমামবাজার থেকে জংশন—একখানা ইঞ্জিন দুখানা গাড়ি; যায় আর আসে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল নরসিং। বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই—

গুপ্তি সায়েব একটু ভাবলেন—তাই তো হে, পাঁচমতি পর্যন্ত সার্ভিস তোমার চলবে তো? কাঁচা রাস্তা; বর্ষার সময় গরুর গাড়ি পর্যন্ত চলে না—

—আজ্ঞে দেখি। না চলে তো তখন—। তখন যে কি করবে নরসিং জানে না। নরসিংয়ের ধারণা তখন যে কি হবে সে জানে একমাত্র ভাগ্য। এখানে সে আসবে তাই কি সে জানত? জল ফুরাল, দাঁড়াতে হল। না দাঁড়ালে মোটরের পিছনে যে গাড়ি আসছিল তার সঙ্গে দেখা হত না। গাড়িখানা উল্টাল। শুখনরাম বার হল সেই গাড়ি থেকে, তামাকের ছোট পেটি আর ফট্‌কিকে নিয়ে। ফট্‌কি সঙ্গে না থাকলে শুখনরামের উপর তার মেজাজ গরম হত না। আর তা না হলে শুখনরাম আর তার গরম মেজাজের উপর মেজাজ দেখাবার জন্য পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হেঁকে বসত না। সুতরাং এখানে যদি না চলে সার্ভিস, তখন যে কি করবে সে তা জানে না।

গুপ্তি সায়েব বললেন—তা ভাল, দেখ। একখানা দরখাস্ত করে দিয়ো।

নরসিং আবার তোষামোদ করবার চেষ্টা করলে—হুজুরই তো মালিক। আপনি যা করবেন তাই হবে।

গুপ্তি সায়েব বললেন—ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের ক্ষতি হবে। তা—। একটু ভেবে বললেন—সে হবে'খন। জনকতক ভদ্রলোকদের দিয়ে মোটর-সার্ভিসের সুবিধা দেখিয়ে দরখাস্ত করিয়ে দেবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব।

গঙ্গার তটভূমি নিকট হয়ে আসছে। বনঝাউ দেখা দিয়েছে রাস্তার পাশে। বড় বড় আমবাগান দেখা যাচ্ছে। দু-পাশের সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে রাস্তাটা ক্রমশ বাঁধের মত উঁচু হয়ে উঠেছে, সাঁকোর সংখ্যা বাড়ছে। যাত্রী-গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। নরসিংয়ের হাতে গাড়িখানা চলেছে পাকা জকির হাতের ঘোড়ার মত।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন গুপ্তি সায়েব। সিগারেটের ধোঁয়া ভারি চমৎকার ভাবে ছাড়েন তিনি, গোল কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্রমশ ফাঁদলে বড় হয়ে প্রায় ছুটে চলে সামনে। মেজবাবুও ধোঁয়া ছাড়তেন এমনিভাবে, বলতেন—ধোঁয়ার রিং। বড়লোকের বড় কায়দা!

বড় বেশী ভেবেছিল নরসিং। কিন্তু অতি সহজে লাইসেন্স হয়ে গেল। সুতরাং এ নসিব ছাড়া আর কি হতে পারে? তার নসিব নয়—এ হয়েছে শুখনরামের নসিবে! সেদিন সদর শহর থেকে ফিরে যখন এই কথাটা সে বড় গলা করে জাহির করলে তখন শুখনরাম হেসে বলেছিল—আরে ভাই,

হামার নসিবের সাঁথে আপনি নসিব যখন জড়াইয়ে দিলেন তখন এ তো হোবেই হোবে। বলে সে হা-হা করে হেসে উঠেছিল।

শুখনরাম সেইদিন সকালে এক সওদায় পাঁচ হাজার মুনফা করে দিল্‌দরিয়া মেজাজ নিয়ে বসে ছিল। শুখনরামের কথাটা নরসিংয়ের মনে লাগল। কথাটা অত্যন্ত সত্য বলে মনে হল তার। গিরবরজার যে ঘর থেকে মা-লক্ষ্মী চলে গিয়েছেন আগুনের আঁচে ঝলসে—সেই লক্ষ্মীছাড়া ঘরের ছেলে সে। দিদিয়ার কথা শুনে সে একদিন বেরিয়েছিল—লেখাপড়া শিখে সে মানুষ হয়ে মা-লক্ষ্মীকে ফেরাবে বলে। কিন্তু নসিব কপাল যে সঙ্গে সঙ্গে যায়। দিদিয়া একটা ছড়া বলত—

"গোপাল যাচ্ছে কোথায় ?
ভূপাল।
কপাল ?
সঙ্গে।"

কপাল মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই চলে। তাই তো বিয়ে-সাদীর সময় মানুষ সব চেয়ে আগে দেখে কনের কপাল।

ভেবে-চিন্তে কথাটা খুব সত্য বলে মনে হল নরসিংয়ের।

শুখনরাম বললে—তব্‌ তো সব ঠিক হইয়ে গেল। এখুনি আপনি টাকা লিয়ে তুরন্ত গাড়িঠো ঠিক বানাইয়ে ফেলেন।

তার পর গলা নামিয়ে বললে—আজ রাতে একবার পাঁচমতি যাবেন ? দুঠো পেটি ছুঁয়া পৌঁছা দেনে হোগা।

দু পেটি বলতে নরসিং বুঝেছিল অনেক। কিন্তু আসলে দুটো পাঁচসেরী ঘিয়ের টিনের কৌটায় আড়াই সের করে পাঁচসের মাল। এবার গাঁজা নয়—আফিং। গন্ধ নিবারণের জন্য ঘিয়ের আবরণ দিয়ে টিনে পুরে পাঠানো হচ্ছে। চালানের রকমারি ব্যবস্থা আছে। পাঁচমতির বাজারে জগুবাবু, জগবন্ধু বাঁড়ুজ্জে বাবুলোক, বড় জমিদার ঘরের ভাগ্নে; বাবুদের ম্যানেজার, আবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘিয়ের ব্যবসাও করছে। খাঁটি গাওয়া ভয়সা ঘি এই গঙ্গার ধারের সরস অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে কলকাতা চালান দেয় এবং বাইরের আড়ত থেকে বাজারে ঘি এনে ওখানকার দোকানে সরবরাহ করে। সঙ্গে সঙ্গে আছে এই গোপন কারবার। পাঁচমতি থেকে ওদিকে তার বাঁধা খুচরা কারবারী খরিদ্দার আছে। তারা নিয়ে গিয়ে সরবরাহ করে গাঁওলা গাঁয়ে।

ভরি পিছু অল্প কিছু সস্তা দেয়। নেশাখোরদের কাছে একটা পয়সা, একটা আধলাও মূল্যবান। তা ছাড়া এই লুকিয়ে কেনার একটা আলাদা নেশা আছে। এই মালের যা তেজ, সে সরকারী মালে নাই। নেশাখোরেরা বলে—সরকারী মালের আরক বের করে আর কিছু থাকে না। এ মালের জোর চাহিদা।

মাল নিয়ে এসেছিল একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। আমীরের মত চেহারা। তেমনি তার বেশভূষা। নরসিং তাকে দেখেছে। সে এসে উঠেছিল ডাক-বাংলোয়। চামড়ার খোঁজে সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এসে উঠল শুখনরামের গদিতে। শুখনরাম রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। আন্দরমহলেরও ওধারে একখানা ঘর। সেই ঘরে কারবার, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। গোলক ধাঁধার মত ঘুরে ঘুরে পথ। নরসিংকে ডেকে শুখনরাম ঘিয়ের টিন দুটো হাতে দিলে। বললে—হাজার রুপেয়ার মাল। জগুবাবুর পাশে পানশো রুপেয়া গুনে লিবেন। কুছ ডর নেহি। বড়া জমিদারের কাছাহরি একদম ঘুসে যাবেন গাড়ি লিয়ে। দিল্ চাহে তো হুঁয়া থাকবেন রাতমে।

কারবারী মুসলমান ভদ্রলোক বললেন, নেহি। রাত্তিরেই চোলে আসবেন। রাত্তিরেই আমি যাব—ট্রেন ধরব, গাড়ি চাই আমার।

নরসিং আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল; চমৎকার বাংলা বলেন ভদ্রলোক। সামান্য টান, আর দু-একটা কথার বাঁকা উচ্চারণ ছাড়া ধরাই যায় না যে, ভদ্রলোক বাঙালী নন।

শুখনরাম বলেছিল, আরে না—না। সে হবে না সাব। তার পর অশ্লীল কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে সে, যার অর্থ হল শুখনরাম তাঁকে একটি অতিসুন্দরী নারী উপহার দিতে চায়।

নরসিং চমকে উঠল। কে সে? সে কি—?

পরমুহূর্তেই শুখনরাম বললে, আচ্ছা, পহেলে দেখেন। বলেই সে চলে গেল অন্দরের দিকে। নরসিং দাঁড়িয়ে রইল।

মুসলমান ভদ্রলোক বললেন—শীগ্‌গির শীগ্‌গির চলে যান,। শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফিরবেন। রাত্তিরেই আমি যাব। যান দেরি করবেন না।

নরসিং তবু গেল না। বললে—হ্যাঁ, যাই। বলেও সে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক এই সময় তার অনুমানকে সত্য করে ফট্‌কিকে সুমুখে নিয়ে উপস্থিত হল শুখনরাম। ঘরের মধ্যে ফট্‌কিকে ঠেলে কুৎসিত বীভৎস হাসি হেসে

শুখনরাম বললে, দেখেন।

নরসিং আর দাঁড়ল না। চলে এল। গাড়িতে চেপে নিতাইকে বললে—মার হ্যাণ্ডেল।

নিতাই জানে ব্যাপারটা। রাম জানে না। রাম বিস্মিত হয়ে বললে—প্যাসেঞ্জার কই?

দুর্দান্ত ক্রোধে নরসিং যেন ফেটে পড়ল—চোপরও শালা হারামী কাঁহাকা! সে খবরে তোর দরকার কি?

গাড়িখানা গোঙাচ্ছিল। সুইচ টিপে হেড লাইট জ্বেলে দিয়ে নরসিং গাড়ি ছাড়লে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ধূমকেতুর পুচ্ছের মত তীব্র আলো সামনে ফেলে গাড়িখানা ছুটছিল। জনহীন পথ। হঠাৎ নিতাই বললে—সাপ, সাপ যাচ্ছে।

রাস্তার পার থেকে একটা কালো সাপ চলে যাচ্ছে ওপারে; নরসিং বাড়িয়ে দিলে গতিবেগ, একটা কঠিন আক্রোশে পূর্ণশক্তির পথ পায়ের চাপে মুক্ত করে—গাড়িখানাকে ছেড়ে দিলে। দেবে—ওটাকে সে চাপা দেবে। গেল, গাড়ির সামনে থেকে বেরিয়ে গেল! ক্ষিপ্রহাতে স্টীয়ারিং অল্প বেঁকিয়ে দিলে নরসিং। বেঁকে গাড়িখানা প্রায় রাস্তার প্রান্তে এসে পড়ল, আর হাত দুয়েক পরেই নেমে গিয়েছে রাস্তার ঢাল। আবার বেঁকল গাড়িখানা। রাস্তার মাঝখানে এসে আরও খানিকটা গিয়ে থামল। ব্রেক কষে নরসিং বললে—দেখ তো টর্চটা জ্বেলে।

নিতাই টর্চ জ্বাললে। সাপটার মাথার দিকটাই ছেতরে গিয়েছে মোটা রবার টায়ারের চাপে। ধুলোর উপর টায়ারের ছাপ এঁকে বসে গিয়েছে। পিছনের দিকটা এখনও নড়ছে।

—শালা!

মোটরটা এবার অপেক্ষাকৃত সংযত গতিতে চলল।

জগবন্ধু বাঁড়ুজ্জের একটা পা নাই। বগলে ঠুঙি লাগিয়ে এসে দাঁড়াল। এক নজরে নরসিং তাকে চিনে ফেললে—লোকটা শুখনরামের চেয়েও হারামী। ওর দুটো ঠ্যাঙ থাকলে দুনিয়ার সর্বনাশ করে ফেলতে পারত। ওর চেয়েও শয়তান ওই পাঞ্জাবী লোকটা। রাত্রে স্টেশনের পথে বললে—এসব কারবারে সঙ্গে পিস্তল রাখতে হয়। নিজে পিস্তল বার করে দেখালে।

নরসিং দেখলে পিস্তলটা। দেখবামাত্র তার বুকের ভিতরটা লালসার

আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠল। মারণাস্ত্রের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। ওঃ ওই জিনিসটা কাছে থাকলে দুনিয়ায় আর কিসের ভয়! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আবার গাড়ি চালাতে লাগল।

সকালবেলা উঠে মনে হল মনটা তার অত্যন্ত খারাপ হয়ে আছে। নিতাই রাম গাড়ি নিয়ে পড়েছে। খুলে আগাগোড়া সাফ করতে হবে, রদ্দি পার্টস দেখে সেগুলো বিলকুল পাল্টাতে হবে। শুখনরাম আজই টাকা দেবে। দলিল তৈয়ার হচ্ছে তার উকিল-সায়েবের দপ্তরে। এখানকার সব চেয়ে ভাল উকিল তার উকিল। বুড়া উকিলটার গোঁফজোড়াটা দেখে মনে হয় লোকটা একটা উকিলের মত উকিল। কিন্তু ঠিক ভাল লাগছে না নরসিংয়ের। জোসেফ বলেছে, শুখনরামের সঙ্গে লেন-দেনের কারবার করে ভাল করলেন না আপনি।

নিতাই বলেছে—বেটা হাড়ীর মতলব ছিল আপনাকে ওর বহিনের টোপ দিয়ে মুফতে আপনার ভাগীদার হতে—

ধমক দিয়েছে নরসিং। নিতাই গুম্ হয়ে আছে। দুঃখিত হয়েছে একটু। তা হোক। কিন্তু এমন অন্যায় কথা কখনই বরদাস্ত করবে না সে। মেয়ী নীলিমা বড় ভলে মেয়ে। প্রথম দিন তাকে দেখে তাদের পূর্বপুরুষের যে গল্প তার মনে পড়েছিল, সে গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজ আর নরসিং নীলিমাকে নিয়ে কল্পনা করতে সঙ্কোচ মনে করে। অন্যায় মনে হয়।

নরসিংয়ের মনে কেমন একটা আফসোস হচ্ছে। শুখনরামের সঙ্গে জড়ানোটা ভাল হয় নাই। গত রাত্রির কথা মনে হচ্ছে। ফট্কির উপরে ঘেন্না হচ্ছে। আবার মনে হচ্ছে সে করবে কি? সে নিজে কি করলে? কাল রাত্রে সে যা করেছে—না করে তার যেমন উপায় ছিল না, তেমনি ফট্কিরও ছিল না কোন উপায়। ও মেয়ের ওই নসিব। নরসিং মোটর ড্রাইভার—তার ওই নসিব। গেজেট খবরের কাগজ পড় না—দেখতে পাবে—মোটর-ড্রাইভারের নসিব তাদের কোন্‌পথে নিয়ে যায়! হরদম দেখতে পাবে মোটর-ডাকাতির কথা। ড্রাইভারের নসিব প্যাঁক লাগিয়ে তাকে ডাকাতদের সঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছে। দেখতে পাবে পথ থেকে জবরদস্তি তুলে নিয়ে গেল জেনানী —কারও বহু, কি কারও বেটি। নসিবের ফের- ড্রাইভার কি করবে! হাঁ, টাকার লোভ একটা অপরাধ বটে—আর এ সব কাজের নেশাও বটে। কিন্তু নরসিংয়ের বিশ্বাস—এ সব হল মোটর-ড্রাইভারি নসিবের ফের। তার যে

কিছুতেই ইচ্ছা হচ্ছে না শুখনরামের এই পাপ কাজ করতে। কিন্তু কি করবে, উপায় নাই যে।

মোটা মুনাফা আর এই কাজের নেশা। গড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে বাবুলোক সায়েবলোক ট্যাক্সি নিয়ে, পিয়ারী এসে ওঠে। মোটা ভাড়া মেলে, চোখ সামনে রেখে বসে থাকে ড্রাইভার—পিছনে চলে—অশ্লীল কাণ্ড। কি করবে ড্রাইভার? দু-দশ দিন পরে এ কাজে নেশাও একটা জমে যায়, তখন মজা লাগে। নরসিংয়েরও সয়ে যাবে। মজা লাগবে। পাঞ্জাবী কাল রাত্রে স্টেশনে পৌছে করকরে দুখানা দশটাকার নোট দিয়ে গিয়েছে। কুড়ি-কুড়িটা টাকা ছাড়া যায়! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

—সিংজী! শুখনরামের কর্মচারী ডাকছে।—চলুন উকিল বাড়ি। শেঠজী বললেন।

—চলুন। না গিয়ে উপায় কি!

বিকেলে শেঠজী দু-বোতল মদ দিলে। কাল রাত্রের ভাড়াটা শুখনরাম দেয় নাই। এদিক ধারই বদলে দিচ্ছে বোধ হয়। উপায় নাই—ডুবতেই হবে, ফট্ কিন্তু ডুববে। কোন্ দিন দেবে বিক্রি করে কাউকে মোটা টাকায়।

—পাঁচমতি—পাঁচমতি! পাঁচমতি!

শ্যামনগর থেকে সার্ভিসের প্রথম ট্রিপ ছাড়বে।—পাঁচমতি খেয়াঘাট ছ আনা। মোটর ট্যাক্সি।

ট্যাক্সির ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে হাঁকছে রামচন্দর। নিতাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। গেঁয়ো প্যাসেঞ্জারদের ধরে আনতে হয়। দরকার হলে পুঁটলি-পোঁটলা মোট ঘাট বয়ে এনে চাপিয়ে নিতে হয়। নামিয়ে দেবার সময়—ও দায়িত্ব নাই। গাড়ি থেকে পথের ধারে নামিয়ে দিলে খালাস। বিরক্তি ধরলে—মেজাজ খারাপ থাকলে—ছুঁড়ে ফেলে দিলেও দোষ নাই।

গাড়ি মেরামত হয়ে গিয়েছে। সার্ভিস খুলেছে নরসিং। মন্দ চলছে না। মন্দ কেন, ভালই চলছে। কিন্তু শেঠকে নিয়ে মনটা খুঁতখুঁত করছে। লোকটা ভয়ানক ঘড়িয়াল। কি ভাবে, কে জানে? বোধহয় ওই টাকা ক'টা দিয়ে ভাবছে টাকাটা নরসিং দেবে না। রোজ সন্ধ্যার পর—গাড়ি ট্রিপ শেষ করে ফিরলেই আসবে।—কি মোশা, আজ কেত্‌না হল সেল্ আপনার? হিসেবটি নিয়ে ফিরবে। সপ্তাহ শেষে বলবে, দিয়ে দিন না খরচ বাদে যা আপনার

বাঁচল। কি করবেন নিজের কাছে রেখে? বাচ্চা তো হবে না আপনার রুপেয়ার।

আশ্চর্য মানুষ! যে মানুষ গদিতে বসলে কথা বলতে ভয় হয়, মনে হয় একটা বাঘের মত ভয়ানক লোক বসে আছে, সেই মানুষ নরসিংয়ের কাছে এসে দিব্যি তার শতরঞ্জিতে পাশে বসে হেসে কথা বলে। হাসি-তামাশা করে। মধ্যে মধ্যে বলে, কত নিজের হাতে আর রান্না করবেন মোশা? একটা সাদী করেন —না তো একঠো মেয়েলোক রাখেন। কাম কাজ করবে, থাকবে। উসমে কেয়া দোষ? খুব গম্ভীর ভাবে বলে। নরসিংয়ের ইচ্ছা হয় ফট্‌কির কথা বলে। কিন্তু আশ্চর্য, সাহস হয় না। নিতাই প্রথম দিনে শুখনরামকে ঠাট্টা করে বলেছিল—দাদা নয়, উনি আমার ঠাকুরদাদা। ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়। সেই নিতাই এখন কথাই বলতে পারে না, শুখনরাম এলে চুপ করে বসে থাকে। লক্ষ্য করে দেখেছে নরসিং—নিতাই আপনাআপনি হাতজোড় করে বসে।

নরসিং একদিন বলেছিল নিতাইকে—হাতজোড় করিস কেন?

নিতাই আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিয়েছিল—না তো।

রাম বেরিয়ে চলে যায় ঘর থেকে শুখনরাম এলে।

অবসর পেলেই এই সব কথা ভাবে নরসিং।

স্টীয়ারিংয়ের উপর বুক রেখে অলস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে নরসিং ভাবে, কোথা থেকে সে কোথায় এসে পড়ল। দু'শর জায়গায় চারশ টাকা দিয়েছে শুখনরাম। কতকগুলো পার্টস বদলে গাড়িখানা অবশ্য মজবুত হয়েছে, তাজা হয়েছে। দু'শ টাকা এষ্টিমেট করে গাড়িখানাকে ভাল করবার ঝোঁকে নরসিং চারশ টাকা খরচ করে ফেলেছে। শুখনরাম তাতে আপত্তি করে নাই। সে বলে—আপনি হামার কাম দিলেন, আপনার কাম হামি জরুর চালাইয়ে দিব।

কোনরকমে টাকাটা উপায় করে শুখনরামকে ফেলে দিতে পারলে সে খালাস হতে পারবে এ বন্ধন থেকে।

কখন ছাড়বে গাড়ি? পিছনের সীটে তিনজন প্যাসেঞ্জার বসে আছে। তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে।—পাবলিক সার্ভিসের গাড়ি। তার ছাড়বার একটি ধরা-বাঁধা সময় থাকা উচিত। যখন খুশি তখন ছাড়ব বললে চলবে না। এগুলো অত্যন্ত বে-আইনী ব্যাপার।

ঘোড়ার গাড়ি কখন ছেড়ে চলে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি যাবে বলে এক আনা বেশী ভাড়া দিয়ে মোটরে এলাম।

নরসিং ষ্টীয়ারিং ছেড়ে খাড়া হয়ে বসল। বললে---ঘোড়ার গাড়ির আগে পৌঁছলেই হল তো আপনাদের?

—ঘোড়ার গাড়ির আগে কি পরে সেটা কোন কথাই নয়। পাঁচমতি কোন্ টাইমে পৌঁছবার কথা সেইটাই হল কথা। ঠিক টাইমে যদি না পৌঁছয় তাতে যদি আমার ক্ষতি হয়, তার দায়ী হতে হবে তোমাকে।

নরসিং এ কথার কোন জবাব দিলে না। জবাব দিতে গেলে চলে না। ঘোড়ার গাড়িওয়ালারা তাকে তাড়াবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। ভাড়া নামিয়েছে পাঁচ আনায়। বাধ্য হয়ে নরসিং ভাড়া করেছে ছ'আনা। রাস্তায় চলবে এমনভাবে যে, কোনরকমে যেন ঘোড়ার গাড়ির সারি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় না থাকে। ঝগড়া একটা বাধাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পরশু রামাকে বাজারের পথে একা পেয়ে গালাগাল করেছে, মারতেও এসেছিল। কোনরকম সেদিনটা রক্ষা হয়েছে।

—প্যাঁচমতি-শ্যামনগর, পাঁচমতি-শ্যামনগর। মোটর টেক্সি। ছ আনা—ছ আনা। হি-হি করে হাসতে হাসতে রামা এল দুজন প্যাসেঞ্জার নিয়ে।

– ছাড়ুন মশায় ছাড়ুন। এই তো পাঁচজন হয়ে গিয়েছে।

—এই তো বিপদ এদের গাড়িতে চাপার। না আছে ছাড়বার ধরা-বাঁধা সময়, না আছে কজন প্যাসেঞ্জার নেবে তার কোন আইন। গরু-ছাগলের মত ঠেসে ভরে দিলে—সে তোমরা মর আর বাঁচ, ওদের পয়সা হলেই হল।

নিতাই এল। রামা হি-হি করে হেসে বললে—শুধু হাতে এলি? হি-হি-হি। আমি আজ—

-- হ্যাঁ···হ্যাঁ! তোরই জিত--। হ্যাণ্ডেল মার্।

নিতাই বললে—আপনার পাশের সীট খালি রাখেন। নেস্‌পেক্টারবাবু যাবেন।

—ভেতরে জায়গা কোথায় হে বাপু? তিনজন তো বসেছি।

নরসিং আবার রূঢ় দৃষ্টিতে ভিতরের দিকে চেয়ে বলল—চারজনের সীট ওটা —চারজন বসবে ভেতরে।

—কক্ষনও না। তিনজনের সীট।

—আজ্ঞে না। চারজনের।

—চারজনের সীট কিসে তোমার লেখা আছে দেখি? কোন্ আইনে আছে?

মাথা গরম হয়ে উঠল নরসিংয়ের। এক-একজন আইন-জানা লোক আছে, প্রতি কথাতেই তারা আইন দেখায়। নরসিংয়ের ইচ্ছা হল লোকটাকে নামিয়ে দেয়। কিন্তু তাতে এই সার্ভিস চালু হওয়ার মুখে বদনাম হবে। একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সংযত করে নিয়ে নরসিং বললে—আজ্ঞে বাবু, এই তো একটুখানি পথ—সাত মাইল। আধঘণ্টার মধ্যে চলে যাব। একটু কষ্ট না করলে উপায় কি? সবারই তো যাওয়া চাই। তা ছাড়া পুলিস ইন্সপেক্টার যাবেন—কি করব আমরা? ভাড়া যা পাব সে তো জানেনই! কিন্তু সীট না রেখে তো আমাদের উপায় নাই।

তবু লোকটা গজগজ করে।—হলেই বা পুলিস ইন্সপেক্টার। আইন মেনে চলতে হবে তো তাঁকে? না, পুলিস বলে সাতখুন মাপ তার? না, মানুষের মাথায় পা দিয়ে যাবেন!

একটা লোক ক্রমাগত তার পুঁটলি নিয়ে ব্যস্ত। সামনে বনেটের পাশে একটা মোট রাখা হয়েছে—বার বার সে উঁকি মেরে দেখছে আর প্রশ্ন করছে—ওটা পড়ে যাবে না তো?

—না—না। ঠিক আছে।

—একটু সোজা করে দাও দেখি ভাই। একটু টিপে খাঁজে বাঁধে দাও। ও মশাই—পোঁটলাটায় পা দেবেন না। আঃ ছি-ছি-ছি। এই দেখ দেখি কি করে দিলে মোটটাকে—মুখের বাঁধনটা আলগা হয়ে গেল যে!

নিতাই বললে—ও মশাই বকের মতো গলা বাড়াবেন না। মোট আপনার ঠিক আছে।

—বসুন মশাই, বসুন ঠিক হয়ে। গাড়িতে যাওয়া-আসারও কতকগুলো নিয়ম আছে। সেগুলোও আইন। বসুন।

গাড়ি ছাড়ল নরসিং।

থানার সামনে থামল। ইন্সপেক্টারবাবু উঠবেন।

নিতাই বললে—চা খাবেন? পাশেই চায়ের দোকান।

—থাক্, পাঁচমতিতে দাসজীর ওখানে খাব।

দাসজী, সেই সুরেশ দাস। চায়ের স্টলওয়ালা বৈষ্ণব। সে বলেছিল—তুম বি মিলিটারী হাম্ বি মিলিটারী।

—পাঁচমতি-শ্যামনগর। পাঁচমতি-শ্যামনগর মোটর সার্ভিস। ছ আনা ভাড়া।

বারো

সুরেশ দাসের চা-খাবারের দোকান পাঁচমতিতে নরসিংয়ের আস্তানা। সুরেশ দাসের সঙ্গে নরসিংয়ের দোস্তিটা জমে উঠেছে। দাসকে বড় ভাল লেগেছে। দিল্‌খোলা লোক, মিলিটারী মেজাজ। চড়া কথা, কড়া মেজাজ, রাঙা চোখ—এ তিনটের একটাও তার সহ্য হয় না। লাঠি দেখালে সে ডাণ্ডা দেখায়, লোহার বড় উনোনের ধারেই সেটা পড়ে থাকে; মধ্যে মধ্যে সেটা দিয়ে উনোনে খোঁচা দিয়ে আগুনের আঁচ তাজা এবং তেজালো করে তোলে সুরেশ। কিন্তু ভাল কথা মিষ্টি কথা বললে সে খুশী; প্রাণ খুলে হা-হা করে হাসে তখন। তুমি ভাল তো সুরেশ দাস মাটির মানুষ; তার উপরে দোস্তি হলে আর কথাই নাই, দোস্তের গোলাম সে।

মোটরের হর্ন পেলেই দাস দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে চেঁচায়, আ গিয়া—আ গিয়া পাঞ্জাব মেল—বোম্বাই মেল—তুফান মেল! আ গিয়া

লোহার ডাণ্ডাটা দিয়ে আগুনের আঁচ জোরালো করে দিয়ে জল গরমের পাত্রটার ঢাকনি খুলে—জলের অবস্থাটা একবার দেখে নেয়, তারপর আরও খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়; অনেকক্ষণ ধরে যে জল ফুটছে সে জলে চা ভাল হয় না, তাই ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে নতুন করে ফুটিয়ে নেয়। টেবিলের উপর সারবন্দী কাপ সাজিয়ে ফেলে চিনি পরিবেশন করতে থাকে। ছোট ভাই ভবেশকে বলে—কেটলিতে গরম জল ঢাল্। সিগারেটের টিনে একটা বাখারি লাগানো হাতা ডুবিয়ে ফুটন্ত জল কেটলিতে ঢালে ভবেশ। সুরেশ হাঁকে—আ গিয়া পাঞ্জাব মেল! গরম চা। চা-গ্রম! সিঙাড়া নিমকি—টাটকা তাজা ভাজা—দেশী চপ্ কাটলেট!

নরসিংয়ের গাড়ি এসে ব্রেক কষে দাঁড়ায় দোকানের সামনে। খুব এক রাশ ধোঁয়া বার করে দিয়ে এক চোট গর্জন করে ইঞ্জিনটা থেমে যায়। প্যাসেঞ্জাররা নামে। অনেকে চা খাবার খায়, নরসিং নিতাই রাম এরা বসে দোকানের এক পাশে একটা স্বতন্ত্রভাবে ঘেরা জায়গায়; সুরেশ ওটা তৈরী করিয়েছে দোস্তদের জন্য। ওইখানে আড্ডা পড়ে নরসিংদের। আড্ডা চলে ট্রিপের ফাঁকে ফাঁকে। শ্যামনগর থেকে ভোর ছটায় ছাড়ে—সাত মাইল পথ আসতে লাগে পঁয়ত্রিশ মিনিট, পঁচিশ মিনিট পাঁচমতিতে থেকে সাতটায় ছাড়ে পাঁচমতি থেকে শ্যামনগর। ফের আটটায় শ্যামনগর থেকে পাঁচমতি সেকেণ্ড

ট্রিপ। এ দফায় তিন কোয়ার্টার আড্ডা দেবার সময়। পাঁচমতি থেকে সোয়া নটায় ছাড়তে হয়; দশটা থেকে সাড়ে দশটায় যাদের অপিস তারা যায় ওই ট্রিপে। ওই ট্রিপে ভিড় বেশী। দশজন পর্যন্ত চাপায় নরসিং। আরও বেশী চাপাবার উপায় থাকলে আরও বেশী প্যাসেঞ্জার হতে পারে এই ট্রিপে। পান চিবুতে চিবুতে আদালত, ট্রেজারি, মিউনিসিপ্যালিটির কেরানীবাবুরা হন্তদন্ত হয়ে আসে। জন দুয়েক ইস্কুল-মাস্টার আছে। সবসুদ্ধ জন বিশেক ডেলী প্যাসেঞ্জার। বিশজনের মধ্যে আটজন পাকা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে নরসিংয়ের সঙ্গে। বাকী বারোজনের মধ্যে অধিকাংশই যায় ঘোড়ার গাড়িতে। যাওয়া আসায় দৈনিক এক আনা করে দু আনা—তিরিশ দিনের চারটে রবিবার এবং ছুটি-ছাটা নিয়ে আর দু দিন, এই ছদিন বাদ দিয়ে চব্বিশ দিনের চব্বিশ দু আনা—আটচল্লিশ আনা—তিন টাকা, তাদের কাছে অনেক; আরো চব্বিশ বারো আনা আঠারো টাকা একসঙ্গে নরসিংকে দেওয়া তাদের সামর্থ্যে কুলায় না। এই বারোজনের মধ্যে যাদের যেদিন ভাত হয়ে ওঠে না, কি কোন জরুরী কাজে আটকে যায়—তারাই সেদিন অগত্যা নরসিংয়ের গাড়িতে যায়। পিছনের তিনজনের সীটে চারজন বসে—সামনে তার নিজের পাশে বসায় দুজনকে, দুটো ছোট মোড়া পেতে দেয় পিছনের সীটের সামনে, তাতে দুজনে বসে; এতেই তার বাঁধা খদ্দের আটজন বসতে পায়। বাকী দুজন বা একজন যারা আসে তাদের বসিয়ে দেয় সামনে মাডগার্ডের উপরে। বসতে আপত্তি করলে নেমে যেতে হবে। নরসিং কি করবে? বাঁধা বারো মাসের ডেলী-খদ্দেরদের বাদ দিয়ে ছুটো প্যাসেঞ্জারকে বসতে দিতে পারে না। এই ট্রিপে গাড়ি চলে ভর্তি মালঠাসা মহাজনী নৌকার মত। সাত মাইল যেতে পঞ্চাশ মিনিট লেগে যায়। খানাখন্দ দূরে থাক ছোট খাটো গচকায় গাড়ি পড়লে ঘটাং শব্দ করে স্প্রিংয়ের উপরের পাটীখানা নীচের পাটীতে ঠেকে যায়। স্পীড বেশী দিলে স্প্রিং খতম হয়ে যাবে। সাত মাইলের মধ্যে চার মাইল রাস্তার অবস্থা প্রায় মাঠের রাস্তার মত—এই চার মাইল সে চলে ঘণ্টায় আট মাইল স্পীডে, জায়গায় জায়গায় পাঁচ মাইলে কমাতে হয়; বাকী তিন মাইল শ্যামনগরের মুখটায় রাস্তাটা ভাল, এখানে সে দশ মাইল দমে গাড়ি ছাড়ে, মধ্যে মধ্যে পনের মাইলেও ওঠে। শ্যামনগরে ঢুকেই সেই তেমাথাটা, যেখানে বসে সে প্রথম দিন গাড়ি আর পায়ে-হাঁটা যাত্রী গুনেছিল—সেইখানে গাড়ি থামিয়ে প্রথমেই নামিয়ে দেয় ছুটো প্যাসেঞ্জার—যাদের বসতে হয় মাডগার্ডের উপর,

তাদের। খানিকটা গিয়েই নেমে যায় ইস্কুলের মাস্টারবাবু দুজন। ব্যস—তার পর আবার কি ? আর ধরে কে ? থানা কোর্টের সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে নরসিং। এতেও অবশ্য সিপাইদের মাস মাস কিছু কিছু দিতে হবে। একটা কথা আছে—"ভাল করতে নাই পারি মন্দ করতে তো পারি, এখন কি দিবি তা বল ?" আইন মেনে চললেও কিছু না পেলে ছুতোনাতা করে একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে ফেলবে। কিছু না পারলে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় পাঁচ আইন আছে। আর পাঁচ আইনের মামলায় সাক্ষী-সাবুদ প্রমাণ প্রয়োগ এসব কিছু নাই, আছে জরিমানা। দাঁড়ানো মাত্র জরিমানা দু-টাকা, প্রতিবাদ করে 'অপরাধই করি নাই' বললে জরিমানা তিন টাকা হয়ে যায়, আবারও কিছু বলতে গেলে তিন টাকা পাঁচ টাকায় লাফিয়ে ওঠে। তার চেয়ে মা-শেতলা ওলাইচণ্ডী, বাবা-ব্রহ্মদৈত্যের মত প্রণাম করে পুজো দেওয়াই ভাল। ঘোড়ার গাড়িওয়ালারা গাড়ি পিছু চার পয়সা দেয়, সকালে সর্বাগ্রে চৌমাথায় সিপাহীজীকে দিয়ে তবে গাড়ি ছাড়ে। সে দেয় চার আনা হিসাবে। পাঁচমতিতে দিতে হয় দু-আনা। এই সাড়ে নটার ট্রিপটি ছাড়বার ঠিক আগেই একজন ওদের আসবেই। সুরেশ দাসের দোকানে বসবে।—"চা হৈল ভাই সুরেশ ? দেখি একঠো বিড়ি।"

বিড়ি ধরিয়ে দোকানের সামনে বেঞ্চিটাতে চেপে বসবে। নরসিংকে আপ্যায়িত করবে—"কেয়া ভাই সিংজী, কেমন আছেন মোশা ?" তার পরই বলবে, "মরসুম তো সিংজীর। আরে বাপ রে! বাদুড়কে মাফিক পেসিঞ্জর ঝুলকে ঝুলকে যাচ্ছে রে বাবা!" তার পর একদফা অট্টহাসি। হাসি থামিয়ে বলবে, "তা বেশ, বহুত ভালা, আপকে উন্নতিমে হামিলোক খুশী আছি।"

সুরেশ চায়ের কাপটি হাতে দিয়ে, বলে, লেন।

—দুঠো নিমকি তো দেও রে ভাই।

সুরেশ নিমকি দিয়ে আর একটি বিড়ি বার করে পাশে নামিয়ে দেয়। তার পর দেয় দুটি সুপারিকুচি। এবং চোখ টিপে নরসিংকে ইশারায় বলে, ফেলে দেন দু-আনি একটা। নরসিংয়ের কাছে বিদায়ী নিয়ে সুপারি চিবিয়ে বিড়ি ধরিয়ে নরসিং এবং সুরেশের কিছু হিতসাধন করে আস্তে আস্তে খসে পড়ে। তবে মধ্যে মধ্যে উপকার পায় নরসিং। এস-ডি-ও, ডি-এস-পি কি ম্যাজিস্ট্রেট, এস-পির, এ রাস্তায় যাবার কথা থাকলে সেটা তারা জানিয়ে

দেয়। শ্যামনগর চৌমাথাতেই বলে দেয়, আজ খোড়া হুঁশিয়ারিসে যাবেন ভাইয়া, পুলিশ-সাব যায়েগা পাঁচমতি।

পাঁচমতিতে বলে, এ ভাই, নরসিং দাদা, ডি-এস-পি কো আনে কা বাত হ্যায়।

নরসিং সেদিন আর মাডগার্ডের উপর কাউকে বসায় না। ভিতরের আট জনের মধ্যেও জন দুইকে কোনরকমে ফাঁকি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দেয়; ছ'জন এসে জুটবামাত্র নিতাইকে বলে, মার হ্যাণ্ডেল। রামকে রেখে যায় স্বরেশের দোকানে।

নিতাই অর্থপূর্ণ স্বরে ডাকলে, সিংজী!

নরসিং উত্তর দিলে. হুঁ। অর্থাৎ সে দেখেছে এবং ঠিক আছে।

ঘোড়ার গাড়িগুলো সামনে চলছে পাঁচমতি থেকে শ্যামনগর। চারখানা গাড়ির একখানা আগে আগে তার পাশাপাশি দুখানা, তাদের পিছনে একখানা। বেশ বন্দোবস্ত করে সাজিয়ে রাস্তা বন্ধ করে চলেছে। ওদের পাশ কাটিয়ে অতিক্রম করে যাবার উপায় নাই। হর্ন দিলেও সরবে না। অর্থাৎ ঝগড়া করার মতলব। অবশ্য নরসিং ইচ্ছা করলে পিছনের গাড়িখানাকে ডাইনে রেখে ওদের মেরে এখুনি বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভয় হয় মাডগার্ডে যারা বসে আছে তাদের জন্য। নিতাই রাম হলে 'কুচপরোয়া নেই' বলে সে বাঁকিয়ে দিত গাড়ি। কিন্তু এ সব হচ্ছে বচনবাগীশ 'ডরফোকনার' দল। মুখে লম্বা লম্বা বাৎ, রাজা উজার খতম করে দেয়, কিন্তু গাড়িটা একটু টলুক, কাত হোক—ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকবে, এ ওকে আঁকড়ে ধরবে আর চাৎকার করে উঠবে মেয়েছেলের মত।

মন্থর গতিতেই গাড়ি চলেছে। পুরনো গাড়ি, স্পীডোমিটার অনেকদিন আগে খারাপ হয়ে গিয়েছে। বারকয়েক মেরামত করিয়েছিল—তার পর সে একেবারেই জবাব দিয়েছে, এখন কাঁটাটা নড়েও না চড়েও না, পাঁচ মাইলের দাগের উপর কাত হয়ে পড়ে আছে; গাড়িখানা খুব জোর ঝাঁকি খেলেও নড়ে না—একটু-আধটু কাঁপে। নরসিং কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে বলে—উয়ো শারোয়া মর্‌গিহিস। খুব রাগ হলে একসময় ওটার উপর স্টার্টিং হ্যাণ্ডেলটা মেরে চুরমার করে দিতে ইচ্ছা হয় নরসিংয়ের। কিন্তু গাড়িখানার শোভা বাড়িয়ে রেখেছে বলে ভাঙে না। যাক সে কথা। স্পীডোমিটার খারাপ হয়ে গেলেও নরসিং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে গাড়ি কত মাইল জোরে

চলেছে। ছ-সাত মাইল। এর চেয়ে কমিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচ মাইলে নামালেও উপায় হবে না। ছ্যাকড়া গাড়ির পক্ষীরাজেরা তার চেয়েও কম জোরে চলেছে। ওদের আর দোষ কি? আকারে রামছাগলের চেয়ে একটু বড়, খেতে না পেয়ে এবং খাওয়ার অভাবে অষ্টপঞ্জর ঝরঝর করছে, নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে, চোখের কোণে পিচুটি জমেছে; লোহা এবং কাঠ দিয়ে গডা ওই গাড়ি, তার উপর পাঁচ থেকে সাত জন সোওয়ারীর ওজন টানবার ওদের ক্ষমতা কোথায়? টানে চাবুকের চোটে—জান দিয়ে কলিজা ফাটিয়ে টানে, দাঁড়াতে পেলেই হাঁপায়। কতকগুলোর পিঠে গাড়ির সাজের ঘর্ষণ লেগে ছাল চামড়া উঠে দগদগে ঘা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে মায়া হয় নরসিংয়ের। মনে হয় ওই কোচম্যানগুলোকে ধরে ওই চাবুক কেড়ে নিয়ে চাবকায়। আবার কখনও কখনও দয়াও হয়। মনে হয় সে মোটর নিয়ে আসাতেই ওদের মন্দ দশা আরও মন্দ হয়ে গিয়েছে। কোচম্যানদের রুটি, ঘোড়াগুলোর দানা-পানিতে সে-ই ভাগ বসানোর জন্যই ওদের ওই দশা। এব আগে বোধ হয় আরও একটু গায়ে-গতরে ছিল ঘোড়াগুলো! কিন্তু সে কি করবে? এই তো দুনিয়ার ধারা-ধরন। একজন ওঠে একজন পড়ে। মানুষের মত এই সব ব্যাপারেও ঠিক ওই এক ধারা-ধরন। কেরোসিন এসে রেড়ির তেলকে ওঠালে। লণ্ঠন এসে ডিবিয়াকে ওঠালে। দুমড়ে ভাঁজার চাকু ছুরির আমদানি হল, কামারে ছুরীর দিন গেল। ক্ষুরের মাথা খেতে বসেছে, বাজারে 'বেলেড' ক্ষুর এসেছে। গাঙের বুকে নৌকার রেওয়াজ উঠতে বসেছে ইষ্টিমারের ধাক্কায়। তামাকের ব্যবসাতে মন্দা পড়েছে, সিগারেট চলছে মুখে মুখে। কলকাতাতে ট্রামগাড়ি ঘোড়ার গাড়ির মাথা খেয়েছিল, সেই ট্রামগাড়ি কায়দা হয়ে গেল —দোতালা বাসের রেওয়াজে। শ্যামনগর পাঁচমতিতে এসেছে মোটর নিয়ে, ঘোড়ার গাড়ি নাজেহাল হবেই; সে না এলে আর কেউ আসত। সে হয়তো দু-দিন আগে এসেছে, অন্য লোক আসত দু-দিন পরে। তফাত এইটুকু।

ঘন ঘন বারকয়েক হর্ন দিয়ে নরসিং মুখ বাড়িয়ে বললে—কি হে পথ দেবে না দেবে না? মতলব কি?

উত্তর দিল না ওরা। কষের দাঁতে জিব ঠেকিয়ে ক্যা-ক্যা শব্দ করে মাথার উপর চাবুক ঘুরিয়ে শব্দ করতে লাগল।

এদের সঙ্গে লড়াই একদিন দিতেই হবে। না দিয়ে উপায় নাই। নিতাই পাশে দাঁড়িয়ে আপন মনেই গাল দিতে শুরু করেছে। নরসিং ছত্রীর ছেলে।

লড়াই দিতে পিছপাও নয়। কিন্তু সে তাকালে গাড়ি-ভর্তি প্যাসেঞ্জারদের দিকে। কেরানীবাবু আর ইস্কুল-মাস্টার সব। বিপদ এদের নিয়ে। একটা কিছু হলে ওরা গাড়ি থেকে নামতে শুরু করবে। তার পর ওরাই দেবে তার ব্যবসার গায়ে জল। ইতিমধ্যে ওরা অধীর হয়ে উঠেছে। হাতের বিড়ি সব নিবে গিয়েছে, ধরেই আছে; উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে ঘোড়ার গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে—উঃ—আঃ করছে। নরসিং আবার হাঁকলে –এই ঘোড়ার গাড়ি!

ঘোড়ার গাড়ির একজন কোচওয়ান বললে—রাস্তা তো কারুর বাবার নয়, এস না তুমি পিছু পিছু।

নিতাইয়ের আর সহ্য হল না, সে লাফিয়ে নেমে এগিয়ে গিয়ে বললে—মোটরের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি যেতে পারে না। তাকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে।

একজন—এ সেই সোভান, সোভান আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে, তার পর বললে সকলের পিছনের গাড়িওয়ালাকে– এ কাদির, দে না বে চাবুকটা হাঁকড়ে শালার মুয়ে।

নিতাই ক্ষেপে উঠল। গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের সকলেও গরম হয়ে উঠেছে। একজন বললে—আজই গিয়ে একটা দরখাস্ত করতে হবে। এ তো ওরা অত্যাচার আরম্ভ করেছে।

একজন মুখ বাড়িয়ে বললে—কি হে, তোমাদের গাড়ি তোমরা এক পাশ করবে কিনা?

সোভান হেসে দাঁত বার করে কাদিরকে বললে—আবে কাদির, শালা, চুনো পুঁটিরা কি বলছে রে?

কাদির জবাব দিলে—বেইমান হারামী সব আজ মোটর পেয়েছে। সা-লা—মোটর—! সালা—!

নিতাই এগিয়ে চলল ঘোড়ার মুখের কাছে—গিয়ে লাগাম ধরে টেনে এক পাশে সরিয়ে দেবে জোর করে। নরসিং হঠাৎ ডাকলে—নিতাই!

নিতাই জবাব দিলে—থামুন, আমি দিচ্ছি ঠিক করে।

—ফিরে আয়।

—ফিরে যাব? নিতাই বিস্মিত হয়ে থমকে ঘুরে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ। নরসিং স্টীয়ারিংয়ে পাক দিয়ে গাড়ির মুখ ঘোরাচ্ছে বাঁ পাশে। বাঁ পাশের ঢালটা বেশ চওড়া। বেশ ক্রমে ক্রমে ঢালু হয়ে পাশের মাঠের সঙ্গে মিশেছে। নরসিং সামনে স্থির দৃষ্টি রেখে ডাকলে—নিতাই!

নিতাইয়ের মন বিদ্রোহী হলেও উপায় নাই। গাড়ি নামবে ঢালের মুখে, সিংজীর বাঁ পাশে দু-জন লোক বসেছে। মাডগার্ডে লোক বসেছে, বাঁ পাশটায় সিংজীর নজর পুরো চলবে না। ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে তাকে ওপাশটা দেখতে হবে, বলতে হবে সিংজীকে—'ঠিক আছে। চলুক, চলুক। হুঁশিয়ার গচকা আছে, হুঁশিয়ার। আচ্ছা—ঠিক হ্যায়।'

গাড়ি নামল ঢালের মুখে।

—ও বাবা, মাঠে নামছে কোথা হে? আরে ওহে—ওই, কি বিপদ, এই এই! ওহে! মাডগার্ডের একজন চীৎকার করে উঠল।

—চুপ করুন, ঠিক আছে। ভয় নেই।

সোভন চেঁচাচ্চে—চল—চল জলদি। সপাসপ চাবকাচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। ওরা বুঝতে পেরেছে নরসিং মাঠে নেমে মাঠের উপর উঠবে। ঘোড়াকে প্রাণপণে মারছে ওরা।

গ্রীষ্মকালে শস্যশূন্য ক্ষেত, সমতল মাঠে মাটি কঠিন হয়ে আছে। নরসিংয়ের গাড়ির চাপে মাটির উপরের স্তরটা শুধু মুড় মুড় করে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি ছুটেছে—অন্তত পনের মাইল বেগে ছুটছে। সড়কের চেয়ে মাঠ অনেক ভাল।

গতির প্রতিযোগিতার একটা কৌতুক লেগেছে প্যাসেঞ্জারদের মনে। সকলেই চেষ্টা করছে দেখতে—ডান দিকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ক্রমশ পিছনে পিছিয়ে যাওয়া ঘোড়ার গাড়িগুলোর দিকে। দাঁতে দাঁত ঘষে ওরা ঘোড়াগুলোকে ঠেঙাচ্ছে। নরসিংও দেখে একটু হেসে দৃষ্টি ফিরিয়ে সোজা গাড়ির সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে—হবে একদিন ওদের সঙ্গে।

আজই না-হওয়ার জন্য নিতাই একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সে বললে—আপনি ভয় পেয়ে গেলেন. নইলে আজই হয়ে যেত একটা হেস্তনেস্ত।

—ভয়? নরসিং রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রূঢ়স্বরে বললে—ভয়?

—নইলে—আজই তো—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু প্যাসেঞ্জারদের কথা আমাকে আগে ভাবতে হবে। ওঁদের আপিস আছে, আদালত আছে, ইস্কুল আছে। ওঁদের টাইম মাফিক পৌঁছে দিতে হবে আমাকে। তা ছাড়া মারামারি হলে ওঁদের কারও কিছু হলে তখন কি হবে?

—ঠিক কথা।

—হাজার হলেও তুই হলি হোঁতকা। বুঝলি? ঝগড়া ঘোড়ার গাড়ির কোচওয়ানদের সঙ্গে আমাদের। ওঁদের কিছু নয়। সে ঝগড়া মারামারি করব আমরা। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—হবে সে ঝগড়া, আলবাৎ হবে, দেখবি সেদিন।

লজ্জিত নিতাই পিছনের দিকে তাকিয়ে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের দেখছিল, আর চেঁচিয়ে ডাকছিল—আও—আও—জলদি—আও। নিজের খুশীকে সে ঠিক যেন ব্যক্ত করতে পারছিল না। তাই হিন্দী বন্ধ করে—তার মাতৃভাষায় প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকলে—আয় রে—শালারা—আয়। তারপর সে দেখাতে আরম্ভ করলে বুড়ো আঙুল। তারপর সে আবার চীৎকার করে উঠল—পাঁচমতি-শ্যামনগর, শ্যামনগর-পাঁচমতি মোটর সার্বিস।

অকস্মাৎ সে চীৎকার করে উঠল, গেল রে—মল রে—গেল রে। আ—শালা।

নরসিং সন্ত্রস্ত সতর্ক হয়ে উঠল, গাড়ির ব্রেক কষতে আরম্ভ করলে। প্যাসেঞ্জারেরা কেঁপে উঠল। বুক তাদের ঢিপ-ঢিপ করছে।

— ছোট্ শালারা, ছোট্। রাস্তা বন্ধ করে ছুটবে। শা—লা!

কোন বিপদ তাদের সামনে আসে নাই। বিপদ ঘটেছে ঘোড়ার গাড়ি-গুলোর। পাশাপাশি গাড়িগুলো ছুটছিল প্রাণপণ গতিতে। হঠাৎ দুটো গাড়ির চাকায় চাকা বেধে গিয়ে বিপদ ঘটেছে। একখানার চাকা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ে আর একখানার গায়ে হেলে পড়ে কোনরকমে মারাত্মক বিপদ থেকে বেঁচেছে।

নরসিং একবার তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তারপর সে অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি নিজের গাড়ির সামনে নিবদ্ধ করে ষ্টীয়ারিং ঘোরাতে আরম্ভ করলে। এইবার মাঠ ছেড়ে আবার সে সড়কে উঠবে।

সড়কে উঠে সে প্যাসেঞ্জারদের দিকে তাকিয়ে বললে—পরের মন্দ, বুঝলেন কিনা, এ যে করতে যাবে, বিপদ তারই হবে। আপন ধর্মে যে থাকবে, ভগবান তাকে রক্ষা করবেনই।

রাস্তার উপর উঠল গাড়ি। খোলা রাস্তা। সামনে আর ঘোড়ার গাড়ি নাই। নিতাই বললে, লেন—লাইন কিলিয়ার।

মাইল দেড়েক অতিক্রম করেই শ্যামনগরের তিন মাইল ভাল রাস্তা। নরসিং গাড়িতে স্পীড দেবার আগে মাঠের দিকে তাকিয়ে আর একবার দেখে

নিলে। গ্রীষ্মের ধূলিসমাচ্ছন্ন কাঁচা সড়ক, ধুলোর রাশি উড়িয়ে চলল গাড়ি। পাঁচমতি-শ্যামনগর মোটর সার্ভিস।

আজ কিন্তু পঞ্চাশ মিনিট লাগে নাই। লেগেছে সাতচল্লিশ মিনিট। তিন মিনিট আগে এসে পৌঁছে গিয়েছে। প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলল—হাই ইস্কুল পোস্টাপিস হয়ে মোড় ফিরে কোর্টের সামনে দিয়ে এক্সাইজ আপিসের সামনে আবার মোড় ফিরে বাজারের মধ্যে মোটর-পার্টসের দোকানের কাছে।

পাঁচমতির প্যাসেঞ্জারেরা আজকাল ওই দোকানের সামনেই অপেক্ষা করে। সকালের দিকে প্যাসেঞ্জার খুব বেশী হয় না। রাত্রে যারা গঙ্গার ঘাট ইষ্টিশানে ট্রেনে নেমে ওদিকের মোটর সার্ভিসে শ্যামনগর আসে তারা এক দফা যায় প্রথম ট্রিপে। তারপর দুটো ট্রিপ—একটা আটটায়, শেষটা সাড়ে দশটায়। এ দুটো ট্রিপে লোকজন বেশী হয় না। কোন ট্রিপে তিন, কোনটায় চার। বিকেলবেলা থেকে পাঁচমতি যাবার লোক বেশী। সকালে যারা এল তারাই ফেরে। সাড়ে তিনটে থেকে ট্রিপ শুরু; সাড়ে তিনটেয় ছেড়ে চারটে পাঁচ বা দশ মিনিটে পাঁচমতি; সাড়ে চারটেয় পাঁচমতির তিন-চারজন নিয়ে শ্যামনগর পাঁচটায়। এবার পাঁচটা পনের মিনিটে বোঝাই গাড়ি নিয়ে পাঁচমতি। সকালের সেকেণ্ড ট্রিপে কেরানীবাবুরা আসে, তারাই ফিরবে। একেবারে হাঁ-হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চেপেই বলে—চল—চল। কিন্তু তবু সকালের সেকেণ্ড ট্রিপের মত ভিড় হয় না। মাডগার্ডে কেউ বসে না। ভেতরেই বসে আটজন। সকালে যাদের কোনরকমে দেরি হয়ে যায় অথচ আপিসে ঠিক সময়ে পৌঁছুতেই হবে, তারাই দায়ে পড়ে মাডগার্ডে বসে। বিকেলে আপিসের তাড়া নাই; আপিসের সায়েব নাই বাড়িতে; কাজেই তারা ঘোড়ার গাড়িতে এক আনা পয়সা বাঁচিয়ে একটু আরাম না হোক আমিরী করে বাড়ি ফেরে।

গাড়িখানা এসে দাঁড়াল মোটর-পার্টসের দোকানের সামনে। নিতাই রেডিয়েটারের ঢাকনিটা খুলে দিলে। এক ঝলক টগবগে ফুটন্ত জল উছলে পড়ল, ধোঁয়া বার হচ্ছে। ভিতর থেকে মগ বার করে ঠাণ্ডা জল ভরে দিলে। গরমের দিন, ইঞ্জিন তেতে উঠেছে, একটু হাওয়া লাগার প্রয়োজন।

রামেশ্বর আর তারক বসে আছে তেল-কালি মেখে। সেলাম করে

রামেশ্বর বললে—কি সিংজী কেমন ?

হাসলে নরসিং, সেও সেলাম করে বললে—ভাল। আপনি ভাল ? এলেন কখন ?

রামেশ্বর এবং তারককে বদলি করেছে মোটর সার্ভিসের মালিক। তাদের সদর শহরে নিয়ে গিয়েছে, সেখানকার মেরামতি কারবারে কাজ দিয়েছে। এখানকার পাদরীসাহেব চিঠি লিখেছিল। সেই মেরী নীলিমার ব্যাপার। কোম্পানি ওদের বদলি তো করেইছে উপরন্তু শাসিয়েও দিয়েছে।

মেরী নীলিমা আশ্চর্য মেয়ে ! চোখ রাস্তার উপর রেখে সেই যে বাড়ি থেকে বার হয়—ইস্কুলে পৌঁছুবার আগে চোখ তোলে না।

সাড়ে দশটা বাজে। এখন এখানে মর্নিং ইস্কুল চলেছে। এইবার সে ফিরবে। পাঁচমতি ট্রিপ নিয়ে যাবার পথে রোজ দেখা হয় তার সঙ্গে। এই ট্রিপে যাবার সময় নরসিং ইচ্ছা করেই একটা রাস্তা ঘুরে যায়। ব্যাপারটা নিতাই বুঝেছে। সে হেসে বলে—সিংজীর এই 'টিরিপে' 'দিগ ভম' হয় !

নরসিং কিছু জবাব দেয় না। গোপনে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। নীলিমা দাস বড় ভাল মেয়ে। তাকে তার ভাল লাগে। তার বেশী কিছু নয়। জোসেফ মোটর-ড্রাইভার, কিন্তু নীলিমা পাস করে ইস্কুলে মাস্টারি করে। নসিবের খেয়াল। গিরবরজার সিংরায় বাড়ির ছেলে সে, আর গিরবরজার হাড়ী, যাদের—। যাক, ছুনিয়ার হাল-চাল ! আপসোস করে লাভ নাই। নসিবের খেয়ালে আজ সে মোটর-ড্রাইভার। তার ওই ফট্‌কিই ভাল।

ফট্‌কিও আজ কদিন আসে নাই। সাহুজী শুখনরাম কিছু আঁচ পেয়েছে বোধ হয়। কাঠেঘেরা বারান্দায় যে জানালাগুলো ছিল তাতে আজকাল সন্ধ্যার সময়েই মজবুত তালা চাবি বন্ধ হচ্ছে। সাহু একদিন বলেছিল হাসতে হাসতে—আওরতকে কভি বিশোয়াস করবেন নাই সিংজী।

আরও খবর পেয়েছে, একদিন নাকি ফট্‌কিকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করেছে।

অন্যমনস্ক ভাবে নরসিং একটু সরে এসে নির্জনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। এখান থেকে নীলিমা দাসের আসবার পথটা দেখা যায়।

হর্ন দিচ্ছে নিতাই। নিজের পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলে নরসিং। পকেটে একটা মোটা ওয়াচ রাখে সে। মেজবাবু দিয়েছিলেন। সাড়ে দশটা বাজে। নরসিং সেখান থেকে এসে দাঁড়াল গাড়ির পাশে। তিনজন প্যাসেঞ্জার এ ট্রিপে গাড়িতে চেপে বসল। নিতাই হাণ্ডেল

ঘুরিয়ে স্টার্ট দিলে।

—পাঁচমতি! পাঁচমতি! পাঁচমতি! লাস্ট টিরিপ, লাস্ট টিরিপ!

গাড়ি চলল, ঘুরল নরসিংয়ের দিগ্‌ভ্রমের রাস্তায়। কই, কোথায় আজ মেরী নীলিমা দাস? দূর থেকে ছাতা দেখা যাচ্ছে না তো?

পথে একটা গরুর গাড়ির আড্ডা। এখান থেকে তিন মাইল দূরে এক জাগ্রত মা-কালীর স্থান। সেখানে যাত্রী যায় শনি-মঙ্গলবার। একটা হাটও সেখানে আছে—আলু কলাইয়ের আড়ত আর গরুও বিক্রি হয়। গরুর গাড়ি এই পথে ভাড়া খাটে। শনি-মঙ্গলবার মা-কালীর যাত্রী নিয়ে যায়। সোম-শুক্রবার হাট।

আজ এখানে ভূপা মাহাতো আর সখিরাম কাহার তাদের ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসে জুটেছে দেখা যাচ্ছে। গরুর গাড়িওয়ালাদের সঙ্গে যাত্রী নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। এখানে কয়েক মুহূর্তের জন্য না দাঁড়িয়ে নরসিং পারলে না। ভূপা আর সখিরাম এসেছে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের রুটি মারতে। চলবে—তা চলবে। যাত্রীরা ঘোড়ার গাড়ি পেলে গরুর গাড়িতে যাবে কেন?

—পাঁচমতি! পাঁচমতি! পাঁচমতি! লাস্ট টিরিপ! গাড়ি শ্যামনগরের মিশন গার্লস স্কুলের সামনে দিয়ে ধূলো উড়িয়ে এসে পড়ল তে-মাথায়। গার্লস স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মেরী নীলিমা। শহর পার হয়ে মাঠের মধ্যে এসে নরসিং বললে—রবিবার দিনে মনে করে রাখবি নিতাই, একখানা টামনা নিতে হবে সঙ্গে।

রবিবার এ লাইনেও ট্রিপ কম। ইমামবাজারের মত এখানেও রবিবার আরাম করে নরসিং নিতাই রাম। ঘাটরোড-শ্যামনগর সার্ভিসের কোম্পানীর কারবারেও রবিবার ছুটো ট্রিপ কম। জোসেফের কিন্তু রবিবারে ছুটি নাই। এস-ডি-ও সাহেব টুরে বার হন শুক্র-শনিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত। টুরে না বার হলে যান ঘাটরোড—একবার সদর শহর ঘুরে আসেন। যে সপ্তাহে টুরে যান না সেই সপ্তাহের রবিবারটা তার ছুটি।

এ রবিবার নরসিং সকালবেলায় লাস্ট ট্রিপ মেরে নিতাইকে বললে—সাহুজীকে বলে রেখেছি দুখানা টামনা নিয়ে যাব। চাইলে দেবে।

টামনার প্রয়োজন সম্বন্ধে নিতাই কোন প্রশ্ন করলে না। সে কথা হয়ে গিয়েছে ওদের রাত্রির আলোচনার মধ্যে। শুকনো ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে নরসিং

যে নতুন রাস্তাটা অবিষ্কার করেছে—ধান তোলার প্রয়োজনে গরুর গাড়ির চাকার দাগ ধরে—সে রাস্তার জমির আলগুলো ছেঁটে সমান করে নেবে; কাজ খুব বেশী নয়, তিনজন ঘণ্টা কয়েক পরিশ্রম করলেই হয়ে যাবে। পঞ্চাশ মিনিট কমে এসে পঁয়তাল্লিশে নেমেছে এই কয়েক দিনের মধ্যে; কেটে ছেঁটে বেশ সমান করে নিলে চল্লিশ মিনিটে ট্রিপ এসে যাবে।

নিতাইয়ের সঙ্গে শুখনরামও বেরিয়ে এল। বললে—চলেন, আমাকে ওকিলবাবুর মোকামে ছেড়ে দিয়ে যাবেন। দরকার আছে। নিজেই সে গাড়ির দরজা খুলে ভিতরের সীটে বসে পড়ল ধপ করে। গাড়িটা দুলে উঠল তার ভারী দেহের আকস্মিক পতনে। উপায় নাই! মহাজন। তার উপর তারই বাড়িতে রয়েছে। এ বেগারটুকু দিতেই হবে। সাহুজী সিগারেট বার করে বললে—খান।

হঠাৎ বললে—ওই কেরেস্তানটার বাড়িমে আপনি যান সিংজী?

নরসিং বিরক্ত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সাহুজীর দিকে চেয়ে আবার তখনই সামনে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

সাহু বললে—আরে রাম-রাম। কেরেস্তান উলোক! না—যাবেন না আউর। আরে ছি! এর পর সে অনর্গল অশ্লীল কথা প্রয়োগ করে যায় জোসেফ এবং মেরী নীলিমা সম্পর্কে। নরসিংকে উপদেশ দেয়—ওই কেরেস্তান মেয়েটির মোহে যেন কদাচ না পড়ে।

নরসিং চুপ করে গাড়ি চালিয়ে যায়, কোন উত্তর দেয় না। বিশেষ করে আজ এই রবিবার দিন—সাহুর কথাগুলো তার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিজনক হয়ে উঠছে। রবিবার বিকেলবেলা জোসেফের বাড়িতে চমৎকার একটি চায়ের আসর বসে। রবিবার দিন জোসেফের সাজ-পোশাকের ঘটাটা একটু বেশী। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনেও বেশ একটি পারিপাট্য থাকে। রীতিমত মাখন দিয়ে টোস্ট, বাড়ির তৈরী কেক, ডিম, তার সঙ্গে চা! বিকেলের আসরে জোসেফও প্রায় সাহেবের টুর সেরে ফিরে আসে; দু-এক রবিবার থাকে না। কিন্তু সে না থাকলেও ক্ষতি হয় না। নরসিং বেশ স্বচ্ছন্দেই যায়। মেরী নীলিমার সাহচার্য তার ভাল লাগে। সে মনে মনে ধন্যবাদ দেয় ভগবানকে যে, ভাগ্যিস জোসেফ মোটর-ড্রাইভার হয়েছে নইলে নীলিমার মত মেয়ের সঙ্গে তো তার কথা বলবার সুযোগই জুটত না! আরও ভাবে—দুনিয়ার মালিকের মজার খেয়ালের কথা। জোসেফের ঠাকুরদার বাপ ছিল গিরবরজার হাড়ী। ছত্রীদের

বাড়ির সবচেয়ে ছোট কাজ করত। কেন ক্রীশ্চান হয়েছিল সে কথাও খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছে নরসিং।

তেরো

জোসেফ থেকে তিন পুরুষ আগে তার ঠাকুরদার বাপ অর্থাৎ প্রপিতামহ ক্রীশ্চান হয়েছিল। ক্রীশ্চান হয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য। গিরবরজার সিংদের উচ্ছিষ্ট একটি গোপকন্যা রোগজীর্ণ হয়ে অকাল-বার্ধক্যে কুৎসিত হয়ে পড়ায় রক্ষক সিংটি তাকে ত্যাগ করে পথে বার করে দিয়েছিল। একটা প্রবাদ আছে যে, পশুরাজ সিংহ কখনও রোগা জানোয়ার খায় না। গিরবরজার সিংরা সে প্রবাদ মেনে চলত। শুধু গিরবরাজ সিংরাই নয়, যৌবন-বিলাসী পশুরাজ মাত্রেরই এই এক স্বভাব। এ পশুরাজেরা শুধু গুজরাট আফ্রিকায় বাস করে না, এ নরসিংরা পৃথিবীর সর্বত্রই বাস করেন। থাক্ সে কথা। ওই রোগজীর্ণ অকালবৃদ্ধা গোপকন্যাটিকে সিংমশাই পরিত্যাগ করার পর তাকে আশ্রয় দিয়েছিল জোসেফের প্রপিতামহ। সে ছিল ওই সিংমশায়টিরই অনুচর; পুরাকালের গল্পের সিংহ-ব্যাঘ্রের অনুচর শৃগাল বললে ঠিক হবে না, তবে সেনাপতি বনবরাহ বললে ভুল হবে না। সেও শক্তিশালী লাঠিয়াল, সুস্থ যৌবনধন্য। ওই মেয়েটির প্রতি তার একটা আকর্ষণ ছিল, প্রভুর ভয়ে দমিত আকর্ষণ; সেই আকর্ষণেই কঙ্কালসার মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়ে তার অতৃপ্ত মালিকানা স্বত্বের কামনা পরিপূর্ণ করতে চেয়েছিল। নিছক মালিকানা স্বত্ব ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ উর্বর জমিতে বালি পড়ে মরুভূমি হয়ে গেলে যে অবস্থা হয়—মেয়েটির তখন সেই অবস্থা। সিং তাতে তখন আপত্তিও করে নাই। ছেঁড়া জুতো পথে ফেলে দিলে যদি কেউ কুড়িয়ে নেয়—তাতে আপত্তি কেউ করে না, কিন্তু জোসেফের প্রপিতামহের অধ্যবসায় ছিল অপরিসীম। সে মেয়েটার সেবা আরম্ভ করলে। সেবা আর অন্য কিছু নয়—তাকে দিলে সে পরিপূর্ণ বিশ্রাম আর আহার। আহার তাও আঙুর বেদানা ডালিম এসব নয়—সে তাকে খেতে দিলে তারা যা খায়, পাঁকাল মাছ, শামুক গুগলি, ডাল, ভাত আর বাড়ির গরুর খাঁটী দুধ! মাস কয়েকের মধ্যেই মেয়েটির মাথায় চুল উঠে গেল, গাল দুটো হয়ে উঠল কাঁচা টমেটোর মত।

ক্রমে মাথায় চুল গজাল, কাঁচা টমেটোর মত গাল দুটোয় যেন পাক ধরল। কপালের কালচে ভাবটা কেটে গেল, ফুটে উঠল তার সাবেকের রঙ। মেয়েটাকে নিয়ে জোসেফের প্রপিতামহ প্রায় পাগল হয়ে উঠল। মেয়েটাও, কৃতজ্ঞতাই হোক আর প্রেমই হোক, একটা কিছুর বশবর্তী হয়ে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করলে রক্ষাকর্তার কাছে। জাতি বিচার করলে না, রূপ বিচার করলে না, অবস্থা বিচার, কি অন্য কোন বিচারই করলে না। মেয়েটার নব কলেবরের কথা গিয়ে পুরাতন সিং মালিকের কানে পৌছল। সিংজাতীয় পুরুষেরা চায় যৌবন, রূপ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য কি ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার করে না, তুচ্ছকুলোদ্ভবা স্ত্রীরত্ন স্পর্শ করতে কোন দ্বিধা তাদের নাই—পূর্ব মালিকও সিং —সেও বিচার করলে না। একেবারে সরাসরি গিয়ে সিং-মহাশয় জোসেফের প্রপিতামহের বাড়ির দরজায় কেশর ফুলিয়ে দাঁত বার করে থাবা গেড়ে বসল। জাতিগৌরবে বঞ্চিত জোসেফের প্রপিতামহ সাহসের অভাবে সিংপদবাচ্য ছিল না বটে, কিন্তু গোঁ এবং শক্তিতে সে কম ছিল না—এদিক দিয়ে বিচার করলে অনায়াসেই তাকে ভীম বরাহ বা মহিষাসুর বলা যেতে পারত। দ্বন্দ্ব যুদ্ধও বাধত, কিন্তু এই মেয়েটি তাকে সুবুদ্ধি দিলে। রাত্রির শেষ প্রহরে দুজনে উঠে গ্রাম ত্যাগ করলে। আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করেছিল অবশ্য জোসেফের প্রপিতামহ নিজেই। পাদরীরা তখন এ অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল। তুলসী-মাহাত্ম্যের কদর্থ ব্যাখ্যা করে উলঙ্গিনী কালীমূর্তির বর্বরতা ও অসভ্যতা লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কালা-আদমীকে গোরা বানাচ্ছিল। সর্বদেশে সর্বকালে সমাজ ও রাষ্ট্রে অবহেলিত নিপীড়িতেরা মজ্জমানের তৃণ থেকে তৃণান্তর আশ্রয় গ্রহণের মত ধর্ম থেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করে থাকে; জোসেফের প্রপিতামহও সটান এসে উঠল শ্যামনগরের পাদরীদের আশ্রয়ে। মুসলমান হওয়ার কথাও ভেবেছিল, সে তখন মরীয়া, এই মেয়েটিই তখন তার সব; কিন্তু তার বিবেচনায় মুসলমান হওয়া ভাল মনে হয় নাই। মুসলমানেরা ঠিক ওই পাদরীসাহেবের মত ঐশ্বর্য বা জোরালো আশ্রয় দিতে পারে না—আরও একটা কথা মনে হয়েছিল—সেটা আশঙ্কার কথা—সিংদের মত তাদের মধ্যেও নারী-শিকার নিয়ে মারামারি বেশী; ওদের মধ্যেও শের মর্দানার প্রাদুর্ভাব অনেক। আরও ছিল। জোসেফের প্রপিতামহ জানত যে, মুসলমান হলেন মীরজা, মল্লিক, খাঁ—ওরা তার সঙ্গে চলবে না, ভাল কুলের সেখরাও তার সঙ্গে চলবে না, তাকে চলতে হবে

এই সব ঘরানা ঘরের বাড়িতে যারা চাকর, খেটে খায়, যাদের গাড়ির ছেলে-মেয়েরা ভোরবেলা গ্রাম-গ্রামান্তরের কাঠ ভেঙে আনে, পাঁকালমাছ ধরে —তাদের সঙ্গে। কেরেস্তান ধর্মে এ সব নাই বলেই তার ধারণা ছিল। তাই সে মেয়েটিকে নিয়ে সটান এসে উঠল শ্যামনগরে; পাদরীদের গির্জার সিঁড়ির পাশে আস্তানা গাড়লে। শ্যামনগরে তখন একজন ব্রাহ্মণ, দুজন কায়স্থ এবং ঘর দুয়েক মুচি—এই নিয়ে সবে ক্রীশ্চান-পল্লীর পত্তন হয়েছে। ব্রাহ্মণ যুবকটি তখন দাড়ি রেখেছে এবং সে দাড়ি বেশ বড়ও হয়েছে। পাদরীদের মত আলখাল্লা পরে বুকে লোহার 'করস' ঝুলিয়ে সে বেড়ায়। কায়স্থেরা চাকরি করে। একজন সকলকে লেখাপড়া শেখায়। অন্যজন সাহেবদের হিসাবনিকাশ করে।

ব্রাহ্মণ ছেলেটি বিয়ে করে নিয়ে এল মুর্শিদাবাদ থেকে, চমৎকার মেয়েটি —বৈদ্য কেরেস্তানের মেয়ে; কায়েস্থেরাও বিয়ে করলে; একজন কায়স্থ বিয়ে করলে কলকাতায়, বিয়ে করে সেইখানেই সে থেকে গেল। অন্যজন বাধ্য হয়ে বিয়ে করলে ওই মুচি কেরেস্তানদের একটি মেয়েকে। বাধ্য হয়ে বিয়ে করলে, তার কারণ মেয়েটি তখন সন্তানসম্ভবা।

তার পর তিন পুরুষ ধরে অর্থাৎ জোসেফ পর্যন্ত পরিবর্তন অনেক হয়েছে।

ব্রাহ্মণ-ক্রীশ্চানের বংশের একটি শাখা এখনও এখানে আছে। বাকী তিনটি শাখা এখান থেকে চলে গিয়েছে। একটি শাখা কলকাতায়, এক শাখা মাদ্রাজ অঞ্চলে, অন্যটির খোঁজ কেউ জানে না; কায়স্থের যে ছেলেটি বিয়ে করে কলকাতাতেই থেকে গিয়েছিল; তাদের বংশের ছেলেদের কয়েকজন পুলিস সার্জেণ্ট হয়েছে। ব্রাহ্মণ ছেলেটির যে শাখাটি এখানে আছে তাদের বাড়ির কর্তা এখানকার পাদরী রেভারেণ্ড ব্যানার্জী। ব্যানার্জীর দুই ছেলে, এক ছেলে এম-এ পাস করে ডেপুটিগিরি পেয়েছে। অন্যটি বি-এ পাস করে বসে আছে। বসে আছে তার কারণ ছেলেটি কানা এবং খোঁড়া দুই-ই। ছেলেবেলায় পায়ে অপারেশন হয়ে একটা পায়ের গোড়ালি গিয়েছে অকেজো হয়ে, তার পর এই কয়েক বৎসর আগে স্মলপকস্ হয়ে একটা চোখ গিয়েছে। ছেলেটির সম্ভবত বিয়ে হবে না। কে দেবে ওকে মেয়ে? যে সমাজে ওদের করণ-কারণ সে সমাজে কেউ বিয়ে করবে না ওকে। ওদের বাড়ির ছেলে-মেয়ের বিয়ে আজও এখানে হয় নাই। ছেলে-মেয়েরা কলেজে পড়তে যায়—

কলকাতাতে, সেখানে ওদের জানাশুনা বনেদী ঘর আছে, বেশ একটি গোষ্ঠীর গণ্ডিতে ঘেরা সমাজও আছে। তারই মধ্যে চলাফেরা করতে করতে ছেলে-মেয়ের আলাপ-পরিচয় হয়। সে পরিচয় ঘন হয়ে প্রেমে দাঁড়ায়—বিয়ে হয়। ক্রমে অবশ্য গণ্ডির পরিধি বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যাদের বলে, তাদের সঙ্গেও দু-একটা করণ হচ্ছে। একজন বিলেতে গিয়েছিল, সেখান থেকে সে খাঁটী ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে এনেছে।

বাকী ঘর কয়েকটির কয়েকটি শাখাও এখান থেকে চলে গিয়েছে; যারাই লেখাপড়া একটু ভাল শিখে ভাল উপার্জন করছে, তারাই চলে গিয়েছে কে কোথায় ঠিক সন্ধান জানা নাই। বেশ নাম-করা বড় কেউ হয় নাই, তাই কেউ সন্ধানও রাখে নাই। বাকী কয়েক ঘর এখানে পড়ে রয়েছে, মিশনের কাজকর্ম আঁকড়েই আছে। দু-চারজন ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য করে; কয়েকজন বেকার—সামান্য লেখাপড়ায় পাঠ্যজীবন শেষ করে মদ খেয়ে গুণ্ডামি করে কাল কাটাচ্ছে; প্রথম জীবনে জোসেফও ছিল তাদের মধ্যে একজন; পরে সে নিজেকে সংশোধন করে মোটর-ড্রাইভিং শিখে ড্রাইভারি করছে। মেয়েরা অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখে এখানকার ছেলেদের কাউকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করে। সকলেই অবশ্য চায় এদের মধ্যে যে ছেলেটি ভাল তাকেই ভালবাসতে, কিন্তু ভাল ছেলেরা এখানকার মেয়েদের দিকে তাকায় না, তারা অবসর খোঁজে বাইরে যাবার, সেখানে গিয়ে তাদের মনোমত জীবনসঙ্গিনী খুঁজে নিতে চায়।

যে কায়স্থ ছেলেটি বাধ্য হয়ে মুচির মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল তাদের উপাধি ঘোষ; ঘোষ-বাড়ির একটি ছেলে ম্যাট্রিক পাস করে রেলে গার্ড হয়েছে, তার দিকেই এখন সব বাড়ির গৃহিণীদের নজর, অবিবাহিতা মেয়েগুলিও মনে মনে তাকেই কামনা করে; নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখে—লাল পেণ্টিং করা রেলের বাংলো, সামনে এক টুকরো বাগান, দুয়ারে জানালায় রঙীন ছিটের পর্দা, বারান্দায় কিছু আসবাব, একজন খানসামা ইত্যাদি। আরও দুটি ছেলে এখানে কোর্টে কেরানীর কাজ করে। তাদেরও তারা অবহেলা করে না, কিন্তু ধরা দিয়ে বাঁধা পড়তেও চায় না। জোসেফের বোন মেরী নীলিমা কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের মেয়ে। কালো মেয়েটির মনে যে কি স্বপ্ন তা সে-ই জানে। সে এদিক দিয়ে একেবারে হিম-শীতল নিস্পন্দ অর্থাৎ মৃত বললেই হয়। সে ওই গার্ড-সাহেবের বাড়িও কোনদিন যায় না। সে বাড়ি এলেও

যায় না। এখানকার মেয়েদের মধ্যে সেই কেবল ম্যাট্রিক পাস। তাও থার্ড ডিভিশনে পাস করেছে। রেভাণ্ডের ব্যানার্জীর চেষ্টায় এখানকার এম-ই গার্লস স্কুলে সবচেয়ে ছোট শিক্ষয়িত্রীর চাকরি পেয়েছে। ম্যাট্রিক পাসও করেছে সে ওই রেভারেণ্ড ব্যানার্জীর কৃপায়। তিনি তাঁর ওই কানা খোঁড়া ছেলেটিকে বলে দিয়েছিলেন নীলিমার পড়াশুনা একটু দেখে দিতে। নীলিমার অসাম ধৈর্য তাই ওই বসন্তের দাগে ক্ষতবিক্ষত একচক্ষু লোকটার কাছে মাসের পর মাস বসে থেকে পড়া বলে নিয়েছে। এখনও দিনে একবার যায় তার কাছে, ইচ্ছে—প্রাইভেটে আই-এ দেবে। কেরানী ছেলে দুটি অত্যন্ত ব্যগ্র তার মনোরঞ্জনের জন্য। নীলিমার মত স্ত্রী তাদের কাছে আদর্শ স্ত্রী। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের পরিশ্রমের উপার্জনে বেশ একটি সচ্ছল সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখে তারা। কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে নীলিমার এদিক দিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় না। অথচ এখানে শহর জুড়ে নীলিমাকে নিয়ে নানা অবাঞ্ছনীয় আলোচনা এবং আলোড়ন চলছে।

এখানকার হিন্দু এবং মুসলমান তরুণ সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ অংশ সতৃষ্ণ নয়নে নীলিমার দিকে চেয়ে থাকে। ক্রীশ্চান-সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত—এই বিধানকে তারা স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগের বিধান মনে করে এবং ক্রীশ্চান মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার কুৎসিত ব্যাখ্যা করে, প্রলোভন দেখায়, বিরক্ত করে। কখনও কখনও দু-একটা নিন্দ্যনীয় কাণ্ডও ঘটে যায়। দু-চারটি মেয়ে এদের নিয়ে খেলাও করে। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশের দৃষ্টি এখন পড়েছে গিয়ে এই কালো মেয়েটির উপর। সকল কুরূপকে উপেক্ষা করে তার প্রতি আকর্ষণের কারণ—সে লেখাপড়া শিখেছে। বাংলাদেশে আজও পর্যন্ত শিক্ষিতা মেয়েদের জীবন-দর্শনের যে বিকৃত ব্যাখ্যা সর্বত্র প্রচলিত, এখানে সে ব্যাখ্যা হয়তো একটু জোরালো। শুধু হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা অংশই নয়, ওদের নিজেদের সমাজে বেকার ছেলেগুলিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারাও শিস কাটে, ইঙ্গিতে রসিকতা করে। তাকে রাস্তায় একা দেখলে মুসলমান ছোকরারা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে বলে 'জানি'। হিন্দুর ছেলেরা গান ধরে ; তাদের মধ্যে কবি-কবি ভাবটা একটু বেশী। ক্রীশ্চান বেকার পাশ দিয়ে যাবার সময় মৃদুস্বরে বলে, ডার্লিং। দু-চারজন তরুণ উকিল-মোক্তারও নীলিমাকে ইঙ্গিতে নিজেদের প্রেম নিবেদন করে। এরাই সবচেয়ে কুৎসিত এবং অশ্লীল।

নীলিমা কিন্তু নিস্পন্দ হিমশীতল এদিকে।

নীলিমার মা এর জন্য বিরক্ত। মেয়ের বয়স হয়েছে; মা আর ইঙ্গিতে কথা বলে না, সোজা খুলেই বলে, তোর মতলবটা কি? রেভারেণ্ডদের বাড়ির কানা ছেলটাকে বিয়ে করবি নাকি? তা হলে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দোব।

নীলিমা বলে—কেন সে নিরীহ লোককে নিয়ে পড়লে বল তো?

মা বলে—তবে? তবে ব্যারিস্টার-ম্যাজিস্ট্রেট কে তোকে বিয়ে করতে আসবে?

নীলিমা লেখাপড়া শিখে কথাবার্তাগুলো একটু বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বলে, শুধু বাঁকাই নয় অত্যন্ত ধারালও বটে। মায়ের কথায় সে একটুও বিচলিত হয় না, যদিই বা হয় তা অন্তত বাইরে থেকে বোঝা যায় না। সে নির্বিকারের মতই হাতের কাজ করে যায়, সেলাইয়ের কাজ করতে থাকলে সেলাই থেকে চোখ না তুলেই সে বলে—মস্ত বড় আয়নাখানা দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছ, আমিও আমার ব্যাগে আয়না রেখেছি একখানা,—কানাও নই, চোখের কোনো ডিফেক্টও নাই। আর তোমাকে দিব্যি গেলে বলতে পারি, সারাদিন খেটেখুটে রাত্রে কোনদিন স্বপ্ন দেখার মত ঘুম পাতলা হয় না, সুতরাং—। বাকীটা আর সে বললে না, মুখ তুলে মায়ের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

এই ধরনের জবাব বুঝতে মায়ের কষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এই ধরনের জবাব দিতে পারে না বলে মায়ের রাগ বেড়ে যায়। সে বলে—কিন্তু বিয়ে তো করতে হবে, না কি? এর পর বয়স গেলে ওই পোড়া কাঠের দিকে কেউ ফিরে চাইবে আর? পাস করার গুমোর, বিশ টাকা মাইনের গুমোর তখন বুকে যে পাথর হয়ে বসবে!

নীলিমা তবুও হাসে।

—হাসছিস যে? তখন করবি কি?

—কি আর করব! জর্দন নদী অনেক দূর, কিন্তু গঙ্গা আছে। গঙ্গাকেই জর্দন ভেবে নিয়ে রোজ গঙ্গাস্নান করব আর মথি-লিখিত সুসমাচার পড়ব; বাইবেলও পড়ব।

মা এবার দৃঢ়ভাবে বললে—কিন্তু ওই সিংয়ের গাড়িতে চেপে যে রোজ ইস্কুলে যাচ্ছিস, লোকে যে দশ কথা কানাকানি করতে আরম্ভ করেছে।

—রোজ?

—সে তুই জানিস, আর যারা বলছে তারা জানে।

—যাক। তুমি যখন জান না, তখন—

বাধা দিয়ে মা বললে—লোক যে বলছে—

—লোকের কথায় যদি বিশ্বাস কর তবে আমার উত্তর তো তুমি বিশ্বাস করবে না, সুতরাং কথা বলে তো কোন লাভ নেই আমার।

মা বললে—লাভ না হোক, লোকসান তো হবে না।

হেসে নীলিমা বললে, হবে বৈকি। কথা ক'টা বলার পরিশ্রমটাই লোকসান হবে।

মায়ের মুখ দেখে মনে হল, মা এবার রাগে ফেটে পড়বে। তবে কি ভাবে ফেটে পড়বে তাই বোধ হয় ভাবছে মা। কেলেঙ্কারীর ঝামেলা ভালবাসে না নীলিমা। তাই সেটা নিবারণের জন্য কিছু বলার আগেই বললে, পাঁচদিন গিয়েছি ওর মোটরে। তিনদিন দাদা সঙ্গে ছিল। দু-দিন অবশ্য একা গিয়েছি। তাতে যদি আমার দোষ হয়ে থাকে, তবে দাদার সঙ্গে লোকটি বাড়িতে এলে তাকে খাতির কর কেন?

—আর খাতির করব না! স্পষ্ট বলে দোব। লোকে পাঁচ কথা বলছে।

নীলিমা হেসে বললে—লোকের কথা ছেড়ে দাও। লোকে চায় ওর মোটরে না গিয়ে তাদের সঙ্গে গায়ে গা দিয়ে ইস্কুলে যাই, তারা এসকর্ট করে নিয়ে যায় আমাকে। দাদাও ড্রাইভার—ও-ও ড্রাইভার, দাদার বন্ধু, লোকটিকে বেশ লাগে আমার। আরও ভাল লাগে কি জান? গির্‌বরজার ছত্রী—যারা এককালে আমার ঠাকুরদার বাপকে জুতো মেরেছে, এঁটো খাইয়েছে—তাদের বাড়ির ছেলে এসে—। নীলিমা হাসে। হাসি থামিয়ে আবার বলে—দাদাও ওকে খুশী করতে চায়। কিছু যদি বলবার থাকে তো দাদাকে বল।

জোসেফ নরসিংকে যে একটু খুশী করবার চেষ্টা করছে এটা সত্য। নরসিং শুধু ড্রাইভার নয়; সে গাড়ির ওনার অর্থাৎ মালিকও বটে; মাইনের চাকর নয় সে, সমস্তটা লাভেরই হকদার। সুতরাং সমস্ত ড্রাইভার-মহলেই সে হয় খাতিরের লোক, নয় তো ঈর্ষার পাত্র। রামেশ্বরপ্রসাদ, রসিদ—এরা তাকে ঈর্ষা করে, তারা বলে ড্রাইভার-ওনার চামচিকে পক্ষী। জোসেফ কিন্তু ওকে খাতির করে। সে নিজে এমনি একখানি গাড়ির মালিক হতে চায়। সব দিক দিয়ে নরসিং তার আদর্শ। নরসিংয়ের যেমন অতি অনুগত দুটি লোক—নিতাই আর রাম আছে, তেমনি একটি লোক রাখবার কল্পনা তার। দুজন লোকের খরচ বেশী, একজন লোক রাখবে সে। ধোয়া মোছা টুকিটাকি

মেরামত, চাকা পাংচার হলে স্টেপ্‌নী অর্থাৎ বাড়তি চাকাটা খুলে পরানো, জ্যাক দিয়ে ঠেলে গাড়িটাকে উঁচু করে তোলা—এসব কাজে দুজন লোক হলে ভাল হয়, নিজেকে বেশী খাটতে হয় না, কিন্তু তেমনি তার খরচও আছে। সে নিজে বেশী খাটতে প্রস্তুত। এছাড়া নরসিং গিরিবরজার সিং-বাড়ির ছেলে—তারও পূর্বপুরুষ একদা গিরিবরজার অধিবাসী ছিল—এই হিসাবেও খানিকটা তার ভাল লাগে। তার পূর্বপুরুষ ছিল সিংদের গোলাম—অস্পৃশ্য, সিংদের কাছে হাতজোড় করে থাকত ; আর নরসিংয়ের বন্ধু, নরসিংয়ের সমান পদস্থ হয়ে ঘোরাফেরা করে এটাও তার বেশ লাগে। মেলামেশার মধ্যে এটা অবশ্য অহরহ মনে পড়ে না—কখনও কালেকস্মিনে প্রসঙ্গ উঠলে, হঠাৎ মনে হলে বিচিত্র ধরনের তৃপ্তি অনুভব করে সে। আরও একটা কারণ আছে। রামেশ্বর, রসিদ প্রভৃতি এখানকার ড্রাইভারদের সঙ্গে তার সদ্ভাব নাই। সে নিজে ক্রীশ্চান ; লেখাপড়া ওদের চেয়ে বেশী জানে, সভ্যতা-ভব্যতার আইন-কানুনও বেশী জানে—নিজে সরকারী অফিসারের ড্রাইভার, সেই হেতু সে ওদের অসভ্য বর্বর ভাবে এবং নিজেকে ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। রামেশ্বর, রসিদ এরাও ওকে ঘৃণার চোখে দেখে—কেরেস্তান শব্দটাকেই ওরা অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করে! মেয়েদের স্বাধীনতা আছে, তারা লেখাপড়া শেখে, সেজেগুজে পথে বেড়ায়, এজন্য তাদের অশ্লীল কথা বলে ; বিশেষ করে জোসেফের সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু এবং ম্যাট্রিক পাস করে ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে বলে নীলিমার উপরেও তাদের আক্রোশটা বেশী। ওই সব নানা ধরনের সূত্র একসঙ্গে পাকিয়ে একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এই জটিলতার মধ্যে জোসেফ নরসিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। প্রীতির আধিক্য হেতুই সে প্রীতিকে অকপটে প্রকাশ করে নরসিংকে বুঝিয়ে দেবার অভিপ্রায়েই জোসেফ প্রতি রবিবারে নিজের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে, তাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী মায়ের সঙ্গে, নীলিমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে নীলিমার প্রতি রসিদ-রামেশ্বরের অভদ্র বর্বর আচরণের প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত দেখাতেই সে বাইরেও নীলিমাকে সঙ্গে নিয়ে নরসিংয়ের সঙ্গে বেড়ায়, বাজারে দেখা হলে দাঁড়িয়ে আলাপ করে। নীলিমার ইস্কুলে যাওয়ার সময় নরসিংয়ের পাঁচমতি যাওয়ার পথে গাড়ি খালি থাকলে গাড়িতে চড়ে বসে। বয়সের ভাল লাগায় নরসিংয়েরও এটা ভাল লাগে। না, তার চেয়েও অনেক বেশী ভাল লাগে। অনেক—অনেক বেশী। রূপ এবং যৌবনকে ভাল লাগা

এক ; এ ভাল লাগা আর এক ভাল লাগা। শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতা মেয়ের মধ্যে শিক্ষিতা কালো মেয়েকে সেই ভাল লাগার চোখে অশিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ের চেয়ে বেশী ভাল লাগে। ফটকি তো তার উপর উচ্ছিষ্ট।

ড্রাইভার নরসিং জীবনে নীলিমার মত মেয়ের সাহচর্য কখনও কল্পনা করতেও পারে নাই। তার স্ত্রী জানকীর মৃত্যুর পর বিবাহের বাসনা তার মনে যখনই জেগে উঠত তখনই তার মনে পড়ত শহরে ইস্কুলে যাওয়া কিশোরী মেয়েদের ছবি। তাদের সমাজে এ ধরনের মেয়ে নাই ; যদিই দূরে দূরান্তরে কোথাও থাকে তবে তার মত ড্রাইভারকে সে মেয়ে সমর্পণ করবে কেন তার অভিভাবক ? কখনও কখনও মদের নেশায় উত্তেজিত মস্তিষ্কে কল্পনা করত তার দ্রুতগামী এই মোটরে এমনি একটি মেয়েকে হাতে ধরে টেনে তুলে নিয়ে তিরিশ-চল্লিশ মাইল স্পীডে পালিয়ে গেলে কি হয় ? মনে পড়ে যেত তার গিরবরজার সিং-বংশের আদি-পুরুষের কথা।...আবার নেশা ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তার ওটা স্বপ্নের মত মনে হত !

শিক্ষিতা কালো কুরূপা নীলিমার সঙ্গে আলাপ, তাকে গাড়িতে চড়িয়ে ইস্কুলে পৌছে দেওয়ার ভাগ্যটা তাই তার কাছে অকল্পিত সৌভাগ্য। সাধারণ ড্রাইভার-জীবনে এটা ব্যতিক্রম। সে অবশ্য গল্প শুনেছে, দু-দশজন বড়লোকের ঘরের মেয়ে-বউ ড্রাইভারের প্রেমে পড়েছে, জানাজানি কানাকানি হতেই ড্রাইভারের চাকরি গিয়েছে। দু-এক ক্ষেত্রে মেয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়েও গিয়েছে, কিন্তু সেও ব্যতিক্রম। এবং সে ব্যতিক্রমের সঙ্গেও এ ব্যতিক্রমের পার্থক্য আছে। জোসেফ নীলিমাকে নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে ; তার গাড়িতে চড়ে, পরিহাস করে, হাসে। সে সমস্তই প্রকাশ্য—সহজ, তার এতটুকু অংশও কোন শাসনে কোন বাধায় পীড়িত অথবা সংকুচিত নয়। এ যে অকল্পিত সৌভাগ্য !

জানকীর কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—চরিত্রহীনা কসবী জাতীয় নারীর সঙ্গে ব্যাভিচার করবে না। কিন্তু অপরূপ রূপযৌবনসম্পন্না এই ফটকি মেয়েটার কাছে সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারত না, যদি না নীলিমা এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াত।

এ রবিবারটা কাটল পাঁচমতিতে সুরেশ দাসের ওখানে। খরচ অবশ্য নরসিংয়ের, কিন্তু বন্দোবস্ত সব সুরেশের। দাসজীর বন্দোবস্ত পাকা। হাঁসের মাংস—খিচুড়ি—মদ—মাছভাজা থেকে আরম্ভ করে—একজন বাউলের

দেহতত্ত্বের গান এবং নূপুর পায়ে নাচ পর্যন্ত। হেসে সে বললে—সব ঠিক করে রেখেছি বন্ধু, নাচ-গান পর্যন্ত।

নরসিং হাসলে।

নিতাই বললে—আরে যান মশাই। ডারী নিয়ে আবার নাচগান হয়?

দাস বললে—হুঁ হুঁ। বিনা ডারী—লাল শাড়িও হতে পারে—তবে সুরেশ দাসের এলাকায় নয়, সুরেশ দাস দেখিয়ে বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসবে, কিন্তু নিজে সেখানে থাকবে না।

নিতাই কেমন যেন গজগজ করছে ভেতরে-ভেতরে। খেটেছেও আজ খুব। মজুরের কাজ করেছে। ওকে খুশী করার প্রয়োজন আছে। নরসিং সুরেশকে বললে—ওর ব্যবস্থা একটা করে যদি দিতে পারেন তো ভাল হয়!

সুরেশ বললে—আপনার?

—না।

—বহুত আচ্ছা। খুব খুশী আমি এতে। আচ্ছা, ও বেটার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। ওই ছোঁড়াটা? রামটা?

একটু চুপ করে থেকে নরসিং বললে—ওর কথা নিতাইকে জিজ্ঞাসা করুন।

নিতাই রাম দুজনেই গেল।

নরসিং সুরেশের সঙ্গে বসে সুখ-দুঃখের কথা কইলে। সুরেশের দুঃখ নাই। সে বলে—যো হোগেয়া সো যানে দো। সে সব ভেবে মনখারাপি করো না। আনন্দ কর। ব্যস। বেশ কয়েক পাত্র পান করে সুরেশ নরসিংযের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে বসল। ওই এক বাতিক সুরেশের। বিশেষ করে মদ খেলে তখন দু-হাত পাঞ্জা-লড়াই চাই। লোক না পেলে দুটো ম্যাড়া আছে, তাদের নিয়ে চুঁ খেলে। নরসিংয়ের কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যে নীলিমাকে বার বার মনে পড়ল। বেশ কাটল রবিবারটা।

তার উৎসাহ যেন বেড়ে গিয়েছে।

গিরিবরজা থেকে পাঁচমতির পথে সড়ক ছেড়ে মাঠের বুকের পথ কেটে সমান করে নেওয়ার পর হিসেব মত সময় বাঁচার কথা তিন থেকে পাঁচ মিনিট। কিন্তু নরসিং আজকাল এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছে যে সময় বাঁচছে আট মিনিট। পঞ্চাশ প্রথমে নেমেছিল পঁয়তাল্লিশে, কেটে নেওয়ার পর নামবার কথা চল্লিশে, কিন্তু সাঁইত্রিশের বেশী লাগছে না এখন। রামা নিতাইয়ের ধারণা তাড়াতাড়ি ফেরার মূলে নরসিংয়ের আছে নীলিমাকে গাড়ি করে ইস্কুলে পৌঁছে দেওয়ার

সময় করে নেওয়ার চেষ্টা।

রামা বলে—দাদাবাবু আজকাল উড়ে চলেছে। শালা তুফান মেল।

নিতাই কিন্তু অসন্তুষ্ট, সে বলে—হঁ্যা, যেদিন গোঁত্তা খেয়ে ঘাড় গুঁজে পড়বে সেই দিন হবে।

রামা একটু বিস্মিত হয় নিতাইয়ের মুখে এ ধরনের কথা শুনে। কি হল নিতাইয়ের? নরসিংও সেটা অনুভব করলে ক্রমে। কিছু একটা হয়েছে নিতাইয়ের। সে একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করলে—কি হল তোর বল্ দেখি?

নিতাই বললে—হবে আর কি বলেন? গাড়ি 'ডেরাইব' করা যে ভুলে গেলাম মশাই!

নরসিং স্বীকার করলে—তা বটে। নিতাইকে এখানে এসে অবধি স্টীয়ারিং ছেড়ে দেয় নাই। সে বললে—ঠিক হ্যায়, কাল থেকে একবেলা তোর, একবেলা আমার।

নিতাই খুশী হয়ে গেল।

নিতাই কিন্তু জবরদস্ত ড্রাইভার হবে। বেটার হাতটা একটু কড়া এই যা। বেটা যে রকম মোড় নেয় জোরে! নরসিং বার বার ওকে সাবধান করে—খবরদার, মানুষের জীবন তোর হাতে।

রামাটাও মধ্যে মধ্যে স্টীয়ারিং ধরছে। নিতাইয়ের পাশে বসে স্টীয়ারিং ধরে।

রামা হঠাৎ একদিন নরসিংকে চুপিচুপি বললে—নেতাই শালার পোকা ঢুকেছে দাদাবাবু! রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে পরামর্শ করছে—ড্রাইভিং লাইসেন্স নেবে। আমাদের কাজ ছেড়ে ড্রাইভারি চাকরি করবে!

নরসিং বিস্মিত হয় নাই। এ পথের এই ধারা। সে নিজেও জানে। সে যখন মেজবাবুর গাড়িতে কণ্ডাক্টারের কাজ করতে করতে মোটর চালাতে শিখেছিল, তখন সে ড্রাইভিং শিখে লাইসেন্স নেবার জন্যেই শিখেছিল। রহমৎ ড্রাইভারের কাছে কাজ শিখে সে রহমতের জায়গাতেই ড্রাইভার হয়ে বসেছিল। নিতাইকে ড্রাইভিং সে যখন শিখিয়েছে, তখন সে মনে মনে ভেবেছিল—নিতাইকেও সে লাইসেন্স নেওয়াবে। এখানে এসেও সে-কথা সে ভেবেছে। সে নিয়ে কথাও হয়েছে। এ ছাড়াও তার মনে আরও অনেক কল্পনা আছে। সামনে বর্ষা এগিয়ে আসছে। একটু জোর বৃষ্টি নামলেই প্রথমে মাঠের পথ বন্ধ হবে, তারপর ক্রমে কাঁচা মাটির সড়কও বন্ধ হবে। সে মধ্যে মধ্যে ভাবে—এই

শ্যামনগরে সে ছোটখাটো একটা মেরামতী কারখানা খুলবে ; তার লাইসেন্সটা পাঁচমতির রাস্তা ছাড়াও ওই শহরের ঘাট পর্যন্ত বাড়িয়ে নেবে। তাতে এখানকার মোটর-কোম্পানীর সঙ্গে একদফা ঝগড়া বাধবে। নরসিংয়ের ক্ষমতা নাই মোটর কোম্পানীর সঙ্গে ঝগড়া করবে। সে ভাবছে শুখনরামকে যদি নামানো যায়। সাহুজীর টাকা আছে। এ কাজে লাভ আছে। সাহুজী যদি গাড়ি কেনে—একখানা বাস, একখানা মোটর ; সবচেয়ে ভাল হয় যদি তার সঙ্গে একখানা ট্রাক কেনে। তা হলে জোর চলবে কোম্পানী। সে আর জোসেফ দুজনে ভাগে কিনবে একখানা মোটর। একটাতে ড্রাইভার হবে নিতাই, একটাতে জোসেফ, অন্যটায় রামাকে বসালে চলে কিন্তু সে এখনও ছেলেমানুষ, রামাকে সে নিজের গাড়িতে রেখে তালিম দেবে, অন্যটায় বসিয়ে দেবে হাফিজকে। হোটেলে জুয়ার আসরে যে রামেশ্বরের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বলেছিল—পরসাদ সাহেব এ অন্যায় আপনার। হাফিজ লোকটি ভাল।

আজ সকাল থেকে নিতাই ট্রিপে নাই। ছুটি নিয়েছে। বলেছে—আমার শরীর আজ ভাল নাই সিংজী। আমি আজ আর যেতে পারব না।

গায়ে হাত দিয়ে নরসিং দেখেছিল—গায়ে তাত তো নাই!

—সর্বাঙ্গ বেথা করছে, মাথা টিপটিপ করছে। আমি কি মিছে কথা বলছি মশায়?

অবিশ্বাস করে নাই নরসিং, অবিশ্বাসবশত পরীক্ষা করবার জন্যও গায়ে হাত দিয়ে দেখে নাই, মমতাবশতই দেখেছিল, তাই নিতাইয়ের মেজাজ খারাপ দেখে তার বিশ্বাস হল বেশী। নিশ্চয়ই বেচারার শরীব খাবাপ, নইলে মেজাজ খারাপ কেন হবে! সস্নেহে হেসে সে ছ-আনা পয়সা দিয়ে বলেছিল—যাক্, শুয়েই থাক্। দোকান খুললে চার আনার মদ আর দুটো কুইনিন খেয়ে নিস। আমি রামাকে নিয়ে চললাম।

পাঁচমতি থেকে ট্রিপ নিয়ে ফিরে দেখলে, নিতাই বাসায় নাই। মদের দোকানে, চায়ের দোকানেও পেলে না। পথে হাফিজ বললে—নিতাই রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে বোধ হয় শহরে গিয়েছে।

—শহরে? আশ্চর্য হয়ে গেল নরসিং। এতক্ষণে চুপিচুপি রামা বললে—হয়েছে দাদাবাবু। আপনাকে বলতে আমার মনে ছিল না।

রামার মুখে নিতাইয়ের এই কথা শুনে সে আশ্চর্য অবশ্য হল না, পাখির ছানার ডানা গজায় উড়বার জন্যই, নিতাই ড্রাইভিং শিখেছে লাইসেন্স নেবার

জন্যই ; কিন্তু তাকে লুকিয়ে তার শত্রু ওই রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে দোস্তি করে ষড়যন্ত্র করে নিতে চলেছে—এ জন্য তার দুঃখ হল। ড্রাইভারের মেজাজে দুঃখ নীরব বিষণ্ণতায় আত্মপ্রকাশ করে না, করে ক্ষোভের মধ্য দিয়ে। নরসিং বললে—শালা হারামী কাঁহাকা! ও, এই জন্যে বুঝি? তাই শরীর খারাপ?

ক্ষুব্ধ মনের তাড়নায় সে গাড়িটাকে মোড় ফিরাবার মুখে নিয়ে গিয়ে ফেললে রাস্তার ধারে, রাস্তা মেরামতের জন্য গাদা করে রাখা পাথর-কুচির গাদার ওপর। কিন্তু ওস্তাদ ড্রাইভার নরসিং শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে ষ্টীয়ারিং, পায়ের চাপে গতি নিয়ন্ত্রিত করলে। ঠিক পার হয়ে গেল। শা-লা!

ফ-স্-স্ স্।

—কি হল? গিয়েছে একটা চাকা! পিছনের বাঁ দিকের কোণটা বসে যাচ্ছে। ব্রেক কষলে নরসিং। লাফ দিয়ে নামল রামা।

—এঃ, একটা বোতল-ভাঙা কাচ দাদাবাবু। টায়ারটার পাশে ঠিক সেই ক্ষয়া জায়গাটাতে ঢুকে গিয়েছে। পাথর-গাদায় বোতল-ভাঙা কাচ ফেলেছে কে?

নরসিং নামল।

ট্রিপের সময় চলে যাচ্ছে। আপিসের সময়! এই ট্রিপে বাঁধা খদ্দের অনেক। তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে!

—নিয়ে আয় জগ। নিজে লেগে গেল স্টেপ্‌নীটা খুলতে। মনটা খিঁচড়ে গিয়েছে, ফুটে-যাওয়া চাকাটার বোল্টগুলি খুলতে ক্রমাগত বাধা পাচ্ছে। শালা নিমকহারাম বেইমান! ছোটলোকের বাচ্ছা তো হাজার হলেও!

—কি হল? পাংচার?

জোসেফ আর নীলিমা। নীলিমা ইস্কুলে যাচ্ছে। নরসিংয়ের মন খানিকটা স্নিগ্ধ হল। সে ওরই মধ্যে নমস্কার করতেও ভুললে না।—নমস্কার।

জোসেফ এসে দাঁড়াল নরসিংয়ের পাশে।

—আঃ! করলেন কি? আঙুলটা জখম করে ফেললেন? সরুন, আপনি সরুন। আমি দেখি। নীলি, তুই বরং চলে যা আজ। আমি দেখি! সিংজী আঙুলটা জখম করে ফেলেছেন।

নীলিমা আঙুলটা দেখে শিউরে উঠল—বেঁধে ফেলুন এক্ষুনি। রামা, তুমি চট করে গিয়ে খানিকটা বরফ নিয়ে এস।

হেসে নরসিং বললে—ড্রাইভারদের ও রকম অনেক লাগে। রামের এখন যাওয়া চলবে না।

নীলিমা বললে—না, চলুন ওই আগে বরফ পাওয়া যায়। আসুন।

—উহুঁ। আমার প্যাসেঞ্জার বসে আছে পাঁচমতিতে।

হন হন করে চলে গেল নীলিমা।

ঘটাং-ঘটাং-ঘট-ঘট-ঘট। জগ খুলে নিয়ে গাড়ির ভিতরে ফেলে দিলে রামা সেটাকে।

জোসেফ বললে—ও কে. ঠিক হয়ে গেছে।

পানের দোকানের একটা ছোকরা ছুটে এল। তার হাতে নীলিমার রুমালে জড়ানো খানিকটা বরফ!

জোসেফ বললে—লাগান, উপকার হবে। রামা, তুমি ওঁর পাশে বসে আঙুলের ওপর ধরে রাখ। ডান হাতে দিব্যি স্টীয়ারিং চলবে ওঁর।

নরসিং সুস্থ হাতটায় সিগারেট বার করে ধরলে। বললে—আপনি নিন, একটা বার করে আমার মুখে দিয়ে ধরিয়ে দিন।

সিগারেট ধরিয়ে সে গাড়িতে চেপে বসল। রামা হাতে বরফ ধরিয়েছিল। নরসিং সেল্‌ফ স্টার্টার ব্যবহার করলে। গাড়িখানা গর্জন করে উঠল। রামাকে বললে—হাঁক।

পাঁচমতি—পাঁচমতি—পাঁচমতি।

ফুঃ করে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বরফ থেকে হাত টেনে নিয়ে সে গীয়ারের উপর রাখলে।

—পাঁচমতি—পাঁচমতি—পাঁচমতি।

চৌদ্দ

আরও মাসখানেক পর।

—শ্যামনগর, শ্যামনগর, শ্যামনগর।

বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। এবার বর্ষা নেমেছে দেরীতে। শ্রাবণ মাস—গোটা আষাঢ় নরসিং গাড়ি চালিয়েছে। আকাশে মেঘ ঘুরছে। মধ্যে মধ্যে রিম-ঝিম-বৃষ্টি নামছে। কাঁচা সড়ক হলেও নবাবী আমলে তৈরী রাস্তা, অন্তত তিন চারশো বৎসর ধরে জমে তলদেশ 'বজ্রকঠিন' হয়ে গিয়েছে। নরসিং 'বজ্রকঠিন' শব্দটি ব্যবহার করে। 'বজ্র' নামক পদার্থটি আসলে কি এবং আসলে তার

আকার-আয়তন আছে কিনা, সে সব বিশ্লেষণ করলে কথাটা দাঁড়ায় কিনা, এ সব প্রশ্নই তার কাছে নাই। সে শুনে আসছে কথাটা এবং কথাটা ভারি ভাল লাগে তার কাছে, তাই সে ব্যবহার করে। বজ্র বলতে নরসিং জানে, এ দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে—শাণিত এবং কঠিনতম একটা অস্ত্র। লম্বা তীরের ফলার মত আকার, সেটা আকাশে ক্রুদ্ধ দেবতা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়, ব্রহ্মশাপগ্রস্তের উপর এসে পড়ে। এমন কি, মধ্যে মধ্যে যে গাছের উপর বাজ পড়ে তার কারণ ওই অভিশাপ। ওগুলো ব্রহ্মশাপগ্রস্ত গাছ। বজ্রাস্ত্র এসে শাপগ্রস্তকে বিনাশ করে আকাশে চলে যায়। একমাত্র কলাগাছের কাছে এই বজ্রাস্ত্র পঙ্গু। কলাগাছ হল কলা-বউ, সে হল স্ত্রীলোক, তার উপর যদি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাজ এসে পড়ে তবে সে আর ফিরতে পারে না। কলাগাছের কোমল বুক চিরে ফেলবামাত্র তার শক্তি লোপ পায়, আগুন নিভে যায়, বজ্রাস্ত্রের টুকরো ওই গাছের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকে। সিঁধেল চোরেরা এর সন্ধানে থাকে। এ অস্ত্র যে পায়, তার আর ভাবনা নাই। ইট কাঠ পাথর এমন কি দেওয়াল যদি লোহারও হয় তবে এই ফলা দিয়ে কাটলে পাকা ফলের শাঁসের মত কেটে যাবে। ছেনিতে কাটে না, আগুনে গলে না, হাতুড় দিয়ে পিটলে ভাঙে না, একটা কণা পর্যন্ত খসে না, এমনি কঠিন এই বজ্রাস্ত্রের টুকরো। তিন-চারশ বছরের সড়কটার তলাটা ঠিক তেমনি কঠিন। উপরে হাত দেড়েক মাটি, যেটা হালআমলে ফেলা হয়েছে। তাই চাকায় চাকায় গুঁড়ো হয়, গ্রীষ্মে ধুলো হয়ে ওড়ে, বর্ষায় কাদা হয়ে এলিয়ে পড়ে, বর্ষা ফুরিয়ে গেলে শুকিয়ে ঘায়ের মামড়ির মত কদর্য হয়ে ওঠে। কোনরকমে যদি এক পুরু হুড়িপাথর আর লাল মোরাম এনে বিছিয়ে দিতে পারা যায় তবে আর ভাবতে হয় না। একেবারে—নরসিং বলে—একেবারে ফাস্ট কেলাস মোটর রোড হয়ে যায়। কিন্তু কে রাজা কে মন্ত্রী, কে গুরু কে গোঁসাই, এর পাত্তা করাই এক কঠিন ব্যাপার! গোটা রাস্তাটায় হুড়িপাথর মোরাম দেওয়া দূরে থাক্, এর মধ্যেই কয়েকটা বিশ্রী গর্ত দেখা দিয়েছে। সেগুলিকে অন্তত ওইভাবে মেরামত করিয়ে দেবার জন্য নরসিং কনট্রাক্টরের কাছে গিয়েছিল। কনট্রাক্টর বলেছে—ওভারসিয়ারবাবু বললেই আমি করে দেব। ওভারসিয়ারবাবু বলেছে—হুড়িপাথর? ক্ষেপেছ নাকি তুমি? কাঁচা সড়কে হুড়িপাথর?

নরসিং বলেছিল—এখন কয়েক ঝুড়ি হুড়িপাথর দিলে আর গর্ত হবে না। না হলে এক পশলা চেপে জল হলেই ও একেবারে 'জাওন গাড়া' হয়ে যাবে।

এখানে বর্ষণ হওয়াকে 'বৃষ্টি হওয়া' বলে না, বলে 'জল হওয়া'। 'জাওন গাড়া' বলে জলে কাদায় ভর্তি খানাকে। ওভারসিয়ার হেসে বলে দিয়েছেন—তখন গাছের ডাল কেটে ফেলে দিয়ে তার ওপর মাটি দিয়ে দেব।

নরসিং ধরেছিল এস-ডি-ওকে। এস-ডি-ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে দরখাস্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার থ্রু দিয়ে দেবে, আমি রেকমেণ্ড করে দেব।

তাও করেছিল নরসিং। ডিষ্ট্রিক বোর্ডের চেয়ারম্যান লিখেছেন—কাঁচা রাস্তার নুড়িপাথর দিয়ে মেরামতের বরাদ্দ কোন কালে নাই। যা নাই, তার রেওয়াজ আমি কি করে করব?

রেওয়াজ নাই। দেশে কি মোটরের রেওয়াজ ছিল কোন কালে? নরসিং ও নিয়ে আর মাথা ঘামায় নাই। ঘামিয়ে লাভ নাই। অল্পস্বল্প বৃষ্টি এখন, এ সময়ে প্যাসেঞ্জারের ভিড় বাড়ছে। গোটা রাস্তাটা চটচটে কাদায় ভরে গিয়েছে, পিছল হয়েছে, বর্ষায় ভিজতে হচ্ছে মানুষকে, হেঁটে যাওয়ায় অনেক কষ্ট, পথিকেরা এখন গাড়িতে যেতে চায়। ঘোড়ার গাড়িগুলো এর মধ্যেই ঘাল খেয়েছে, মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। দশ-বারোখানা গাড়ির কয়েকখানা শ্যামনগর শহরেই ভাড়া খাটে; খান দুই-তিন গরুর গাড়ির মাথা খেতে উঠে পড়ে লেগেছে। শ্যামনগর থেকে তিন মাইল দূরবর্তী জাগ্রত মা-কালীর থান এবং গরু-ছাগলের হাট—হাট দেবীপুরে ভাড়া খাটছে। খান পাঁচেক এখনও পথে চলছে। এ পাঁচখানা গাড়ির ঘোড়া ভাল। কিন্তু রাস্তার কাদা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছে। ছেলেবেলায় নরসিং পড়েছিল, গরু-মহিষাদির ক্ষুর চেরা বলিয়া কাদায় চলাচলের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। এবং ঘোড়ার ক্ষুর জোড়া বলিয়া কাদার মধ্যে ঘোড়া ভাল চলিতে পারে না। আজকাল রাস্তায় ঘোড়াগুলো যখন অতিকষ্টে চলে তখন নরসিং আপন মনেই বলে—'ঘোড়ার ক্ষুর জোড়া বলিয়া—।'

আজ বৃষ্টি কিছু বেশী হয়েছে; মোটরের চাকা পিছলে যাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গর্ততে জল জমেছে, সমস্ত সড়কটার উপরেই চার-পাঁচ আঙুল পুরু-কাদার একটা আস্তরণ পড়েছে; এখানকার মাটি অত্যন্ত আঠালো, টায়ারে মধ্যে মধ্যে এমন কাদা জমে যাচ্ছে যে মাডগার্ড পর্যন্ত পুরু হয়ে উঠে খস-খস শব্দ উঠছে। খুব সাবধানে যেতে হচ্ছে। মাঠের রাস্তা বন্ধ, সেখানে এখন কাদা এক হাঁটু সমান। ওদিকে নামলে আর রক্ষা নাই। রথচক্র গ্রাস হয়ে

যাবে। ইঞ্জিন চলবে, চাকাও ঘুরবে, কিন্তু গাড়ি এক ইঞ্চি এগুবে না। কাদার মধ্যেই চাকা সর-সর শব্দ করে পাক খেতে থাকবে। এইবার সার্বিস বন্ধ করতে হবে, আর উপায় নাই। 'ঘোড়ার ক্ষুর জোড়া বলিয়া' আজ রাস্তায় একখানাও ঘোড়ার গাড়ি নাই। কেবল গরুর গাড়িগুলো চলেছে সেই এক চালে। কিবা রাত্রি কিবা দিন, কিবা গ্রীষ্ম কিবা বর্ষা—সমান চালে চলেছে ক্যাঁ-ক্যাঁ ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে, পাড়াগাঁয়ের দা'ঠাকুরী চালে—এক হাতে ছাতা লাঠি, এক হাতে হুঁকো নিয়ে ভারিক্কি চালে চলার ভঙ্গিতে।

এই সময়টা কিন্তু ভাল রোজগারের সময় ছিল। ভাড়া বাড়িয়ে দিলেও কেউ আপত্তি করত না, ঝিপি-ঝিপি বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য সুড়সুড় করে হুডের তলায় এসে ঢুকত। পাঁচমতির যারা ডেলী-প্যাসেঞ্জারি করে তারা বর্ষার সময়টা শ্যামনগরে বাসা গাড়তে বাধ্য হয়। মোটর চললে তারাও বাঁচত। মরুক অকর্মার দল সব; লেখাপড়া শিখেছে, না, কচু শিখেছে। দরখাস্ত করে তদ্বির করে এই সাত মাইল রাস্তা পাকা করে নিতে পারে না? বড় বড় জমিদার আছে, তাদের না ভাবনা না চিন্তা, জমিদারি করে ঘি দুধ মাছ মাংস খায় আর ঘুমোয়, মামলা-মকদ্দমা লেগেই আছে। সে চালায় তাদের কর্মচারীরা; রাস্তা পাকাই হোক আর কাঁচাই হোক বাবুদের কিছু আসে যায় না। নেহাত দরকার হলে পাল্কি আছে, ভিজতে ভিজবে বেটারা, কাদা ভাঙবে তারাই, কয়েক বাড়িতে বুড়ো হাতী আছে, বর্ষার সময় তাদের হাতী বার হয়। থপ-থপ করে জলকাদা ভেঙে চলে।

—হুঁশ করে, একটু হুঁশিয়ার হবেন সব। নরসিং হেঁকে উঠল।

সামনে একটা বড় খন্দক ঠিক একেবারে মাঝখানে, দুপাশে দুফালি কাদাভরা জায়গা, খন্দক বাঁচিয়ে যেদিকেই যেতে যাবে সেইদিকেই একপাশের চাকা একেবারে রাস্তার কিনারার উপর পড়বে। কোনরকমে যদি কিনারা ধ্বসে তবে মোটর নিয়ে 'মালকবাজি' অর্থাৎ উল্টে ডিগবাজি খেয়ে মাথা নীচু করে পড়বে। চাকা চারটে আকাশের দিকে উঠে যাবে। নরসিং অবশ্য ভয় খায় না, এভাবে মোটর চালানো তার নতুন নয়। মেঠো পাড়াগেঁয়ে যারা সাইকেল চালায় তারা মাঠে আপথে সাইকেল চালিয়ে যায়; এও তাই। পাশে বসে রামা পাশে সামনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বলে চলেছে—'চল চল, হুঁশিয়ারি হুঁশিয়ারি, বহুৎ আচ্ছা, বলিহারি, কেয়াবাৎ—জয় মা-কালী, ঠিক হ্যায়।' অতি সন্তর্পণে নরসিং চালিয়ে পার হয়ে আসে দুর্গম স্থানটা। আর

কিন্তু সার্বিস চলবে না মনে হচ্ছে। বন্ধ করতে হবে। ওদিকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মেরামতির নোটিশ দিয়ে রাস্তায় ট্রাফিক বন্ধ করবে দু-চার দিনের মধ্যেই। একটা সিগারেট খাবার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু উপায় নাই। রাস্তার যা অবস্থা তাতে ষ্টীয়ারিংয়ে এক হাতের জোর রেখে ভরসা হয় না। শালা শূয়ারকি বাচ্চা নিতাই। বেটা ভেগেছে। পাখির বাচ্চার ডানা গজালে সে আর মা-বাপের বাসায় থাকে না। উড়ে পালায়। নিতাই পালিয়েছে। সে থাকলে তাকে ষ্টীয়ারিং ছেড়ে দিয়ে একটা সিগারেট খেয়ে নিতে পারত।

এবার রাস্তা ভাল। গাড়ির স্পীড বাড়ালে নরসিং। রাস্তায় রাহী চলেছে এক পাশ ঘেঁষে। জনকয়েক চলেছে ঠিক মাঝখান বরাবর। হর্ন দিলে নরসিং।

—জ্বালালে রে বাবা! মোটর এল, না, আপদ্ এল!

পাড়াগেঁয়ে হালফ্যাশানি চাষা-ভূষো শহরে চলেছে মামলা করতে। দু-চক্ষে দেখতে পারে না নরসিং। 'আধ আখুরে' যে বলে এদের, সে মিথ্যে বলে না। অ-আ-ক-খ অক্ষরগুলোর আধখানা চেনে না। ছাপা অক্ষর চিনতে পারে, বানান করে পড়ে কোনরকমে; কিন্তু হাতের লেখা হলেই—ব্যাস, 'আজমীর গেয়া'কে 'আজ মর গেয়া' একপ্রহর কসরতের পর।

রাম বলে উঠল—হাঁ, হাঁ—গর্ত গর্ত···গচকা।

—দেখেছি।—নরসিং গর্তের উপর দিয়েই গাড়িটা চালিয়ে দিলে, স্পীড একটু বাড়িয়ে দিয়েই চালিয়ে দিলে। জলভরা গর্তের উপর দিয়ে গাড়ি চলে এল কাদা জল ছিটিয়ে। নরসিং পিছনের দিকে চেয়ে বললে—শালা।

রাম এতক্ষণে বুঝেছে। সে হি-হি করে হেসে উঠল, সেই সর্বনেশে হাসি। সে হাসি আরম্ভ হলে আর থামতে চায় না। প্যাসেঞ্জাররাও হাসছে। ওই চাষী দুজনের জামাকাপড় কাদায় ভরে গিয়েছে। মাথায় মুখে পর্যন্ত কাদা লেগেছে। একজনের বোধহয় মুখের ভিতরে চলে গিয়েছে কাদা। লোকটা থু-থু করে থুথু ফেলছে।

জল-বৃষ্টি হলে এটা একটা আমোদ পায় নরসিং। শুধু নরসিং কেন? সব ড্রাইভারেরই আমোদ লাগে। বিশেষ করে সাদা পরিষ্কার জামাকাপড় পরে, বেশ ফিটফাট বাবুটি সেজে যারা যায়, তাদের দেখলেই গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে জলকাদার উপর দিয়ে গাড়ি চালাতে ইচ্ছে করে। কাদায় যখন ধোপদুরস্ত জামাকাপড় ছিটেয় ভরে গিয়ে চিতেবাঘ হয়ে ওঠে, তখন ওদের মুখের চেহারা

দেখে সবচেয়ে আমোদ লাগে।

রামা এখনও হি-হি করে হাসছে। নরসিং প্রাণপণে আত্মসংবরণ করেছিল, এবার সেও হাসতে আরম্ভ করলে।

শ্যামনগর এসে গিয়েছে। এইবার পাথর দেওয়া রাস্তা। চালাও। স্পীড বাড়ালে নরসিং সময় সংক্ষেপের জন্য নয়, ভাল রাস্তায় জোরে চালাবার আরাম অথবা আনন্দের জন্য। সময় এখন পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টিতে উঠেছে। কুড়ি মিনিট বেশী লেগেছে। সে জন্য প্যাসেঞ্জারদের অভিযোগ নাই, চোখ আছে তাদের, তারা দেখতেই পায়, অবুঝ নয়, বুঝতেও পারে এবং বিবেচনাও আছে তাদের—বিরক্তি হয়তো বোধ করে, কিন্তু তাদের চেয়ে বিরক্তি বোধ করে নরসিং নিজে। সাত মাইল রাস্তা আসতে যদি পঁয়ষট্টি মিনিটই লাগে তবে আর মোটর চালিয়ে লাভ কি?

—রোখো, এই, রোখো।

পথের ধারে জামাকাপড়ের উপর হ্যাট মাথায় দিয়ে সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে ও কে? ও! শ্যামনগরের মিউনিসিপ্যালিটির ওভারসিয়ারবাবু।

হু। বুঝেছে নরসিং ব্যাপারটা। তখনই বার বার বারণ করেছিল নরসিং—ওরে রামা, একটা গাদা থেকে নিস না। পাঁচ জায়গা থেকে নিলে ধরতে পারবে না।

—রোখো!

রুখলে নরসিং।—নমস্কার বাবু। কোথাও যাবেন নাকি? সীট রাখতে হবে?

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠে ওভারসিয়ার এর উত্তরে বললে—তোমার নামে আমি রিপোর্ট করব। তোমার সহিসের লাইসেন্সের মাথা খেয়ে দোব আমি। বদমাস পাজী লোক কোথাকার!

নরসিংয়ের পায়ের নখ থেকে মাথার চুলের প্রান্তদেশ পর্যন্ত একটা ক্রুদ্ধ বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। গিরবরজার ছত্রী-রক্তের এটা স্বভাব-ধর্ম।

কিন্তু তার আর একটা অভ্যাস-ধর্ম জন্মেছে। ড্রাইভারি কর্ম করতে করতে ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, এস-ডি-ও, এস-পি, ম্যাজিস্ট্রেট এদের ধমক খেয়ে সে ধমক হজম করার অভ্যাস। এই এখানে আসার যেটা হেতু, এস-ডি-ও বেত মেরেছিলেন। সেই বেত সে চেপে ধরে বলেছিল, মারবেন না স্যার।

সেই হেতুটার মূলে তার যে অসহনশীলতা ছিল তার জন্ম নরসিং মনে মনে অনুশোচনা করে। মনে হয় বেতটা অমনভাবে চেপে না ধরলেই হত। আরও দু-চার ঘা বেত হয়তো মারত এস-ডি-ও, তারপর ক্ষান্ত হত, তাতে তার রাগটা পড়ে যেত। তা হলে এতকালের সহিসি ছেড়ে এই কাদামাটির দুর্গম পথে তাকে আসতে হত না। সাপ যে সাপ, তাকেও মানিয়ে চলতে হয় অবস্থার সঙ্গে। নরসিং এটা নিজের চোখে দেখেছে। একই দিনে একটা বেদে দুটো সাপ ধরেছিল, একটা ধরেছিল মাঠে—নরসিং সেখানে উপস্থিত ছিল, আর একটা ধরেছিল গ্রামে--নরসিংয়ের প্রতিবেশী বাড়িওয়ালা গড়াঞী মশায়ের বাড়িতে; দুটোই গোখরো, আকারে আয়তনে ঠিক এক। কিন্তু মাঠের সাপটার সে কি তেজ, বেদের হাতে ঢালের মত করে ধরা ঝাঁপিটার উপর ছোবলের পর ছোবল মেরে নিজের মুখটাকে রক্তাক্ত করে ফেললে। আর গ্রামের সাপটা যেন মরা, মাথা দু-এক বার তুললে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে নিজের দেহের পাকানো কুণ্ডলীর মধ্যে মুখটা গুঁজে দিলে। নরসিং বলেছিল—ওটার জাত হল আসল গোখরোর জাত। আর এটা হল ঢোঁড়ার জাত বোধ হয়।

হেসে বেদে বলেছিল—"আজ্ঞে না, মাঠের সাপ আর গাঁয়ের সাপের এমনি তফাতই হয় আজ্ঞে। মাঠের সাপকে মানুষের সঙ্গে তো ঘর করতে হয় না। মানুষের 'বেক্কম' জানে না। তাই একেবারে ফোঁসাচ্ছে। গাঁয়ের সাপ জানে, মানুষ কী! বুঝলেন আজ্ঞে, তাতেই ওরা মানুষের কাছে 'বেক্কম' দেখায় না। 'অ্যাবস্থার মত বেবস্থা' আর কি।"

গিরবরজার ছত্রীর ছেলের রক্ত বংশধারা অনুযায়ী প্রথমেই চঞ্চল হয়ে উঠলেও পরমুহূর্তেই যে শান্ত হয়। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে ওটা। নরসিং নিজেকে সংযত করবার জন্ম নির্বাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল ওভারসিয়ারের দিকে। ওভারসিয়ার বললে—অ্যাঃ, আবার চাউনি দেখ, যেন গিলে খাবে!

নরসিং এবার বললে--গিলে তো মানুষ মানুষকে খায় না; আপনি কিন্তু যে রকম করছেন তাতে মনে হচ্ছে ধরে মারবেন আমাকে। কেন বলুন দেখি? কি করলাম আমি?

—কি করলে? মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার পাথরের গাদা থেকে তুমি পাথর নিয়েছ কেন হে বাপু?

—পাথর? ওই পাথর-কুচি?

—হ্যাঁ হে। ন্যাকা সেজো না। কেন নিয়েছ বল?

—খাবার জন্যে নিয়েছি। পাথর-কুচির ডালনা রেঁধে খেয়েছি। কি আর বলব বলুন? পাথর-কুচি চুরি! পাথর-কুচি চুরি করে আমি কি করব? আপনার কন্‌ট্রাক্টরকে ধরুন গিয়ে। সে এখান থেকে সরিয়ে আর এক জায়গায় গাদা দিয়ে নতুন মাপ দেবে।

—দেখ হে, বেশী চালাকি করো না। যে দেখেছে, যে জানে, সে আমাকে বলেছে। এখানকার পাথর নিয়ে তুমি গাড়িতে তুলে নিয়ে যাও, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের ফাটলে দাও। আমি সব খবর পেয়েছি।

—বেশ তো, যে দেখেছে সে আমার সামনে বলুক। আপনি তো দেখেন নাই, আপনার কথা তো প্রমাণ নয়।

ওভারসিয়ার এবার এগিয়ে এল। বললে—চল, মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে যেতে হবে তোমাকে। চেয়ারম্যানের কাছে যা বলতে হয় বলবে।

একটু চুপ করে থেকে নরসিং বললে—এখন আমার সার্বিসের সময়। এখন তো যেতে পারব না, যাব এর পরে। এর পর আপনার সঙ্গে দেখা করব।

'দেখা করব' কথাটা ইশারার কথা। ওরই মধ্যে অনেক কথা বলা হয়ে গেল। গোটা পাঁচেক অন্তত খসবে। পাঁচ টাকার কমে রাজী হবে না ওভারসিয়ার। কথাটা সত্য। একটা খন্দকে দেবার জন্য কয়েক ঝুড়ি পাথর-কুচি নিয়েছে নরসিং। মাথাব্যথা তো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নয়, রাস্তা তো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বারদের কাছে ধোবির পরিষ্কার করতে নেওয়া কাপড়, ফাটে আর ছেঁড়ে তাদের কি আসে যায়? যারা হাঁটে রাস্তা তাদের, এখন সব চেয়ে রাস্তাটা আপনার হল নরসিংয়ের। দিনে তিন বার তিন-বার ছ-বার—এই সাত মাইল পথ তার মোটর ছোটে। একটা খন্দক ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠছিল, রাত্রের অন্ধকারে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার জন্য জমা-করা পাথরের গাদা থেকে কয়েক ঝুড়ি পাথর নিয়ে সে খন্দকটায় দিয়েছে। উল্লুক বেকুব রামা! একটা গাদা থেকে বেশী পাথর নিয়েছে। বার বার সে বারণ করেছিল। কিন্তু রামা সেই হি-হি করে হেসেছে, বলেছে—আপনি যেমন দাদাবাবু! দায় পড়েছে ওভারসিয়ারের।

নরসিং বলেছিল—মেম্বাররা দেখে যদি কেউ কৈফিয়ত চায়?

তখন বলে দেবেন—গরুতে খেয়ে নিয়েছে। বলে সেই হি-হি করে হাসি।

নরসিংও হেসে ফেলেছিল। কথাটা খুব মিথ্যে নয়। ও-জেলায় রাস্তায় কাঁকর দেওয়া হয়। ঠিকেদারের সঙ্গে ওভারসিয়ারের বন্দোবস্ত আছে।

রাস্তায় কাঁকর আশী ফুট দিলে একশ ফুটের মাপ দেয় ওভারসিয়ার। চেয়ারম্যান কড়া হলে মধ্যে মধ্যে ইন্‌স্পেকশনে আসে, দু-দশটা গাদা চেক করে দেখে। কম হয়ই! কৈফিয়তে ওভারসিয়ার বলে, তিন মাস পড়ে আছে, ঝড়ে উড়েছে, জলে গলেছে, তারপর ধরুন মানুষ গরু ছাগল এদের পায়ে পায়ে চলে গিয়েছে।

ওখানকার লোকে কথাটার উপর রঙ চড়িয়ে বলে—গরুতে খেয়ে নিয়েছে।

ওভারসিয়ারও এখানে একটা কিছু রিপোর্ট দেবে আর কি! লোকসানের মধ্যে নরসিংয়ের পাঁচটা টাকা। আর আফসোস, জাত গেল পেট ভরল না। ঝুড়ি কয়েক পাথর দিয়ে একটা খন্দক বন্ধ করেও সার্বিস চালানো গেল না। কাঁচা রাস্তা পাকা করতে গেলে যে পাথর লাগে সে চুরি করে সংগ্রহ করা যায় না।

কথাটা কিন্তু বলে দিলে কে? এইখানে কয়েক ঘর পশ্চিমা ডোম বাস করে। শহরে ঝাড়ুদারের কাজ করে। কিন্তু সন্ধ্যার পরই ওদের দুপুর রাত হয়ে যায়। মদের নেশায় খানিকটা হল্লা করে ঘুমিয়ে পড়ে। ওদের তো এ চুরি দেখার কথা নয়। মেয়েগুলো অবশ্য জেগে থাকে। এদের মেয়েগুলো অত্যন্ত বিলাসিনী। পুরুষেরা মদে অচেতন হয়ে গেলে ওরা কান পেতে থাকে বাইরের ইশারার জন্য। শিসের শব্দ ভেসে আসে, টুপ টাপ করে ঢেলা পড়ে। নরসিংয়ের মনটা হঠাৎ খুশী হয়ে উঠল—পাথর কোথায় গেল এর একটা ভাল কৈফিয়ত পাওয়া গেছে। ওই ডোমপাড়ার উঠানে এবং চারিপাশে ছড়িয়ে আছে। ডোম-মেয়েগুলোর সন্ধানে যারা আসে তারাই ইশারা জানাতে ঢেলা মেরে গাদা সাবাড় করে দিয়েছে। ওভারসিয়ার এ কথা শুনবে না, কিন্তু ওভারসিয়ারের এ কথা মিউনিসিপ্যালিটি শুনবে।

রামা হঠাৎ বললে—জানেন দাদাবাবু, এ কথা বলে দিয়েছে কে জানেন?

—কে?

—নেতাই। এ আপনার ওই শালার কাজ।

—নিতাই! নরসিং সোজা হয়ে বসল। ঠিক। এ আর কেউ নয়, ওই নিতাই। বেইমান নিমকহারাম হাড়ী ছোটজাতের বাচ্চা ওই শয়তানের কাজ। নিতাইয়ের ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়ে গেছে; রামেশ্বরোয়া এখন তার পরামর্শদাতা হয়েছে, সেই এখন তার মুরুব্বি, গার্জেন। রামেশ্বরোয়ার তদ্বিরে

ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়েছে, একটা কাজও জুটিয়ে দিয়েছে রামেশ্বরোয়া। এখানকার এই শ্যামনগরে এক বাবু একখানা পুরনো 'লঝ্ঝড়' ফোর্ড গাড়ি কিনেছে। বাবু মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বার, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার, প্রচুর মদ খায় আর আমোদ করে বেড়ায়, চেয়ারম্যানরা যা বলে তাতেই সায় দিয়ে যায়। এস-ডি-ও, ডি-এস-পি, ম্যাজিস্ট্রেটের তোষামোদ করে, রাত্রে ডোমনী নিয়ে আমোদ করে।

তারই সেই ফোর্ডগাড়িতে খোরাক-পোশাক আর পনেরো টাকা মহৈনেতে ড্রাইভার হয়েছে নিতাই। রাম কহো! পনের টাকা মাইনে যার, সে আবার ড্রাইভার! নরসিং তাকে কম কি দিত—খোরাক দিত, বারো টাকা মাইনে দিত। পোশাক আর তিন টাকা বেশী মাইনে সে চাইলে নরসিং তাকে নিশ্চয় দিত। আর সেও তো তাকে বলেছিল, লাইসেন্স করে দোব—দোব—দোব। নরসিংয়ের মনে হয়, নিতাইয়ের মত অকৃতজ্ঞ, এতবড় বেইমান দুনিয়ায় কখনও হয় নাই, হবে না। হাড়ীর বাচ্চা গরুর রাখালি করে, নয়তো মাটি কেটে কিংবা লাঙল ঠেলে জীবন যেত। বড় জোর ইমামবাজারে বাবুদের বাড়িতে ঘোড়ার সহিসের কাজ করত, ঘাস কাটত, ঘোড়ার ময়লা ফেলত মাথায় করে। সে-ই তাকে মোটরের কাজ শিখিয়েছে, ড্রাইভিং শিখিয়েছে। সে তাকে ড্রাইভিং শিখিয়েছিল বলেই না এই লাইসেন্স সে পেয়েছে! সেই তো তার গুরু। কলিকাল, পাপের কাল। একালে বেইমানিই হল গুরুদক্ষিণা। নিতাই তার যা করেছে—তার আনুগত্য, তার প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম, সে সমস্তই নরসিংয়ের কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। ঠিক কথা। ঠিক ধরেছে রামা। এ চুকলামি করেছে নিতাই। বেইমান নিমকহারাম ছোট জাতের বাচ্চা ওই নিতাই। নিতাই আসে ওই ডোমপাড়ায়। ডোমনী সংগ্রহের জন্য আসে। নিজের জন্যও আসে—মনিবের জন্যও। ওই কোনরকমে দেখে থাকবে। নিতাই-ই বলেছে তার মনিবকে, তার মনিব বলেছে ওভারসিয়ারকে। বলুক! বলে কি করে দেখবে নরসিং।

'পাঁচঠো রুপেয়াকে কিস্মৎ।' বাস। "ডোমপাড়ায়—ডোমনীদের ইশারা দিবার জন্য ঢেলা মারিয়া মারিয়া পাথর গাদার পাথর শেষ করিয়া দিয়াছে। অমুক বাবুর ড্রাইভার নিতাইচরণ হাড়ী ইহাদের একজন। রামেশ্বরোয়া ড্রাইভারও যায়।"

নিতাইয়ের বাবু মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বার। বাবুর নামটা করতে পারে না

ওভারসিয়ার। সে এখন থাক। সময় হলে সে নামও চাউর হবে। মিউনিসি-প্যালিটির ভোট আসছে। কংগ্রেস নাকি এবার দাঁড়াবে। 'বন্দে মাতরম্, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'! সে কি মাতন! নরসিং চিরদিন ভোটের সময় তার গাড়ি দিয়েছে কংগ্রেসকে। এবারও দেবে। কংগ্রেস এবার ডিস্ট্রিক বোর্ডেও ভোটে দাঁড়াবে। সেখানেও সে গাড়ি দেবে।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক টেনে রুখলে নরসিং। সামনেই মদের দোকানটা। রাম বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলে। এই তো সবে ছ-টা বাজে। এখনও দুটো ট্রিপ বাকি। একবার যাওয়া—একবার আসা। ফিরে এসে ন-টার সময় দাদাবাবুর বোতল নিয়ে বসবার কথা। রাস্তা খারাপ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, এই অবস্থায় নেশা ধরলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে। নরসিং সে দৃষ্টিকে গ্রাহ্য করলে না। গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল। রামকে ডাকলে—আয়।

—আর ট্রিপ দেবেন না?

—না।

—এ ট্রিপে কিন্তু লোক হত।

—ভাগ। আয়। পয়সা পয়সা করে তুই ক্ষেপে যাবি দেখছি। আয়। পয়সার ভাবনা আজ আর নরসিংয়ের নাই। মদ খেয়ে মেজাজকে তার চড়া সুরে বাঁধবার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পয়সা যেতেও আছে আসতেও আছে, দু-মাসে রোজগারও সে যথেষ্ট করেছে। খরচ-খরচা বাদে চারশর ওপর জমিয়েছে নরসিং। শুখনরামের টাকা সে ফেলে দিয়েছে। নরসিংয়ের আর কোন ঋণ নাই। পঞ্চাশের উপর টাকা তার হাতে। তা ছাড়া দরকার হলে শুখনরাম এবার তাকে পাঁচশ টাকা দেবে এক কথায়। টাকার জন্য আজ তার মেজাজ খারাপ নয়। আজ তার মেজাজ চায় গরম হয়ে উঠতে; এই দোকানে নিশ্চয় আসবে নিতাই রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে। সে আজ নিতাইকে একবার দেখবে। এস-ডি-ও, ডি-এস-পি, দারোগা ও ওভারসিয়ার নয় নিতাই! হাড়ীর ছেলেকে সে-ই ড্রাইভার বানিয়েছে; দরকার হয়েছে আবার সে তার হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিয়ে ড্রাইভারি ঘুচিয়ে দেবে। ছেলেবেলায় হিতোপদেশে একটা গল্প পড়েছিল সে। এক মুনি তপস্যা করছিলেন—একটা ইঁদুরের বাচ্চা কাকের মুখ থেকে খসে পড়ল। বড় মায়া হল মুনির। মুনি তাকে বাঁচালেন। কিছুদিন পর বিড়ালে তাকে তাড়া করলে। মুনি তাকে বিড়াল করে দিলেন। বিড়ালকে তাড়া করলে কুকুরে। মুনি তাকে কুকুর করলেন মন্ত্রবলে

কুকুরটা বাঘের ভয়ে সারা হয়ে একদিন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। মুনি তখন তাকে বাঘ করে দিলেন। বাঘ হয়ে ইঁদুরটার আস্পর্ধা বাড়ল; সে একদিন এল মুনিকেই খাবার মতলবে। তার মতলব বুঝে মুনি হেসে মন্ত্র পড়ে বললেন —ফের ইঁদুর হয়ে যাও। বাস্! হয়ে গেল সে বাঘ থেকে সেই কুৎসিত ভীতু ইঁদুর, যে ইঁদুর গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

নিতাইয়ের দেখা পেলে না নরসিং।

শালা! ছুটো ট্রিপ লোকসান। এমন নেশার আমেজটা বরবাদ! একটা চরম উত্তেজনাপূর্ণ কিছু না করলে তার মেজাজ শান্ত হচ্ছে না। ন-টায় দোকান বন্ধ হল। নরসিং অত্যন্ত আক্ষেপ নিয়ে এসে মোটরে বসলে। বিলকুল বরবাদ আজ। রাত্রে শুখনরামের সঙ্গে দেখা করবে ভেবেছিল। ইচ্ছা ছিল শেঠকে একখানা ট্রাক কিনবার জন্য ভজাবে। এতগুলো টাকা দু-মাসের মধ্যে ফেলে দেওয়াতে শুখনরামও একটু বিস্মিত হয়েছে। সে যা বলেছিল সেটা তার কানে এখনও বাজছে। শেঠ বলেছিল—বাস্, আঁ? দু-মাহিনার অন্দরে টাকাটা শুধে ফেললেন সিংজী? কেয়াবাৎ! তবে শেঠ লোক ভাল, সুদ এক পয়সা নেয় নি। বলেছে, আপনি আমাকে অনেক কাম দিয়েছেন—আপনার পাশে সুদ নিলে ধরমকে কি কৈফিয়ত দিবে মোশা?

নরসিং বলেছিল—নামুন না আপনি সুদ্ধু। দেখিয়ে দিই একবার।

—আচ্ছা। হেসেই কথাটা বলেছিল শেঠজী।

শেঠ নামলে—এখানকার মোটর কোম্পানীর সঙ্গেও নরসিং পাল্লা দিতে পারে। ইচ্ছে ছিল কথাটা আজ পাড়বে। কিন্তু এখন সেও মদ খেয়েছে। শেঠও বসেছে নেশায়, সিদ্ধি খেয়েছে বিকেলে, তার পর চরস, তার পর গাঁজা। এখন আর কথাবার্তার জুৎ হবে না। বরবাদ হয়ে গেল সব।

মোটরের হেড লাইটে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার গাড়ির আড্ডাটা। একটা গাড়িকে ধাক্কা মারলে কি হয়? এক শিকারী শিকারে গিয়ে বাঘ ভালুক কিছু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কাক মেরেছিল গুলী করে। তেমনি ধারা নিতাইয়ের বদলে ঘোড়ার গাড়িটাকে—। কিন্তু হাত অভ্যস্ত কৌশলে গাড়িগুলোকে পাশে রেখে নিরাপদে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা বাঁয়ে রেখে মোটর কোম্পানীর আফিস পিছনে ফেলে গাড়ি মোড় ফিরল। ওই শুখনরামের গদির পাশে তার আস্তানা। আঃ!

টর্চ ফেললে কে ?—কে ? গাছতলায় কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ?—কে ? এগিয়ে গেল নরসিং।

—নরসিং ! চিনতে পার আমাকে ?

—কে ?

ইমামবাজার থানার পাশে থাকতাম আমি। পুলিসের কনস্টেবলরা ভাড়া দেয় না বলে—

—বাবু! ডেটিনিউবাবু! অনন্তবাবু!

—চুপ কর। আস্তে কথা বল।—বাবু নিজেই এগিয়ে এলেন নরসিংয়ের খুব কাছে।

এবার মুখে হাত আড়াল করে খানিকটা সরে এসে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে নমস্কার করলে নরসিং। ভদ্রলোক হেসে বললেন—মদ খেয়েছ তার জন্য লজ্জা করতে হবে না। কাছে এস।

—বলুন।

—আমাকে ট্রেন ধরিয়ে দিতে হবে। সাড়ে এগারটার ডাউন ট্রেন। ভাড়া কি নেবে বল ?

সে কথার জবাব না দিয়ে নরসিং বললে—আপনার জিনিসপত্র ?

—এই যা আমার সঙ্গে।

—আসুন।

ভদ্রলোক কাঁধের ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে দিলেন, মাথায় চাপিয়ে নিলেন টুপিটা। চেপে বসলেন গাড়িতে। চল। তার পর বললেন—তোমাকে তো বলতে হবে না। আমার এখানে আসার কথাটা যেন—

নরসিং গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললে—ঠিক আছে বাবু।

গাড়ি ছুটল। নরসিংয়ের নেশা নরসিংকে আজ বাঘের মত সাহস এনে দিয়েছে। হেড লাইটের আলো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার উপর, পোকা উড়ছে আলোর মধ্যে। দু-ধারে বন। গঙ্গার তীরভূমির আগাছার জঙ্গল। হু-হু করে গাড়ি চলেছে। ডেটিনিউবাবু। নরসিং জানে, ওঁদের জিজ্ঞাসা করতে নাই, কোথায় এসেছিলেন, কোথায় যাবেন—এসব কথা। দু-তিন বার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। এও সে জানে যে, পুলিস পিছনে আসতে পারে মোটর হাঁকিয়ে। সামনে যদি আসে তবে সে যদি পয়দলে থাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে নরসিং।

স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে এতক্ষণে নরসিং জিজ্ঞাসা করলে—বাবু, শরীর ভাল আছে?

—হ্যাঁ। পাঁচ টাকার একখানি নোট বার করে বাবু নরসিংয়ের হাতে দিলেন। নরসিং নিজের ব্যাগ খুলে বার করলে একটি টাকা। বাবুর কাছে এক পয়সা ভাড়া বেশী নিতে পারবে না সে। বাবু হেসে বললেন—না, রাখ।

—আজ্ঞে না বাবু, আপনার কাছে—

—মিষ্টি খেয়ো, আমি দিচ্ছি। মদ খেয়ো না কিন্তু। বাবু হেসে স্টেশনে ঢুকে গেলেন।

পনেরো

এই এরা এক মানুষ। ছুনিয়ার মানুষের জাতের মধ্যে এদের জাত আলাদা। দেশের মধ্যে এমন মানুষ তো সে দেখলে না, যারা এদের না ভালবাসে, না খাতির করে! পুলিস যে পুলিস—যারা এদের ধরে, যারা এদের আটক রাখে তারাই কি এদের কম খাতির করে, কম ভালবাসে? পুলিস হলেই সে খারাপ লোক হয় না, ভাল আর মন্দ নিয়ে ছুনিয়া, পুলিসের মধ্যে ভালও আছে মন্দও আছে; ভাল যারা তাদের কথা ছেড়েই দেয় নরসিং; চাকরি নিয়েছে পুলিসের—ডিউটি করতেই হয়, ডিউটি করেও তারা এই সব বাবুদের ভালবাসে। ছোটখাটো অনেক দোষ ঢেকে নেয়। তা ছাড়া ছোটখাটো ব্যবহারে যে ভালবাসা দেখায় সে সব নরসিং চোখে দেখেছে। নিজের বাসার ভাল জিনিসটির একটু ভাগ এঁদের না দিয়ে তারা খায় না। নজরবন্দী অবস্থার বাবুরা পুলিসের কাছে যে সব আবদার করে সব আবদার রাখবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। ভাল লোক পুলিসের কথা বাদ দেয় নরসিং। মন্দলোক পুলিস—যারা বাঁকা পথ ছাড়া চলে না, নিজের চাকরি আর পকেট ছাড়া কিছু জানে না—তাদেরও দেখেছে এদের খাতির করতে। এই বাবুরই একবার জর হয়েছিল—বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন জরে। সে এক বদমাশ দারোগার আমল। সেই বদমাশ দারোগাকে বাবুর মাথার শিয়রে বসে থাকতে সে দেখেছে চিন্তিত মুখে। নরসিংয়ের গাড়িতে তিনি স্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠিয়েছিলেন সদরে—বাবুকে সদর হাসপাতালে পাঠাবার মঞ্জুরীর

জন্য। নিজের কানে দারোগাবাবুকে বলতে শুনেছে নরসিং—মরে গেলেও এ সব লোক তো আক্ষেপ করবে না, কিন্তু আমি চোখে দেখব কি করে? পরকালে জবাবই বা কি দোব? আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল নরসিং। এই দারোগাবাবুটিরও পরকালের ভাবনা আছে, এর মুখেও এমন কথা বার হয়! অনেক ভেবে দেখেছে নরসিং। শুকনো গাছে ফুল কখনও ফোটে না। কিন্তু—"হরিনামের গুণে গহন বনে মৃত তরু মুঞ্জরে।" এ সব মানুষের গুণই এই।

বাবু এল প্রথম ইমামবাজারে। ক'দিন পরেই এক হুলুস্থুল কাণ্ড। ইমামবাজারের জনচারেক বাবুভাই মদ খেয়ে গরীব বোষ্টমপাড়ার মেয়েদের স্নানের পুকুরের ঘাটে নেমে হল্লা করছিল। এটা ওরা বরাবরই করত। বোষ্টমরা নিরীহ ভিখারীর জাত—হাতজোড় করে ফল পায় নাই, ভদ্র মাতব্বরদের কাছে গিয়েও কিছু হয় নাই; পুলিসের কাছে তারা যায় না—ওখানে তাদের যাওয়ার অভ্যাস নাই কোন কালে। শেষে ওরা সব সহ্য করে যেত। বাবুরা হল্লা করে পথ দিয়ে গেলে ঘরের মধ্যে ঢুকত, ঘাটে নামলে ঘাট থেকে উঠে আসত! উঠে না যাওয়া পর্যন্ত ঘাটে আর নামত না। অনন্তবাবু বেরিয়েছিলেন…হঠাৎ সেদিন তাঁর নজরে পড়ল এমনিধারা কাণ্ড। চারজনে ঘাটে নেমে হাত-মুখ ধোয়ার অছিলায় হল্লা করছে, কয়েকটি মেয়ে ভিজে কাপড়ে রাস্তার এক পাশে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, একটি মেয়ে বেশী জলে ছিল। সে উঠতে পারে নি—মাথায় ঘোমটা টেনে নীরবে একগলা জলে সে দাঁড়িয়ে আছে। এ দেশের লোক পুরুষ পুরুষ ধরে যে ব্যবহার সয়ে আসছে, অনন্তবাবুর তা সহ্য হল না। তিনি গিয়ে প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু এখানকার বাবুদের ছেলে—বনগাঁয়ের রাজা শেয়ালের বাচ্চা তার উপর মদ খেয়ে মাতোয়ারা অবস্থা—তারা একেবারে মারতে এল অনন্তবাবুকে। ব্যস—লেগে গেল লড়াই। চার শেয়াল হলে কি হবে! এ বাবুরা হল—শের মানে বাঘের জাত। অনন্তবাবু বক্সিং জানেন। ঘুষির চোটে চারজনকে তিনি 'ভানুমতির খেল' দেখিয়ে দিলেন। তার পর সে অনেক হাঙ্গামা। দরখাস্ত, মামলা করবার হুমকি—অনেক কিছু। দারোগা তখন যে ছিল, সে ছিল ভাল লোক। সে অনন্তবাবুর পক্ষ নিলে। আর বাবুর কপাল জোর—কালেক্টর ছিলেন ভারী তেজী, অল্প বয়স, তিনি এসে সমস্ত শুনে বাবুদের ছেলেদের লাঞ্ছনার বাকি রাখলেন না। পুরুষ পুরুষ ধরে যে অনাচার চলে আসছিল, ওই বাবুটি একদিনে বন্ধ করে দিলেন। শুধু তাই নয়। ওই

জাতভিখারী বোষ্টমের লাঞ্ছনা সহ্য করে যে পিঠ বেঁকে গিয়েছিল, সে পিঠ সোজা করে তারা দাঁড়াল।

তার পর বাবু ক'দিনের ভেতর প্রায় গোটা গ্রামকে জয় করে ফেললেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আর প্রাণখোলা হাসি আর মানুষের সঙ্গে আলাপ করার ক্ষমতা—এই তিনটি মূলধন। তবে আসল মূলধন—অন্যায় হলে তাকে রুখে দাঁড়ানোর অভ্যাস আর ক্ষমতা। নরসিংয়ের নিজের—। সামনেই একটা বাঁক ঘুরে শহরে ঢুকবার তে-মাথার মোড়। মোড়টা দেখে বিদ্যুতের মত একটা কথা মাথায় খেলে গেল। ওই তে-মাথার মোড়ে একজন পুলিস দাঁড়িয়ে থাকে। হেড লাইট নিবিয়ে দিলে সে। রাম বললে—দাঁড়ালেন যে?

—হুঁ। নরসিং বললে—শহরে ঢুকব না!

—ঢুকবেন না?

—না! পাঁচমতি চলে যাব সটান!

—পাঁচমতি?

—হ্যাঁ। চুপ করে বসে থাক্। নরসিং গাড়ি ঘুরিয়ে, একটা কদর্য গেঁয়ো রাস্তা ধরে শহরকে পাশে রেখে সতর্ক মন্থর গতিতে চলতে আরম্ভ করলে। রামাকে বললে—টর্চটা জেলে মাঝে মাঝে পথটা দেখে নে।

আর একটু নেশা হলে ভাল হত। কিন্তু উপায় নাই। পাঁচমতিতে পৌঁছে দোস্ত সুরেশের কাছে গাঁজার ভরসা একমাত্র ভরসা। তবে আজ নজরবন্দী বাবুকে পৌঁছে দিয়ে মেজাজটা তার ভারী খুশী হয়েছে। ভারী খুশী। সমস্ত শরীর চন চন করছে, মাথার ভিতরটা এই বাদলার মধ্যেও ঝাঁ-ঝাঁ করছে। এই ধরনের ট্রিপ না-হলে ট্রিপ!

শ্যামনগরের এলাকা পাশে-পাশে পার হয়ে সে এসে উঠল বাদশাহী সড়কে। এইবার জেলে দিলে হেড লাইট। চল পাঁচমতি। রাতটা কাটাতে হবে দোস্ত দাসের ওখানে। তাকে বলতে হবে—লাস্ট ট্রিপে পাঁচমতি থেকে বেরিয়ে মাইল দুয়েক গিয়েই গাড়ির মাথা বিগড়েছিল। সেই তখন থেকে টর্চের আলোয় খুট-খাট্ খুটুর-মুটুর করে শয়তানকে সোজা করে পাঁচমতিতেই ফিরে এল। শ্যামনগর পর্যন্ত ছ-মাইলের ঝুঁকি নিতে সাহস হল না। দু-মাইল পথ পাঁচমতি আর দোস্ত যখন এখানে রয়েছে তখন আর ভাবনা কি? কথাটা পাখিকে শেখানোর মত শিখিয়ে দিতে হবে রামাকে।

নরসিং আন্দাজ করতে পারে, দোস্ত সুরেশ দাস কি রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে

উঠবে। সে বলবে—আলবৎ, জরুর। নইলে আবার দোস্তি কিসের? আমার ঘরও যা তোমার ঘরও তাই। যা ঘরে আছে একমুঠো—একমুঠোই সই, তাই তিনজনে ভাগ করে খাব, একটা বিছানায় তিনজনে শোব। ব্যস্। বলেও সে উনোনে নতুন করে আঁচ দেবে। ময়দা মাখবে। আলু কুটবে। বেশী উৎসাহ হলে এই রাত্রেও সে একটা বোতল অন্তত যোগাড় করে আনবে।

রামা বলে উঠল—দাদাবাবু!

নরসিং তার আগেই দেখেছে। সমস্ত শরীরে তার রোঁয়াগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে। গাড়ি সে মুহূর্তে থামিয়ে ফেললে; হেড লাইট নিভিয়ে দিলে। দুটো প্রকাণ্ড বড় সাপ। রাস্তার দু-মাথায় পরস্পরের দিকে মুখ করে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নরসিং বুঝতে পেরেছে, ব্যাপারটা কি! এই আকাশভরা মেঘের অন্ধকারের মধ্যে রিমিঝিমি বাদলের আমেজে ওরা খানা-ডোবার কলরবমুখর ব্যাঙেদের লোভ ভুলে আর-এক টানে এসে রাস্তার দু-মাথা থেকে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাম ভয় পেয়ে গেল, বললে—আলো নিভিয়ে দিলেন কেন?

—কড়া আলো চোখে লাগলে ভয় খাবে। সাপের চোখে পাতা নাই।

—কিন্তু—

—ধ্যাৎ, বুঝতে পারছিস না, জোট খেতে এসেছে! টর্চটা জ্বাল। দে, আমাকে দে।

অত্যন্ত সাবধানে জ্বাললে সে টর্চটা। এমনভাবে শূন্যলোকে ফেললো আলো যেন মাটির উপর না পড়ে অথচ তার আভায় মাটি দেখতে পাওয়া যায়। হাঁ, ওই যে! ঠিক মাঝরাস্তায় দুটো লতার মত পরস্পরকে পাক দিয়ে জড়াজড়ি করে লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পড়ে গেল মাটিতে। ওই আবার জড়িয়ে নিচ্ছে। ওই উঠে দাঁড়িয়েছে ফের লেজের উপর ভর দিয়ে। এমন খেলা নরসিং আর দেখে নাই কখনও। এর আগেও সে সাপের জোটখাওয়া দেখেছে। সে দিনের বেলা আর সে সাপ ছিল ছোট। এই এমন অন্ধকার বাদলা রাত্রে ঘন জঙ্গলে দু-পাশ ভরা বাদশাহী সড়কের মত জায়গায় অজগরের মত সাপ-সাপিনীর এমন পাগলের মত খেলা করা সে নয়। হিস-হিস গর্জনে একেবারে মাতিয়ে তুলেছে জায়গাটা। যেমন হোক আলোর আভা পড়েছে—তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। মোটরের ইঞ্জিনটা চলছে, তার শব্দ উঠছে, পেট্রোলের ধোঁয়া ভিজে ভারী বাতাসে নীচে-নীচেই ঘুরছে—কিছুতেই

গ্রাহ্য করছে না তারা। আ-হা-হা, ওই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে জড়াজড়ি করে —ফণা মেলে মুখে মুখে, যেন মুখে মুখ দিয়ে তুলছে! নরসিংয়ের সমস্ত শরীরে একটা কি বয়ে যাচ্ছে, বুকের ভিতরটা কেমন করছে। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওই বিষধর বিষধরীর লীলাতরঙ্গায়িত দেহের দিকে। কি হিল্লোল!

রাম বললে—দাদাবাবু!

খেলতে খেলতে সাপ দুটো পাশের জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। আর দেখা যায় না। রাম নরসিংকে ডাকলে। নরসিংয়ের এখনও যেন হুঁশ হয় নাই। তার মনের মধ্যে উন্মত্ত কল্পনা চলছে; নীলিমা আর ফট্‌কি, ফট্‌কি আর নীলিমা।

রাম বললে—দাদাবাবু, চলুন।

—তুই চালাতে পারবি গাড়ি?

রাম চমকে উঠল। এই অন্ধকারে এই রাস্তায় তাকে গাড়ি চালাতে বলছেন দাদাবাবু? কিন্তু সে দাদাবাবুর সাকরেদ, সে কি 'না' বলতে পারে? সে বললে—আপনি পাশে বসে থাকবেন—ভয় কি? খুব পারব।

নরসিং তাকে সীট ছেড়ে দিয়ে বললে—ঘুরিয়ে নে গাড়ি।

—ঘুরিয়ে নেব?

—হ্যাঁ, শ্যামনগর।

কিছুদূর এসেই নরসিং আবার তাকে বললে—সর্, ছেড়ে দে আমাকে। এমন করে যেতে রাত কাবার হয়ে যাবে। এবার গাড়ি ছুটল। নরসিং পাগল হয়ে গিয়েছে।

পরণাম গিরিধারী সিং, পরণাম তোমাকে, জান্‌কী, জান্‌কী মাপ করিস তুই নরসিংকে—কসম সে রাখতে পারছে না। পারবে না।

গাড়িটাকে নিয়ে সে ঝড়ের মত এল ক্রীশ্চান-পাড়া ঢুকবার রাস্তার মুখে। কিন্তু এখানে এসে খানিকটা দমে গেল। নীলিমাকে এই রাত্রে সঙ্গিনী কল্পনা করতে তার মন কেমন ভয় পাচ্ছে। অসম্ভব মনে হচ্ছে। গাড়িটাকে নিয়ে সে আবার ফিরল। এসে দাঁড়াল শেঠের বাড়ির এলাকায় নিজের আস্তানায়। গাড়ি থেকে নেমে সে অকারণ হর্ন দিতে লাগল।

ঘুম ভাঙবে না ফট্‌কির?

শেঠের সিন্দুকের মত বাড়িটা নিস্তব্ধ। কোন সাড়া নেই।

নরসিং বাড়িটার চারিদিকে ঘুরতে লাগল। মধ্যে মধ্যে ঢেলা তুলে বন্ধ জানালায় ছুঁড়ে মারতে লাগল।

রামা গাড়ি তুললে—বাঁশের দরমা দিয়ে তৈরী গ্যারেজের মধ্যে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল দাদাবাবুর জন্য। কিন্তু দাদাবাবু ক্ষ্যাপার মত ঘুরছেই। এবার সে সাহস করে দাদাবাবুর হাত ধরে বললে—আসুন, শোবেন।

—ছাড়্।

—না। শেষে কেলেঙ্কারী হবে একটা। আসুন শোবেন।

নরসিং চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরেটা তার যেমন মোটরের তেলে কালিতে পেট্রোলের ধোঁয়ার তাতে জ্বলছে—ভিতরেও তেমনি দাহ। সে আজ নিজেকে সামলাবার একতিয়ার হারিয়েছে।

রাম বললে—কাল। কাল আমি তাকে এনে দোব।

নরসিং একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে। রাম তার হাতে ধরে ঘরে এনে কলসী থেকে জল ঢেলে মাথা ঘাড় ধুইয়ে দিলে। তারপর খাবার দিলে। খাইয়ে তাকে শোয়ালে।

পরদিন সকালে উঠেই সে গেল জোসেফের বাড়ি।

নীলিমা তাকে দেখে ভুরু কুঁচকে বললে—এমন চেহারা কেন আপনার?

নরসিং রাঙা চোখে তার দিকে চেয়ে হাসলে।

নীলিমা বললে—সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছেন বুঝি? আপনারা—। সে ঘাড় নেড়ে বললে—ড্রাইভারি করলে তাকে এই করতেই হবে? বসুন, দাদাকে ডেকে দিচ্ছি।

সে আর তার কাছেই এল না। নরসিং দশটা বাজতেই মদের দোকানে গিয়ে উঠল। আকণ্ঠ মদ গিলে বাড়ি ফিরল। সমস্ত দিন অজ্ঞানের মত পড়ে রইল। রামা তাকে স্নান করালে, খাওয়ালে, বিছানায় শুইয়ে দিলে। সন্ধ্যেবেলা উঠে সে স্নান করে পরিপাটী করে বেশভূষা করে আবার গেল জোসেফের বাড়ি। জোসেফ মাকে ডাকলে—মিস্টার সিংকে চা খাওয়াও মা।

—নীলিমা কোথায়?

—সে গেছে পড়তে—রেভারেণ্ড ব্যানার্জীর বাড়ি।

একটু চুপ করে থেকে নরসিং বললে—দোকানে যাবে না?

—না। আনিয়ে রেখেছি। খাবে নাকি?

—অল্প। আজ অনেক খেয়েছি।

—চা থাক মা। জোসেফ ভিতরে নিয়ে গেল নরসিংকে।

অল্প নয়। তবে সকালের তুলনায় অল্প খেয়ে বাসায় ফিরে নরসিং বিছানায় শুয়ে পড়ল। আর দাঁড়াতে পারছে না সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

অঘোরেই ঘুমোচ্ছিল সে। হঠাৎ তীব্রতর চাঞ্চল্য এবং শিহরণ খেলে গেল তার সর্বশরীরে—একটা স্পর্শের আস্বাদে। সে রক্তরাঙা চোখ মেলে চাইলে। তার বুকের উপর মাথা রেখে শুয়েছে ফট্‌কি। বাইরে মেঘ ডাকছে। রিমঝিম বৃষ্টি হচ্ছে। রামা ডাকলে—দাদাবাবু, উঠুন, খান কিছু।

খাবারের থালা সামনে নামিয়ে দিয়ে সে বললে—আমি গ্যারেজে গাড়িতে শুচ্ছি গিয়ে।

নরসিং উঠে বসল। চোখের সামনে তার সাপ দুটো খেলা করার ছবি নাচছে।

ষোল

একটা বাদলা আসন্ন। 'দেবতা মুখ নামিয়েছে কাল থেকে'—অর্থাৎ আকাশে মেঘের ঘনঘটা, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই; এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে, মধ্যে মধ্যে ফিনফিনে বৃষ্টি আসছে; 'ধরতি'র (ধরিত্রীর) চেহারা হয়েছে যেন অভিমানিনী কালো বউয়ের মত; কালো বউটি যেন মুখ নামিয়ে বসে আছে। আকাশের গায়ে জমাটবাঁধা মেঘের কোলে কোলে হালকা পেঁজা তুলোর মত ঘন কালো রংয়ের মেঘ ছুটছে, আসছে, চলে যাচ্ছে, আবার আসছে, সন-সন করে যাচ্ছে, কলকাতার পিচের পথে 'থার্টি-ফর্টি' মাইল স্পীডে চলে যেমন 'লাইট ইঞ্জিন'-ওয়ালা দামী গাড়ি তেমনি ভাবে চলেছে। বাতাসটা বন্ধ হয়ে একবার গুমোট ধরলেই জোর বৃষ্টি নামবে।

সাহুজীর বারান্দায় ভিজে কাপড় হাওয়ায় উড়ছে। একখানা রঙ্গিলা ছিটের শাড়ি, দুখানা মিলের—একখানা ডুরে, একখানা খুব চওড়া কালাপেড়ে; ওরই মধ্যে দুখানা ধুতি সরুপাড় নিয়ে মিন্‌মিন্ করছে। এক পাশে একখানা

আধময়লা থান কাপড়। ওখানা ফটকির কাপড়, নরসিং চিনতে পারছে। সাহুজীর চিলের ছাদের আলসের কোণে একটা কাক বসে আছে, এদিক ওদিক ঘুরছে, মাথা কাত করে নীচের জিনিস দেখছে, মধ্যে মধ্যে স্থির হয়ে গলার নরম ফ্যাকাসে পালকগুলো ফুলিয়ে বসে থাকছে। নরসিংয়ের মনেও বেড়ে আমেজ লেগেছে। সকালে এখনও আবগারীর দোকান খোলে নাই ; খুললেই একবার যাবে সেখানে, একটা পাট অন্তত নিয়ে আসতে হবে। একটা বোতলে এক ঢোক পড়েছিল, সেইটুকুই খেয়ে আমেজ করে বসে নরসিং সিগারেট ফুঁকছে। একটা পাট আর আধ সের মাংস, তার সঙ্গে চালে ডালে খিচুড়ি। ভাবছে, ছাগল ভেড়ার মাংস না এনে একটা হাঁস আনবে কিনা। হাঁস আনলে হাঙ্গামা আছে—পালক ছাড়ানো, কাটাকুটি করা, নাড়ীভুঁড়ি ঘাঁটা, এগুলি হাঙ্গামা তো বটেই, তার উপর নরসিংয়ের গা ঘিনঘিন করে। গ্রিজ, মোবিল, পেট্রোল, গাড়ির তেল-কালি নাড়তে নরসিংয়ের গা ঘিনঘিন করে না, কিন্তু এই সব নাড়ী ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারে না সে। রামা থাকলে ভাবনা ছিল না, সে-ই সব করত। রামা নাই, আজ সাত-আট দিন হল বাড়ি গিয়েছে। বাড়ি তো হতভাগার চুলোয়, গিয়েছে ইমামবাজার, সেই নেকড়ানী পিসি—নরসিংয়ের মামীর কাছে। ফিরবার পথে গিবৃবরজা হয়ে ফিরবে বলে গিয়েছে।

মাসখানেকের কাছাকাছি আজ শ্যামনগর-পাঁচমতি সার্ভিস বন্ধ। বাদশাহী সড়ক কাদায়-জলে খানা-খন্দকে ভরে উঠেছে—গাঁওল-গাঁয়ের গরু-মহিষ-চলা গো-পথকেও হার মানিয়েছে। ভাড়াটে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানগুলো এখন লাফাচ্ছে—লম্বা লম্বা বাত্‌ বলছে। তাও সেদিন বড় বৃষ্টিটার পর তিন দিন এরাও ওপথে হাঁটতে সাহস করে নাই। গত বছর নাকি একটা বড় কাদায় একখানা গাড়ি পড়ে যাওয়ার ফলে একটা বলদ একদিন ঘায়েল হয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত কসাইখানার পাইকারকে বেচে দিতে হয়েছে। ঘোড়ার গাড়ির পক্ষীরাজগুলো কিন্তু বেঁচেছে কিছুদিনের জন্য। চারিদিকে এখন দল-দাম-ঘাসের সমারোহ, সামনের পা-দুটোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে কোচওয়ানেরা তাদের ছুটি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ; বেটারা সব খুব খাচ্ছে। হাড়পাঁজরা-সার ঝুরঝুরে চেহারাগুলো এরই মধ্যে একটু-আধটু চেকনাই মেরেছে যেন। ইমামবাজার থেকে সদর শহরের সড়কের পাশে কাঁকুরে মরুভূমির মত ডাঙায় বর্ষার সময় কচি কচি পাতলা ঘাস বেরিয়ে ফিকে সবুজ হয়ে ওঠার কথাও মনে পড়ে নরসিংয়ের।

এক সারি গরুর গাড়ি আসছে, দুই উঁচু করে কাঠ বোঝাই করেছে। গঙ্গার তীরে—অফুরন্ত জঙ্গল কাটছে, বোঝাই করে নিয়ে আসছে তা। আসুক ; কিন্তু রাস্তার দফারফা করে দিলে উল্লুক গাঁইয়ার দল। ওদের দেখলে গা জ্বলে যায় নরসিংয়ের। নরসিংয়ের এক এক সময়ে ইচ্ছে হয়, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস তুলে দিয়ে মাল-বওয়ার সার্ভিস খোলে, কার বিক্রি করে দিয়ে ট্রাক। না না, মফঃস্বলে চলবে না ইণ্টারন্যাশানাল মহাপ্রভু! চোরাবালিতে হাতী বসে যাবে। হালকা মজবুত ট্রাক চাই। নানান ধরনের গাড়ির কথা মনে হয়। হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল নরসিং। গাড়ির সারির পাশে পাশে—ছাতা মাথায় দিয়ে লোকটা কে? থানার সিপাহী মনে হয় যেন! মুখ দেখা যাচ্ছে না, পায়ের জুতোজোড়াটা ভোঁতা নাগরা, কাপড় সেঁটে লেগে রয়েছে পায়ের সঙ্গে, হাঁটুর নীচে অবধি নেমেছে কোনরকমে ; গায়ের পাঞ্জাবিটায় বগলের কাছে তিনটে সেলাই রয়েছে যেন। তা ছাড়া এমন দুলে দুলে চলা তো যার গরম নাই, গরব নাই তার সম্ভবপর নয়। গরব আর গরম তো পুলিসের একচেটিয়া।

হ্যাঁ ঠিক। চামোরী সিং সিপাহী। নরসিংয়ের ভুল হয় নাই। সকাল বেলায় চামারী সিং কোথায় চলেছে! বুকটা তার ধ্বক করে উঠল। মাসেক খানেকর ক'দিন বেশীই হবে—রাত্রের অন্ধকারে সে ডেটিনিউবাবুকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে, কথাটা তার মনে পড়ে গেল। নড়ে-চড়ে বসল নরসিং। খবর পেয়েছে নাকি?

বেইমান ছোটলোকের বাচ্চা নিতাই! ওই শূয়োর-কি বাচ্চারই কাজ নিশ্চয়! সেদিন বেটা চুকলামি করতে এসেছিল। এসে রামাকে বলেছিল; তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় নাই। বেঁচে গিয়েছে হারামজাদা নিমকহারাম। নরসিংকে বলতে এলে, থাপ্পড় লাগাত তাকে নরসিং। হারামজাদ নিমকহারাম! দুনিয়াতে কুত্তা যে কুত্তা—সেও কখনও বেইমানি করে না, নিমকহারামি করে না। শুধু কুত্তা কেন, কোন জানোয়ারই নিমকহারাম নয়। গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, মহিষ মনিবকে কখনও ভুলে যায় না। মনিব বিক্রি করে, জানোয়ার যেতে চায় না সে বাড়ি থেকে, চিৎকার করে, মাথা নাড়ে, জোর করে বেঁধে নিয়ে গেল কাঁদে—চোখ দিয়ে জল পড়ে। আর মানুষকে একটুকরো এঁটো রুটি বেশী দাও, ব্যস্! তোমার নিমক ভুলে তার গোলাম হয়ে যাবে।

নিতাই রামাকে বলেছিল—গুরুজীর ছামনে যেতে আমার ডর লাগছে

ভাই। তু বলিস গুরুজীকে। খুব পেরাইভেটে বলে গেলাম তোকে। পুলিস বোধ হয় পিছু লেগেছে গুরুজীর।

পুলিস এসেছিল তার মনিবের কাছে। অনন্তবাবু ডেটিনিউ এখানে এসেছিল, সে খবর পুলিস পেয়েছে। নিতাইয়ের বাবুর এক ভাগ্নের কাছেই এসেছিল বলে তাদের বিশ্বাস। পুলিসের ধারণা রাত্রের মোটরবাসে এসেছিল অনন্তবাবু। কিন্তু কোথায় কোন্‌দিকে সে চলে গেল সে খবর তারা পাচ্ছে না। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল নিতাইকে—বাবুর মোটরে করে সে বাবুকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে কি না। নিতাই সত্য কথাই বলেছে। গাড়ির চাবি থাকে বাবুর কাছে। বাবুর হুকুম ছাড়া সে যাবে কি করে? নিতাইয়ের বাবুকে তারা অবিশ্বাস করে না। বাবু আংরেজ-সরকারের খয়ের-খাঁ। রায়বাহাদুর খেতাব পাওয়ার লোভে কুকুরের মত জিভ দিয়ে জল পড়ে। সাহেবদের খানা খাওয়ায়, তাদের হুকুমে চাঁদা দেয়, তাদের হুকুমে নাচে। সত্যি সত্যি নাচে। একজন সাহেব এসে নাচিয়ে গেছে তাদের। ঢুলিতে ঢোল বাজাত—বাবুরা সব নাচত। বাবুর কথায় বিশ্বাস করে তারা নিতাইকে রেহাই দিয়ে ফিরে গিয়েছে। নিতাইয়ের কিন্তু আশঙ্কা হয়েছে নরসিংয়েব জন্য। তাই সে বলতে এসেছিল রামাকে। আসল কথা, নিতাই-ই অনন্তবাবুকে নরসিংয়ের সন্ধান দিয়েছিল। বাবুর ভাগ্নের কাছেই এসেছিল অনন্তবাবু। হঠাৎ দেখা হয় নিতাইয়ের সঙ্গে। নিতাই-ই তাকে নরসিংয়ের আস্তানার কাছে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

শালা এ জানলে—নরসিং কখনও—। না—না। অনন্তবাবুকে 'না' বলতে পারবে না। দেশের জন্য যে বাবুরা ফাঁসি যায়, জেল খাটে, নজরবন্দী হয়ে থাকে—তাদের কি কখনও কেউ 'না' বলতে পারে? তাদের ভাইবেরাদার —যত মোটর-ড্রাইভারকে সে জানে তারা কেউ 'না' বলে না। ও-জেলার সদরে মোটর-সার্ভিস কোম্পানীর মালিক দুর্দান্ত বুধাবাবু--সরকারের খয়ের-খাঁ পুলিসের দোস্ত। তার সার্ভিসের ড্রাইভারেরাও চেনা স্বদেশীবাবুদের এমন কত সাহায্য করে। বুধাবাবু জানতেও পারে না। অনন্তবাবু শুধু স্বদেশীবাবুই নয়, বাবু তার যে উপকার করেছেন সে কথা নরসিং ভুলতে পারে না। ইমামবাজারে এসেছিল এক বদলোক দারোগা—তার আমলে পুলিস বিনা ভাড়ায় যাওয়া-আসা করত, আবার জবরদস্তি করে চোখ রাঙাত। সমস্ত শুনে একদিন অনন্তবাবু দরখাস্ত দিলে উপরে, গেজেটে ছাপিয়ে দিলে। ব্যস্ সব ঠাণ্ডা।

এর ফলে নরসিংকে একদিন একটা তুচ্ছ কারণে থানায় ডেকে তাকে অপমান-লাঞ্ছনা করবার উদ্যোগ করেছিল দারোগা-জমাদার-কনস্টেবলরা। থানার পাশেই ছিল ডেটিনিউবাবুদের বাসা। অনন্তবাবু হাসতে হাসতে এসে বসলেন থানায়, বললেন—হিতোপদেশের গল্পের অভিনয় হচ্ছে বুঝি? দেখতে এলাম তাই। তারপর বললেন—সেই গল্পটা নিশ্চয়ই! নেকড়ে ও মেষশাবক! সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পেয়েছিল নরসিং। সে কথা কি ভুলতে পারে নরসিং?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। চামোরী সিং এসে সাহুজীর গদির সামনেই দাঁড়াল। আসুক চামোরী সিং—নরসিং ঠিক আছে। সে-পথ সে বন্ধ করে রেখেছে। বাবুকে পৌঁছে দিয়ে শ্যামনগর ঢুকবার মুখে কথাটা তার হঠাৎ মনে হয়েছিল—সে শ্যামনগরের বাজারে ঢুকবার পথ ছেড়ে শ্যামনগরকে পাশে রেখে একেবারে সেই ঝাড়ুদার ডোমপাড়ার ওপার দিয়ে একটা ভাঙাচোরা পথ ধরে বাদশাহী সড়কে উঠে সটান পাঁচমতি যাবার মতলব করেছিল; কিন্তু সেই সাপ দুটো—সাপ আর সাপিনী তাকে যাদুতে ভুলিয়ে ফিরে পাঠালে শ্যামনগর। তার জন্ম তার আপসোস নাই, তবে সেদিন পাঁচমতি গেলেই ভাল হত। তবে পথ সে বন্ধ করে রেখেছে। সুরেশ দাশকে সকল কথা বলে অনুরোধ করেছে যে, এনকোয়ারী হলে তাকে বলতে হবে—সে রাত্রে নরসিং পাঁচমতিতে সুরেশের দোকানে ছিল। সুরেশ বিশ্বাসযোগ্য লোক। দোস্ত বললে—সে নিজের প্রাণ দিয়ে তাকে বিপদ আগলে রক্ষা করবে। রামাও হুঁশিয়ার ছত্রীর ছেলে। সুতরাং ভয় তেমন নাই। কিন্তু হঠাৎ পুলিস দেখলেই চমকে ওঠাটা এখনও যায় নাই। 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'! আবার কোথা দিয়ে কি ভাবে কোন্ সুতো যে টেনে বার করবে কে জানে! আজ সে আশঙ্কা ফলে গেল। খুব জোরে সিগারেট টানতে লাগল সে।

—এ—সিং, এ ডেরাইবর সাব! চামোরী সিং তার নাম ধরেই ডাকছে। উত্তর দিতে গিয়ে গলায় আওয়াজ আটকে গেল নরসিংয়ের। আই-বি আপিসের গল্প শুনেছে সে অনেক। ভয়ঙ্কর গল্প।

—এ নরসিং—সিং!

কোনমতে নরসিং এবার জবাব দিলে—কে?

—আরে বাহার আসো মোশা।

নরসিংয়ের পা কাঁপছে। বোতলগুলো বেবাক খালি।

কলসী থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে এক গেলাস জল খেয়ে নিয়ে সে

বাইরে এল।

চামেরী সিং বললে—আজ তিন বজে কালেক্টর সাব আইবন, ডিস্ট্রিক্ট বোডকে চেয়ারম্যান আইবন। পাঁচমতি সড়ককে লিয়ে দরখাস্ হইয়েছে, ইনকুয়ারী হোবে। তুমার পর হাজির হোনেকে হুকুম হয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে নরসিং কেমন হয়ে গেল। এমন আনস্মিকভাবে এক মুহূর্তে ভয়ের শ্বাসরোধী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে অভাবনীয় আনন্দের মধ্যে সে জীবনে কখনও আসে নাই।

চামেরী সাহুজীকে হাঁকতে লাগল। সাহুজীকে কেন? চামোরী বললে—দরখাস্ করনেওয়ালাদের মধ্যে সাহুজীও একজন। উনকে বোল দেনা ভাইয়া।

—আলবৎ আলবৎ। জরুর—জরুর বোলেঙ্গে। সাথমে লে যায়েঙ্গে।

চামোরী সিং চলে গেল। নরসিং নিজের ঘরের মধ্যে এসে কি করবে ভেবে পেলে না। অথচ এই আনন্দের উচ্ছ্বাসটা প্রকাশ না করে সে কোনমতেই স্থির থাকতে পারছে না। কটুকিকে পাবার এখন উপায় নাই। জোসেফের বাড়ি যাবে? জোসেফ আছে, মেরী নীলিমা আছে। চা খাওয়াবে মেরী নীলিমা। জোসেফ মদ খাওয়াতে পারে।

'পাঁচমতি সড়ককে লিয়ে দরখাস্ হইয়াছে।'—দরখাস্তের কথা সে জানে, সেই তার উদ্যোক্তা। কিন্তু দরখাস্তে ফল হবে এমন প্রত্যাশা সে করে নাই। কিন্তু লেগেছে দরখাস্ত, বাস্—। ঢেলে দাও পাথর—দাও বিছিয়ে ছ-ইঞ্চি পুরু করে। তার উপর দাও মোরাম লাল কাঁকর। চালিয়ে দাও রোলার, বাস্—উ—উ—উ—উ—ভর—র—র—র—উ—উ—উ। ভোঁ—ভোঁ—ভোঁপ। সোজা স্টীয়ারিং ধরে একসিলারেটরে পা চেপে বসে থাক; ছুটুক গাড়ি তিশ-পঁচিশ মাইল স্পীডে, ঘুরুক পাক দিয়ে চারিপাশের বন-জঙ্গল মাঠ, নেহাত পাশের গাছগুলো সড়াক সড়াক করে পিছলে ছুটে চলে যাওয়ার মত—পিছনে পড়ে থাক্। আনন্দের সঙ্গে অকারণ অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে নরসিং একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে মাথা পিছনের দিকে হেলিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জোসেফের বাড়ির দিক চলল।

দুখানা ট্যাক্সি—না, একখানাকে বদলে একখানা বাস্। তার পর একখানা কার—ট্যাক্সি—তার পর একখানা ট্রাক। জোসেফকে একের তিন অংশ। এ দিলেও কি মেরী নীলিমাকে পাওয়া যাবে না? ওরা ক্রীশ্চান। হলেই বা!

নরসিং জাত মানে না। নরসিংয়ের জাত অনেক দিন মরে গিয়েছে। নিতাইয়ের সঙ্গে খেয়েছে, রহমানের সঙ্গে খেয়েছে, জোসেফের সঙ্গে খেয়েছে, তার আবার জাত! জাত তার নাই—তার থাকবার মধ্যে যা আছে সে তার পেট আর তার 'মটরোয়া' ট্যাক্সি-কার, আর যদি তোমাকে পায় তবে স্ত্রী—। ফিন্‌ফিন্ করে বৃষ্টি পড়ছে মুখে-চোখে, বাতাসে লম্বা চুলগুলি উড়ছে, জামা কাপড় ভিজছে। ভিজুক।

আগে পাঁচমতির সড়ক নিয়ে দরখাস্ত ছিল মামুলী ব্যাপার। সেই যে-কাল থেকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পত্তন হয়েছে সেই কাল থেকে সড়কটার জন্ত প্রতি বৎসর একখানা, কোনবার বা তিন-চারখানা। আগে আগে দরখাস্ত করতেন বাবুলোকেরা—জমিদার উকিল কেলাসের বাবুরা, জমিদারের মামলা-মকদ্দমার জন্ত তাঁদের নিজেদের যাওয়া-আসার অসুবিধা হত, মধ্যে মধ্যে নিজেদের যেতে হত, উকিলবাবুরা শনিবার বাড়ি আসতেন, তাঁদের অসুবিধা হত। শ্যামনগরে আদালত যে-কাল থেকে বসেছে সেই কাল থেকেই পাঁচমতি থেকে আদালতের আমলা সরবরাহ হয়ে আসছে। তারা অবশ্য হেঁটে যাওয়া-আসা করত, তারা দরখাস্তে সই করত না। তখন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, রাজপ্রতিনিধি দণ্ডমুণ্ডের মালিক, সরকারী কেরানীদের অন্নদাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রের সামিল। সুতরাং দরখাস্তে সই করে তাঁর রোষনয়নে পড়তেও চাইত না এবং নিমক খেয়ে নিমকহারামির পাপ থেকেও পরিত্রাণ পেত। দরখাস্তের ফলে খানা-খন্দক বুজিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলা হত, কাদা হত একহাঁটু। এক ইঞ্জিনিয়ার কাদার মধ্যে গাছের ডাল কেটে দেবার ব্যবস্থা করে মগজের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার পর কাল পাল্টাল; গঙ্গার ধারে রেল-লাইন পড়ল, ঘাটরোড স্টেশনে নেমে শ্যামনগর হয়ে এ অঞ্চলে যাওয়া-আসার যাত্রীর সংখ্যা বাড়ল, ওদিকে ঘোড়ার গাড়িওয়ালারা এল ভিড় করে। তখন ঘোড়ার গাড়ির নাম ছিল 'কেরাচী'। সাইকেল উঠল। দেখতে দেখতে বছর দশেকের মধ্যে সাইকেলে পাঁচমতি-শ্যামনগর ছেয়ে গেল, পাড়াগাঁয়েও দু-চারখানা ঢুকল। কয়লা, কেরোসিন তেল, কলের লণ্ঠন, কাচের চুড়ি, চা আর সাইকেল—এ কয়েক দফা দেশে এল যেন বর্ষার বন্যার মত। এসেই দেশ ছেয়ে ফেললে। দুশ আড়াইশ থেকে দেখতে দেখতে একশ—আশী—পঞ্চাশ, আজ তো জাপানী সাইকেল তিরিশ টাকায় পাওয়া যায়; রঙ-চটা, কট কট শব্দ করে চলে

এমন পুরনো সাইকেল পনের টাকা, দশ টাকাতেও পাওয়া যায়। লটারি তো লেগেই আছে—এক টাকা টিকিট। কেরানীবাবুরা প্রায় সবাই একখানা করে সাইকেল কিনে ফেললে। তারপর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হল নন-অফিসিয়াল চেয়ারম্যান। এবার কেরানীবাবুরাও দরখাস্ত দিতে শুরু করলেন। ক্রমে পল্লীগ্রাম থেকেও দরখাস্ত পড়তে আরম্ভ হল। দরখাস্ত বাড়ল, কিন্তু রাস্তায় মাটি কমল। লোকে বলে—চুরি। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বলে, চুরি করবে কি ? টাকা কোথায় ? জেলায় রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য হিসেব করে দেখা যায়··· বাংলার জেলাগুলির মধ্যে তৃতীয় কি চতুর্থ, কিন্তু আয়ের হিসাব করলে তালিকার প্রায় শেষে এসে পড়ে। আমরা কি করব ? প্রশ্ন ওঠে, অফিসিয়াল চেয়ারম্যান থাকতে যে মাটিটা পড়ত তা আসত কোথা থেকে ? উত্তর আসে, আমরা ধনীর মুখের দিকেই তাকাই না, ধনীর নিয়ে দরিদ্রের কল্যাণ করাই আমাদের ব্রত, কয়েকটা বড় রাস্তার উপর নজর না দিয়ে আমরা পল্লী-উন্নয়ন করছি। যা হোক্, এতই যখন চিৎকার উঠছে তখন এক শত টাকা বেশী বরাদ্দ হল।

এমনি ভাবেই চলছিল। এমন সময় দেশে এল মোটর-বাস। কলকাতা থেকে বাইরে আসতে আরম্ভ করলে। এখানে শ্যামনগর থেকে ঘাটরোড স্টেশন পর্যন্ত পাকা রাস্তা, সেখানে মোটর-বাস সার্ভিস হল। প্রথম প্রথম উকিলবাবুর বেকার ছেলে, মত্তব্যবসায়ী সাহাদের আধুনিক ছেলে পুরনো কার নিয়ে ট্যাক্সি চালাতে আরম্ভ করলে। তার পর একজন কাপড়ের দোকানদার করলে প্রথম বাস। তারপর হল আরও খানদুয়েক। তার পরই এল এই কোম্পানী, যাদের বাস-সার্ভিস এখন চলছে ঘাটরোড থেকে শ্যামনগর। ঘোড়ার গাড়িগুলো হার মেনে ঘাটরোড ছেড়ে পাঁচমতির দিকে মোড় ফেরালে। এবার বাবুরা যাঁরা কাজের জন্য শ্যামনগরে থাকতেন তাঁরা ডেলিপ্যাসেঞ্জারি আরম্ভ করলেন। যাতায়াতও বাড়ল। জমিদারেরা, বাবুরা, ব্যবসাদারেরা যাঁরা পাল্কি অথবা গরুর গাড়ি চড়ার ভয়ে যথাসম্ভব কম যাতায়াত করতেন তাঁরা 'কেরাচী' গাড়ির সুযোগ পেয়ে বাড়িতে খেয়ে-দেয়ে শ্যামনগরে এসে কাজ-কর্ম নিজে দেখেশুনে সেরে সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরতেন। গ্রামের লোকেরাও কেরাচী গাড়িতে আট আনা পয়সা দিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। এবার দরখাস্ত ছাড়াও খবরের কাগজে মধ্যে মধ্যে ছাপা হতে আরম্ভ হল— 'শ্যামনগর-পাঁচমতি রাস্তার দুরবস্থা'। অফিসার সাহেবদের তখন মোটর

হয়েছে। তাঁদের মোটরে ধুলোকাদা লাগায়, কখনও-সখনও অ্যাকসেল ভাঙায়, তাঁরাও নোট দিতে আরম্ভ করলেন। এবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড চঞ্চল হল খানিকটা। একশর জায়গায় সাময়িক বরাদ্দ দুশ-আড়াইশতে উঠে গেল। এই ভাবেই চলে আসছিল, এবার নরসিং এসে ট্যাক্সি সার্ভিস খুলে গোলযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। এবার দরখাস্তের জোর খুব। এতখানি নরসিং প্রত্যাশা করতে পারে নি। নরসিং নিজের অদৃষ্ট সম্পর্কে আস্থাবান হয়ে উঠল ক্রমশ। সময় তার ভাল এসেছে। নইলে এই সময়টিতেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মোটর কোম্পানী থেকে মোটরের রাস্তার উন্নতির জন্য টাকা পাবে কেন? অদ্ভুত যোগাযোগ! আমেরিকায় যারা মোটর তৈরী করে, তারা অনেক টাকা দিয়েছে ভারতবর্ষে মোটরের রাস্তার উন্নতির জন্য। সে অনেক টাকা—একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি। সেই লক্ষ নিযুত অর্থাৎ অনেক লক্ষ টাকা এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পেয়েছে। দরখাস্ত এবং টাকা···দুয়ের যেখানে মিল হয়েছে সেখানে ভাবনা কোথায়?

জোসেফের একদফা চায়ের আসর উঠে গিয়েছিল। সাধারণত বাসী রুটির সঙ্গে হাঁসের ডিম আর একটু চিনি সহযোগে প্রাতরাশ হয়ে থাকে, দুখানা করে রুটি জনপ্রতি বাঁধা বরাদ্দ। রাত্রে জোসেফ রুটি খায়। ক্রীশ্চান হয়ে অবধি ওদের সংসারে এই বিধিটা চলে আসছে। পুরুষেরা রাত্রে রুটি খায়—আটার রুটি। পাঁউরুটি রবিবার ছাড়া পাওয়া যায় না, তার উপর নিত্যব্যবহারে খরচও কিছু বেশী পড়ে, তাই দেশী রুটিতেই ভাত-বর্জনের কাজটা সারতে হয়। ক্রীশ্চান হওয়ার দ্বিতীয় পুরুষে অর্থাৎ জোসেফের পিতামহ দু-বেলাই রুটি চালিয়েছিল নবীন অনুরাগে। কথাটা উপহাসের নয়। ক্রীশ্চান হয়ে এই পরিবারটি দ্বিতীয় পুরুষে অতি স্বাভাবিক নিয়মে, অতি উগ্রভাবে এ দেশীয় খাদ্য-পোশাক-ভাষা সব বর্জন করে—এ দেশের লোকদের থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র পৃথক হতে চেষ্টা করেছিল। অন্তর বাহিরে দু-দিক দিয়েই সে চেষ্টা স্বাভাবিক নিয়মে চলেছিল। বাইবেল সযত্নে তোলা থাকত; ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে এবং গির্জায় ফাদারের প্রার্থনা শুনে যথাশক্তি আধ্যাত্মিক দিকটা পরিপুষ্ট করত। সেই পুরাতন খাদ্যাখাদ্য বর্জন করে নূতন-ধর্ম-অনুমোদিত-খাদ্য গ্রহণের প্রচেষ্টায় বড়িতে পাঁউরুটির ব্যবস্থা হয় প্রথম; তারপর ক্রমে আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এবং

পাঁউরুটির দুষ্প্রাপ্যতার বদলে দেশী রুটির ব্যবস্থা হয়। মেয়েদের কিন্তু ভাত ভিন্ন তৃপ্তি হত না, রুটি তাদের বরদাস্ত হত না। বাংলাদেশে হাড়ি ডোম বাউরী প্রভৃতিদের মধ্যে আজও শূকর পালনের রেওয়াজ আছে, শূকর মুরগী হাঁস তারের জীবিকার একটা প্রধান উপায়; শূকর-মাংসও তারা খায়। খাদ্যের দিক দিয়ে হ্যাম-ফাউল-ডাকে তাদের অসুবিধে হয় নি; ক্রীশ্চান হয়ে বীফ্ ধরেছিল। প্রথম-পুরুষে বীফে মেয়েদের ঘৃণা হত; দ্বিতীয়-পুরুষে সেটা অবশ্য সেরে গিয়েছে। তৃতীয় পুরুষ থেকে তারা খাঁটি ইণ্ডিয়ান ক্রীশ্চানে পরিণতি লাভ করেছে। একবেলা ভাত একবেলা রুটি—সুক্তো-চচ্চড়ির সঙ্গে রাই সরষের গুঁড়ো—সপ্তাহে তিনবার মাছ—দু-তিন দিন মাংসের বিলিতি রান্নার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছে। মেয়েরা কয়েকদিন দু-বেলাই ভাত খায়, দু-তিন দিন—ওই মাংস যে কয়েকদিন হয়—সেই কয়েকদিন খায় রুটি। সদর শহরে যাওয়া-আসার সুযোগ হলে পাঁউরুটি আসে, সেদিন একটা মুরগী অথবা হাঁস মেরে রান্না হয়। পার্বণ ইত্যাদিতে সমারোহে বিলিতি রান্না চলে—মুরগী হাঁস পাঁউরুটি—তার সঙ্গে মেয়েরা বাড়িতে তৈরী করে স্যাণ্ডউইচ, কেক, পুডিং। মুরগী চালান যায় এ অঞ্চল থেকে, তাই মুরগীর ডিম বেশী খাওয়া হয় না, হাঁসের ডিমটা সকালবেলায় প্রাতরাশে ব্যবহার করে।

সকালে জোসেফ চা খায় বিছানায় শুয়ে। জোসেফের মা পাকা গৃহিণী। নীলিমার ঝোঁক রাত্রে রুটির দিকে হলেও তার ঝোঁকে ভাত খেতেই বাধ্য হয় নীলিমা। নীলিমার মা মানুষ হিসাবে অত্যন্ত স্থূল—সে আকারেও বটে প্রকারেও বটে। নীলিমা ম্যাট্রিক পাস করে সব দিক দিয়ে সূক্ষ্ম হতে চেষ্টা করে, প্রায়ই সে কেক তৈরী করে; নীলিমার মা আপত্তি করে হার মানলেও সেগুলিকে যথাসম্ভব বাসী না করে দেয় না। কাচের জারে পুরে চাবি দিয়ে রেখে দেয়। পাঁউরুটি আনলে তাও লুকিয়ে রাখে, অন্তত পাঁচ দিনের আগে খেতে দেয় না। নীলিমা তাগিদ না দিলে মধ্যে মধ্যে দু-একখানা পাঁউরুটি দশ-পনেরো দিনে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়—ফেলে দিতে হয়।

জোসেফের মা প্রথম দিন নরসিংহকে অভ্যর্থনা করেছে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে। গিরবরজার ছত্রী সিংরায়দের গল্প তার স্বামীর সংসারে তিন পুরুষের রঙ-ধরানো গল্প। সেদিন নরসিং ছিল তার কাছে সেই গল্পের দেশের মানুষ। তার পর ব্যবহারিক জগতের মেলামেশার মধ্যে নরসিং যখন নিতান্তই সাধারণ

মানুষ বলে চোখে ঠেকল, তখন তার সম্ভ্রম উবে গিয়ে তার স্থানে জন্মাল সর্বস্বান্ত মূর্খ বড়লোকের ছেলের উপর সাধারণ মানুষের যে আনন্দদায়ক উপেক্ষা এবং ঘৃণার মনোভাব—সেই মনোভাব। সেই মনোভাব আরও প্রখর হয়ে উঠেছিল নরসিংয়ের সঙ্গে নীলিমার হৃদ্যতার অভিব্যক্তিতে। নরসিংয়ের গাড়িতে সে ইস্কুল যায়, নরসিং এলে সে হেসে কথা কয়, চা তৈরী করে দেয়—এটা তার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিজনক হয়ে উঠেছিল। আজ শ্যামনগর-পাঁচমতি রাস্তা পাকা হচ্ছে এবং সেই রাস্তায় একখানা মোটর-বাস, একখানা ট্যাক্সি, একখানা ট্রাক নিয়ে ব্যবসার পরিকল্পনা এবং সেই ব্যবসায়ে জোসেফের মাকে অন্তত একের-তিন অংশ দিতে চাওয়ার প্রস্তাবে জোসেফের মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল। অন্যদিন সে ভদ্রতার খাতিরে তার বিরক্তি নরসিংয়ের সামনে প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু অবিরত চেষ্টা করে মেয়েকে আড়াল করে ফিরতে।

আজ সে মেয়ের সামনেটা ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় একটা মোড়ায় বসে পায়ের গাঁট টিপতে আরম্ভ করলে। বোধ হয় আজকার এই সামনে ছেড়ে দেওয়াটা তার নিজের কাছেই অশোভন ঠেকছিল বলে—গাঁটের সামান্য ব্যথাটা হঠাৎ রাত্রি থেকে বেড়ে উঠেছে, এই ছলনার আশ্রয় করলে। কথাটা প্রকাশ না করে বললে—পাছে পা টেপার অভিনয়টা বোধগম্য না হয় এই ভেবে জোসেফ ও নরসিংয়ের কথার মধ্যেই সে ব্যাঘাত দিয়ে বললে—তোমাদের তো পাঁচমতির রাস্তা পাকা হচ্ছে, মোটর চালাবে আরামসে, রোজগার করবে। আমি কিন্তু ওই কালীঠাকুরের থানে যাবার রাস্তাটার জন্য একটা দরখাস্ত করব। দিবি তো নীলি আমার একটা দরখাস্ত লিখে! উঃ বাবা—বাতের ব্যথায় মরে গেলাম। যত বেতো রুগীদের নিয়ে দরখাস্ত সই করাব আমি। বলে সে হি-হি করে হেসে উঠল।

নীলি খুব চতুর মেয়ে। বয়স হলে অবশ্য সকল মেয়ের মনেই অন্তত এ দিক দিয়ে কিছু চতুরতা স্বাভাবিকভাবেই জন্মায় এবং বয়স্কদের কাছ থেকে শেখে—নারী জীবনেরই এটা ঐতিহ্য; নীলি এ সব বিষয়ে বিশেষ চতুরতা শিক্ষা পেয়েছে তার সহকর্মিণী অর্থাৎ মিশনের গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের কাছে। মনোবিদ্যার যুগ এটা—মনের খবর নিয়ে এ যুগের সভ্যতা-সম্মত বাঁকা এবং চোখা বাক্যবিন্যাসের মধ্য দিয়ে তাদের যে মনোবিলাস চলে সে বিলাস সদ্য তরুণী নীলির খুবই ভাল লাগে। এগুলি সে শোনে না—গেলে। গেলা-

জিনিস সে হজম করেছে। মায়ের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেললে নীলি।

বাঁকা দৃষ্টি এবং মুচকি হাসির ওজন কম কিন্তু ধার বেশী ; ব্লেডের মত দাগ টানলেই গভীর ক্ষত হয়ে যায়। মায়ের মনে লাগল। মা বলে উঠল—ওই হাসি দেখতে পারি না। দু-চক্ষে দেখতে পারি না।

—চোখ বন্ধ করে পা টেপ না কেন ? আরামটা ভোগ করতে পারবে বেশী। এ হাসিও দেখতে হবে না।—নীলিমা আবার তেমনি ভাবে তাকিয়ে তেমনি হেসে উত্তর দিলে।

মা এবার চিৎকার করে উঠল—হে ভগবান, আমার মরণ হোক—আমার মরণ হোক, আমার মরণ হোক। আমাকে নাও তুমি—আমাকে নাও। দয়া নাই—মায়া নাই—আমি বাতে মারা যাচ্ছি—আমার—। এর পর আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে সে হাঁউ হাঁউ করে কাঁদতে লাগল। কান্নাটা অবশ্যই অভিনয় নয়—মেয়ের ওই ধারালো আঘাতের যন্ত্রণা যত না হোক তার উপযুক্তমত উত্তর দিতে না পারার ক্ষোভের পীড়ন কান্নার পক্ষে যথেষ্ট।

জোসেফ হাসতে লাগল। সেও মাকে জানে। নীলি চা করছিল তৃতীয় দফায়। এর আগে একদফা চা-ডিম-কেক দিয়ে চা খাইয়েছে নরসিং এবং জোসেফকে। সেই খাওয়ার মধ্যেই ব্যবসাবাণিজ্যের কথা এবং শ্যামনগর-পাঁচমতি রাস্তা সম্পর্কে গুপ্ত তথ্য অর্থাৎ মোটর-কোম্পানীর দেওয়া টাকা পাওয়ার কথা জোসেফ তাকে বলেছে। নরসিংও তাকে বলেছে নিজের ব্যবসার পরিকল্পনার কথা। চায়ের কাপ জোসেফ নরসিংয়ের সামনে নামিয়ে দিয়ে সেও এক কাপ চা নিয়ে বসল—মায়ের এই হাউ-মাউ কান্নার জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হল না। ব্যস্ত হয়ে উঠল নরসিং। ভদ্রতার খাতিরেও বটে এবং নীলিমার মাকে সন্তুষ্ট করতে চায় বলেও বটে। সে বললে—কালীথানের বাতের ওষুধ বুঝি খুব ভাল ? তা চলুন না একদিন—একটু রোদ উঠুক, রাস্তা-ঘাটটা একটু শুকিয়ে যাক—চলুন, আমার গাড়ি তো বসেই রয়েছে।

এক কথাতেই মা খুশী হয়ে গেল। চোখের জল মুছে বললে—বেঁচে থাক তুমি বাবা, তোমার উন্নতি হোক অনেক করে। তোমার সঙ্গে থেকে যদি জোসেফের উন্নতি হয় সেই আমার ভরসা। তোমার বাবার কত বড় বংশ—তোমাদের কত মান—কত নাম—কত ডাক! শ্বশুরের কাছে শুনতাম—গায়ে কাঁটা দিত।

নরসিং একটু স্ফীত হল অহঙ্কারে, একটু তৃপ্তি হল তার। এর বেশী কিছু না। কোন আক্ষেপ বা ক্ষোভ—এসব আর জাগে না। অনুভব করতে পারে না।

জোসেফ উঠে বললে—যাই, স্নানটা সেরে নি। মেঘলা করে থাকলেও বেলা অনেক হয়েছে। আজ আবার সায়েবের সায়েব আসবে। গাড়ি নিয়ে যেতে হবে ঘাটরোড স্টেশন। ওপার থেকে নৌকোয় আসবে। নিজের গাড়িটি আনবে না। ভারী চালাক।

নরসিং হেসে বললে—পাঁচমতির সুরেশ দাস—আমার বোষ্টম মিতে বলে, বাবার বাবা!

জোসেফ বললে—এ বেটা কালেক্টর বড় খট্‌মেজাজী লোক। তারপর নীলিমার দিকে তাকিয়ে বললে—তোদের স্কুলে যাবে নাকি?

—কি জানি!

—তা হলেও একটু পরিষ্কার হয়ে যাস। তোর ভাল সেলাই কিছু নিয়ে যাস।

হেসে নীলিমা বললে—আমাদের ইস্কুলে ভিজিটর এলে "টেল দি ম্যান টু কাম্ টু মি"-কে পার হয়ে আর কিছু দেখতে হয় না!

নীলিমাদের মিশন গার্লস্ ইস্কুলে প্রধানা হলেন খাঁটি ইংরেজ-মহিলা। নীলিমাও তাঁর ছাত্রী। সরু গলায় তাঁর ইংরেজী উচ্চারণের জন্য "টেল দি ম্যান্ টু কাম্ টু মি" এই লাইনটিই তাঁর নাম দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পথে ভদ্রলোকের ছোট ছেলেরা তাঁকে দেখলে কণ্ঠস্বর মিহি করে বলে—"টেল দি ম্যান্ টু কাম্ টু মি।" মেমসাহেব হাসেন।

জোসেফ চলে গেল।

নরসিং উঠল, বললে—তা হলে আমিও চলি।

মা বললে—বসো বাবা বসো একটু। নরসিংকে বসতে বলে সে নিজে উঠে খোঁড়াতে ভুলে গিয়ে সহজ পায়েই হেঁটে চলে গেল।

নীলিমা হেসে উঠল সশব্দে।

নরসিং বললে—কি?

—মা খোঁড়াতে ভুলে গিয়েছে। বাত-বাত বলছিল না?

—ও! নরসিং কিন্তু বুঝতে পারলে না ব্যাপারটার কিছুই। বুদ্ধির সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে নরসিং স্থূল!

বাইরের দরজায় বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল।—ড্রাইবর সাব!

এস-ডি-ওর আর্দালী। ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল নীলিমা।

হিন্দুস্থানী মুসলমান চাপরসী নীলিমাকে দেখে হেসেই বললে—কালেক্টর সাব আসবন আজ, ড্রাইবর সাবকো জলদি যানে বলিয়েছেন সাব।

নীলিমা উত্তর দিলে—গোসল কর রহে হেঁ। তুরন্ত যাইয়ে গা।

সে ফিরল সঙ্গে সঙ্গে।

আর্দালী এবার নরসিংকে বললে—তুমনে ভি তলব দিয়া সাব।—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে চেয়ারম্যান আওর মেম্বার ভি আইয়ে গা। উনকে লিয়ে গাড়ি লেকে যানে কো হুকুম দিয়া সাব।

মুহূর্তের জন্য পা থেকে মাথা পর্যন্ত চিন্ চিন্ করে উঠল নরসিংয়ের। জিভের ডগায় এসে গেল—নেহি যায়েগা—যাও—বোল দো তুমহারা সাবকো, কিন্তু পরমুহূর্তেই আত্মসংবরণ করলে সে। পাঁচমতি-শ্যামনগর রাস্তা ভাল হলে তার বাস চলবে—ট্যাক্সি চলবে—ট্রাক চলবে। আরও মনে পড়ে গেল ইমামবাজার—জংসন স্টেশন সদর শহর সার্ভিস—তার সোনার সার্ভিস! মেজাজের জন্যই তার সে সার্ভিস গিয়েছে। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—যাও সাবকো বোলো—ঠিক টায়েমমে যায়েঙ্গে হম।

নীলি একটু হাসলে। নরসিং এবং দাদার উপর অশ্রদ্ধা হচ্ছে তার। ওই আর্দালীটা ওদের 'তুম' করে কথা বলে।

নরসিং বললে—তা হলে চলি এখন।

—আচ্ছা।

নরসিং গাড়িটা নিয়ে বাজারে এসে দাঁড়াল। ঘাটরোড—ঘাটরোড স্টেশন। গাড়িটা তো খালিই যাবে, যদি দুটো চারটে প্যাসেঞ্জার পাওয়া যায়! তাই পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনা! যা হয়! ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ভাড়া দেবে হয়ত, কিন্তু কি দেবে কে জানে! নাই যদি দেয় তাই বা কি করতে পারে নরসিং? কলকাতাতেই ট্রামে-বাসে কনস্টেবলরা ভাড়া দেয় না। এই সব কথা মনে হলে তখন সে আপনার মনেই চিৎকার করে বলে, দূর দূর দূর! ছোটলোকের কাম—বেইজ্জতিকে কারবার! দূর কর শালা, দূর কর।

—গুরুজী!

পাশেই এসে দাঁড়াল একখানা ফোর্ড গাড়ি। নিতাই ড্রাইভ্ করছে।

নরসিং কথা বললে না। মুখ ফিরিয়ে রইল।

নিতাই বললে—আমি যাব আপনাদের সঙ্গে। জোসেফের গাড়িতে

ম্যাজিস্টর, আপনার গাড়িতে চেয়ারম্যান, আমার গাড়িতে বাবুর সঙ্গে মেম্বর-টেম্বররা আসবেন।

নরসিং তবু কথা বললে না।—হারামজাদা বেইমান কাঁহাকা! পনের টাকা মাইনের ড্রাইভার—বগলস আঁটা নেড়ী কুত্তার বাচ্চা! তোর সঙ্গে কথা কইবে নরসিং?

নিতাই বললে—আমার ওপরে খুব রেগেছেন, লয়?

—না নাঃ। রাগটাগ কারুর ওপরে আমার নাই।

নিতাই একটু চুপ করে থেকে বললে—আচ্ছা সেলাম। গাড়িতে তেল নিতে এসেছি! চলে গেল সে গাড়ি নিয়ে।

যাবার সময় নিতাই এল সব শেষে। গাড়ির মধ্যে তার বাবু। নিতাই হর্ন দিয়ে হাত নেড়ে ইশারা করেছে পথ দাও। পথ ছেড়ে দিলে নরসিং। নিতাইয়ের বাবু ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর। নিতাই খুব জমকালো পোশাক পরেছে। আসবার সময়েও নিতাইয়ের গাড়িকে তার পথ ছেড়ে দিতে হল। নিতাইয়ের বাবুর গাড়িতেই এলেন চেয়ারম্যান। বন্ধুলোক। নিতাইয়ের বাবু যেমন মদ খায় চেয়ারম্যানেরও তেমনি মদের ঝোঁক। কেউ কারও মুখের গন্ধ পায় না। তিক্ত ভাবে হাসতে হাসতে দুজন মেম্বরকে নিয়ে নরসিং সব চেয়ে পিছনে এল।

মিটিং—তদন্ত শেষ হল রাত্রি দশটায়। নরসিংয়ের মাথা ঝন্‌ঝন্ করছে, আগুন জ্বলছে। শয়তানের রাজত্ব! বেইমানের কাল! মর গিয়া! ধরমরাজ মর গিয়া! ভগোয়ান মর গিয়া! হে ভগোয়ান! বিলাত আমেরিকার কোম্পানী দিয়েছে লাখে লাখে টাকা—সেই টাকাতেও পেট ভরছে না ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের আর এই এখানকার কুমীর ওই বাস কোম্পানীর! বলে—মনোপলি সার্বিস হোক, যে টাকা দেবে বছর বছর সেই পাবে সার্বিস। বছরে পঁচিশ টাকা—রাস্তা মেরামতের জন্য। আপত্তি করেছেন এখানকার এস-ডি-ও। কেঁচে গিয়েছে মতলবটা, কিন্তু এ শয়তানি মতলব!

মদ সে প্রচুরই খেয়েছিল ক্ষোভে। টলতে টলতে ফিরল বাসায়।

শুখনরামের লোক বললে—শেঠজী আছেন ডাকবাংলায় চেয়ারম্যানের ওখানে। আপনাকে যেতে বলেছেন গাড়ি নিয়ে। আরে বাপ রে—ওই এক লোক! আজ শেঠজীর চেহারা দেখে নরসিংয়ের তাক লেগে গিয়েছে।

হাকিম-চেয়ারম্যানের মধ্যে চেয়ারে বসে—মাথা উঁচু করে—কি বলছিল ! সে মনোপলি সার্বিস সম্বন্ধে কথা বলে নাই, তবে রাস্তা পাকা করা নিয়ে খুব দামী দামী কথা বলেছে। মাল আনতে তার ভারী অসুবিধে হয়।

শেঠজীকে নিয়ে নরসিং পাগলের মত হাসতে হাসতে ফিরল। শেঠ আজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে। ধরাধরি করে তুলতে হল শেঠজীকে। হাসতে হাসতেই সে বাসায় ফিরল।

কে ? ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে ও কে ?

ফটকি !

সতেরো

মোটর ড্রাইভারের দিন-রাত্রি। দিনটা চলে উড়ে ; রাত্রির খানিকটা অংশও দিনের সামিল। দু-হাতে ধরা থাকে স্টীয়ারিং, পায়ের তলায় থাকে ক্লাচ, একসিলারেটর, ফুটব্রেক, হাতের পাশে থাকে গিয়ারিং হ্যাণ্ডেল, হ্যাণ্ডব্রেক। চোখ থাকে পথের সামনেটায় নিবদ্ধ ; স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি। নীচে থেকে ওঠে গরম ভাপানি, প্রায় বুক পর্যন্ত গরম ভাপানিতে সিদ্ধ হতে থাকে। নাকে অবিরল ঢোকে পেট্রোলের ধোঁয়ার গন্ধ। কানের দুপাশে, কপালে সামনের চুলগুলোকে পিছনের দিকে উড়িয়ে বাতাস লাগে। সকালে-সন্ধ্যায় বাতাস ঠাণ্ডা, দুপুরে গরম,—গ্রীষ্মের দুপুরের বাতাসে মুখ জ্বালা করে, বর্ষায় লাগে জলের ছাঁট, শীতে কনকনে ঠাণ্ডায় মুখের চামড়া যেন অসাড় হয়ে আসে। দুপাশে কাছের জিনিস, বাড়ি-ঘর, গাছপালা, মানুষ-জনই যেন পিছনে চলে যায় ছুটে ; খোলা মাঠ হলে দূরের গাছপালা, গ্রাম, গরুবাছুর, মানুষ পাক দিয়ে ঘুরতে থাকে। মধ্যে মধ্যে ছেদ পড়ে, গাড়ি থামে, তখন নেমে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আরামের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরীরটা জুড়িয়ে নেয়। অল্পক্ষণের জন্য গাড়ি থামলে গাড়ি থেকে আর নামে না, স্টীয়ারিংয়ের উপর মাথা রেখে একটু জিরিয়ে নেয়। সারাদিনের পর যখন "বিলকুল ছুট্টি" মেলে তখন শরীর টলতে থাকে, মনে হয় মাটিই টলছে। মোবিল-পেট্রোল, তৈলাক্ত লোহার কষ-কালি, বাতাসে উড়ে লাগা ধুলোকাদা এবং সারাদিনের ঘামে সবশরীরে একটা জর্জরতা অনুভব করে। শরীরের গ্রন্থিগুলো খুলে পড়তে

চায়, পেশীতে পেশীতে টাটানি জাগে ; অবশ্য এ তাদের সহ্য হয়ে যাওয়া ব্যাপার —ক্ষয়রোগের রোগীর নিত্য অপরাহ্ণের স্বল্প উত্তাপের মত। তখন চাই মদ। মদ পেটে পড়লেই শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কেয়া হ্যায়? কোন্ হ্যায়? কিস্‌কে পরোয়া?—এই তখন মুখের বুলি। বেপরোয়া টলতে টলতে-চলে। নরসিংও চলে। চলতে চলতে রামকে অথবা যে সঙ্গী থাকে তাকেই বলে— এখানে কি আছে ; কুছ না। বুড়ো আঙুল ছুটো নেড়ে বলে—টু-টু টন্-টন্। উ সব হ্যায় কলকাত্তামে।

কলকাতায় দেখেছে নরসিং—রসা রোডে, হাজরা রোড, শ্যামবাজারে ভবনাথ সেন স্ট্রীটের মোড়ে রাত্রি দশটা এগারোটায় হল্লা করতে করতে চলেছে শিখ ড্রাইভারের দল। কলকাতায় মোটর-ব্যবসা মানেই শিখদের কারবার। মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কামিজ, পরনে হাফপ্যান্ট, পায়ে নাগরা, লম্বা-চওড়া জোয়ান সব টলতে টলতে চলেছে—হা-হা ইয়া! খবরদার! মারো ডাণ্ডা! তার সঙ্গে অট্টহাসি—হা-হা-হা-হা। অশ্লীল কথা, অশ্লীল গান। সমস্ত দিন দশ-বারোটা লোহার ঘোড়া আর পেট্রোল গ্যাসের উত্তাপের সঙ্গে লড়াই করে এইবার কোমল শীতল দেহের স্পর্শের মধ্যে নিজেদের উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে অবসন্নতায় এলিয়ে দেবার জন্য অধীর হয়ে ওঠে। বস্তির নোংরা পল্লীর গলিপথে ঢুকে পড়ে।

কি আছে এখানে? ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ—!

গঙ্গার ধার, রেড রোড, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের সামনে পাশে বড় বড় গাছে-ঘেরা নির্জন পথ, পিচ-ঢালা শক্ত সমতল পথ, ট্যাক্সি চলে বড় দীঘির জলের উপর নৌকার মত। পিছনের সীটে বসে থাকে সাহেব আর মেম ; তাদের গুনগুনানি কানে এসে ঢোকে, তাদের খিলখিল হাসিতে শরীর শিউরে ওঠে। এই কলকাত্তা।

এখানে কিছু নাই—'কুছ্ না, কুছ্ না'—আপেক্ষ করতে করতে রামেশ্বরোয়া, তারক, ইসমাইল, রসিদ সকলেই মদ খেয়ে গিয়ে বসে নিজেদের আড্ডায়—সেই চা-মাংসের দোকানে, খানিকটা সময় জুয়া খেলে, ঝগড়া করে, তারপর আড্ডা ভেঙে গিয়ে ঢোকে এখানকার বেশ্যাপল্লীতে। হাড়ী-ডোমপল্লীর কাছাকাছি নোংরা একটা বস্তি—খুপরীর মত ঘরের দরজায় কেরোসিনের ডিবরি জেলে বসে থাকে ঐ পল্লীর কুলত্যাগিনী মেয়েরা। মধ্যে মধ্যে ধাক্কা খায় ভদ্রলোকের সঙ্গে। উকিল মোক্তারদের মুহুরি, দু-চারজন

উকিল-মোক্তারও মাথায় ঘোমটা টেনে ছুটে পালায়। ওরা প্রথমটা চুপ করে থাকে, কিন্তু তারা খানিকটা দূরে পড়লেই হো হো করে হাসে।

নরসিং অনেকদিন নিজেকে এই শেষের মহল্লার কারবার থেকে দূরে রেখেছিল। প্রথম জীবনে জান্‌কী এসে তার জীবনের লাগামটা কষে চেপে ধরেছিল। অনবরত তাকে মনে পড়িয়ে দিত—সে গিরবরজার ছত্রী-বংশের ছেলে। বলত,—যার বাত্‌ ঠিক থাকে না, তার জাত চলে যায়। তুমি আমার কাছে কসম খেয়েছ। জান্‌কী মরে গেল, তার মৃত্যুর পরে নরসিং জান্‌কীর শোকে জান্‌কীর কাছে-দেওয়া কসমটাকে পালন করবার জন্য নিজেকে আরও শক্ত করে তুলতে চেষ্টা করলে। ছত্রী-বংশের অহঙ্কারটাকে আরও বড় করে তুললে মনে মনে। কিন্তু দুনিয়া হল শয়তানির রাজ্য। নরসিং বলে—'হারামির জায়গা'। এখানে কারো ভাল থাকবার উপায় নাই। ছোট ছোট করে লোককে এখানে ছোট করে দেয়। প্যাসেঞ্জার থেকে আরম্ভ করে রাস্তার ওভারসিয়ার, থানার জমাদার, দারোগা, ইন্সপেক্টর, সমস্ত লোকে মাথায় ডাণ্ডা মেরে ওকে ছোট করে দিলে। সবারই এক বুলি —বেটা 'ট্যাক্সি-ড্রাইভার' ছোটলোক। গিরবরজার ছত্রী-বংশের ছেলে কি ছোটলোক হয়? কিন্তু পেটের দায়ে প্যাসেঞ্জারের কথা সইতে হল, সাজার ভয়ে ওভারসিয়ার-দারোগা-জমাদারের লাল চোখ দেখে সেলাম বাজাতে হল। শেষে পর্যন্ত এস-ডি-ওর বেত খেয়ে নরসিংয়ের ছত্রীত্বের অহঙ্কারের শেষটুকু মুছে গেল। তা-ই বোধ হয় গেল। ওই বেত খেয়ে বাড়ি আসবার পথেই শুখনরাম সাহুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সাহুকে ধমক মেরেছিল নরসিং প্রথমটা। সেই সাহু পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়ে তারই গাড়িতে সওয়ার হয়ে বসল। সে পঞ্চাশটা টাকা পঞ্চাশ চাঁদির জুতো। ছোট কারবার করে সত্যিই ছোট হয়ে গিয়েছে নরসিং। তারপর ওখানে এসে যা করলে—সে ভাবলে নরসিং নিজের মনেই চিৎকার করে বলতে থাকে—ভাগ্‌—ভাগ্‌—ভাগ্‌।

ফট্‌কি চমকে ওঠে নরসিংয়ের আলিঙ্গনের মধ্যে থেকে।—কি? ভয় হয় ফট্‌কির, হয়তো তাকেই তাড়িয়ে দিতে চাইছে নরসিং।

নরসিং মাথা নাড়তে থাকে, ফট্‌কির মুখে চোখ রেখে বলে—তোকে নয়।

—তবে কাকে?

—আরশুলা। পায়ে আরশুলা উঠেছে।

নরসিং ফট্‌কিকে গ্রহণ করেছে। জান্‌কীর কাছে দেওয়া কসম তার মনে নাই এমন নয়, কিন্তু সে কসম আর মানে না নরসিং।

কি-ই বা মানে সে আর? গির্‌বরজার ছত্রী-বংশের ছেলে সে, সে আজ গির্‌বরজারই হাড়ীদের ক্রীশ্চান বংশধরের বাড়ীতে তাদের হাতে তাদের হেঁসেলে খায়। তাদের মেয়ে মেরী নীলিমা আজ তার কাছে নতুন মডেলের 'মাস্টার বুইক' গাড়ির মত স্বপ্নের বস্তু। পুরনো তাপ্পি-মারা ভাড়াটে শেভ্রলে গাড়ির মালিক এবং ড্রাইভার নরসিংয়ের নতুন গাড়ি দেখলেই মনে নেশা লাগে, দিনের আলোতেই এই ভাঙা গাড়ি চালাতে চালাতে নতুন দামী—ওই বুইক গাড়ি কেনার কল্পনার স্বপ্ন রচনা করে, পদ্যপাঠের কবিতার সর্বস্বান্ত হয়ে মাটির বাসনের ব্যবসায়রত সেই বেনের ছেলের মত। এমনি বুইক গাড়ি কিনে চালাবে সে একদিন। সঙ্গে সঙ্গে মেরী নীলিমাকে নিয়েও তার কল্পনা নানা স্বপ্নকাহিনী রচনা করে। এক এক সময় নরসিং বেশ বুঝতেও পারে যে এসব নেহাতই মিথ্যে, এ সব কখনই সত্য হবে না, কিন্তু মনকে মানাতে পারে না। কিছুতেই মানে না মন।

সমস্ত দিন গাড়ি চালানোর উত্তেজনার উপর রাত্রে লাগে মদের নেশার ঘোর—তখন সে ফট্‌কিকে বুকে টেনে নেয়; কিন্তু সকালে নেশা কেটে যায়, সুস্থ মস্তিষ্কে সহজ মনে ফট্‌কির উপর বিতৃষ্ণা জাগে। তখন তার মন অস্থির হয় মেরী নীলিমার জন্য! হাড়ীর বংশের ক্রীশ্চান-ধর্মাবলম্বী কালো মেয়ে—নীলিমা। কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা নরসিংয়ের কাছে মনে হয় সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাময় এবং দুর্লভ। দিনের আলোতে সহজ মনের সম্মুখে নীলিমা তার কালো রূপ নিয়েই স্বপ্ন হয়ে ওঠে। পরিচ্ছন্ন আধুনিক রুচিসঙ্গত পোশাকে পরিচ্ছদে কালো মেয়েটিকেই অপরূপ মনে হয়; হাড়ীর বংশের মেয়ে হলেও ম্যাট্রিক-পাস নীলিমার কথাবার্তা ভাবভঙ্গি শুনে এবং দেখে নরসিংয়ের মনে হয়, এই মেয়েই তার মনের সকল ক্ষোভ-গ্লানি মুছে দিয়ে আনন্দে শান্তিতে তার জীবনকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারে। মনে হয়—কিসের জাত? ওর জন্য জাত দিতে তার কোন দুঃখ নাই। কিন্তু 'সব ঝুট হ্যায়'। নীলিমাকে নিয়ে কোন কল্পনাই তার সত্য নয়, সব মিথ্যে।

ইমামবাজারের বাবুদের বাসের রহমত ড্রাইভার নরসিংয়ের গুরু। রহমত ড্রাইভার তাকে বলেছিল তার এমনিধারা গল্পের কথা। কলকাতায় তখন সে ট্যাক্সি-ড্রাইভার ছিল; একটি কলেজে পড়া মেয়েকে দেখে সে পাগল হয়ে

উঠেছিল। কলেজে যাবার সময় মেয়েটি যে স্টপেজ থেকে ট্রামে উঠত—ঠিক সময়টিতে রহমত তার কিছু দূরে ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আপনার সীটে বসে মেয়েটিকে দেখত শুধু। মেয়েটি ট্রামে উঠত, রহমতও তার ট্যাক্সি নিয়ে ট্রামের পাশে পাশে চলত ওই ট্রামের গতির সঙ্গে সমান তাল রেখে। কলেজের সামনে মেয়েটি নামত, কলেজে ঢুকে যেত, রহমত গাড়ি নিয়ে চলে যেত ভাড়া খাটতে। তার পর?—নরসিং প্রশ্ন করেছিল রহমতকে। তার পর আর কি? একদিন দেখলাম, এল না। দু-দিন না। তিন দিন না। শেষে গাড়ি নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকলাম—গলির মধ্যে তাদের বাড়ি। ছুটির পর তার পিছনে এসে বাড়িও সে দেখেছিল।—দেখলাম মাল বোঝাই হচ্ছে মোটরে। বাড়ির ছাদে হোগলার ছাউনি; মেয়েটি বউ সেজে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়িতে চড়বে। ব্যস্, ফিরে এলাম। শুধু ঝগড়া হয়ে গেল যে-ট্যাক্সি দুটো ভাড়া নিয়ে যাচ্ছিল—তাদের ড্রাইভারের সঙ্গে। মিছে ঝগড়া; পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আমার দোষেই মাডগার্ডে ধাক্কা লেগে গেল।

নীলিমাও হয়তো একদিন চার্চে যাবে কারো হাত ধরে। সেদিন নরসিংয়েরও ঝগড়া হয়ে যাবে কারো সঙ্গে।

ফট্‌কি বলে—আমি আর ওই কুপোর বাড়িতে থাকব না। অর্থাৎ শুখনরামের বাড়িতে। আমাকে তুমি নিয়ে চল।

রাত্রের নেশার মধ্যে নরসিং উৎসাহিত হয়ে ওঠে। আলবৎ, জরুর।

ফট্‌কি পরামর্শ দেয়—চল, এখান থেকে পাঁচমতিতে একখানা ঘর ভাড়া করে আমাকে রাখবে। রাত্রে এখন এখানে থাক, তখন পাঁচমতিতে থাকবে।

ঠিক—ঠিক। ফট্‌কির বুদ্ধি দেখে নরসিং অত্যন্ত খুশী হয়ে ওঠে। ঠিক বলেছে। এমন জীবন আর ভাল লাগছে না। এই চুরি-চুরি খেলা, এ কি নরসিংয়ের পোষায়? এ হল ছোটলোকের কাজ। 'ডরফোক্‌না'—ভীতুলোকের কাজ।

—তা ছাড়া।—ফট্‌কি নরসিংয়ের খুশী মেজাজের স্পর্শ পেয়ে অভিমান করে ঈষৎ ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—তা ছাড়া এমন করে আসতে আর পারব না বাপু। কোনদিন যদি ধরে ফেলে, তবে ওই যে কালো কুমীর—ও আমাকে খুন করে দেবে। মেথর ঢোকার দরজা দিয়ে সরু গলিটা দিয়ে আসি, এখনও ধরতে পারে নাই। এবার ধরতে পারলে তোমারও মুস্কিল হবে, আমাকেও

হয়তো খুন করে গুম্ করে দেবে।

—হুঁ।

ফট্‌কি বলেই যায়—বারান্দা থেকে কাপড় ঝুলিয়ে ঝুলে নামার কথা বলেছিল সেই বুড়ী ঝি হারামজাদী। কুমীর ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নাই। বলে—ওই নরম চেহারা, ওই মেয়ে কাপড় ঝুলিয়ে নামতে পারে কখনও? বলে সে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

নরসিং চুপ করে বসে ভাবে।

—কি ভাবছ?

—কিছু না! তাই চল্। পাঁচমতিতেই ঘর ভাড়া করে তোকে নিয়ে যাই। শুখনরামের টাকাগুলো ফেলে দি।

ফট্‌কি সাদরে নরসিংয়ের গলা জড়িয়ে ধরে। নরসিং স্নেহভরে ফট্‌কির পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। হঠাৎ ফট্‌কি উঠে বসে বলে—ছাড়, তোমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দি।

—না।

নেশার উত্তেজনার মধ্যে ফট্‌কির সেবা নরসিংয়ের ভাল লাগে না। সে চায় দৈহিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি।

শেষরাত্রে ফট্‌কি উঠে চলে যায়। কোনদিন নরসিংকে ডাকে, কোনদিন ডাকে না। সকালে উঠে নরসিং কথাটা ভাবে। এই ফট্‌কিকে নিয়ে কি জীবন কাটানো যায়? আর ফট্‌কিই কি তাকে নিয়ে জীবন কাটাতে পারবে? আবার কাকে দেখে তার নেশা জাগবে কে বলতে পারে? একটা দাঁতনকাঠি চিবুতে চিবুতে চলে মাঠের দিকে; ফেরার পথে ক্রীশ্চানপাড়া হয়ে ফেরে; পথে জোসেফের বাড়ির দরজায় ডাকে—জোসেফ, উঠেছ?

কালো মেয়ে রুখু অবিন্যস্ত চুলে বাঁধা-বেণী ঝুলিয়ে সাড়া দেয়—আসুন নরসিংবাবু। ওর কালো চেহারায় রুখু চুল যেন বড় ভাল মানায়। আর ভাল লাগে ঝকঝকে মুক্তার মত দাঁতগুলি।

—জোসেফ ওঠেনি?

—না। এখনও নাক ডাকছে। নীলিমা মৃদু হাসে—খিলখিল হাসি নীলিমা বড় হাসে না।

—তবে চলি।

—বসুন, চা খেয়ে যাবেন।

নরসিং আর আপত্তি করে না, বাইরের বারান্দায় একটা ল টেনে নিয়ে বসে পড়ে। চেয়ারে মোড়ায় ভীষণ ছারপোকা।

জোসেফের বাড়ি থেকে ফিরে বাসায় এসে বাজার। নিতাই চলে গিয়েছে। বেইমান এখন বাবুর বাড়িতে ড্রাইভারি করছে। ড্রাইভারি, না, গোলামি। বাবুর জুতাও ঘুরিয়ে দিতে হয়—এ কথা হল', করে বলতে পারে নরসিং। মনে পড়ে মেজবাবুর কথা। নরসিং—তবু তো ছত্রীর ছেলে গলায় পৈতে আছে, তবু মেজবাবুর বরাত করতে বাধত না—নরসিং, আমার ধুতি পাঞ্জাবি নিয়ে আয় তো। হ্যাঁ, আর এই চায়ের কাপগুলো নিয়ে যা। এঁটো চায়ের কাপ। প্রথম-প্রথম নরসিংয়ের মনে ছত্রীবংশের মান-ইজ্জতের গরম জেগে উঠত। তার পর তাও করতে হয়েছিল। আর বাধত না। নিতাইটা তো হাড়ীর ছেলে, নরসিং জানে—তাকে বাবু যখন পনেরো টাকা মাইনে আর দুবেলা খাবার দিয়ে রেখেছে তখন নিশ্চয় বলে—এই নিতাই, আমার জুতোজোড়াটা নিয়ে আয় তো। একটা খবর তো সে এর মধ্যেই পেয়েছে—বাবুর বাড়িতে সার্কেল-ডেপুটি আফজল খাঁ সাহেব মধ্যে মধ্যে আসেন, চা খান, খাবার খান, তাঁর বাসন নিতাইকে তুলতে হয়, পরিষ্কার করতে হয়। মরুক নিতাই। যার যেমন নসিব, নরসিং করবে কি?

রামা শূয়ার কবে ফিরবে কে জানে! সে উল্লুকটা ফিরলে এই সব হাঙ্গামা থেকে নরসিং বাঁচবে। বাজার করা, রান্না করা—এ সব এক হাঙ্গামা। কয়েক-দিন হোটেলে খেয়েছিল, কিন্তু হোটেলে কি বারো মাস দুবেলা খাওয়া যায়! তার উপর রোজগার নাই, কাজ নাই—এ সময় করবেই বা কি?

বাজার করে ফিরে একবার গাড়ি বার করতে হবে। বর্ষার সময়; উকিলবাবুদের অনেকে এ সময়টা ছ্যাকরা গাড়ি ভাড়া করে কোর্টে যায়-আসে; নরসিং ছ্যাকরা গাড়ির চাকার দাগ ধরে অল্পস্বল্প রোজগারের পথ আবিষ্কার করেছে। তিনজন উকিল মক্কেল পেয়েছে। এঁরা হলেন বড় উকিল এখানকার মধ্যে। একজন একা যান-আসেন, মাসকাবারি বন্দোবস্ত করেছেন তের টাকা। দৈনিক আট আনা হিসেবে মাসের চারটে রবিবার বাদ দিয়ে ছাব্বিশ দিনে তের টাকা। মাঝের ছুটিছাটাগুলো ধর্তব্য নয়, তেমনি মধ্যে মধ্যে মেয়েরা যদি কোন বাড়িতে বেড়াতে যায় তবে সেটাও হিসেবের মধ্যে আসবে না। আর দুজন একসঙ্গে যান-আসেন। তাঁরা দুজনে দেন

বারো টাকা। রবিবার বা অন্য ছুটির হিসেবনিকেশও নাই আর বাড়ির মেয়েরা মোটরে চড়ে কুটুম্বিতাও করতে যায় না। এ ছাড়াও শহরের মধ্যে একটা আধটা ভাড়া মেলে, তার রেট নরসিং করেছে এক টাকা। এক টাকার কম মোটরে চড়া হয় না,—কমে যেতে চাও, চলে যাও ছ্যাকরা গাড়ির আড্ডায়। অবশ্য কমেও নিয়ে যেতে পারে নরসিং, কিন্তু তাতে ভিতরে গদিতে বসে যেতে পাবে না, মাডগার্ডের উপরে বা ফুটবোর্ডে চেপে যেতে হবে। চীনেম্যান জুতোওয়ালারা কম দাম বললে বলে—এক পাতি হোগা। এও তাই। ভাগো বাবা, পথ দেখ; ছ্যাকরা গাড়িতে যাও, আরও কম হবে। হেঁটে যাও, পয়সা লাগবে না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একবার যায় পাঁচমতির সড়কের তে-মাথায়। রাস্তা পাকা হচ্ছে, তার মালপত্র—অর্থাৎ ইটের খোয়া, স্টোন ব্যালাস্ট, মিলের বয়লার-ঝাড়া পোড়া কয়লার ছাই—ঢালাই হচ্ছে। এখন বাদশাহী সড়ক এতদিনে আংরেজী সড়ক বন্‌তা হ্যায়। ইস্টিরিট হয়ে যাচ্ছে সড়ক। এর উপরে পড়বে লাল মোরাম। তার উপরে চলবে রোলার। রাস্তা তৈরি হয়ে গেলেই তার উপর চলবে নরসিংয়ের কোম্পানীর গাড়ি। 'সিং দাস এ্যাণ্ড কোম্পানী'—মানে নরসিং জোসেফ এ্যাণ্ড কোম্পানীর গাড়ি। নরসিং আর জোসেফের গাড়ি। কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছে। মোটর-কোম্পানীর সঙ্গে চিঠি লেখালেখি চলছে, চিঠি লিখছে নীলিমা। নরসিং দেবে তার পুরনো গাড়িটা কোম্পানীকে, গাড়িখানার দাম যা হবে সে বাদ দিয়ে যা থাকবে মাসিক ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে তা শোধ দেবে। জোসেফও টাকা যোগাড়ের চেষ্টা করছে। শুখনরামকে দলে নেওয়ার কথা এখনও ঠিক হয় নাই। জোসেফও আপত্তি করেছে, নরসিংও মন ঠিক করতে পারছে না এ বিষয়ে। ফট্‌কিই তার মতটাকে ডুবিয়ে দিয়েছে, নইলে শুখনরামকে কোম্পানীতে নেবারই তার ষোল আনা মত ছিল। শুখনরাম ট্রাক কিনুক দুখানা, পাঁচমতি থেকে যত মাল বইবার একচেটে কারবার হয়ে যাবে। ওদিকে ঘাটরোড পর্যন্ত মাল বইবার সুবিধে রয়েছে। দুখানা কেন, চালালে চারখানা ট্রাক চলবে। কথাবার্তার মধ্যে কয়েকবার নরসিং শুখনরামকে কথাটা বলেও দেখেছে। শুখনরাম হাঁ-না কিছু বলে নাই। কথাটা পাকাপাকি করবার সংকল্পের মুখেই ফট্‌কিকে গ্রহণ করলে এবং ফট্‌কি আবদার ধরলে তাকে নিয়ে পাঁচমতিতে বাসা বাঁধতে হবে।

সে করতে গেলে শুখমরামের সঙ্গে সদ্ভাব চটে যাবে, এটা নিশ্চিত। সেই

ভাবনায় পড়েছে নরসিং। বর্ষার জল রাস্তার দুপাশের মাঠে থৈ থৈ করছে; ধান পোঁতা শুরু হয়ে গিয়েছে, চাষীদের কাজকামের শেষ নেই, চোখে স্ফূর্তি কত! কাজকামের মধ্যেই মানুষের আসল স্ফূর্তি। প্রায় বেকার হয়ে বসে আছে নরসিং, মনের মধ্যে রাজ্যের বিরক্তি জমে উঠেছে।

শহর থেকে ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। ঢং-ঢং-ঢং-ঢং? চারটে বাজল। শহরের প্রান্তে ছোট জেলখানার ফটকে ঘড়ি পেটা হয় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। বর্ষার সময় আওয়াজ বেশীদূর যায় যেন, বিশেষ করে আকাশে মেঘ থাকলে। গ্রীষ্মের সময় এখান থেকে জেলখানার ঘণ্টার আওয়াজ এমন স্পষ্ট শোনা যায় না।

এখন ফিরতে হবে নরসিংকে। গাড়ি নিয়ে যেতে হবে কোর্টে। বড় উকিল-বাবুর কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটেয় গাড়ি চাই। বাড়ি ফিরে ঠিক পাঁচটায় চা খাবেন। বুড়োর কি বাঁচবার চেষ্টা রে বাবা! নিক্তির ওজনে খায়, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলে। পঞ্চাশ বছর বয়স থেকে রাত্রে গুনে দুখানি লুচি খায়।

রামা চলে যাওয়ায় বড় অসুবিধা হয়েছে। একটা লোক গাড়ি ধুয়ে দেয়, কিন্তু দাঁড়িয়ে না দেখলেই ফাঁকি দেয়। ঘোড়ায় চড়ে আসে যেন। অবশ্য দোষই বা তাকে কি দেবে নরসিং? শুখনরামের গদিতে মাথায় করে বস্তা বয়ে তার দিন চলে, প্রায় বাঁধা কাজ, কাজে লাগবার খানিকটা আগে এসে কয়েক বালতি জল তুলে চাকার উপর ঝাপ্টা দিয়ে ঢেলে দিতে দিতেই গদির সরকার হাঁক পাড়ে। তাকেও ছুটে যেতে হয়। গাড়ির ভিতরটা ক'দিন ঝাড়া হয় নাই। উকিলবাবুদের চোগা-চাপকানেই ধুলো মুছে যায়। কিন্তু জোড়ের ফাঁকে ফাঁকে ধুলো জমেছে অনেক। ঝাড়নটা দিয়ে ঝেড়েও যেতে চায় না ধুলো। গদিটা টেনে সরাতে হবে। বিরক্তিভরেই নরসিং টেনে তুললে গদিটা আর গালাগাল দিলে নিতাইকে এবং রামাকে—বেইমানের দুনিয়া, ছোটলোকের বাচ্চা কখনও সাচ্চা হয় না দুনিয়ায়। আর সেই উল্লুক গিধ্বড় বাড়ি গিয়েছে তো যেন রাজগী পেয়েছে সেখানে। সেই তো নেকড়ানী পিসি!

চমকে গেল নরসিং। ওটা কি? চিক্‌চিক্ করছে কি ওটা? সোনার জিনিস, কানের গহনা। মাকড়ির মত হাল ফ্যাশানের কানের গহনা। কোন মেয়ে-প্যাসেঞ্জারের কান থেকে পড়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার দুদিন আগে বুড়ো উকিলবাবুর বাড়ির মেয়েরা দুপুরবেলায় গিয়েছিল

এস-ডি-ওর বাড়ি। ঠিক এই দিকেই বসেছিল উকিলবাবুর বেটা-বউ—নতুন বউ। নিশ্চয় তার। শাশুড়ী-ননদের ভয়ে সম্ভবত হারানোর কথাটা চেপে গিয়েছে, বলতে পারে নি। না হলে নিশ্চয়ই খোঁজ হত। তার কাছেও আসত লোক। প্যাসেঞ্জারেরা কতজনে কত জিনিস ফেলে যায়, আবার খোঁজ করতে আসে। ফিরিয়ে দেয় নরসিং। প্যাসেঞ্জারের জিনিস গেলে বদনামী হয়। কলকাতার কথা অবশ্য আলাদা। সেখানে কে কাকে চেনে? কার কথা কে শোনে, মনে রাখে? কিন্তু মফঃস্বলে ও চলে না। কলকাতার এক সাহেব-কোম্পানীর জুতোর দোকানে লেখা আছে—'খরিদ্দার প্রভুর সমান'। ও-জেলার মোটর-কোম্পানীর মালিক বুধাবাবু বেতরিবৎ ঝগড়াটে কণ্ডাক্টার-ড্রাইভারকে বলত—ওরে হারামজাদা শূয়ার-কি বাচ্চা, প্যাসেঞ্জার হল লক্ষ্মী। প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে ঝগড়া যদি ফের শুনি কোনদিন তো তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব, টেনে জিভ ছিঁড়ে দেব।

পকেটে ফেললে জিনিসটা। খোঁজ করলে দিতে হবে, না করে—। চোখ দুটো চকচক করে উঠল নরসিংয়ের। ওজনে আধ ভরি হবে। পনেরো টাকার কম নয়। প্রায় বেকার অবস্থায় যা হয়। হঠাৎ মনে পড়ল নীলিমাকে। এমনি আর একটা গড়িয়ে নীলিমাকে দিলে নীলিমা নেবে না? নীলিমার হাতে না দিয়ে ওর মায়ের হাতে কিংবা জোসেফের হাতে দিলে আরও ভাল হয়। কালো নীলিমার কানে চিকচিকে সোনার গহনাটা বাহার দেবে।

বুড়ো উকিলবাবু গম্ভীর লোক, কথাবার্তা বড় বলেন না। নরসিং দরজা খুলে দেয়, মুহুরি মামলার ফাইলগুলো দেয়, বুড়োবাবু গাড়িতে উঠে কোণে হেলান দিয়ে বসেন, পাকা গোঁফ-জোড়াটা বার দুয়েক হাত দিয়ে টেনে যেন সোজা করে নেন—ব্যস্। বাড়িতে গিয়ে নিজেই দরজা খুলে নেমে যান। চাকর এসে ফাইল নিয়ে যায়।

নরসিংয়ের মনের মধ্যে সোনার গয়নাটার কথাই ফিরছিল। অনেকক্ষণ থেকেই তার মনে হচ্ছিল, কথাটা বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল নীলিমার মুখ। মন তখন বলছিল—মরুক গে, তার কি এত সাধু সাজবার গরজ। যার জিনিস সে যদি খোঁজ না করে, দাবি না করে, তবে তার দোষটা কোথায়? কিন্তু উকিলবাবু গাড়ি থেকে নামতেই সে কতকটা যেন সব যুক্তিতর্ক ভুলে গিয়েই তাঁকে কথাটা বলবার জন্যে ডাকলে—বাবু।

ভুরু কুঁচকে উকিলবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।

মুখের এই চেহারা দেখে নরসিং এক ভড়কে গেল। তবু সে বললে—বলছিলাম স্যার—

উকিলবাবু বললেন—মাস শেষ না হলে টাকাকড়ি দেব না আমি। গট্‌গট করে চলে গেলেন উকিলবাবু।

শালা! নরসিং স্ফুটকণ্ঠেই গাল দিয়ে উঠল। সে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। বাবুর পিছন পিছন এসে বারন্দায় উঠে বললে—টাকাকড়ি আমি চাইনি বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

আবার ঘুরে দাঁড়ালেন উকিলবাবু, বললেন—সন্ধ্যের পর এস। সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুরে ভিতরের দিকে অগ্রসর হলেন তিনি।

—একটা কথা, বাড়িতে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করবেন কারও কিছু হারিয়েছে কি না?

আবার ঘুরলেন উকিলবাবু। স্তব্ধ হয়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে যেন কথাটা বুঝে নিয়ে বললেন—হারিয়েছে কি না? মানে?

—আমি একটা জিনিস পেয়েছি গাড়িতে।

—কি জিনিস?

সে কথার জবাব না দিয়ে নরসিং বললে—পরশু তারিখে মায়েরা গিয়েছিলেন এস-ডি-ও সাহেবের বাড়ি। তার পর আর মেয়েছেলে যায় নাই। আপনি একবার তদন্ত করে দেখবেন বাড়িতে। আমি বরং সন্ধ্যের সময় আসব।

উকিলবাবু এবার নরসিংয়ের পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলেন।—কি জিনিস? জিনিসটা কি হে?

—জিজ্ঞাসা করবেন মায়েদের। তাঁদের হলে তাঁরাই বলবেন কি জিনিস।

নরসিং নিজেই যেত, কিন্তু উকিলবাবু তার অবসর দিলেন না। উকিলবাবুর লোক তাকে খুঁজে বার করলে।—বাবু ডাকছেন।

উকিলবাবু চোখ-মুখ রাঙা করে বসে আছেন। যেন বড় মামলায় সওয়াল করে হাঁপাচ্ছেন। নরসিং যেতেই বললেন—হ্যাঁ, বউমার কানের মাকড়ি-দুল হারিয়েছে। পেয়েছ তুমি?

নরসিং গয়নাটি বার করে টেবিলের উপর নামিয়ে দিলে।

—ইয়েস্! দ্যাটস্ ইট! এ-ই বটে! হাতে করে তুলে নিয়ে তিনি বাড়ির

মধ্যে চলে গেলেন।

নরসিংয়ের মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। সে মৃদুস্বরে আবার গাল না দিয়ে পারলে না। শা-লা! ভাল কথা বলতে জানে না দুনিয়া। অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এসে সে গাড়ি নিয়ে চলে এল। মনটা কিন্তু তার ভারী খুশী হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে এতে তার ভাল হবে—এ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত। উকিলবাবু—ওই বুড়োয়া—ও এর দাম না দিক, দুনিয়া এর দাম দিতে কসুর করবে না। পাকা নয়া রাস্তা, আংরেজ আমলের ইষ্টিরিট রাস্তায় মেয়েছেলে নিয়ে যারা যাবে তারা নরসিংকে খোঁজ করবেই। শা-লা।

ক্লাচ—ফুটব্রেক—সব শেষে হ্যাণ্ডব্রেকটা পর্যন্ত টেনে ধরলে। আর একটু হলেই চাপা পড়েছিল একটা। ধাঁ করে ছুটে বেরিয়ে এসেছে পাশের গলি থেকে।

পরের দিন কিন্তু উকিলবাবু নিজে থেকেই কথা বললেন।

—কি হে, কাল আমি বাড়ির ভিতর থেকে আসতে আসতে তুমি চলে গেলে কেন?

নরসিং যথাসাধ্য মিষ্টভাবেই জবাব দিলে—আপনি তো দাঁড়াতে বলেন নি!

—ও, বলি নি, না? ভুলে গিয়েছিলাম তা হলে। একটু চুপ করে থেকে বললেন—ইউ আর এ গুড ম্যান, অ্যান অনেস্ট ম্যান। সততা আছে তোমার।

নরসিং কোন জবাব দিলে না।

গাড়ি থেকে নেমে উকিলবাবু পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে বললেন—ধর।

জোড়হাত করে পিছিয়ে গেল নরসিং।—এর জন্যে আমি কোন বকশিশ নিতে পারব না স্যার। বাড়িতে কাজকর্ম হলে নিজে চেয়ে নেব বকশিশ, জরুরী কাজে ট্রেন ধরিয়ে দিয়ে দু-টাকা বেশী ভাড়া দাবি করব স্যার। কিন্তু এর জন্যে কিছু নিতে পারব না।

উকিলবাবু নোটখানা পকেটে পুরে কোর্টে গেলেন।

বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে বললেন—দেখ হে, তোমার ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ আমি করতে পারব না। তুমি সন্ধ্যের পর একবার আমার এখানে আসবে। কিছু কথা বলব।

চমকে উঠল নরসিং। ক্ষতি হয়—? ক্ষতির চেষ্টা তা হলে কিছু হচ্ছে? সে প্রশ্ন করে উঠল—আজ্ঞে?

—সন্ধ্যের পর এস, সন্ধ্যের পর।

আঠারো

মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। উকিলবাবু বললেন—তোমার ক্ষতি হয় এমন কাজ অর্থাৎ নরসিংয়ের ক্ষতি হয় এমন কাজ কিছু হচ্ছে। উকিলবাবু জানতে পেরেছেন! উকিলবাবু যখন জেনেছেন তখন আইন-আদালতের কাণ্ড। অর্থাৎ মামলা-মকদ্দমা। কে করেছে মামলা-মকদ্দমা? নরসিং কারও কাছে টাকা ধারে না, কারও খাজনা রাখে না। কোন এ্যাকসিডেণ্ট হয়নি—কোন প্যাসেঞ্জার ক্ষতিপূরণের নালিশ করতে পারে না। কারও সঙ্গে মারপিট হয়নি, গালিগালাজ হয়নি। মধ্যে মধ্যে ঘোড়ার গাড়ির কোচওয়ানদের সঙ্গে দু-চারটে কড়া কথা বলাবলি হয়েছে, তার জবাব তারাও দিয়েছে। তবে?

ডেটিনিউবাবুর কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। পুলিস কিছু করেছে? খুব সম্ভব। বুকটা ধড়াস করে উঠল তার। তা ছাড়া আর কি হতে পারে? মিউনিসিপ্যালিটির ক-ঝুঁড়ি পাথর চুরি? না না না। ওটা বাজে। মিউনিসিপ্যালিটির ওভারসিয়ারবাবু নগদ পাঁচটা টাকা তার হাত থেকে নিয়ে পকেটে পুরেছেন। আর কি হতে পারে? ওভারলোডিং-এর কেস? বেশী যাত্রী বোঝাই করার জন্যে পুলিস কেস করেছে? হতে পারে হয়তো। কিন্তু এমন তো কোনদিনের কথা মনে পড়ে না। তা ছাড়া সিপাহীদের দৈনিক পার্বণী তো সে নিয়মিত দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল শুখনরামের কথা। সাহুজীর ছোট ছোট তামাকের পেটি সে মধ্যে মধ্যে নিয়ে আসে। তাই নিয়ে কিছু কি? কিন্তু ধরা তো সে পড়েনি, সাহুজীরও কিছু হয়নি, তবে মামলা হয় কি করে? সারাটা বিকেল তার চিন্তার মধ্যে কাটল। সন্ধ্যের সময় মদের দোকানে গিয়ে একটা শিশিতে সে মদ কিনে পুরে নিলে, খেলে না; উকিলবাবুর কাছে যেতে হবে, মুখে গন্ধ নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

উকিলবাবু মৌজ করে বসেছেন বারান্দায়; একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে বসেছেন, সামনে একটা ছোট টেবিল—টেবিলের উপর একটা শৌখীন টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। একটা কাচের গেলাসে মধ্যে মধ্যে চুমুক দিচ্ছেন আর গড়গড়ার নলে তামাক খাচ্ছেন। উঃ উঃ! তামাকের ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে আর একটা গন্ধ কিসের? আরে সীতারাম, বোম শঙ্কর হরি হরি! কাঁচা মাংসের গন্ধ বাঘের কাছে লুকানো যায় না; মাছের গন্ধ বেড়ালের কাছে চাপা দেওয়া যায় মসলার গন্ধ মিশিয়ে? বাবু মদ খাচ্ছেন। নরসিং খুব খুশী হয়ে উঠল উকিলবাবুর উপর। এ না হলে মানাবেই বা কেন, আর শরীরই বা থাকবে কেন? এই বয়সে খাটুনি তো কম নয়! সারাটা দিন সকাল থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত বকবক করা, জেরা করা—এ কি সোজা কথা! বড় বড় উকিলের চালই এই। ও-জেলাতেও সে দেখেছে, শুনেছে। সন্ধ্যের পর মাপ করা শিশি থেকে দাগে দাগে ঢেলে জল মিশিয়ে একটু একটু করে—বাবুরা বলেন 'শিপ করে'—খান। চ্যাংড়া উকিলেরা বেশী খায়; মধ্যে মধ্যে বেএক্তিয়ার হয়েও পড়ে; দু-চারজন কসবীপাড়ায় হানা দেয়।

বারান্দায় উঠতেই উকিলবাবু বললেন—এসেছ?

বিনীত নমস্কার করে নরসিং বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বসো। উকিলবাবু গেলাসে চুমুক দিয়ে ডাকলেন—রামধনিয়া। গেলাসটা নিয়ে যা। জল মিশিয়ে আধ গেলাস দিয়ে যা। তামাক টানতে লাগলেন বাবু। বার-দুই টেনে নলটা ফেলে দিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—হ্যাঁ। তোমার ক্ষতিকর কিছু আমার করা উচিত নয়!

নরসিং বললে—আমি তো স্যার কোন অন্যায়ই করিনি।

—ইয়েস। অন্যায় কর নি। তা ছাড়া তুমি অনেষ্টির পরিচয় দিয়েছ। বউমা তো কথাটা চেপে গিয়েছিলেন বকুনির ভয়ে। তুমি অনায়াসে ওটা আত্মসাৎ করতে পারতে। ইয়েস, তোমার অনেষ্টি তুমি প্রুভ করেছ। ইয়েস।

নরসিং উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করে রইল।

উকিলবাবু একটু চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করলেন—বাট্‌ ইউ সি, সংসারে বেঁচে থাকাটা একটা যুদ্ধ—স্ট্রাগল্‌। ইয়েস—জীবনযুদ্ধ। বিশেষ আজকালকার বাজারে। একজনকে কিছু করতে গেলেই আর একজনের এলাকায় হানা দিতে হবেই। তুমি এখানে এসে হানা দিলে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের রোজগারের এলাকায়। ঠিক কি না বল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! নরসিং আশ্বস্ত হল, তা হলে ঘোড়ার গাড়িওয়ালাদের কোন তড়পাইয়ের ব্যাপার। উকিলবাবু গোঁফ চুমরে নিয়ে বললেন, ইয়েস। ব্যাপারটা ঠিক তাই, বড় ছেলেটা আমার বসে আছে। ভাবছিলাম, কি করে দেওয়া যায় ওকে! তা শ্যামনগর-পাঁচমতি রোড পাকা হওয়ার প্রপোজাল হতেই শুখন সাহু আমার কাছে এল। ওর বড় ছেলের সঙ্গে আমার ছেলেটির ফ্রেণ্ডশিপ আছে। আমাকে প্রপোজাল দিলে রাস্তাটায় মনোপলি-সার্ভিস নিয়ে ওদের দুজনকে একটা মোটর-বাস বিজনেস করে দেওয়ার। কথাটা ভাল লাগল আমার। ইয়েস। দেখ, ছেলেটা বসে আছে, তা ছাড়া এমন একটা রাস্তায় যদি মনোপলি-সার্ভিস পাওয়া যায় তবে মন্দ হবে না ব্যবসাটা। ইয়েস, ভালই হবে। শুখনরাম আমাকে বললে, আড়াই মাসে বেশ লাভ করেছ তুমি। নরসিংয়ের মাথার মধ্যে মুহূর্তে ক্ষোভের যেন একটা হাউই বাজি ছুটে গেল। গিরবরজার ছত্রীর ছেলে নরসিং, দশ-বারোটা লোহার ঘোড়ার রাশ ধরে দিনভর হাঁকায় নরসিং। চড়াসুরে বাঁধা মেজাজের তার কড়া কথায় অল্প ছোঁওয়ায় কেটে যায় তার, সে উঠে দাঁড়াল। হয়তো অঘটন কিছু ঘটিয়ে ফেলাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সংসারে ব্যক্তিগত স্বভাবটাই সব নয়, তার চারিপাশের পৃথিবীকে তাকে না-মেনে উপায় নেই। তার এই তীব্র ক্ষোভ এবং ক্রোধকে হাউইয়ের সঙ্গে তুলনা করলে পারিপার্শ্বিককে তুলনা করতে হবে বর্ষাঋতুর সঙ্গে। বর্ষার মেঘলা আকাশ এবং বর্ষণ যেমন হাউইকে অল্প একটু উঠতেই দমিয়ে দেয়, তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে উঠেও সে চারিপাশের প্রভাব স্মরণ করে আবার দমে গেল। উকিলবাবুর বুদ্ধি এবং টাকা, শুখনরামের শয়তানি আর টাকা—এর সামনে সে কতটুকু? আর সে তো সেই গিরবরজার ছত্রী নয়। গিরধারী সিংরায়ের বাস নাই, ফৌত হয়ে গিয়েছে গিরধারী সিং। দাঁড়িয়ে উঠে সে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—তা বেশ তো। আমি তো গরীব। আপনাদের টাকা আছে, আপনারা ব্যবসা করবেন বৈকি! গরীবের রুটি নেবেই তো বড়লোক। তা বেশ, আমি চলে যাব এখান থেকে।

উকিলবাবু হেসে বললেন—বসো, বসো তোমার দুঃখ হচ্ছে বুঝতে পারছি। ইয়েস, তোমার দুঃখ হবার কথা। ইয়েস, 'ন্যাচারল এটা—বেরী বেরী ন্যাচ্যারল। উকিলবাবু Natural-কে বলেন 'ন্যাচারল,' Very-কে বলেন 'বেরী'। এককালে তাঁর ইংরেজী বলার খ্যাতি ছিল। বড় বড়

কথা দিয়ে ইংরেজী বলতেন। একালের ছেলেরা তাকে বলে 'বোম্বাষ্টিক'! উকিলবাবু হাসতে হাসতে গেলাসে আবার একটা চুমুক দিয়ে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে চাকরকে ডাকলেন—রামধনিয়া, এলাচ আর লবঙ্গ দিয়ে যা আর কয়েকটা। তারপর নরসিংকে বললেন—বসো, বসো! আরও কথা আছে। ইউ আর এ গুড ম্যান, অনেস্ট ম্যান; কিন্তু আমিও অনেস্ট ম্যান, ডিসনেষ্টি আমি পছন্দ করি না! কাল থেকেই আমি ভাবছি, হোয়াট ইজ দি ওয়ে আউট? বুঝতে পারছ? কঃ পন্থা? মানে, সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না— এমন কি পথ থাকতে পারে? এ্যাণ্ড আই হ্যাভ ফাউণ্ড ইট আউট। ভেবে বের করেছি। ইয়েস—এর চেয়ে আর ভাল হতে পারে না।

নরসিং বললে, আসছি। স্যার, এক্ষুনি আসছি। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে, ঠিক সময়ে অভ্যাসের নেশা পেটে না-পড়ায় শরীর মেজাজ বেশ তাজা হচ্ছে না, তার উপর উকিলবাবুর গেলাস থেকে গন্ধ এসে নাকে ঢুকে তাকে চঞ্চল করে তুলছে। সে আর থাকতে পারলে না, উকিলবাবুর বাড়ির কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, শিশিটা বার করে নির্জলা মদ গলায় ঢেলে দিলে; গন্ধের ভয় নাই, 'নাইপাকা' হরিণকে কি বলে যেন? কস্তুরী হরিণ! ওই 'নাইপাকা' হরিণের মত বাবু এখন নিজের মুখের খোসবয়েই মশগুল। আর যদি পায়ই গন্ধ তাতেও নরসিং গ্রাহ্য করবে না। যে লোক তার রুটি মারতে হাত বাড়িয়েছে, তাকে আর খাতির কিসের? ঠাণ্ডা কথায় জবাব দিয়ে নরসিংয়ের সুখ হচ্ছে না! গ্যাস বানিয়ে নিতে হবে। ধাঁ করে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে চোঁ-চোঁ করে যাকে বলে—সেইভাবে টানতে লাগল। বর্ষাকালের সিগারেট—জলো হাওয়ায় আর জোরালো টানে সিগারেটটা পাটকিলে রঙ ধরে গরম হয়ে উঠল চলন্ত ইঞ্জিনের তৈলাক্ত নাট্ অর্থাৎ ক্রুপের মত।

—কই হে?—উকিলবাবু ডাকছেন। বাবু আজ খুব খুশী হয়েছেন দেখছি ভাল। কি পথ তিনি বার করেছেন শোনাই যাক। তার পর নরসিং যা হয় করবে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সে এবার বেশ শক্তভাবে পা ফেলে বাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

উকিলবাবু বললেন—দেখ হে, আমি ঠিক করেছি—ব্যবসা করতে গেলে তোমাকে বাদ না দিয়ে তোমাকে নিয়ে ব্যবসা করলেই সব ঠিক হয়ে যায়। কোন সমস্যা নেই আর। নয় কি? এখন আমার প্রপোসাল হচ্ছে—

'প্রপোসাল' মানে বোঝ তো? প্রস্তাব—ইয়েস—প্রস্তাব। তুমিও আমাদের ব্যবসাতে লেগে যাও।

এবার নরসিং একটু খুশী হল। মন্দের ভাল এ-প্রস্তাব। সে জোসেফ এবং শেঠজীকে নিয়ে কোম্পানী খুলবার কল্পনা করেছিল—এতে জোসেফের বদলে উকিলবাবু আসছেন। জোসেফ বাদ যাচ্ছে—তার আর কি করতে পারে নরসিং। বন্ধু লোক আর মেরী নীলিমার ভাই। নইলে গির্বরজার হাড়ীর ক্রীশ্চান বংশধরের সঙ্গে শেয়ারে ব্যবসা করতে তারও মন খুঁতখুঁত করে।

নরসিংয়ের কাছে কোন জবাব না পেয়ে উকিলবাবু বললেন—কি? মত নেই নাকি তোমার?

—আজ্ঞে, মত থাকবে না কেন? এ তো খারাপ কথা বলেন নি আপনি?

—ইয়েস, খারাপ কথা আমি বলি না। সে লোক আমি নই। যাক্—তুমি তা হলে রাজী?

—হ্যাঁ। রাস্তা যখন পাকা হচ্ছে, প্যাসেঞ্জার যখন হয়, তখন আরও গাড়ি চলবে সে আমি জানি। তবে মনোপলি-সার্বিস করে যদি আমার রুটিটা মারেন, তা হলেই আমার উপর অধর্ম করা হবে। নইলে—

—ইয়েস, নইলে অধর্ম হবে না। এবং সেটাই আমি চাই।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তো ওই গরুর গাড়ির রাস্তায় মোটর চালিয়ে লোকের চোখ খুলে দিয়েছি। খারাপ রাস্তায় কেউ তো মোটর চালিয়ে লোকসানের ঝুঁকি নিতে চায় নি।

—বটে। ও কথাটা তুমি বাদ দাও। রাস্তা যখন পাকা হচ্ছে তখন তুমি এর আগে মোটর না চালালেও লোকে নতুন করে সার্ভিস খুলত! সেটা কোন দাবি নয় তোমার। তবে তুমি অনেস্ট লোক—তোমার ক্ষতি আমি চাই না, এইটেই হল আসল কথা। এখন শোন। আমরা একখানা মোটর বাস্ নিয়ে আসছি।

—এর সঙ্গে ট্রাকসুদ্ধ আনুন বাবু, এ পথে মালের আনাগোনা প্যাসেঞ্জারের চেয়ে অনেক বেশি!

—গুড আইডিয়া! দ্যাটস্ ইট! এ কথা মনে হয় নি আমাদের! এই জন্যেই তোমাকে চাই আমাদের মধ্যে! ইয়েস, বেরী গুড আইডিয়া!

নরসিং উৎসাহিত হয়ে উঠল। উকিলবাবুর মত গণ্যমান্য বিচক্ষণ পদস্থ

ব্যক্তির প্রশংসা তার মত ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ সামগ্রী, সে বললে—আমি খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি বাবু, মালের গাড়ি—গড়ে কত মণ করে মাল আসে গাড়িতে, মণ করা ভাড়া হিসেব করে খতিয়ে দেখেছি, মালের ট্রাক এখানে চালু করতে পারলে খুব লাভ। তা ছাড়া ট্রাক করলে আরও একটা কারবার জুড়তে পারা যাবে এর সঙ্গে।

—কি বল তো?

—রাস্তার ঠিকেদারি।

—কন্‌ট্রাক্টরি? আই সি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বর্ষার সময় মেরামতের জন্যে রাস্তা বন্ধই থাকে কিছু দিন। আমি দেখেছি—বুধাবাবু, মানে, পাশের জেলায় বুধাবাবুর মোটর সার্বিস একরকম একচেটে, তিনি রাস্তা কন্‌ট্রাক্ট নেন; গরুর গাড়িতে পাথর-কাঁকর ঢালাই করতে দু-মাস লাগলে—ট্রাকে সে কাজ দশ দিনে হয়ে যায়। বসে থাকার লোকসানটা হয় না—ঠিকেদারির লাভ থাকে—আর সব চেয়ে বড় কথা—রাস্তা মেরামতটি ভাল হয়। মানে—ওভারসিয়ারের প্রণামী দিয়ে ঠিকেদারেরা কম কাঁকর-পাথর দিয়ে বেশি লিখিয়ে লাভ করতে গিয়ে রাস্তার মাথা খেয়ে দেয়, সেটি হয় না। আমাদের হাতে রাস্তা থাকলে আমরা গাড়ির জন্যে রাস্তা ভাল করে মেরামত করাব। ভেবে দেখুন ঠিক বলেছি কি না।

উকিলবাবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন—গ্র্যাণ্ড বলেছ। চমৎকার আইডিয়া! ইয়েস। অদ্ভুত কথা! মনোপলি সার্বিসের জন্যে বছরে একটা টাকা আমাদের ওই রাস্তার জন্যে দিতেই হবে। কন্‌ট্রাক্ট আমাদের থাকলে —ইউ উইল বি লাইক ফ্রায়িং এ হিল্‌সা ফিস। মাছের তেলে মাছ ভাজা হয়ে যাবে। গ্র্যাণ্ড! গুড! তোমাকে আমাদের চাই। বুঝলে?

নরসিংয়ের মাথায় মৌজ ধরে এসেছে, সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

উকিলবাবু বলেন—নাউ অর্থাৎ এখন আসল কথাটা বলে নি। মানে 'টর্মস' বুঝলে। শর্ত। আমি খুব সোজা লোক। বাঁকা-চোরা গলি-ঘুঁজি ঘেঁটে ঘেঁটে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আমি খোলসা করে কাজ করতে চাই। দেখ ব্যবসা করতে গেলেই আগে ঠিক করতে হয় মূলধন। তা তোমার মূলধন—ক্যাপিট্যাল আমরা ঠিক করেছি বিশ হাজার টাকা। ইয়েস বিশ হাজার। বাস দুখানা—বারো থেকে চোদ্দ হাজার—মানে, গাড়ি কিনব নতুন। তা ছাড়া মনোপলি সার্বিসের জন্য রাস্তায় দিতে হবে দু-হাজার। আর ধর—ডিষ্ট্রিক্ট

বোর্ডের লাগবে শ-পাঁচেক—মানে পূজো। এই গেল সাড়ে ষোল হাজার। তারপর গ্যারেজ এ-ও-তা এসব আছে। এখন ট্রাক একখানা কি দুখানা কিনতে গেলে টাকা আরও বেড়ে যাচ্ছে—ধর আরও দশ-বারো হাজার।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকিলবাবু যোগ-বিয়োগ করে টাকার পরিমাণ ধার্য করেন তিরিশ হাজার। তারপর বললেন—এখন কারবারে অংশীদার হতে গেলে তোমাকেও এর একটা অংশ দিতে হবে। তা না হলে অংশীদার হওয়া যায় না। আমি জানি না—ইয়েস্—আমি কি করে জানব কত টাকা তুমি দিতে পার ?

নরসিংয়ের মনে হল—সে যেন কোন উঁচু জায়গা থেকে নীচের দিকে পড়ে যাচ্ছে—সর্বাঙ্গ কেমন শিরশির করছে, হাত-পা নাড়বার শক্তি নাই। একটা সাপ যেন মুখে না কামড়ে লেজ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। তিরিশ হাজার টাকার অংশ—!

উকিলবাবু উৎসাহ-ভরে বলে গেলেন—এক, তোমার গাড়িটা আছে, ওটার দাম যা আমি এনকোয়েরি করে জেনেছি তাতে ম্যাক্সিমাম হাজার টাকা। ওটা আমরা মোটর-কোম্পানীকে বেচে গাড়ি কেনবার সময় এক্সচেঞ্জ দিলে কিছু হয়তো বেশি পেতে পারা যাবে। মানে, পুরনো গাড়ি আমি রাখব না। বুঝলে ? এখন এর ওপর কি দেবে তুমি—বল ?

নরসিং নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—টাকাকড়ি আমার নাই বাবু। কোথায় পাব আমি ?

—তা হলে মাত্র গাড়িখানার দাম। ধর—এক হাজার ; তা হলে তিরিশ ভাগের এক ভাগ। দু-পয়সার সামান্য কিছু বেশি। সামান্য মানে হাজার টাকায় মাসে লাভ বলে ৩৩।৴৪ পাই পাবে তুমি। আর কাজ করবে তার একটা মাইনে পাবে। বেশ, কালই তুমি গাড়িখানা লিখে দাও—

নরসিং ঘাড় নেড়ে বললে—গাড়ি আমি বেচব না বাবু।

চমকে উঠলেন উকিলবাবু। ঘাড় বেঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—মানে ? একটু চুপ করে থেকে বললেন—তা হলে তুমি এতে রাজী নও ? এর পর খুব গম্ভীর হয়ে বললেন—ভাল। দ্যাট্‌স গুড। আমি খালাস।

নরসিং পকেট থেকে শিশিটা বার করে অল্প খানিকটা সরে গিয়ে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে খানিকটা মদ খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ওই

আড়াল থেকেই বললে—আজ্ঞে ও শর্তে আমি রাজি নই। কোম্পানীকে গাড়ি আমি দেব, কিন্তু গাড়ি আমারই থাকবে, আপনাদের গাড়ি আপনাদের থাকবে, আপনাদের আয় আপনারা নেবেন, আমার গাড়ির আয় আমার থাকবে। মনোপলি নিতে যে টাকা লাগবে তার যা ন্যায্য অংশ হবে আমি দোব। গাড়িখানা কোম্পানীকে বেচলে দু-পয়সা অংশ হবে বলেছেন, তা বেশ ঐ টাকার দু-পয়সা অংশ আমি দোব।

—না। সে হয় না।—উকিলবাবু সোজা হয়ে বসলেন। দিলদরিয়া মেজাজ, গলার মৌজী কণ্ঠস্বর পাল্টে গিয়েছে। ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন—ও-সব কাঁচা কাজ আমি করি না। ও-সব বাঙালীর এলোমেলো কাজের মধ্যে আমি নেই। আমার কারবারের মধ্যে আমি থাকতেও দোব না।

একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে ঢুকল কম্পাউণ্ডের মধ্যে; উকিলবাবু উঠে দাঁড়ালেন ব্যস্ত হয়ে।—কে? নিজেই আলোটা তুলে ধরলেন—কে, সাহুজী?

হ্যা-হ্যা করে হেসে মুখ বার করে সাহুজী বললে—জী, হুজুর।

—গাড়ি? গাড়িতে এলে? এনেছ নাকি?—উকিলবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সাহু উকিলবাবুর কথার জবাব না দিয়ে গাড়ির ভিতর কাউকে উদ্দেশ করে বললে—আরে নাম্ রে বাবা, নাম্।

উকিলবাবু হেসে বললেন—যাক, তা হলে সত্যিই ব্যবসা করবে তুমি!

—আলবৎ। দেখেন, মানুষটাকে দেখেন আগে। একবার পায়ে তেল দিবে তো—বাত আধা ভাল হইয়ে যাবে।

গাড়ি থেকে ধবধবে সাদা থান কাপড় পরে নামছে একটি মেয়ে। নরসিং দাওয়ায় উবু হয়ে বসেছিল—সে উঠে দাঁড়াল। থামের আড়াল থেকে এগিয়ে এল। উকিলবাবু সম্ভবত উত্তেজনার প্রাবল্যে এতক্ষণ নরসিংয়ের কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি এবার সচেতন হয়ে উঠলেন, বললেন—নরসিং, তুমি যেতে পার এখন।

মেয়েটি চঞ্চল হয়ে মুখের ঘোমটা সরিয়ে চারিদিকে চাইলে—নরসিংয়ের নাম শুনে ফট্‌কি তাকেই খুঁজছিল। নরসিংয়ের দিকে চেয়ে তার চোখ জলে ভরে উঠল। উকিলবাবুর হাতের চিমনির আলো তার চোখ-ভরা জলের উপর ছটা ফেলেছে।

শুখনরাম নরসিংকে দেখে বিরক্ত হয়েছে—বিব্রত হয়েছে, এটা বুঝতে পারলে নরসিং। শুধু বুঝতে পারলে না একটা কথা। ফট্‌কিকে এখানে এক

রাত্রির জন্যে দিয়ে যাচ্ছে শুখনরাম অথবা চিরদিনের জন্য? শুখন নরসিংকে বললে—ওকিলবাবু আপনাকে যানে বলছেন সিংজী।

—যাব। আর দুটো কথা আছে।

—সে কাল হবে। রামধনি! ডাকলেন উকিলবাবু।—এই নতুন ঝিকে নিয়ে যা। বুঝলি?

শুখনরাম বললে—খাসবাবুর ঘরের কাজকাম করবে—বাবুকে সেবা-উবা করবে। খ্যা-খ্যা করে হাসতে লাগল শুখনরাম।

উকিলবাবু ধমক দিয়ে বললেন—থাম, থাম। সে ও জানে। যাও গো তুমি, এর সঙ্গে যাও।

শুখনরাম ফট্‌কিকে বললে—যা না রে।

নরসিং স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ফট্‌কির দিকে। রাত্রে ফট্‌কির চেহারা বদলাত আগে, বাঘিনীর মত চোখ জ্বলত, কিন্তু ফট্‌কি আজ অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। আজই হয়েছে, কি কতদিন হয়েছে, কে জানে। আজ কিন্তু নরসিংয়ের চোখে পড়ল। তার আজকার এমন চেহারা আর কখনও নরসিং দেখে নি। প্রথম যেদিন নরসিং মাঠের মধ্যে তিরস্কৃতা ম্লানমুখী ফট্‌কিকে দেখেছিল—সে চেহারাও তার মনে আছে, সেদিন পথে যেতে যেতে তার মনে হয়েছিল—মেয়েটি যেন গরুর গাড়ির চাকায়-লাগা টুকরো মাটির মত, অসহায়ের মত, চাকায় লেগে দেশ থেকে দেশান্তরে চলেছে। আজকার চেহারা তার অত্যন্ত করুণ। ফট্‌কি এ জীবনে কখনও কাঁদে নি। শুধু হেসেছে; সে কি হাসি! কাচের পেয়ালার আওয়াজের মত আওয়াজ বেজে ওঠে সে হাসিতে। মদভর্তি কাচের পেয়ালার মতই ফট্‌কি—তাকে যে আদর করে তুলে মুখে ধরেছে, তারই মুখে সে ওই হাসির আওয়াজ নেশার মৌজ যুগিয়েছে। হঠাৎ যেন মদ-ভরা কাচের পেয়ালা দুধ-ভর্তি জয়পুরী শ্বেত-পাথরের গেলাস হয়ে গিয়েছে যাদুর মত কিছুর ছোঁয়া লেগে। রাত্রের অন্ধকারে আসত, আলো জ্বালতে সাহস করত না; নরসিং ঠাওর করতে পারে নি ফট্‌কির এই পরিবর্তন। সুন্দর রঙ ফট্‌কির, সাদার সঙ্গে একটা লালচে আভা খেলত; আজ সে লালচে আভা কেউ যেন মুছে দিয়েছে।

রামধনি খানিকটা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। ফট্‌কি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এক পা নড়ে নি। এক নূতন দৃষ্টি চোখে নিয়ে নরসিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টি কিছু বলছে। কি বলছে সে কথা শুখনরাম বুঝতে পারলে

।, উকিলবাবু বুঝতে পারলে না, কিন্তু নরসিংয়ের বুঝতে ভুল হল না। চোখের কোল-ভরা জল তারা না-দেখে-দেখে আজ আর দেখতেই পায় না।

শুখনরাম এবার ধমক দিয়ে উঠল—আরে হারামজাদী, তুর কানে আসছে না বাত্—না কি?

পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে শুখনরাম তাকে সামনে ঠেলে দিলে—যা-ও।

অতর্কিতে ধাক্কা খেয়ে ফট্‌কি হয়তো উপুড় হয়ে পড়ে যেত; কিন্তু নরসিং তার আগেই এগিয়ে এসে দুই হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল। শুধু ধরে ফেলে তাকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েই ক্ষান্ত হল না, সকল বিপদের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে সমস্ত সঙ্কোচ লজ্জাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজের পাশে টেনে নিয়ে বললে—না।

এই আকস্মিক ঘটনায় এবং নরসিংয়ের গলার আওয়াজে শুখনরাম-উকিলবাবু চমকে উঠলেন, রামধনির হাতে একটা কাচের গেলাস ছিল—সেটা তার হাত থেকে পড়ে ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভেঙে গেল।

উকিলবাবু হাজার হলেও উকিলবাবু—তিনি সর্বাগ্রে সামলে নিয়ে নরসিংয়ের স্পর্ধায় রাগে জ্বলে উঠে চিৎকার করে উঠলেন—ই-উ সোয়াইন!

নরসিং চিৎকার করে উঠল—খবরদার! তারপর ফট্‌কির হাত ধরে টেনে বললে—আয়, চলে আয়।

উকিলবাবু বললেন—তোমাকে আমি জেলে দেব। আমার ঝি—

নরসিং বললে—ও আমার পরিবার।

—বেটা শয়তান, তুই ছত্রী আর ও সদ্‌গোপ বিধবা; তোর পরিবার?

—হাঁ হাঁ। আমি মর্দানা ও আমার আওরৎ। ছত্রী? সদ্‌গোপ? হা-হা করে হেসে উঠল নরসিং।

এতক্ষণে শুখনরাম চিৎকার করে উঠল—বন্দুক—বন্দুক—আপনার বন্দুকঠো নিকলান ওকিলবাবু—বন্দুক।

নরসিংয়ের হাসি তখনও থামে নাই, একথায় সে হাসিতে তার আবার জোর ধরে গেল। সে পকেট থেকে বড়-ফলার চাকু-ছুরিটা বার করে খুলে ফেললে।

মফস্বলের শহর, তাও সদর-শহর নয়—মহকুমা-শহর। বড় রাস্তায় টিম্‌টিমে কেরোসিনের আলো জ্বলে এখানে ওখানে এক একটা। গলিপথগুলোর এ-মাথায় একটা আলো ও-মাথায় একটা আলো, মাঝখানটা অন্ধকার। সেই

অন্ধকার গলিপথে হনহন করে চলেছে নরসিং। ফট্‌কিকে ছুটতে হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গ রেখে। নরসিংয়ের এক হাতে টর্চ, এক হাতে সেই ছুরিটা। মধ্যে মধ্যে টর্চটা জেলে পথ দেখে নিচ্ছে। মনে কোন ভাবনা-চিন্তার অবসর নাই। সকল ভাবনা-চিন্তার আজ একটা ফয়সালা হয়ে গিয়েছে। নরসিং জানে, সে বিশ্বাস করে, মানুষের ভাবনা-চিন্তায় দুনিয়ার কোন কিছুরই ফয়সালা হয় না। ফয়সালা-করনেওয়ালা একজন আছেন, তিনিই করে দেন সকল কিছুর শেষ রায় হুকুমনামা, তার উপর আর কোন আর্জি-আদালত চলে না। নইলে ঠিক যখন এখানকার হাটের সকল ভাল-মন্দ লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ হয়ে গেল, মোটর-সার্বিসের জন্য যখন আর কারুর খাতির রেখে মন যুগিয়ে চলবার আর প্রয়োজন রইল না, উকিলবাবু শুখনরাম এঁদের কারুর সঙ্গেই নির্ভয়ে সোজা তকরার করতে এতটুকু ভয়ও আর তার রইল না, তখন ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ফট্‌কির সম্বন্ধে একটা ফয়সালা করবার জন্য তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন কেন? উকিলবাবু যদি নরসিংয়ের প্রস্তাবে আপত্তি না করতেন, তা হলে নরসিং কি করত কে জানে? সে কি এমনিভাবে ফট্‌কিকে নিয়ে ছুরি ঘুরিয়ে চলে আসত? না, চুপ করে মুখ নামিয়ে বসে থাকত, ফট্‌কি কিছুক্ষণ কেঁদে চোখ মুছতে মুছতে উকিলবাবুর অন্দরে গিয়ে ঢুকত, নরসিংও ফিরে এসে খুব মদ খেত, হা-হুতাশ করত? কোন কসবীর বাড়ি যেত? বড় জোর মেরী নীলিমার কথা নিয়ে মনে মনে কাহিনী তৈরী করত। সে মনে মনে বললে—দুনিয়াদারীর মালেক শিউশঙ্কর রাম ভগবান—তোমার পায়ে হাজার বার পরণাম। মানুষ কি নিজের মন বুঝতে পারে? বার বার তার ভুল হয়। অবতার যে রামচন্দ্র, তিনি বুঝতে পারেন নাই—নরসিং তো ছার মতিভ্রষ্ট মোটর-ড্রাইভার; সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গেল—রামজী কাঁদলেন, সে কান্নায় পশু কাঁদল, গাছের পাতা ঝরে গেল, বনের বানর কাঁদল, তাঁর সাথী হল, দরিয়ার তুফানের উপর পাথর ভেসে রইল, রামচন্দরজী লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে মেরে সীতাকে উদ্ধার করলেন। ব্যস্, তাঁর ভুল হয়ে গেল। ইজ্জৎ বড়, না সীতা বড়—এই নিয়ে সওয়াল-জবাব করতে গিয়ে চুক হয়ে গেল তাঁর! বললেন—আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে সীতাকে। সীতা আগুনে ঝাঁপ দিলেন। ব্যস্, তখন রামজী বুঝলেন—কার দাম বড়। ধুলার উপর লুটিয়ে পড়লেন—কাঁদলেন। সে কান্নায় আগুন নিভে গেল—বেরিয়ে এলেন সীতামাই। অযোধ্যায় এলেন। রামচন্দর রাজা হলেন, আবার

প্রজার কথায় ভুল করলেন। ভুল করলেন। এই ভুল করেই তো চলছে দুনিয়ার মানুষ। মন একবার বুঝেও আবার ভুল করে বসে। মহারাজা রামচন্দ্র অযোধ্যাপতি! তাঁর যে ইজ্জৎ, কি তাঁর যে রাজ্য সে তাঁর উপযুক্ত, তার মোহে তিনি ভুল করেছেন। নরসিংয়ের পক্ষে এই সার্বিসই তার রাজ্য। আজ যদি শ্যামনগর-পাঁচমতির মনোপলি-সার্বিসের অংশীদারীর পাট তার থাকত —তবে সেও নিশ্চয় এমনই ভুল করত। ওই মোহ ছুটে যাওয়াতেই যে ফট্‌কির দাম কত তার কাছে—এক লহমায় বুঝতে পারলে। চোখের সেই দৃষ্টি আর জল এই দুই দিয়ে ফট্‌কিও তার দাম তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। ওই দুটি না দেখলে নরসিং কিছুতে বুঝতে পারত না। কিন্তু এ বড় আশ্চর্য। ঝুটো-কাচ ফট্‌কি এমন করে সাচ্চা পাথর হয়ে উঠল কি করে? কিসের যাদুতে? যার যাদুতেই হোক—হয়েছে—সে নিয়ে সে ভাববে না। দিন-দুনিয়ার মালিক, যাঁর যাদুতে দুনিয়ার দিন-রাত্রির খেলা চলছে; যাঁর যাদুতে পাখিতে গান গায়, ফুলে সুবাস বিলায়, যাঁর যাদুতে ছোট খুকী বড় হয়ে হয় বহুড়ী, বুকে তার জমে মউফুলের মধু, বহুড়ী হয় মা, বুকের মৌ-ফুলের মধু হয়ে যায় ক্ষীর— এ হল সেই দিন-দুনিয়ার মালিকের যাদু। সেই মালিকের কাছে নরসিং বার বার আর্জি জানালে—সকল যাদুর সেরা যাদুওয়ালা, সকল হাকিমের শেষ হাকিম, ফট্‌কির উপর এই যেন তোমার শেষ যাদু হয়, এই যেন তোমার শেষ হুকমত—শেষ রায় হয়।

—একটু আস্তে চল। ফট্‌কি হাঁপাচ্ছে, সে আর চলতে পারছে না।

—আস্তে?

—হ্যাঁ।

নরসিং বসে পড়ল মাটিতে। বললে—আমার গলা জড়িয়ে ধরে পিঠে চেপে নে।

—না।

—না নয়। এখুনি জলদি গিয়ে আমাকে গাড়িখানা বার করে নিতে হবে সাহু বেটার ওখান থেকে। বেটা যদি এসে গাড়িটা আমার আটকে দেয় তো মুস্কিল হবে। চেপে নে।

ফট্‌কি আর আপত্তি করলে না। অন্ধকার গলিপথে ফট্‌কিকে পিঠে নিয়ে নরসিং চলতে লাগল। হঠাৎ তার একটা কথা মনে হল। মনে হল যাদুর মন্তরটা সে জানতে পেরেছে। ঠিক তাই। সে ডাকলে—ফট্‌কি!

—কি ?

—একটা কথা শুধাব, ঠিক জবাব দিবি ?

—বল।

—ঠিক জবাব দিবি ?

—তোমার গা ছুঁয়ে কি মিছে কথা বলতে পারি আমি ?

—তোর বাচ্ছা, মানে, ছেলে হবে—নয় ?

ফট্‌কি বলে উঠল—ধ্যেৎ।

—আমি বুঝেছি রে আমি বুঝেছি।

ফট্‌কি বললে—না—না—না। তোমাকে ছুঁয়ে মিছে আমি বলব না।

—তবে ?

—কি তবে ?

—সেই ফট্‌কি তুই এমনি হলি কেন ? উকিলবাবুর বাড়িতে তো খুব সুখে থাকতিস। বুড়োর পরিবার নাই, বড়লোক, তুই তো ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ওঠাতে বসাতে পারতিস !

ফট্‌কি জবাব দিল না।

—আমার সঙ্গে এলি কেন ?

—জানি না।

—জানিস না ?

—না। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।

—নরসিং হয়ত হাসতো এ কথায়, কিন্তু হাসতে পারলে না, তার ঘাড়ে ফোঁটা ফোঁটা গরম কিছু পড়ছে। সে চমকে উঠল। ফট্‌কি কাঁদছে ! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরসিং বললে—কাঁদিস না ফট্‌কি। নে, এখন নাম্‌। এসে গিয়েছি। তুই এই গাছতলায় দাঁড়া। আমি গাড়িটা বার করে আনি।

—এখুনি পাঁচমতি যাবে ?

—না। আমার এক দোস্ত আছে এখানে—তার বাড়ি যাব।

জোসেফের বাড়িতে উঠল নরসিং ! বাড়ির কাছে এসে নরসিংয়ের একটু দ্বিধা হল ; ভয়ও হল। নীলিমা ? সে কিভাবে গ্রহণ করবে তাদের ? হয়তো ঘেন্নায় মাটির উপর থুথু ফেলবে। বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চোখা-চোখা কথা বলবে। হয়তো বলবে—এই ধারার জঘন্য কারবারের মধ্যে তারা নিজেদের

জড়াতে পারবে না। জোসেফকে সে ভয় করে না, সেই তার ভরসা, সেও মোটর-ড্রাইভারি করে। একসঙ্গে তারা মদ খায়।

আশ্চর্যের কথা কিন্তু, নীলিমা ঠিক উল্টো ব্যবহার করলে—নরসিংয়ের সঙ্গে ফট্‌কিকে দেখে প্রশ্ন করলে—এটি কে নরসিংবাবু?

নরসিং এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললে—ওটি? ওকে আমি ভালবাসি মিস দাস। মানে ওকে আমি বিয়ে করব। নীলিমার কাছে বিয়ে করব কথাটা বলে ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ পবিত্র না করে পারলে না।—মানে, বিধবা বিয়ে।

—বলেন কি? দেখি—দেখি কেমন বউ হবে? নীলিমা বাঁ হাতে ফট্‌কির ঘোমটা সরিয়ে ডান হাতে হ্যারিকেনটা তুলে ধরলে। ফট্‌কিকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল, বললে—বাঃ বাঃ, এ যে ভারী সুন্দর বউ হয়েছে নরসিংবাবু! আমাদের খাওয়াচ্ছেন কবে?

—খাওয়াব। তার আগে যে বিপদে পড়েছি তা থেকে উদ্ধার করুন। জোসেফ কই?

—সে আজ খুব নেশা করেছে, বিছানায় পড়ে হাত পা ছুঁড়ছে, বিড়বিড় করে বকছে। কিন্তু বিপদটা কি?

চিন্তিত হয়ে নরসিং বললে—তাই তো!

—তাই তো বলে চিন্তা কেন? আমাকে বলুন না? আমি কিছু করতে পারি কি না ভেবে দেখি।

—শুনবেন? কিন্তু—

—কিন্তুটা কিসের?

একটু ভেবে নিয়ে নরসিং বললে—শুনুন। কিন্তু আর কিসের? ঠিক কথা। সে পকেট থেকে শিশিটা বার করে অবশিষ্ট মদটুকু নিঃশেষে খেয়ে বললে—আপনার দাদা মোটরের কাজ করে। খানিকটা তো বুঝতে পারেন আমাদের ধাত। মেয়েটিকে এনেছিল—কিনে এনেছিল ওর বাপের কাছ থেকে শুখন সাহু। আমিই গাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম শুখনকে আর ওকে শ্যামনগর। তারপর—

হেসে নীলিমা বললে—ভালবাসা হল দুজনে।

—হ্যাঁ। আজ হঠাৎ বুড়া উকিলবার কাছে শুখন সাহু ওকে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। আমি ছিনিয়ে নিয়ে চলে এসেছি।

—বেশ করেছেন।

—ওরা যদি পুলিসে খবর দিয়ে জবরদস্তি করে মামলা করে ?

—মেয়েটি তো বলবে, ও আপনার সঙ্গে ইচ্ছে করে এসেছে ? কি ভাই—কি বলছ ?

ফট্‌কি সলজ্জভাবে হেসে মুখ নামালে।

নরসিং বললে—ওকে তো ওর বাপ বিক্রি করেছে।

হেসে নীলিমা বললে—এ যুগে মানুষ কেনা-বেচা হয় না। তবে অন্য রকম মিছে মামলা করে হয়রান করতে পারে। বেইজ্জৎ করতে পারে কোর্টে।

—বেইজ্জতি ?—হেসে উঠল নরসিং।

একটু চুপ করে থেকে নীলিমা বললে—আসুন আমার সঙ্গে। সাবধান হওয়া ভাল।

—কোথায় ?

—রেভারেণ্ড ব্যানার্জিদের বাড়ি। ওঁদের বাড়ির ছোট ছেলের কাছে। তাঁর পরামর্শ নিয়ে যদি পুলিসে কি এস-ডি-ওর কাছে খবর দিয়ে রাখতে হয় তো দিয়ে রাখতে হবে।

বেশি দূর নয়, কিন্তু খুব কাছেও নয়। ক্রীশ্চানপাড়ার দীঘিটার উত্তরপাড় আর দক্ষিণপাড়। মধ্যে পূর্বপাড়ে গির্জা, মিশন, সমাধি ক্ষেত্র। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য যারা ক্রীশ্চান হয়েছিল—তারা আভিজাত্য বজায় রেখে দক্ষিণ দিকে বাড়ি করেছিল।

অন্ধকার নির্জন পথে নীলিমার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে নরসিংয়ের মন যেন কেমন অনুশোচনায় ভরে উঠল। এই কালো মেয়েটি, এই তার আকাশের ফুল! আকাশের ফুল—রাত্রের অন্ধকারে আকাশে-ফোটা ফুল ফেলে সে মাটিতে-ফোটা ফুল তুললে অবশেষে ? অথচ—অথচ তার মনে হচ্ছে, সে ইচ্ছে করলেই আকাশের তারাফুল পেতে পারত। নীলিমা নীরবে পথ চলছে। কোন কথা আর বলে না। কি ভাবছে নীলিমা ? ইচ্ছে হচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে নীলিমার মুখে হাত বুলিয়ে দেখে, আঙুলের ডগায় গরম জলের স্পর্শ পাওয়া যায় কি না! কিন্তু আত্মসংবরণ করলে সে।

রেভারেণ্ড ব্যানার্জির ছোট ছেলে লেখাপড়া জানা লোক। এককালে বসন্ত হয়ে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে ক্রীশ্চান হওয়া সত্ত্বেও ভাল

চাকরি পাওয়া সম্ভবপর হয় নি ; সারা মুখে বসন্তের দাগ, ভদ্রলোককে কুৎসিত দেখায়। কিন্তু লোকটি বড় ভাল। নীলিমা তাঁকে সব বলতেই তিনি বললেন—মেয়েটিকে মিশনে এনে রেখে দাও রাত্রে। তার পর যা হয় কাল করব। নরসিংকে বললেন—কিছু হবে না এতে। ভয় নেই, কোন ভয় নেই।

নীলিমা বললে—কাল নয়, আজই।

—অন্ধকার রাত্রি, তার উপর একটা চোখ নেই—

হেসে নীলিমা বললে—একটা তো আছে। ওতেই হবে। মিস্টার সিংয়ের গাড়িতে যান আপনি।

—হ্যাঁ। নরসিং সায় দিলে।

হেসে ব্যানার্জি বললে—আচ্ছা।

—চলুন। নীলিমা বেরিয়ে এল নরসিংয়ের সঙ্গে। বেরিয়ে এসে বললে—দাঁড়ান। আবার সে ভিতরে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে আকাশের তারার দিকে চেয়ে নরসিং দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল নীলিমার কথা! এ কি মেয়ে! এর সঙ্গে কি ফট্‌কির তুলনা হয়? এ মেয়ে নরসিংদের জীবনে শুধু স্বপ্ন। কিন্তু না, অনুশোচনা সে করবে না।

—ঠিক তো?—বলতে বলতে বেরিয়ে এল নীলিমা।

—ঠিক।—ব্যানার্জিও বেরিয়ে এসেছে।

—নরসিংবাবুকে বলি তা হলে। নীলিমা বললে।

—হ্যাঁ, বল।

—চলুন।—নীলিমা বললে নরসিংকে।

অন্ধকারে আবার দুজনে চলল। নরসিং বললে—আমাকে কি বলতে বললেন ব্যানার্জি?

—ব্যানার্জি না—আমি। আমি বলব আপনাকে।

—কি?

—আপনাদের উপকার করছি—তার বদলে আমার, মানে—আমাদের একটা উপকার করতে হবে। কাল রাত্রে আমাকে আর ব্যানার্জিকে ঘাটরোড স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে। কাউকে না জানিয়ে—দাদাকে পর্যন্ত না।

নরসিং থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

নীলিমা বললে—আমার মায়ের আপত্তি উনি কানা বলে, দেখতে কুৎসিত

বলে ; ওঁদের বাড়ির আপত্তি আমাদের ঘরের মেয়ের সঙ্গে ওঁদের কারও বিয়ে আজও হয় নি। অথচ আমরা অনেক দিন থেকেই পরস্পরকে ভালবাসি। উনি আমাকে ম্যাট্রিকের সময় পড়া বলে দিতেন, সেই সময়—। হাসতে লাগল নীলিমা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ পর সে আবার বললে—এবার আমাদের বিয়ে করতেই হবে, নরসিংবাবু।

নরসিং প্রশ্ন করলে—কোথায় যাবেন ?

—কলকাতা। এখানে অনেক হাঙ্গামা হবে। দু-পক্ষের ঝগড়া-ঝাঁটি। কলকাতাই সব চেয়ে ভাল জায়গা। কিছুক্ষণ পর আবার সে প্রশ্ন করলে—ও রাস্তায় তো সাহুরা মনোপলি সার্বিস করছে। আপনি কোথায় যাবেন ?

নরসিং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—দেখি। এখন তো এখানেই থাকতে হবে। পাঁচমতির রাস্তায় কাঁকর পাথর ফেলেছে, নোটিস দিয়ে রাস্তা বন্ধ ; গাড়ি নিয়ে ওদিকে বেরুবার পথ নেই। এদিকে ঘাটরোডে গঙ্গা। পথ ঘাট শুকুক। আমিও ভেবে দেখি—কোথায় যাবো। যাব কোথাও ! এত বড় দুনিয়া ! একটা পথ ধরব।

নীলিমার কানে নরসিংয়ের উদাস ভাবটুকু এড়িয়ে গেল না ; নরসিংয়ের দুঃখের স্পর্শ তাকেও ব্যথিত করে তুললে। সত্যই তো দুঃখের কথা। নরসিংহ ভাঙা-চোরা পথে প্রথম সার্বিস খুলে দিলে। আজ সেই পথ মেরামত করে আর একজনকে মনোপলি সার্বিস দেওয়া হলে তার দুঃখ হওয়ারই কথা। সে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—আপনি খুব দুঃখ পেয়েছেন, না ? দুঃখ পাবারই কথা।

নরসিং কথার জবাব দিলে না। তার মাথার মধ্যে জটিল চিন্তা পাক খাচ্ছিল। দুঃখ—দারুণ দুঃখ তার মনে রয়েছে। সেটা কিসের জন্যে সে তা বুঝতে পারছে না। পকেট থেকে বার করলে মদের শিশিটা। কিন্তু শিশিটা খালি। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে মদের শিশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

নীলিমা হাসলে, বললে—ফুরিয়ে গিয়েছে ?

উত্তর দিলে না নরসিং। গাড়ি বার করতে ব্যস্ত হল।

নীলিমা বললে—ভালই হয়েছে। বেশি না খাওয়াই ভাল। একটা কাজে আছেন।

নরসিংয়ের আফসোস হল। আর এক শিশি হলে সে পারত। এই

মুহূর্তে গাড়ির মধ্যে নীলিমাকে টেনে তুলে নিয়ে ছেড়ে দিতে পারত গাড়িটা। কিংবা ব্যানার্জিকে গাড়িতে চাপিয়ে একটা গাছে কি লাইটপোস্টে ধাক্কা মারতে পারত।

হঠাৎ সে সজাগ হয়ে উঠল। ফুটব্রেক কষে স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে সে সামলে নিলে। দীঘির ধারে এসে পড়েছিল গাড়িটা। আরে বাপ! ছুটে গেল তার নেশা।

নীলিমা হেসে বললে—যাক্, সামলে নিয়েছেন। সাবধান, খুব সাবধানে চালাবেন কিন্তু। গুডলাক্!

এবার নরসিংও মৃদু হেসে বললে—গুডলাক্। আপনাকে গুড লাক্ জানাচ্ছি।

উনিশ

সেই বাদশাহী সড়ক। উঁচু-নীচু, গর্ত-গচকা, ধুলো-কাদা ভরা কত শ বছরের পথ; দু-পাশে গাছের সারির তলায় আগাছার জঙ্গল, কুলকাঁটার ঝোপ ভর্তি করে রেখেছিল। মধ্যে মধ্যে ঝোপের ভিতর থেকে সাপের হিস্-হিস্ শব্দ শোনা যেত, সাপে-ধরা ব্যাঙের কাতরানির আওয়াজ উঠত। রাত্রে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতরে শেয়াল-নেকড়ের চোখ জ্বলতে দেখা যেত—জ্বলন্ত আঙরার টুকরোর মত। মধ্যে মধ্যে পাথরের মাথা উঠে থাকত, সে পাথরে যে কত কালের কত লোকের জখম নখের রক্ত লেগেছে তার হিসেব নাই। কাঁদাভর্তি খন্দকে কত লোকের জুতো বসে থেকে গিয়েছে—তারই বা কে হিসেব রাখে? আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছে এমন লোকের কত কিছু হারিয়েছে, মেয়েদের কানের টাপ, হাতের বাজুর ঘন্টি, গলার মাদুলীও—কি না খসে পড়েছে সেই ধুলো-কাদায় জরাজীর্ণ সড়কের বুকে?

সে বাদশাহী সড়ককে আজ আর চেনা যাচ্ছে না। নতুন চেহারা হয়ে গিয়েছে তার। ঢিলে-চামড়া গাল-তোবড়ানো কুৎসিত বুড়ো ইঞ্জিনিয়ার হাকিমের তাজা দাওয়াইয়ে আঁটসাট-গড়ন চকচকে-চামড়া কাঁচা-জোয়ান হয়ে উঠেছে। তিরিশ ফুট চওড়া রাস্তার দু-পাশে ফুটপাতের মত ছ-ফুট করে বারো ফুট বয়লারের ছাইঢাকা কাঁচা—মাঝখানে ষোল ফুট পাকা; লাল

মোরামের আস্তরণ বিছানো সমতল ঝক্‌ঝকে-তকতকে চোখ জুড়ানো ষোল ফুট চওড়া লাল ফিতের মত পথ। দু-পাশের ছাই-বিছানো ধূসর রঙের মাঝখানে টকটকে লাল—ভারী বাহার দিয়েছে। ধূসর রঙের দু-পাশের কাঁচা অংশের কিনারায় দূর্বাঘাসের চাপড়াবন্দী চলে গিয়েছে সিধে লাইন ধরে। আগাছা কুলঝোপ বিলকুল সাফ হয়ে গিয়েছে। চোখে যেমন বাহার দিচ্ছে—চলেও মানুষ তেমনি আরাম পাবে। কুলকাঁটা শুকিয়ে ঝরে পায়ে ফুটবে না, মাথা-তুলে-থাকা পাথরে হোঁচট লেগে নখ যাবে না। কাদায় পিছলে পড়ে মানুষ আছাড় খাবে না। শুধু কষ্ট হবে গরুর, ধুলো-কাদার মধ্যেই ওদের চলতে আরাম, ছেলেবেলায় পড়েছে নরসিং—'গরুর ক্ষুর চেরা বলিয়া—।' আর কষ্ট হবে কিছু খালি-পায়ে যে সব মানুষ হাঁটে তাদের . খুব বেশি হবে না—আজন্ম খালি-পায়ে হেঁটে ওদের পায়ের তলার চামড়া এমন শক্ত যে শুকিয়ে নিয়ে ঢাল তৈরি করা যায়। আর কষ্ট হবে সেই বেটা হাঁটুভাঙা খোঁড়ার—যে লোকটা হামাগুড়ি দিয়ে শ্যামনগর থেকে পাঁচমতি পর্যন্ত ভিক্ষা করে বেড়ায়। তা সেও ঠিক ফিকির বার করে নেবে কয়েকদিনের মধ্যে, হাঁটুতে চটের প্যাড লাগিয়ে নেবে, হাতে ফিতে-বাঁধা খড়মের মত দুটো চাকতি লাগিয়ে খট্‌খট্‌ থপ্‌থপ্‌ করে চলবে। না চলতে পারে, বাস্‌ সার্বিস হল—বাসে ভাড়া দিয়ে যাবে আসবে। গাড়ির জন্যেই পথ সড়ক, পায়ে যারা হাঁটবে তাদের জন্যে শহরে গাঁয়ে গলি—মাঠে প্রান্তরে 'গোন' আছে, সেই পথে তারা চলুক। 'গোন' হল—মাঠ, পতিত জমি, বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলা ফালি পথ; গহনের মধ্যে দিয়ে সেই হল 'গোন'। ইমাম-বাজারের বড়বাবু বি-এ পাস, তিনি বলতেন কথাটা। বিশ্বাস না কর জিজ্ঞাসা কর এখানকার তেমুণ্ডে বুড়োদের—বাদশাহী সড়কের কথা। কত কাল—কত শ বছর আগে কোন্ নবাব কি বাদশা তৈরি করিয়েছিলেন এই সড়ক তা তারা জানে না—কিন্তু তৈরি করিয়েছিলেন সে তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে। তৈরি করিয়েছিলেন তাঁর ফৌজ যাবে বলে। পয়দল পল্টন যেত নাল-মারা জুতোর আওয়াজ তুলে—কুচকাওয়াজের কায়দায় একসঙ্গে পা ফেলে—হাত দুলিয়ে, তলোয়ার বাগিয়ে, বন্দুক উঁচিয়ে। ঘোড়সওয়ার যেত চার ক্ষুরে ধুলো তুলে, আওয়াজ তুলে। হাতি যেত হাওদা পিঠে—আরও হাতি যেত তোপ টেনে নিয়ে, উট যেত সওয়ার নিয়ে, গড়ি টেনে—উটের গাড়িতে যেত সরঞ্জাম, বয়েল চলত পিঠে ছালা নিয়ে, বয়েল গাড়ি যেত, তাতে যেত বিবি-বাঁদি,

আর যেত রসদ। বুড়োরা বলে—"গল্প নয় বাবা! জমিদার-বাড়ির পুরনো কাগজে প্রমাণ আছে, দেখে এস; ঘোড়ায় হাতিতে উটে ধানের ক্ষেত মাড়িয়ে যাবে না—খেয়ে তছনছ করে দেবে না—এর জন্য মাথট লাগত—নজর সাওয়ারী মাথট!"

বাদশাহী ফৌজ চলে যত—তার পর জমিদার আমীরের হাতি ঘোড়া পালকী বয়েল গাড়ি, পাইক বরকন্দাজ লোক-লস্কর। তার পর সড়কে চলত ব্যাপারীদের কারবার, ছালার বয়েল, ছালার ঘোড়া, মালের গাড়ি। তার পর চলত গৃহস্থ চাষীরা—ক্ষেত-খামারে ধান-চাল কলাই তিসির বস্তা বোঝাই নিয়ে ভারী মজুর চলত ভার কাঁধে—তার পর চলত রাহী।

এবার ইংরেজের আমলে সেই কাঁচা সড়ক হল পাকা। বিলাত না আমেরিকার পেট্রোল-কোম্পানী মোটর-কোম্পানী দিলে টাকা। সেই টাকায় মেটে রাস্তার উপর বিছানো হল ইঁটের খোয়া, তার উপর দেওয়া হল পোড়া কয়লার ছাই আর কুঁচি পাথর, চালানো হল রোলার—সমান হয়ে বসে গেল পাকা ইমারতের মেঝের মতন—তার উপর দেওয়া হল লাল মোরাম, ফের চালানো হল রোলার; দু-পাশের ঝোপ আগাছার জঙ্গল কাটা হল; সাপ মরল, বিছে মরল, গোসাপ মরল; উই-পোকা পিঁপড়ে মরল—সে চোখে দেখা গেল না—মাটির তলায় চাপা থাকল। তার উপর ঢালা হল কয়লারের ছাই। চালানো হল রোলার! দু-দিকে ধারি কাটা হল দড়ি ধরে, ঘাসের চাপড়া বন্দী করে ঘাসের শিকড়ের জালের বাঁধন দেওয়া হল মাটিতে। পাকা হয়ে গেল রাস্তা। মাঝখানে পুরা পাকা, দুটো ধার আধ-পাকা। মাঝখানে চলবে মোটর-বাস ট্যাক্সি ট্রাক; সেই আমেরিকা থেকে আসবে মোটর পেট্রোল মোবিল টায়ার টিউব, এখানে পাকা রাস্তায় চলবে ফুল স্পীডে। দু-পাশের আধ-পাকা রাস্তার ফালিতে চলবে গরুর গাড়ি, ছালার গরু, রাহী মানুষ। নরসিং বলে—বাদশাহী সড়ক, আংরেজী ইস্টিরিট বনে গেল। কখনও বলে—রোড। রোড। রোড কি ইস্টিরিট কোন্‌টা ঠিক সে জানে না। 'ইস্টিরিট' শব্দটা তার বেশি ভাল লাগে বলে ওইটাই ব্যবহার করে বেশি।

এই রাস্তায় মনোপলি সার্বিস নিয়েছে—'সাহু এ্যাণ্ড বোস ট্রান্‌স্‌পোর্টস'। শুখনরাম সাহু আর সেই বুড়ো বোসবাবু উকিলের বেকার ছেলে। ঝক্‌ঝকে সবুজ রঙের দুখানা 'এক টনি' বাস এসেছে—একখানার নাম "জয় গণেশ",

অন্যখানার নাম "উল্কা", পাশে ইংরাজীতে লেখা Express (এক্সপ্রেস)। একখানা আপ—একখানা ডাউন গাড়ি। আরও এসেছে একখানা ট্যাক্সি, একখানা ট্রাক। পাঁচতির বাবুদের তিন বাড়ির তিনখানা মজবুত সস্তা ফোর্ড গাড়ির অর্ডার গিয়েছে।

রাস্তা আজই খুলেছে। কালেক্টর সাব এসে রুপোর কাঁচি দিয়ে কেটে দিলে লাল ফিতের মাঝখানটা। ব্যস্—বেরিয়ে গেল সার্বিসের দুখানা বাস। তার পর হল চা খাওয়া।

সেই দিন থেকে চার মাস পর। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ও কার্তিক পার হয়ে গিয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম। আজ রাস্তা খুললে, সাহু কোম্পানীর সার্বিস আরম্ভ হল। নরসিংও আজই চলল শ্যামনগর থেকে। আর একটা দিন সে এখানে থাকতে পারবে না। ভাঙাচোরা ধুলোয়-কাদায় গর্ত-গচকায় কাঁটায়-পাথরে ভর্তি রাস্তায় নিজের সর্বস্ব ওই গাড়ি তার সঙ্গে নিজের প্রাণকে বিপন্ন করে সেই প্রথম খুলেছিল সার্বিস, আজ এই নতুন রাস্তায় সেই লাইন থেকে উৎখাত হল—আর শ্যামনগরে সে থাকতে পারবে না। সেও চলেছে আর এক দিক লক্ষ্য করে। চার মাস বসে আছে—এখান থেকে বেরুবার রাস্তা ছিল না। তা ছাড়া হাঙ্গামায় পড়েও আটক হয়ে গিয়েছে।

সাহু মামলা করেছিল—ফটিকির জন্যে। নিজে নয়, সে আর উকিলবাবু আড়ালে থেকে ফটিকির দেওর আর বাবাকে দিয়ে মামলা করিয়েছিল। বহুত তোড়জোড়, নানান আঁকাবাঁকা ফন্দি-ফিকিরের সে জাল। সাজা হলে নরসিংকে চালান দিত দায়রায়, সেখানে কালাপানি বেত দুই-ই হতে পারত। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিল—"মোটর-ড্রাইভারের কুকীর্তি! নারীহরণ!"

সাহুর টাকায় এখানকার এক বাঘা উকিল—বুড়ো উকিলবাবুর পরামর্শ নিয়ে সওয়াল করেছিল—"এই যে আসামী, এর প্রকৃতির দুটি কথা আমি সর্বাগ্রে বলতে চাই। এ হল গিরবরজার ছত্রীর ছেলে। এই বংশটির মধ্যে নারীঘটিত কুকীর্তি একটা কুখ্যাতি লাভ করেছে। এর জন্যে এরা ধ্বংস হয়ে গেল। আর এ হল পেশায় মোটর ড্রাইভার। মোটর-ড্রাইভারদের পক্ষে একটা অতি সাধারণ কর্ম।"

নরসিং আদালতেই বলে উঠেছিল—হাঁ হাঁ, মোটর-ড্রাইভার লোক ডাকাত, মোটরে ডাকাতি হয়, মোটর-ড্রাইভার লোক মাতাল, মোটর-ড্রাইভার লোক

আওরত নিয়ে ভাগে। মোটর-ড্রাইভারের চেয়ে খারাপ লোক দুনিয়ায় নাই।

হাকিমের ধমক খেয়ে চুপ করেছিল নরসিং। দায়রায় চালান যাবার জন্য মনকে তৈরি করছিল। কিন্তু হাকিম দিলে বেকসুর খালাস।

এ খালাসের জন্য নরসিং তার নসিবের প্রশংসা করে না। তার নিজের উকিলের ওকালতি বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করারও কিছু নাই। বাঁচিয়েছে তাকে ফট্‌কি।

দিনের বেলায় ফট্‌কি ছিল বোবা মেয়ে—মাটির পুতুল। আদালতের কাঠগড়ায় হাকিম উকিল পেস্কার আর ঘর-ভরা লোকের সামনে কোন মন্তরে কোন দেবতার আশীর্বাদে দিনের বেলার সেই মাটির ফট্‌কি মানুষ হয়ে কথা বলে উঠল। বাঁধ দিয়ে আটক করা থির জল বাঁধ ভেঙে ঝর ঝর আওয়াজ তুলে বেরুতে আরম্ভ করলে—তাকে যেমন আর আটকে দেওয়া যায় না তেমনি ভাবে তার যে মুখ আদালতে দিনের বেলায় খুলল—সে আর বন্ধ হল না।

ফট্‌কি এসে কাঠগড়ায় উঠল; মাথার ঘোমটা কমিয়ে লোক-ভরা আদালত-কামরার চারিদিকে চাইলে প্রথমটা ফ্যালফ্যাল করে। তার পর তার চোখ পড়ল নরসিংয়ের উপর। তার মুখে একটু হাসি দেখা দিলে, চোখের হতবুদ্ধির ঘোর কেটে গিয়ে যেন দেওয়ালগিরির জোড়া সেজের মধ্যে দপ্ করে মোমবাতির আলো জলে উঠল। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে সে কাঠগড়ার কাঠের ফ্রেম। গাল দুটি লাল হয়ে উঠল। সাহুর উকিল তাকে জিজ্ঞাসা করলে—নরসিং তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছে কিনা, উকিলবাবুর বাড়িতে ঝি থাকতে যাবার পথে?

সে ঘাড় নাড়লে। সে ঘাড় নাড়ার দোলায় তার মাথায় ঘোমটা খসে পড়ে গেল। নরসিংয়ের মুখের দিকেই সে চেয়েছিল---ঘোমটা তুলতে বোধ হয় ভুলে গেল।

উকিল ধমক দিয়ে বললে—আমার দিকে চাও।

ফট্‌কি কিন্তু চোখ ফেরালে না।

উকিল বললে—কথার জবাব দাও। নরসিং তোমার হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কি না?

ফট্‌কি নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়েই হাসিমুখে বললে—ওকে আমি ভালবাসি। আমি ইচ্ছা করে ওর সঙ্গে এসেছি। ওর সঙ্গেই যাব।

—তোমার বাপ—দেওর?

—না—না—। উকিলকে কথা শেষ করতেই দিলে না ফট্‌কি। অসহিষ্ণু হয়ে কথার মাঝখানেই বলে উঠল—না—না। কথা বলার সঙ্গে সে প্রবলভাবে ঘাড় নাড়তে আরম্ভ করলে—না। না। না। না।

একদিন নয়, পুরো আড়াই দিন ফট্‌কির এজাহার নিয়ে লড়াই হয়েছিল। আড়াই দিনই নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে ফট্‌কি এজাহার দিয়েছে। সে তার কি কথা! একঘর লোক গিস্‌গিস্ করছে। পচা নর্দমার গন্ধে জমায়েত নীলচে রঙের ভন্‌ভনে মাছির মত একঘর লোক। মধ্যে মধ্যে উকিলের বিশ্রী প্রশ্ন এবং ফট্‌কির বেপরোয়া জবাবগুলি শুনে মাছির ভন্‌ভনে আওয়াজের মত কুৎসিত কথা ও কদর্য হাসিতে তারা মেতে উঠেছে। চোখের চাউনি তাদের ওই মাছিগুলোর মতই ড্যাবডেবে, সে চাউনি স্থির হয়ে নিবদ্ধ ফট্‌কির মুখের উপর। ফট্‌কির গ্রাহ্য নাই। সে হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে নরসিংয়ের দিকে।

উকিল ফট্‌কিকে জিজ্ঞাসা করলে তার আগেকার কথা। বললে—তোমাদের গাঁয়ের অমুক মোড়লের ছেলে অমুককে চিনতে?

নরসিং বারণ করে উঠল কাঠগড়া থেকে—না। আমার সাজা হোক—ওসব কথা ওকে শুধাবেন না।

ফট্‌কি কী বুঝলে সেই জানে। সে বললে—না। আমি বলছি। আমার আবার লজ্জা কি? মান কি? ওই আমার সব। আমি সত্য কথা বলব। আমি যত বড় মানুষ তার একশ গুণ বেশী পাপ আমার। সেই পাপের জ্বালা জুড়িয়েছে—ওই মানুষের সঙ্গ পেয়ে।

সে এবার চাইলে হাকিমের দিকে। বলতে আরম্ভ করলে—গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বলে গেল তার কদর্য কলঙ্কভরা জীবনের কথা। শেষে বললে—এবার সে চাইলে মাটির দিকে—মাটির দিকে চেয়ে খসে-পড়া ঘোমটা মাথায় তুলে দিয়ে বললে—হুজুর, ও মানুষ আমাকে ডাকে নাই, নিজে দোতলার বারান্দা থেকে কাপড় বেঁধে তাই বেয়ে নেমে ওর কাছে গিয়েছি, ওর বুকে গড়িয়ে পড়েছি, ও মানুষ আমার মাথায় হাত বুলিয়েছে, কিন্তু—

কিছুক্ষণ থেমে বললে—এমনি মাসের পর মাস। দু-মাস। আমি হুজুর ওই মানুষের চরণতলায় পড়ে থাকতে চাই; বাপ চাই না; দেওর চাই না; শেঠজীর ঘরের—উকিলবাবুর ঘরের সুখ চাই না; আমি ওকেই চাই। ওর কোন দোষ নাই—ওকে খালাস দেন। আমি ওর সঙ্গেই যাব। ও যদি না

নেয় নদীতে জল আছে, দোকানে দড়ি মেলে, কল্কেফুলের গাছে ফলের অভাব নাই—আমি মরব।

নরসিং অবাক হয়ে ভাবছিল—এ কি হল? এ কেমন করে হল? কিসের গুণে এমন হয়? পেটের জ্বালায় যে দুনিয়ায় মা ছেলে বিক্রি করে, ভাল খাবার-পরবার লোভে যে দুনিয়ায় সধবা কুমারীতে ইজ্জত বিক্রি করে—সেই দুনিয়ায় এও ঘটে?

এর পর ডাক্তারসাহেব ফট্‌কির বয়স পরীক্ষা করে দেখলেন, বললেন—বয়স বিশ বছরেরও বেশী। সে সাবালিকা।

হাকিম খালাস দিলেন নরসিংকে। ফট্‌কির উপরেও রায় হল—সে আপন ইচ্ছামত যে কারুর সঙ্গে যেতে পারে।

নরসিং কোর্টের বারান্দায় বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে ফট্‌কি এসে সেই জনতার মধ্যেই তার বুকে মাথা রেখে কাঁধে একটি হাত দিয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। নরসিংও তাতে লজ্জা পায় নাই। গিরবরজার ছত্রীর ছেলে সে, পেশায় সে মোটর-ড্রাইভার, তার আর এতে লজ্জা কি? কিসের লজ্জা? সে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে ফট্‌কির সেই চোখের গরম লোনা জলে নরসিংয়ের মনে আগেকার দেখা যত মেয়ের মুখের ছাপ পড়েছিল, সে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

জান্‌কীর মুখও মনে নাই তার। নীলিমাকেও আর মনে পড়ে না। ফট্‌কি শুধুই ফট্‌কি।

নরসিং গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

ভিতরে ফট্‌কি বসেছে নরসিংয়ের সংসার নিয়ে। জিনিসপত্রগুলো সামলে নিয়ে সে গিন্নীর মত বসেছে। সে লালপেড়ে শাড়ি পরেছে, কপালে কুম্‌কুমের টিপ পরেছে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে। এ যেন সে আগেকার কালের মেয়েই নয়। হাতে পরেছে চুড়ি—গিল্‌টি চুড়ি। বাঁ-হাতে ধরে রয়েছে এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি, ওটাতে আছে খাবার; যদি কোনরকমে উল্টে যায়—সেই ভয়ে ধরে রয়েছে। ডান হাতে ধরে আছে সরা-চাপা জলের কুঁজো; কোলের উপর একটা ছোট সাজি, তার মধ্যে আছে টুকিটাকি জিনিস আর নরসিংয়ের বোতল গেলাস। তিনটে বোতল আছে। কখন যে দরকার হবে তার তো কোন ঠিকানা নাই। যে মানুষ! এ ছাড়া কাপড়ের গাঁঠরি, রান্নার জিনিসপত্র, মায় একটা মোড়া। গরম পুল-ওভার পর্যন্ত বার করে রেখেছে। অগ্রহায়ণ মাস,

বেলা পড়লেই চলন্ত মোটরে শীত লাগবে। এ যেন সে মেয়েই নয়; মরে গিয়ে নতুন করে জন্মেছে ফট্‌কি। ফট্‌কির পাশে বসেছে রামা। রামা ফিরে এসেছে অনেকদিন।

ফট্‌কি রামাকে বলে, দাদাভাই।

রামচন্দ্রের ভারি আমোদ লাগে, এ কি হাসির কথা! দাদা আবার ভাই কি করে হয়? সে হি-হি করে হেসেই সারা হয়, তার সে অভ্যাসের হাসি, বলে—তোমার যখন খোকা হবে তখন তাকে কি বলবে, বাবা-ছেলে?

যে-ফট্‌কি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে লজ্জা পায় নাই, সেই ফট্‌কি ছেলের কথায় লজ্জা পায়, তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, রামাকে লজ্জা দিয়ে জবাব দেবার মত ভাষা খুঁজে পায় না। আবোল-তাবোলের মত জবাব দেয়—তোমার বউ হলে তাকে বলব, বিবি-বউ।

তাতে রামের আপত্তি কি? বিবি-বউ তো সে চায়। সেও মোটর-ড্রাইভারি করবে, এখন করে কণ্ডাক্টরি—এখনই তো সে মোটরের প্রতি ট্রিপে সুন্দর মুখ দেখে মনে মনে আকাশে ফুল ফোটাতে শুরু করে দিয়েছে।

"পাশের জঙ্গল থেকে হুম করে লাফিয়ে গাড়ির সামনে থাবা গেড়ে বসে একটা বাঘ। মেয়েটির সঙ্গীরা ঠক্ ঠক্ কাঁপে। মেয়েটির মুখ সাদা হয়ে যায়। তাকে 'ভয় কি' বলে আশ্বাস দিয়ে পেট্রোলের টিন ঢেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে টায়ার রিমুভারের মাথায় জড়িয়ে জেলে নির্ভয়ে নেমে যায় রাম। আগুন দেখে পালায় বাঘ। ছোরা থাকলে—সে লড়াই করে। বাঘের কলিজায় বসিয়ে দেয় ছোরা।" আরো কত উদ্ভট কল্পনা করে। "এ্যাকসিডেণ্ট হয়, উল্টে যায় গাড়ি। রাম গাড়ির নীচে থেকে সযত্নে উদ্ধার করে মেয়েটিকে।"

রামও চলেছে নরসিংয়ের সঙ্গে। নরসিং জিজ্ঞাসা করেছিল—দেখ্, ভেবে দেখ্, এখানে নতুন সার্বিস খুলছে। নিতাই চাকরি পেয়েছে, তুইও চেষ্টা করলে পাবি। এখানে থাকবি, না, আমার সঙ্গে যাবি—ভেবে দেখ্।

রাম বলেছে—দাদাবাবু, তুমিও যেখানে আমিও সেইখানে।

নরসিং সঙ্গে নিয়েছে রামাকে। রামের কথায় কিন্তু তার হাসি আসে। রাম এখনও নিতাইয়ের মত পাকা ড্রাইভার হয় নাই তো। হলে—। বাচ্চা পাখির ডানার পালক এখনও শক্ত হয় নাই, পালকের নীচে ডানার খাঁজে খাঁজে হাড়ে মাংসে তাগদের তাগিদ আসে নাই, তাগদ হলেই সাড়া জাগবে,

তাগিদ জানাবে মন! তখন পাখসাট্ মেরে নরসিংকে পাশ কাটিয়ে আকাশে উড়বার জন্য ছটফট করবে, ফাঁক পেলেই ভেসে পড়বে। যতদিন সে সময় না আসে ততদিন থাক্। কাজও অনেক দেয় রাম। তাছাড়া ড্রাইভারি শেখাবার একটা সাক্‌রেদ না পেলেও ড্রাইভারি করে মন ভরে না। ফুল স্পীডে চলতে চলতে যখন সামনে কিছু পড়ে, এ্যাকসিডেণ্ট প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে, মরিয়া হয়ে অসীম সাহসে ধাঁ করে স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে ক্লাচ টিপে সে এ্যাকসিডেণ্টকে চুলের তফাতে ফেলে বাঁচিয়ে চলে যায়, তখন তার কৌশল বুঝবারও একজন লোক চাই। প্যাসেঞ্জারে বুঝতে পারে না সব ব্যাপার। বুঝতে পারে সাকরেদ—সে তারিফ করে। রাম একটু বেশী বলে; বলে—এ বাঁচাতে পারে এমন মরদ আমি দেখি নাই। আমার বুক কাঁপছিল। বাপ রে! বাপ রে! এছাড়াও রাম জান্‌কীর ভাই। তাই রাম সম্পর্কে অন্য ইচ্ছে আছে। দেখা যাক কি হয়।

আর সঙ্গে আছে জোসেফ। জোসেফও এখানকার চাকরি ছেড়ে এখানকার সমস্ত পাট উঠিয়ে দিয়ে চলেছে। জোসেফ বসেছে নরসিংয়ের পাশে, সামনের সীটে। নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে, একটা সিগারেট নরসিংয়ের মুখে গুঁজে দিয়ে, নিজের সিগারেটের আগুনটা দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছে। গাড়ি চলেছে ফুল স্পীডে। রাস্তায় এখন গাড়ি গরুর খুব ভিড় নাই। এই অগ্রহায়ণের প্রথম। ফসল এখনও মাঠে, সবে ধানে হলুদ রঙের আমেজ ধরেছে; সমতল রাস্তা—পরিষ্কার ভরা খুব লম্বা দীঘির স্থির জলের মত আরামদার নতুন শ্যামনগর-পাঁচমতি রোড; তার উপর চলেছে নরসিংয়ের গাড়ি, জার্কিং নাই, পুরনো গাড়িতেও ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছে না। চলেছে যেন দীঘির জলে নৌকার মত। শুধু শব্দ উঠছে চারখানা নতুন টায়ারের ঘুরপাক খেয়ে চলার। বিছানো মোরামের উপর স্বল্পস্বল্প আলগা কাঁকরের উপর একটানা স-র-র শব্দ তুলে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে। পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত পেট্রোলের ধোঁয়ার একটা আঁকাবাঁকা রেশ জেগে রয়েছে। নরসিং জোসেফকে বললে—হর্ন দিন।

সামনে ঢিমে-তেতালায় এক সারি গরুর গাড়ি আসছে। আসছে ঠিক মাঝখানটা ধরে, অর্থাৎ মোটরের জন্যে পাকা সীমানা জুড়ে, পাশের ছাই-বিছানো কাঁচা পথটায় হাঁটছে না। হর্নটার রবার বাল্‌বটা ফেটে ছিঁড়ে গিয়েছে, কেনা হয়েছে নতুন বাল্‌ব, কিন্তু এখনও লাগানো হয় নাই, কাল রাত্রে

চারখানা নতুন টায়ার লাগাতেই আধখানা রাত কেটে গিয়েছে ; তখন আর ওটা মনে হয় নাই। বাল্‌বহীন হর্নটা জোসেফের হাতে রয়েছে। জোসেফ সেটাকে তুলে ফুঁ দিয়ে বাজাতে লাগল।

রাম পিছনে ফট্‌কিকে বললে—দাদাবাবুর বেতগাছটা কই? সেই সরু লিকলিকেটা ?

নরসিং সামনে দৃষ্টি রেখে গাড়ির স্পীড কমাতে কমাতে বললে—না।

রাম বললে—আসছে দেখ দেখি। মোটরের রাস্তা জুড়ে—

নরসিং বললে—রাস্তা সবারই।

জোসেফ বললে—কিন্তু বড় শয়তান বেটারা! বড় শয়তান!

নরসিং স্টীয়ারিং ঠিক করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। রাম বেত ব্যবহার করলে না, কিন্তু মুখে গাল না দিয়ে ছাড়লে না—দেখতে পাওনা বেটারা ?

সে কথায় ওরা গ্রাহ্য করলে না। একজন বললে—হ-হ, খুব ছেড়েছে লাগছে।

খুব জোরেই চলেছে নরসিং নতুন ভাল রাস্তায় জোরে চলার আনন্দেও বটে, এখান ছেড়ে নতুন সার্বিস লাইনের উদ্দেশ্যে চলার ব্যগ্রতায়ও বটে। নতুন সার্বিস লাইনের সন্ধান সে পেয়ে গিয়েছে। দিনদুনিয়ার মালেক—যে সকালে উঠে রাজা থেকে আরম্ভ করে মেথরের পর্যন্ত রুটি মাপে, বাঘের খোরাক থেকে শুরু করে পিঁপড়ের খুদের কণা, চিনির দানা মাপতে যার ভুল হয় না—সন্ধান অবশ্য তারই, তবে উপলক্ষ নীলিমা দাস—দাস নয়—নীলিমা আর কানা ব্যানার্জি। তারাই নতুন লাইনের সন্ধান দিয়ে চিঠি লিখেছে। নরসিংয়ের মনে পড়ে রেল-স্টেশনের কথা। ওরা যেদিন পালায় দু-জনে, সেদিন ব্যানার্জি পেট্রোলের দাম বলে দুটো টাকা দিতে এসেছিল, কিন্তু নরসিং বলেছিল—না।—নীলিমা ব্যানার্জি হাত থেকে টাকা দুটো কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে পুরে বলেছিল—ছি! ওঁর অপমান করো না। ভারী ভাল মেয়ে নীলিমা। নীলিমার কথা মনে হলেই নরসিং দুনিয়ার হালচালের মজার কথা ভাবে। গিরবরজার হাড়ীর মেয়ে নীলিমা, আর গিরবরজার ছত্রী বংশের সিংরায় বাড়ির ছেলে সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরসিং।

নীলিমা এবং ব্যানার্জি কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। সেখানে চাকরিও যোগাড় করে নিয়েছে। অণ্ডাল অঞ্চলে মিশনের একটা ব্রাঞ্চে চাকরি

পেয়েছে তারা। ব্যানার্জি কাজে লেগে গিয়েছে। নীলিমাও সেখানে, তবে সে মাস কয়েক পরে জয়েন করবে। খোকা হবে নীলিমার। নীলিমার হবু খোকাকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে নরসিং। ওই হবু খোকাই তাকে আর এক ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচিয়েছে। জোসেফ এবং তার মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে খুবই ঝগড়া হবার কথা। কানা-খোঁড়া-কুৎসিত ওই ব্যানার্জির ছেলেকে তারা পছন্দ করত না। ও কানা-খোঁড়ার চাকরি হবারও কথা নয়। তা ছাড়া ব্যানার্জিরাও কখনও এমন বাড়ির মেয়ে ঘরে ঢোকায় নাই, চিরকাল এই সব ছোট-কাজ করা ক্রীশ্চানদের ঘেন্নাই করে এসেছে। ঝগড়া নিশ্চয়ই হত। কিন্তু নীলিমা 'মা হতে চলেছে'—নিজের এই অবস্থা জানিয়ে যে চিঠিটা লিখে নরসিংয়ের হাতে দিয়েছিল, সেই চিঠিটা পড়ে জোসেফ একটি কথাও বলে নাই, তার মাও কিছু বলে নাই। ব্যানার্জির বাবা চটেছিল নরসিংয়ের উপর। কিন্তু তাদের কি তোয়াক্কা করে নরসিং? রাম কহো! দুনিয়ায় সে কারও তোয়াক্কাই করে না। তোয়াক্কার কথাই নয়, কথাটা হল 'দোস্তির কথা, বেরাদারির কথা'। ওই জিনিসটা হারানোর চেয়ে 'বদ্‌নসিবি' আর নাই। ফটকির মামলায় কত সাহায্য করলে জোসেফ। আর নিতাই? নিতাইয়ের সঙ্গে ছুটে গেল, ভেঙে গেল সম্বন্ধ, নিতাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে। তবে নিতাইয়ের সঙ্গে দোস্তি ভাঙার জন্যে নরসিংয়ের কোন দোষ নাই। নিতাই বেইমানি করলে। সেই নিমকহারাম, সেই বেইমান। রুটির টুকরোর জন্যে বেইমানি করলে সে। করুক। তার জন্যে প্রথম প্রথম তার অনেক রাগ হত—আর রাগ হয় না। এই দুনিয়া! তার দিদিয়া একটা ছড়া বলত—"এ পিথিমী সাত রঙ্গের পুরী, কেউ হাসছেন—কেউ কাঁদছেন—কেউ করেছেন চুরি।" দুঃখ পেয়ে সাধু জ্ঞানীতে হাসে, সংসারীতে কাঁদে, আর নেহাত যারা ছোট তারা দুঃখ ঘুচাতে চুরি, করে ডাকাতি করে, খুন করে, জাল করে। নিতাই বেটা নেহাত ছোট, ছোট কাজ করেছে। বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে সাহু-বোস কোম্পানীর সার্বিস লাইনে ড্রাইভারি চাকরি পেয়েছে। শুকো—চল্লিশ টাকা নাইনে। রামেশ্বরোয়া, তারক এরাও দু-জনে জুটেছে ওই কোম্পানীতে। ওরা সেদিন নতুন গাড়ি নিয়ে, বুক ফুলিয়ে, ক্রীশ্চানপাড়ার দীঘিতে ধুতে এসেছিল। আগে নীলিমাকে ইঙ্গিত করে চিৎকার করত—নীলজল বলে; সেদিন চিৎকার করেছিল—ফটিক জল ফটিক জল। জোসেফ চটেছিল, রাম চটেছিল, কিন্তু নরসিং চটে নাই। বলেছিল—যানে দো

ভেইয়া। রাম বলেছিল—দশ টাকা বেশী মাইনের চাকরি হওয়ায় বেটাদের গরম বেড়েছে। আরে সীতারাম! দশ টাকা বেশী মাইনে হলেও তো গোলামি! আরে গোলামি করতে রাজী হলেও তো নরসিং তোদের মাথার উপর বসত। থুঃ—থুঃ—থুঃ। আবার বলে সার্বিস লাইনসে তো ভাগিয়েছি।

দূর! দূর! দূর! আরে—ঘরের কোণের চামচিকে, আকাশের গিদ্ধবাজকে বলিস, তোকে তাড়ালাম আমি?

এত বড় দুনিয়া; মাটি মাটি মাটি—গ্রাম, শহর, জেলা, দেশ, পরদেশ, পাহাড়, বন—দুনিয়ার কি শেষ আছে রে? মাটি খুঁড়ে বন তোলপাড় করে, পাহাড় ঢুঁড়ে মানুষের কারবার চলেছে। পাহাড় ফুঁড়ে টানেল বানিয়ে, উঁচু জমি কেটে সমান করে, নিচু জমিতে মাটি ফেলে বাঁধ বেঁধে কোম্পানী পাতছে রেল-লাইন—নদী নালা গঙ্গা-যমুনার মত দরিয়ার উপর 'বিরিজ' বানিয়ে চালাচ্ছে রেল, খাল বিল নদী নালা সমুদ্দুরে চলাচ্ছে নৌকা ইষ্টিমার জাহাজ, আজ কলকাতা থেকে পেশবর তক্ চলেছে মোটর—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, আকাশে উড়ছে উড়ো-জাহাজ, ওই সাত মাইল রাস্তায় সার্বিস বন্ধ করে নরসিংয়ের গাড়ি চালানো বন্ধ করবি? ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ!

মেরী নীলিমা আর কানা ব্যানার্জি সন্ধান পাঠিয়েছে। অণ্ডালের আশে-পাশে লাল কাঁকুরে মাটি আর কালো পাথরে ঢেউ-খেলালো ধূ-ধূ-করা মাইলের পর মাইল ধরে জনমানবহীন একটা অঞ্চলে কয়লার খাদ গড়ে উঠেছে। একটা আধটা নয়, বিশ-ত্রিশটা কলিয়ারির কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেখানে ঢেউ-খেলানো পাহাড়ে মেজাজের চড়াই-উৎরাই ভাঙতে পারলে আর কোন হাঙ্গামা নাই; চালাও গাড়ি। মিশনের গাড়ি আছে, জোসেফের চাকরি ঠিক করে দিয়েছে সেইখানে। সেই সঙ্গে লিখেছে—"নরসিংবাবু এখানে ট্যাক্সি নিয়ে এলে খুব সুবিধে হবে তাঁর। খুব চাহিদা গাড়ির। চারিদিকে কলিয়ারির সঙ্গে গ্রাম হাট বাজার গড়ে উঠেছে। দু-একখানা ট্যাক্সি আসানসোল থেকে মধ্যে মধ্যে আসে—যায়। এখানে রেগুলার সার্বিস খুললে লাভ হবে।"

সেইখানে চলেছে নরসিং তার গাড়ি নিয়ে। এ অঞ্চল নরসিংয়ের না-দেখা নয়। মেজবাবু, তার জীবনে শনি ছিল মেজবাবু, যত ভাল দিয়েছে তত মন্দ দিয়েছে। মেজবাবুদের কুঠিতে এদিকে ঘুরে এসেছে নরসিং।

মনে মনে এবার সে অনেক মতলব করেছে। নসিব অনেক ফেরে তাকে

বাঁধতে চেয়েছে, সব ফের কেটে বেরিয়ে দিল্‌কে শক্ত করে বেঁধে চলেছে সে। বাড়িতে বাপকে টাকা দিয়ে যে ক-বিঘে জমি করেছিল—সে জমি ক-বিঘে বেচে দিয়েছে। বাপের সঙ্গে, গিরবরজার সঙ্গে, তার ফারখত। বাপ বলেছে—তোর মুখ আমি দেখব না, তোর হাতের আগুন আমি নেব না। তুই ছত্রী-বংশ থেকে খারিজ।

ব্যস্‌, ব্যস্‌। খারিজ। নরসিং, শুধু মোটর-ড্রাইভার—সে আর কেউ নয়, কিছু নয়। জমি বিক্রির আট-শ টাকা তার মজুত। আরও একশ টাকা সে পেয়েছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকশনে। কংগ্রেস নেমেছিল এবার। সে কংগ্রেসকে দিয়েছিল তার গাড়ি। কংগ্রেস হারিয়ে দিয়েছে নিতাইয়ের সেই মাতাল বাবুটাকে। তাতেই নরসিং খুশী। তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা গাড়ির সামনে লাগিয়ে গোটা শহরটা সেদিন সে ঘুরেছিল। কংগ্রেস দেড়শ টাকা দিয়েছে আর মামলায় তাকে উকিল দিয়েছিল অল্প পয়সায়। ব্যস্‌। এই তার বহুত—খুব।

মোট এখন ন'শ টাকা তার মজুত। আর কিছু কামাতে পারলেই সে একটা নয়া গাড়ি কিনবে ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে। রামাকে বসিয়ে দেবে এ গাড়িতে। নিতাইয়ের বেলা ভুল হয়েছে তার। আবারও ভুল হয় হবে।

জোসেফ আবার হর্ন দিলে।

বাস আসছে পাঁচমতি থেকে।

কে ড্রাইভার? রামেশ্বরোয়া তারক কণ্ডাক্টর। তারক চেঁচিয়ে উঠল—ইয়ে ভাগতা হ্যায়! নরসিং হাসলে। উল্লুকরা জানে না। গোলাম। ছুঁচোর গোলাম চামচিকে। ওদের সঙ্গে বাত-চিত করবে না নরসিং। রামা কিন্তু চেঁচিয়ে উঠল—ভাগতা নেহি, চল রহে হ্যায় নয়া লাইনমে।

এ্যাক্‌সিলারেটারের চাপ কমিয়ে ক্লাচে পা দিলে নরসিং। স্টীয়ারিং ঘুরছে।

জোসেফ জিজ্ঞাসা করলে—পাঁচমতির ভিতরে ঢুকবেন নাকি?

—হ্যাঁ, আমার দোস্তের সঙ্গে দেখা করব। সুরেশ দাস।

দাস অদ্ভুত মানুষ। এই ক'দিন আগে একজনকে চড় মেরে দশ টাকা জরিমানা দিয়েছে ইউনিয়ন কোর্টে। নরসিংকে সে সমাদর করে একবেলা ধরে খাইয়ে তবে ছেড়ে দিলে। যাবার সময় খুব খুশী হয়ে বললে—চলে যাও দোস্ত, নির্ভাবনায় চলে যাও। কলিজায় হিম্মৎ, গায়ে তাগদ আর মাথায়

উপর ধরম, এ থাকলে চোখ বন্ধ করে চলে যাও ত্বনিয়ায় যে দিকে ইচ্ছে।

শেষকালে বললে—ওখানে যদি স্থবিধে হয় তো আমাকে লিখো, আমি গিয়ে মিষ্টির দোকান করব।

গাড়িতে স্টার্ট দিলে। গাড়ি চলল শ্যামনগরের শহরের ধুলোর উপর—পাঁচমতির ধুলো লাগল গাড়ির গায়ে। গাড়ি এসে থামলো ময়ূরাক্ষীর ঘাটে।

সাহু-বোস কোম্পানীর মোটর-বাসের আস্তানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—'জয় মা কালী'। গাড়ি থেকে নেমে এল নিতাই। ঘাটে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। জোসেফ রাম মোটর ঠেলছে। টপগীয়ারে গাড়ি চলছে, তাও আস্তে। বালি এখন ভিজে রয়েছে। নরসিং হাঁকছে—আরও জোরে। আউর জেরা। আচ্ছা ভাই। বহুত আচ্ছা।

গাড়িখানা অপেক্ষাকৃত জোরে চলতে লাগল। রাম ক্ষুব্ধ আক্রোশে বললে—থাক্ থাক্, তোকে লাগতে হবে না।

নিতাই এসে গাড়ি ঠেলতে লাগছে। সে হাসলে, রামের কথার জবাবও দিলে না, ঠেলতেও ক্ষান্ত হল না। মহিষের মত যেমন চেহারা নিতাইয়ের, তেমনি শক্ত; তার ঠেলাতেই বালি ঠেলে বেশ সহজেই চলছে। নিতাই জানে নরসিং চলে যাচ্ছে। তাই সে এই নদী পার হয়ে ওপারে চলে যাবার সময়টিতে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। লাইসেন্সের লোভে সে ওস্তাদকে ছেড়ে রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে জুটেছিল। অনেকদিন ধরেই তার লাইসেন্স নেবার শখ। ওস্তাদ বলত মুখে—এইবার হবে, করে দোব। কিন্তু কি জানি নিতাইয়ের মনে হত নরসিং তেমন গ্রাহ্ করছে না কথাটা। তাই সে রামেশ্বরোয়ার আশ্বাস পেয়ে আগ্রহ দেখে তার সঙ্গে না জুটে পারে নাই। রামেশ্বরই খাওয়া-পরা আর পনেরো টাকা মাইনের চাকরি সেই মাতাল বাবুর বাড়িতে জুটিয়ে দিয়েছে। সে তো নরসিংয়ের কোন ক্ষতি করে নাই! যতদিন তার কাছে ছিল দেবতার মত ভক্তি করেছে, খেটেছে সে গরুর মত। তার লাইসেন্স হওয়ায়—চাকরি হওয়ায়—ওস্তাদের খুশী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু খুশী হওয়া দূরে কথা, ওস্তাদ তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলে! মদের দোকানে বেইমান-নিমকহারাম শূয়ারকি বাচ্ছা বলে গাল দিয়েছে—সে কথাও নিতাইয়ের না-শোনা নয়। তবে নিতাইয়ের দোষটা কোথায়? হ্যাঁ, একটি দোষ সে করেছে। সাহু-কোম্পানীর চাকরির লোভে সে ফট্‌কির মামলায় ওস্তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। তাও

সে একটি মিছেকথা বলে নাই। একটিও না। তার জন্যে সে হাজার শাস্তি নিতে রাজী আছে। সাহু-কোম্পানী ওস্তাদের অনেক ক্ষতিই করেছে। এ লাইন তো বলতে গেলে ওস্তাদেরই লাইন। যখন রাস্তায় গরুর গাড়ির চলতে কষ্ট হত তখন ওস্তাদ এই রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে লোকের চোখ খুলে দিয়েছে। আজ রাস্তা ভাল হল—ওস্তাদকে দিলে উৎখাত করে! সে পাপ নিতাইয়ের নয়। সে চাকরি করছে—চাকর। কিন্তু—। ওস্তাদের এইভাবে চলে যাওয়ায় তার বড় দুঃখ হচ্ছে। সে তাই এগিয়ে এসেছে। গাড়ি ঠেলার সুযোগ পেয়ে ছুটে এসেছে। দুটো কথা বলে সে চলে যাবে।

গাড়িটা এপারে এসে উঠল। আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নরসিং গাড়িতে ব্রেক কষলে। নিতাই কিন্তু কথা বলতে সাহস করলে না। সে ফিরল। নদীর জলে নেমে হাতের ধুলো কালি ধুয়ে একটু দাঁড়াল। তার পর সে আবার ঘুরে এল নরসিংয়ের কাছে। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বললে—ওস্তাদ!

নরসিং ভুরু কুঁচকে চাইলে তার দিকে।

এবার তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নিতাই বললে—গাল দেন, মারুন, যা করবেন—কিছু বলব না, কিন্তু কথা না-বলে যাবেন না। মাফ করে যেতে হবে, আমার দোষ হয়েছে।

নরসিং একটু চুপ করে থেকে হেসে পিঠে হাত দিয়ে বললে—মাফ।

নিতাই বললে—আপনার নসিবটা ভাল নয় ওস্তাদ। ইমামবাজার থেকে কুঠিঘাট সার্বিস—মেজবাবু প্রথম খোলেন বটে—কিন্তু আপনি ছিলেন ড্রাইভার। মেজবাবু মারা যেতে আপনি লাইনটা জমালেন। রেল-কোম্পানী আর বুধাবাবু মিলে আপনাকে উৎখাত করে লাইনটা নিয়ে নিলে—আবার—

নরসিং বাধা দিয়ে হেসে বললে—দেখি আবার কে কোথা উৎখাত করে!

—কোথায় যাবেন?

সে কথার জবাব না দিয়ে নরসিং বললে—মন পাতিয়ে কাজ করিস। মোটরের কাজ ভাল করে শিখিস। ভাল হবে।

ওপারে সাহু-কোম্পানীর মোটর-বাসের কণ্ডাক্টর হর্ন দিয়ে উঠল; সার্বিসের গাড়ি ছাড়বার সময় হয়েছে। নরসিং বললে—যা, হর্ন দিচ্ছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিতাই বললে—যাই। কিন্তু, কোথা চললেন?

হেসে নরসিং নিতাইকে জবাবটা এড়িয়ে যাবার জন্যেই বললে—আরে,

দুনিয়ায় কি যাবার ভাবনা আছে নাকি? বন কেটে শহর বানাচ্ছে, পাহাড় কেটে পথ বানিয়ে—সেই পথে মানুষ ছুটছে, ধূ-ধূ করা ডাঙায় কারখানা বানাচ্ছে, আশেপাশে গড়ছে হাটবাজার, মানুষ দলে দলে ছুটছে—পিঁপড়ের মত দানার সন্ধানে। দুনিয়াতে এখানে জলকর, ওখানে ফলকর, সেখানে বনকর, লা-মহল, কয়লা-মহল অভ্রের খনি, ক্ষেত-খামার, ফসল-কুটো—দৌলতের কি অভাব আছে? যেখানে দৌলত সেইখানে মানুষ, যেখানে মানুষ যাবে সেইখানে গাড়ি যাবে। চললাম তেমনি কোথাও। হা-হা করে হাসতে লাগল সে।

ওপারে হর্ন বাজছে ঘন ঘন। নিতাই আর থাকতে পারলে না। আজ প্রথম সার্বিস। দেরি হলে কৈফিয়ত দিতে হবে। তা ছাড়া সার্বিসের ড্রাইভার হিসেবে কাঁটা ধরে গাড়ি ছাড়বার একটা শখও তার মনে খুব তাগিদ দিচ্ছে, সে ফিরল। কিন্তু মনের মধ্যে কাঁটার খোঁচার মত বিঁধে রইল একটা দুঃখ। ওস্তাদ তাকে পুরো বিশ্বাস করলে না। কোথায় যাচ্ছে সে কথাটা বলে গেল না।

সে দুঃখ নরসিংয়ের বুকেও বেজে রইল। কিন্তু তার সঙ্গে একটু আনন্দও রইল, নিতাইকে অবিশ্বাস করে যে অপমানটুকু করা যায় সেটুকু না-করার মত ঔদার্য তার নাই। তবু স্তব্ধ হয়ে সে গাড়ি চালাতে লাগল। চলল গাড়ি।

মুর্শিদাবাদের পলিমাটির দেশ পার হয়ে—বীরভূমের পাথুরে শক্ত মাটির দেশের মধ্য দিয়ে দেশ হতে দেশান্তরের ধুলো মেখে, তার গাড়ি চলল যে রাস্তা থেকে তাকে উৎখাত করে বুধাবাবু আর রেল-কোম্পানী মনোপলি সার্বিস খুলেছে সেই রাস্তা ধরে—সাঁকোর উপর দিয়ে নদী নালা পেরিয়ে চলল। বড় নদীর বালিতে নেমে, টপগীয়ারে—মানুষের ঠেলায়, সে নদী পেরিয়ে চলল তার গাড়ি। আশপাশের মাঠ জঙ্গল গ্রাম পাক দিয়ে গোল হয়ে ঘুরছে; পথের পাশের গাছগুলো ছুটছে পিছনের দিকে সোজা লাইনে; মাইলপোস্টের পর মাইলপোস্ট পার হয়ে চলল গাড়ি। সামনে এগিয়ে এল নতুন দেশ। মধ্যে মধ্যে কালো পাথরের চাঁই-জেগে-ওঠা লাল মাটির দেশ, চড়াই আর উৎরাই, উৎরাই আর চড়াই,। তিরিশ ফুট চড়াই উঠে পঁচিশ ফুট নেমে—আবার পঞ্চাশ ফুট চড়াই, তার পর বিশ ফুট ঢালে নেমে—ফের ফুট চল্লিশেক উঠে মাইলখানেক সমতল চলেছে। গরুর গাড়ি এবং মোটরের টায়ারের দাগ-আঁকা রাস্তার চিহ্ন।

এ দেশ নরসিংয়ের না-দেখা নয়।

মেজবাবু মরেছিল এই দেশে। সেই ফট্‌ফটিয়াটা—সেইটায় চেপে এখানকার এক ফিরিঙ্গি গরীব ম্যানেজারের মেয়ের সঙ্গে হুল্লোড় করতে আসত রোজ রাত্রে। একদিন মাতোয়ারা হয়ে ফিরবার সময়—একটা পাথরের চাঁইয়ে ধাক্কা লাগিয়ে ছুটকে পড়ে রইল অজ্ঞান হয়ে সমস্ত রাত্রি। সকালে কিন্তু সেই শরীরেই জ্বর নিয়ে জাঁদরেল ফিরেছিল কুঠিতে। তার পর নিউমোনিয়া। তারপর একদিন ঠাণ্ডা হয়ে গেল মেজবাবু। একটা ছুটন্ত ইঞ্জিন যেন 'বিরিজ' ভেঙে পড়ে গেল নদীর জলে। মেজবাবুর দেহটা সেই নিয়ে গিয়েছিল বাবুদের বাসে তুলে গঙ্গাতীরে। সেলাম—মেজবাবু—সেলাম।

—আরে—আরে—!—ঘ্যাঁচ করে টানলে নরসিং হ্যাণ্ডব্রেক, পায়ে কষে বসিয়ে দিলে ফুটব্রেকটা। গাড়িটা থেমে গেল। চড়াইয়ের মাথা থেকে কেমন করে গড়িয়ে নেমে আসছে একটা আধমনী পাথরের চাঁই!

রাম ফট্‌কি শিউরে উঠেছে। নরসিং হেসে আবার স্টার্ট দিলে। চলল গাড়ি। ফের পঞ্চাশ ফুট চড়াই। কেয়াবাৎ রে দেশ! আহা-হা! চোখ জুড়িয়ে গেল। চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে, কিনারায় কিনারায় নীল মেঘ নেমে এসে লালমাটি ছুঁয়েছে। তার মধ্যে কলিয়ারি হচ্ছে। এদিক—ওদিক—সেদিক। মধ্যে মধ্যে কাঠের পোস্টের, মাথায় কাঠের ফলকে লেখা—টু—কলিয়ারি। দেখা যাচ্ছে গীয়ার হেডের ছাঁদাছাঁদি-করা ফ্রেমের একেবারে মাথার উপরে ঘুরছে চাকা. আকাশ-ছোঁয়া চিমনির মুখ থেকে আকাশের গায়ে কালো ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। মধ্যে মধ্যে খুব কাছে এসে পড়ছে কলিয়ারি, দেখা যাচ্ছে সারি সারি কুলী-ধাওড়া; নোংরা, ময়লামাটি-কালি-ঝুলিতে ভরা আধনেংটি সাঁওতাল-বিলাসপুরিয়া মালকাটাদের দুর্গন্ধে ভরা ডেরা। গিজগিজ করছে। কলকল করছে। ফট্‌কি দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দেয়, জোসেফ নাকে রুমাল ঢাকে, রামা হি-হি করে হাসে। নরসিংয়ের দুই হাত বন্ধ,—তা ছাড়া সে গন্ধও পায় না, পেট্রোলের গন্ধ ঢেকে দিয়েছে সব। হঠাৎ তার হাসি পায়। জোফেস নাকে রুমাল দিচ্ছে। হায় দুনিয়া! নিজেদের গায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে না। তেলে কালিতে মোবিলে পেট্রোলে ধুলোয় ভরা, গায়ে মোবিলের লোহার গন্ধ! ওরা কাটে মালিকের জন্তে কয়লা—নরসিংরা গাড়ি চালায় পরকে চাপিয়ে, পরের হুকুমেতে, পরের দরকারে, পরের আমোদের কারবারে। কুছ ফরক নেহি। গাড়ি আবার ঘুরল। নতুন পিট কাটাই হচ্ছে এখানে। পিটের মুখে স্তূপ হয়ে জমে আছে

মাটির পাথরের রাশি, ইঁটের ভাটা পুড়ছে, ইঁট পোড়াই হচ্ছে, টিনের এবং ছাপরার শেড দেখা যাচ্ছে, বড় বড় শেড তৈরী হচ্ছে, তার টি-আঙ্গেল-জয়েস্ট গড়া বিচিত্র ফ্রেম দাঁড়িয়ে আছে; মধ্যে মধ্যে সাদা চুনকাম করা বাংলো ঝকমক করছে; মাঝে মাঝে এসে পড়েছে সাইডিং লাইন, লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে সারিবন্দী ওয়াগান। দু-একখানা মোটরও পেরিয়ে গেল; তার মধ্যে সাহেবী পোশাকপরা ম্যানেজার কিংবা মালিক যাচ্ছে বোধ হয়। কেয়াবাৎ দেশ! আজব কারখানায় নতুন দেশ তৈরি করছে মানুষ এখানে। বিলকুল নতুন দুনিয়া! তার পূর্বপুরুষ গিরধারী সিংয়ের আমলে এ দুনিয়া ছিল না। গিরধারী সিং এসে বনের মধ্যে আড্ডা গেড়ে বন কেটে চাষী ক্ষেত গড়েছিল। সে চলেছে একালের এই নতুন দুনিয়ায়। ঘোড়ায় চড়ে বয়েল গাড়িতে মাল নিয়ে এসেছিল গিরধারী সিং। সে চলেছে মোটরে চেপে। কলকারখানা—লোহা-লক্কড়ের কারবার। ভাল নসিব বল—ভাল নসিব। মন্দ বল—মন্দ। কিন্তু না এসে নরসিংয়ের উপায় ছিল না। দুনিয়াই তাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে। সেও এসেছে খুশী হয়ে। এখানেই নরসিং ঘর বাঁধবে। সেই ঘরে থাকবে ফটুকি। পুরনো গাড়ি বেচে নতুন গাড়ি কিনবে, ট্রাক কিনবে। রোজগারে পকেট ভরে এনে ফট্‌কির আঁচলে দেবে—ব্যাঙ্কে রাখবে। খোকা হবে। হবে বৈকি। তাকেই দিয়ে যাবে সে নিজের সব বিদ্যে, মেকানিক করে তুলবে; তাকেই তো দিয়ে যাবে সে তার জমি-বিক্রি করা টাকায় কেনা গাড়ি আর উপার্জন-করা টাকা।

—বাঁয়ে। হাঁকলে জোসেফ।

সামনেই রাস্তাটা তিন ভাগ হয়েছে। বাঁয়ের রাস্তাটার গায়ে লেখা—'টু মিশন'। বেঁকে মোড় ফিরল মোটর। ফের গীয়ার দিয়ে নরসিং স্পীড বাড়ালে গাড়ির। চলল গাড়ি।

ছোটগল্প-কবিতা-গান

সাপুড়ের গল্প

সাপ নিয়ে যারা কারবার করে তারাই সাপুড়ে। সাপ নিয়ে কারবার অনেকেই করে—বামুন, কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্‌গোপ প্রভৃতি। নবশাকদের মধ্যে অনেকেই করে। ও কারবারের যেন একটা নেশা আছে! এবং ঐ নেশায় নেশাখোরের যে চেহারা দাঁড়ায় সেটা বন্য ও বাউণ্ডুলে। গাঁজা খায়, মদ খায়, ঘর সংসারে মন বসে না; এক কথায় ক্ষেপে ওঠে, আবার ভালবাসলে প্রাণ ঢেলে দিয়ে গ্রীষ্মের জলহীন নদীর মত হাহা করে। খাঁটি এবং খাস সাপুড়ে জাতের যারা—তাদের তো আর কথাই নাই। খাল বিলের কাছে—পতিত প্রান্তরে সেই আরণ্য যুগের ঘর দুয়ারে বাস করে; খাওয়া দাওয়া, আচার আচরণ, নাচ গান, ভিতর বাহির দেহ মনও তাই। সেই আদিম এবং আরণ্য। চেহারায় পর্যন্ত সেই ছাপ। পৃথিবীর বয়সের সঙ্গে মানুষের মনে দেহে কত না পাল্টা-পাল্টি কত না চাঁছাই-ছোলাই হয়েছে—কিন্তু ওদের হয়নি। দেহের মিশমিশে কালো রঙে, করকরে ঘন চুলে, নাক মুখ চোখের গড়নে সে সত্য দিনের আলোয় কালো সাপের মত স্পষ্ট। গ্রামে আসে, ভিক্ষে করে, সাপ নাচায়—মানুষের সঙ্গে হাসি-খুশিতে বাঁশির সুরে সাপের হেলে-দুলে নাচার মতো মনোরম ভঙ্গিতে মন রেখে কথা বলে, আবার খোঁচা খেলেই ছপ করে ছোবল মারতে চেষ্টা করে এবং দিনের বেলা ক্ষুধার জ্বালায় বেরিয়ে পড়া সাপের মতো যত শিগগির পারে ভিক্ষের ঝুলি বোঝাই করে গ্রাম থেকে বেরিয়ে চলে যায় ডেরার দিকে। ডেরা ওরা ঘরের ভেতরে কিছুতেই বাঁধবে না। বাঁধবে বাইরে হয় আমবাগানে, নয় বটতলায়। পুরুষের চেয়ে মেয়েগুলো আশ্চর্য। অবশ্য তার কারণ আছে। দুনিয়ার রাজত্বিটা পুরুষের। তাই ভিক্ষার কারবারে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের পাতা হাতই ভরে ওঠে বেশী। উপচেও পড়ে। এবং অন্দরের দরজায় পুরুষের পাহারা—সে পাহারা পার হয়ে মেয়েরা সহজে যেতে পারে। মেয়েরা চলতে পারে—মিষ্টি গলায় বলতে পারে, হেলতে পারে দুলতে পারে। তাই মেয়েরা আশ্চর্য। সেই মেয়েদের মধ্যেও আশ্চর্য এই

মেয়েটা। মেয়েটা তরুণী নয়, যুবতী—কিন্তু যেন ষোল সতের বছরের মেয়ে। ছিপছিপে চেহারা, মিশমিশে কালো রঙ, ঠোঁট দুটো আরো কালো, তারও চেয়ে কালো রুক্ষু কালো চুলের রাশি। সে অল্প নয়, একরাশ। ওদের দলের কাছেও ও বিচিত্র। তিন তিনবার বিয়ে করে স্বামী ছেড়েছে। আচারে বিচারেও ওর অনেক স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু তবু ওকে সহ্য করে চলে দলের লোক। ওর যত সাহস তত বুদ্ধি। বাবু ভাই, দারোগা, জমাদার—এদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ও একেবারে উকিল মোক্তার। তার উপরে মোহিনী জানে। পুরুষেরা ওকে পছন্দ করে না, কিন্তু না মেনে পারে না। মেয়েরা ওকে একবাক্যে মনে প্রাণে ভালবাসে; ও যাই হউক যাই করুক কারুর বাড়া ভাতে হাত বাড়ায় না; কারুর ঘর ভাঙে না। মাগনে অর্থাৎ ভিক্ষেয় বেরিয়ে ও ঘোরেফেরে একা। পুরুষেরা মনে মনে বলে—পাপ। কিন্তু মুখে সেকথা ফোটে না। মেয়েরা মুখ মুচকে হেসে কটাক্ষ হেনে বলে—ভালোয় ভালোয় ঘুরে এসো। ভাগ দিয়ো। একা সব মেরো না।

মেয়েটা বলে—মিঠাই পেলে ভাগ দিব, মদের চেয়ো না। তার পরেই হাতের বিষম চাকিতে ঘা মেরে হাঁক দেয়—সাপার নাচন। সাপার মাথায় আঁটুলি। মাদুলি করে হাতে বাঁধলে রাজা হয়। লিবা গ?

অবলীলাক্রমে ঘুরে মাগন সেরে সবচেয়ে বেশী ভিক্ষে নিয়ে ডেরায় ফিরে বসে—খিল খিল করে হাসে আর গ্রামের রসিক ছোকরা-বাবুদের কথা গল্প করে সঙ্গিনীদের কাছে।

তারপর একটা ঝাঁপি একটু খুলে বাঁ হাত পুরে দেয়; শব্দ ওঠে ক্যাঁক-ক্যাঁক! বের করে আনে ব্যাঙ। ওই ঘোরা ফেরার ফাঁকেই পুকুর ডোবা থেকে সংগ্রহ করেছে। ব্যাঙটা বের করে এনে বড় ঝাঁপিটা খুলে একটা জোয়ান গোখুরা বের করে তাকে ছেড়ে দেয় এবং ব্যাঙটাকে ছেড়ে দিয়ে বলে—খাও বঁধু। ওইটে ওর বঁধু। সাপটা গেলে, ও দেখে। খাওয়া শেষ হলে পূর্ণোদর সাপটাকে মালার মত জড়িয়ে ধরে আদর করে।

অ—কালীনাগ। তুমি নাগ হইলে ক্যানে? নাগর হইলে না? অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া অঙ্গ জুড়াইতাম। তুমি নাগ হইলা ক্যানে? কালীনাগ? সাপের ঝাঁপিটার উপর কাপড় পাট করে রেখে ঘুমোয়। এ সাপটার উপর বহুজনের হিংসে। বিশ্বাস নেই।

*　　　　*　　　　*

সাপটা হঠাৎ মরল। বিচিত্র ঘটনা : দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়ায় সাপুড়ের দল। মুরশিদাবাদ বীরভূম বর্ধমান মেদনীপুর পর্যন্ত। বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে এক গ্রামে ফেলেছিল ডেরা। শুশুনিয়া পাহাড় ওদের না জানার জায়গা নয়। এখানে ওরা সাবধান। "ভোর বেলায় আগে কেউ বাইরিবা না। দিনমণি চাকিতে থাকতি থাকতি ডেরায় ফিরবা। সিঁধেল চোর লয়রে মানিক, ডাকাত আছে ওৎ পেত্যা।" মানে সাপ নয় বাঘ। সাপ সিঁধেল চোর, বাঘা ডাকাত। "আঁধার নামলে বন থেকে লাল গামছা মাথায় বেঁধ্যা পথের ধারে বস্যা হাই তুলবে, এই লম্বা জিব বার কর্যা আপন মুখ চাটবে। শিয়াল ডাকিলে পরে—বেদেরা লিবে না ঘরে।" ঘরে না নিলে পথে থাকে ; চলে যাও যেদিকে দু-চোখ যায়। এখানে কিন্তু শেয়াল ডাকে না কেউ ডাকে, কেউ ডাকলে কেউ নাই আছে বাঘা ডাকাত ; সকল পথের শেষ সাবধান।

এই শুশুনিয়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে হন হন করে ফিরছিল কালী। মেয়েটার নাম কালী। বেলা তখনও আছে। তেষ্টা পেয়েছিল। দারুণ তৃষ্ণা। পাহাড়ের কোলে একটা ঝর্ণা, সেই ঝর্ণায় গেল যেতে। ঝর্ণার গায়ে দেবতার স্থান। জল খেয়ে উঠেছে কালী—হঠাৎ হি হি করে হেসে কে বললে—বেদেনী।

কালী চমকে উঠে মুখ তুললে। এক সন্ন্যাসী। লম্বা চওড়া শাহী চেহারা, গাঁটপড়া শালের গুঁড়ির মতো। মুখে দাড়ি গোঁফ। মাথায় রুখু চুল। তাতে দু-চারগাছায় পাক ধরেছে। সন্ন্যাসী আবার হেসে বলে—সাপ আছে রে ঝাঁপিতে ?

কালী মুখ মুচকে হেসে বললে—সাপ নয়, সাপা গোঁসাই। ছেড়ে দিলে মাথা তুললে ছাতিতে ডংশাবে। লাল চোখ ঘোলা হয়ে যাবে।

হি হি করে হেসে উঠলো গোঁসাই।—যদি মাথা না তোলে।

—মাথা তুলবে না ?

—না। সন্ন্যাসী একেবারে কাছে এসে বললে—খোল ঝাঁপি। দেখি তোর সাপা।

—তার আগে বল, ডংশালে মোর নাম দোষ নাই। কামানের সময় হইছে। কামাই নাই।

—নাই তোর নাম দোষ। কিন্তু তুই বল যদি মাথা না তুলে।

—মাথা না তুললে সাপারে ছেঁচ্যা দোব।

—আমাকে কি দিবি?

—থাকবার মধ্যি থাকবে তো জাতিকুল আর সাপের খালি ঝাঁপি; লিবা? সন্ন্যাসীর জপতপ-ভাসায়ে ঝাঁপ দিবা বেদে যুবতীর দেহের দহে। গো-সাপুরিতে? গোস্পদে? লিলে দিব।

—দেখিস?

—হ্যাঁ।

—খোল তবে ঝাঁপি।

সাপার ঝাঁপিটা খুলে একটা নিষ্ঠুর খোঁচা দিয়ে ইচ্ছে করেই সরে দাঁড়াল কালী। প্রকাণ্ড সাপটা উঠল মাথা নিয়ে কিন্তু সন্ন্যাসী তার আগেই ঝুলিতে হাত পুরে কি একমুঠো বের করে রেখেছিল—ফ্যাং গঙ্গারাম—বোম শঙ্কর! বলে চীৎকার করে সে সেই মুঠোর ধুলোর মতো বস্তুটুকু দিলে সাপটার মুখে চোখে ফণায় ছিটিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য কাণ্ড। সাপটা মাথা নুইয়ে একেবারে কেঁচোর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে গুটিয়ে গেল। সন্ন্যাসী হি হি করে হাসতে লাগল। ছুটে এগিয়ে এলো কালী—কি হল? কি দিলা?

—ধুলো পড়া।

—না, ওষুদ! কি ওষুদ দিলা? সাপ মেরা্য দিলা আমার? আমার সাপ। কেঁদে ফেলল মেয়েটা! সে একেবারে ঝরঝরে কান্না; সে কান্না দেখে সন্ন্যাসী যেন অপ্রস্তুত হল। বললে—সাপ তোকে আমি দিচ্ছি। ওই দেখ হাঁড়ি করে গাছের ডালে টাঙানো রয়েছে। যেটা খুশি নিয়ে যা।

অবাক কাণ্ড—সত্যিই কালো পোড়া হাঁড়ি টাঙানো রয়েছে, একটা দুটো তিনটে—ওই দুটো, ওই একটা। বেদের মেয়ে উঠল। নামালে হাঁড়িগুলো। সত্যি সাপ গর্জাচ্ছে। কিন্তু—।

—কিন্তু কি? সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলে।

—ই সাপ নিয়ে কি করব?

—কেন?

—আমার উটা সাপা ছিল। সাপা কই?

হা হা অটহাস্যে ভেঙে পড়ল সন্ন্যাসী।—সাপা!

—হাসছ কেন? সাপা আমার পয়মন্ত। সাপার বিক্রমে আর এই

মাদীগুলার বিরুদ্ধে? ইয়ারা পায়ের তলা থেকে কুটুস করে কামড় দিয়া ল্যাজ কাটা দিয়া পালাতে পারে। সাপা এ্যাই ফণা তুলে! তুমি হাসছ ক্যানে?

হি হি হাসি সন্ন্যাসীর ফুরোয় না।

হাসতে হাসতে বললে—আমার ভৈরবী হবি! বাজীতে তুই হেরেছিস। তোর জাতি-কুল ঝাঁপি আমার। আমার সঙ্গে চল; উড়িষ্যাতে তোকে শঙ্খচূড়ের সাপা ধরে দোব। এই সাপা! সে সাপা তুই চোখে দেখিস নাই।

মেয়েটা সর্বনাশী। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সন্ন্যাসীর দিকে। আপাদ মস্তক লেহন করছে দৃষ্টি দিয়ে। সন্ন্যাসী বললে—দেখছিস কি? যাবি?

—এখুনি যাবা? উই গাঁয়ে আমাদের দল। এখুনি ইথান থেকে যাও তো চল। যাবা?

—চল।

—আমাকে শঙ্খচূড় সাপা দিবা। এই সাপা? আপন মাথার উপর হাত তুলে সে সাপের আকার দেখালো।

—দোব।

—তিনবার বল। তিন সত্যি কর।

হা হা শব্দে হেসে উঠল সন্ন্যাসী—দোব। দোব। দোব।

*　　*　　*

মাস পাঁচেক পর খণ্ডগিরি উদয়গিরি থেকে ভুবনেশ্বরের পথের ধারে। গাছের তলায় ভৈরব আর ভৈরবী। ভৈরব গাঁজা খাচ্ছে। ভৈরবী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছে। মাথার উপরে গাছের ডালে ঝুলানো বিরাট একটা হাঁড়ি। সাপের গর্জন শোনা যাচ্ছে!

—নে, খা। ভৈরব গাঁজার কল্কে ভৈরবীর দিকে এগিয়ে দিল। হাতটা ঠেলে দিয়ে ভৈরবী বললে—না।

—কি হ'ল তোর?

—কিছু না। দেহ ভাল লাগছে না।

—তবে মদ খা। দেহ ভাল হবে।

—তু—খা।

ভৈরব মদের বোতল বার করে মদ খেয়ে বোতলটা ওকে দিল—খা। খা বলছি। তোকে যা বলেছিলাম আজ তাই দিয়েছি, শঙ্খচূড়ের সাপা। তবু তুর ই কি? এমন তো ছিলি না।

এবার মদের বোতলটা তুলে মুখে খানিকটা ঢেলে দিয়ে গিলে ফেললে ভৈরবী ; বুকে হাত বুলিয়ে বললে—হল ? লে, এবার তু খা। খা।

—দে। আবার খানিকটা গলগল ক'রে গিলে ভৈরব বললে, লে আর এক ঢোক খা।

—দে, এই লে। বাকীটা তু এক ঢোকে খা দেখি। লে। সে নিজেই হাঁটু গেড়ে উবু হয়ে বসে তার মুখে বোতলটা ঢেলে দিয়ে হি হি করে হাসতে লাগল। মদের নেশা লাগল। ভৈরবীর উদাস ভাব কেটে যাচ্ছে। সে মুহূর্তে মুহূর্তে জাগছে। ফুলে ভরা লতার বাতাসে দোল খাওয়ার মতো ভৈরবের গায়ে দুলে আছাড় খেয়ে পড়ছে। ভৈরব দু'হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। বললে—কাল তুকে সেই ওষুধ দিব। না বললে শুনব না। খেতে হবে। হাঁ ভৈরব ভৈরবীর সন্তান—।

—চুপ! ভৈরবী তার বাকরোধ করে দিলে। উঃ! বলে উঠল সন্ন্যাসী। খিল খিল করে হেসে উঠল ভৈরবী।

ঠোঁটে হাত দিয়ে মুছে নিয়ে দেখে ভৈরব বললে—রক্ত বার করেছিস ?

—সাপিনীর কামড় যি। আবার খিল খিল করে হেসে উঠল ভৈরবী। ভৈরবী শিউরে ওঠে সে হাসিতে।

—দে, মদ দে। নেশাটা জমছে না।

—লে। আবার নতুন মদের বোতল বার করলে ভৈরবী।

* * *

মদের নেশায় অচেতনের মতো পড়ে আছে ভৈরব। একটা গাঁটওয়ালা শাল গাছের গুঁড়ি যেন। ভৈরবীর চোখে ঘুম নাই। রাত্রির অন্ধকার থমথম করছে চারিদিকে। তারই মধ্যে একটা হাতছানি ঝিলমিল করছে। মাথার উপর গাছের ডালে শঙ্খচূড়ের সাপা গর্জাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে—ওটাকে গলায় জড়িয়ে গান গায়।

ও কালী নাগ গ! তুমি নাগ হইলে ক্যানে ? নাগর হইলে না!

"সাপার নাচান! সাপার মাথার আঁটুলি। মাদুলি করি ধারণ করলি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়!" হাঁক দিতে ইচ্ছে হচ্ছে! চঞ্চল হয়ে উঠেছে জাত সাপুড়ের মেয়ে। হাঁড়িটাকে নামিয়ে সাপটাকে বের করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু না। ভৈরব সাপা নয়, বাঘা। বাঘা জেগে উঠবে। তা ছাড়া সাপটার বিষ আজই সবে গালা হয়েছে। বিষ তো কম নয়। প্রায় আধ

ঝিনুক। কোথায় সে ঝিনুকটা? উঠল সে। সন্তর্পণে বের করে আনলে ভৈরবের ঝুলি থেকে। ভৈরব বিষ সংগ্রহ করে রাখে। গাঁজার সঙ্গে খায়। মদের অভাব হলে একটু ঢেলে নিয়ে চেটে খেয়ে ফেলে। তারপর সারাটা দিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। বিশাল শাল গুঁড়ির মতো পড়ে আছে। নাক ডাকছে ঝড়ের গোঙানির মতো। ঝুঁকে পড়ল সাপুড়ের মেয়ে। ঠোঁটের উপর ওই তো কাটা দাগটা। দেশলাই জ্বাললে। এখনও কাঁচা রক্ত জমে রয়েছে একটি কুঁচ ফুলের মতো। আঙুল দিয়ে ঘসে দিলে। আবার রক্ত বের হচ্ছে। ঝিনুকটা উপুড় করে দিলে তার উপর। গাছের ডালের হাঁড়িটা নামিয়ে নিলে মাথায়, কাঁধে ঝোলালে ভৈরবের ঝোলাটা। তারপর সাপিনীর মতো শন শন করে চলল।

শয়তান! ঘেন্না জন্মাচ্ছে! রাগ হচ্ছে। যত বিষ তত রাগ তত হিংসে।

ভৈরবের ঝুলি থেকে একটা কৌটো বের করে খুললে। ওষুধের গুঁড়ো! এই গুঁড়োর ধুলো-পড়ায় তার সেই সাপটা মরেছিল। কটু গন্ধ উঠছে।

সাপের হাঁড়িটার মুখের সরাটায় একটা পাথর দিয়ে ভেঙে একটু ছিদ্র করে একটু গুঁড়ো ঢেলে দিলে। নি—গর্জা। গর্জা। হু।

খিল খিল করে হেসে উঠল জাত সাপুড়ের মেয়ে। গর্জন থেমে গেছে। হুঁ।

—লে, আরও লে। খা, আরও খা। ঢেলে দিলে সে অনেকটা গুঁড়ো।

—এই, গর্জা! লে গর্জা!

আর গর্জায় না। ব্যস! নিশ্চিন্ত! এইবার ছোট্ট একটি আশ্রয়! মাস কতকের জন্যে। না চিরকালের জন্যে।

চুপ করে শুল সে। আকাশে চাঁদ উঠেছে।

"আয় চাঁদ আয় চাঁদ আয় চাঁদ—
আ-রে! আয় আয় আ-রে।
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যারে!"

'তরুণের স্বপ্ন। বৈশাখ ১৩৬৫

ডাইনী

তোমাদের একালে ডাইনী নাই। ডাইনী নাই, মায়াবিনী নাই।

সে হিসেবে একালের ছেলেরা ভাগ্যবান।

আমাদের আমলে, মানে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে ডাইনী, ডাকিনী, মায়াবিনী। একালের ছেলেরা ডাইনী-ডাকিনীর কথা শুনে হেসে উঠবে। কিন্তু সে আমলে আমাদের অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে যেত এদের নামে।

আমাদের গ্রামে আমাদেরই বাইরের বাড়ীর পূর্বপ্রান্তে বড় একটা পুকুর, বড় বড় তালগাছে ঘেরা। তার উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল স্বর্ণ ডাইনির ঘর।

একেবারে গ্রামের প্রান্ত। একপাশে জেলেপাড়া—অন্যপাশে বাউরীপাড়া—মাঝখানে খানিকটা খালি জায়গা। সেই খালি জায়গায় একটা অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছতলায় ছোট একখানি ঘর। তারপর, অর্থাৎ স্বর্ণের বাড়ীর পর পূর্বদিকে আর বসতি নাই, প্রান্তর চলে গিয়েছে। বালি আর কালচে মাটির প্রান্তর। সেই প্রান্তরের মধ্যে শালুকচাঁদা নামে পুকুরটা ছিল গ্রামের শ্মশান। এখানে অবশ্য শবদাহ করা হ'ত না, মুখাগ্নি করা হ'ত। চারিদিকে পড়ে থাকত—মড়ার বিছানা মাদুর, বালিশ ন্যাকড়া বাঁশ, মাটির সরা ভাঁড়, আধপোড়া কুঁচি-কাঠি। পুকুরটার ওপারে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ। দিনের বেলাতেও কেউ সে গাছতলায় যেত না। রাত্রে সেটা জমাট অন্ধকারের মতো থমথম করত।

স্বর্ণ নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে তাকিয়ে থাকত—সেই বটগাছটার দিকে।

আমরা তাই ভাবতাম।

নইলে—প্রান্তরটা যেখানে শেষ হয়েছে—সেখানেই শুরু হয়েছে ধানের ক্ষেত। সবুজ শস্যক্ষেত্র। কিন্তু ডাইনী কি সবুজ ভালবাসে? না বাসতে পারে?

স্বর্ণ ডাইনী। আমাদের দেশের ভাষায় 'স্বনা ডান।'

শুকনো কাঠির মতো চেহারা। শক্ত দু-পাটি দাঁত, একটু নরুনে-চেরা চোখের মত ছোট। তাতে খয়েরী রঙ-এর তারা। বিচিত্র স্থির দৃষ্টি। ভাব-লেশহীন শুষ্ক—যেন খটখট করত দুটো হলদে এই পাথর শুকনো ডাঙার বুকে।

ডাইনীর দৃষ্টি!

এই দৃষ্টিতে ডাইনীরা কচি নধর দেহের, সুন্দর সুশ্রী মানুষের, তরুণী নববধূর দেহের অস্থি চর্ম মেদ মাংস ভেদ করে—ভিতরে প্রবেশ করে খুঁজত প্রাণ-পুতুলী। তাকে পেলে চুষে চুষে তারা খেয়ে ফেলে। নধর মানুষ শুকিয়ে অস্থি-চর্মসার হয়ে যায়, সোনার মত দেহের বর্ণ কালো হয়ে যায়। তরুণী নববধূর সব লাবণ্য ঝরে পড়ে। শুধু মানুষ কেন কচি পাতায় ভরা লকলকে সতেজ গাছ অকস্মাৎ শুকিয়ে যায়। ডাইনীরা তারও সরস প্রাণটুকু দৃষ্টিযোগে পান করে নেয় নিঃশেষে।

স্তব্ধ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে তালগাছের মাথায় চিল চ্যাচায়—চি-ই-ই-লো! চি-ই-লো, চি-ই-লো!

কান পেতে শুনলে শুনতে পাওয়া যায়—ঘরের দাওয়ায় বসে ডাইনী তার স্বরে স্বর মিলিয়ে সঙ্গীত গাইছে—অনুনাসিক মিহি স্বরে গাইছে—ছিঁ-ই-হুঁ-ই-হুঁ! হিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ-হুঁ!

রাত্রে—গভীর রাত্রে স্বর্ণ ডাইনীর ঘরের দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যায়—শব্দ উঠছে—হুট-পাট, হুট-পাট, হুট-পাট!

বাট বইছে স্বর্ণ। যারা ডাইনী তারা ভগবানের অভিসম্পাতে রাত্রে মাটির উপর বুকে হেঁটে বেড়ায়। বাট বয়।

ভয় হয় না এর পর?

*　　　*　　　*

স্বর্ণ তরিতরকারি বেচে বেড়াত। এই ছিল তার জীবিকা। তিন-চার ক্রোশ দূরের হাট থেকে কিনে আনত, বেচত আশপাশের গ্রামে। পান, কাঁচকলা, পাকা রম্ভা, শাক, কুমড়ো এই সব। আমাদের গ্রামে সে বেচত না। আশপাশের গ্রামেই বেচত। গ্রামের কারও বাড়ীতে ঢুকতে সে চাইত না। কি জানি—কার অনিষ্ট সে করে বসবে! তার ভিতর যে লোভটা আছে, সে যখন লক-লক করে জিভ বার করবে তখন তো স্বর্ণের বারণ শুনবে না। কিন্তু স্বর্ণ যে লজ্জায় মরে যাবে! হি-হি-হি! ওর ভিতরের ডাইনীটা তো ওর অধীন নয়! সেই তো ওর জীবনের মালিক, তারই হুকুমে ওকে চলতে হয়। তার হুকুম ছাড়া ওর মরবারও অধিকার নেই। তার ভিতরের যে ডাইনীটা—সে এক সিদ্ধবিদ্যা, তাকে কোন নূতন মানুষকে না-দেওয়া পর্যন্ত স্বর্ণ মরবে না।

স্বর্ণরে মাসী কি কে যেন ছিল ডাইনী!

মৃত্যুকালে আত্মীয় স্বজনদের খবর পাঠিয়েছিল—কিন্তু কেউ যায়নি। ভয়ে যায়নি, যদি সে কোন কৌশলে তাকে দিয়ে যায় ঐ সর্বনাশা ভয়ঙ্কর বিদ্যা!—সে যে ডাইনী হয়ে যাবে।

মৃত্যুর পর স্বর্ণ গেল। নিশ্চিন্ত হয়েই গেল। বিদ্যা সে তো কাউকে দিয়ে দিয়েছে। নইলে মরণ হল কেমন করে। গিয়ে দেখলে—তখন মাসীর অনেক আত্মীয় এসেছে। আত্মীয় যা ছিল ভাগ করে নিয়েছে। সকলে চলে গেল। বিধবা তরুণী স্বর্ণ বসে রইলো দাওয়ার উপর। তার যেমন অদৃষ্ট। হঠাৎ ম্যাও ম্যাও শব্দ করে মাসীর পোষা বিড়ালটি তার পা ঘেঁষে বসল। ওটাকেই কেউ নিয়ে যায়নি। বিড়ালটা তার পায়ে পা ঘষলে, গর গর শব্দ করলে। লেজটা উঁচু করে তার নাকে-মুখে ঠেকিয়ে দিলে। যেন বললে—আমাকে তুমি নিয়ে চল। তুমি কিছুই পাওনি। আমাকেও কেউ নেয়নি।

স্বর্ণের মায়া হল। নিয়ে এল বেড়ালটা। মাছ ভাত-দুধ খাওয়ায়, কোলের কাছে নিয়ে শোয়। পাশের জেলে পাড়ায় যায়, বাউরী পাড়ায় যায়।

সেদিন হইচই উঠল জেলে পাড়ায়।

জেলেদের একটা কচি ছেলের কি হয়েছে ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে, আর কাঁদছে—কাঁদছে যেন বেড়ালের মত আওয়াজ ক'রে।—এ্যাও। অবিকল বেড়ালের শব্দ।

গুণীন এল। গুণীন দেখে বললে—ডাইনীর কাজ। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—ডাইনটা মনে হচ্ছে—

বলতে হ'ল না শেষটা—স্বর্ণের বেড়ালটা ছুটে এল উঠনে, রোঁয়া ফুলিয়ে লেজ ফুলিয়ে—এ্যা-ও... করে থাবা পেতে বসল।

—এই। এই তো বেড়ালটা, এইটাই ডাইন।

—বেড়াল ডাইন?

—হ্যাঁ। কোন ডাইন মরবার সময় ওকে দিয়ে গেছে ডাইনী-বিদ্যে।

—ঠিক কথা। স্বর্ণের মাসী ছিল ডাইনী। বেড়াল তো তারই। কি সর্বনাশ।

একটা জোয়ান জেলের ছেলে—দুরন্ত ক্রোধে বসিয়ে দিলে এক লাঠি তার মাথার উপর। মাথাটা প্রায় চুর হয়ে গেল। কিন্তু তবু মরল না

লেজ পাছড়াতে লাগল। নখগুলো বের করে মাটির উপর আঁচড়াতে লাগল।

গুণীন বলল—সাবধান। কেউ কাছে যাবে না। ও এখন ডাইন মন্ত্রটি দেবার চেষ্টা করবে। নইলে ওর মৃত্যু হবে না।

সে মন্ত্র পড়লে, নিজের অঙ্গবন্ধন করলে—তারপর সন্তর্পণে লেজে ধরে বের ক'রে ফেলে দিয়ে এল গ্রামের প্রান্তে।

স্বর্ণ ঘরে বসে সভয়ে কেঁপে উঠল।

লোকে তাকে গাল দিয়ে গেল। কেন এনেছিল সে ওই পাপকে।

সন্ধ্যের মুখে ক'টি ছেলে পথ দিয়ে গেল, তারা ব'লে গেল বেড়ালটা এখনও মরেনি।—ইঃ, কি গোঙাচ্ছে! বাপরে! শিউরে উঠল তারা।

স্বর্ণ গেল চুপি চুপি। না দেখে থাকতে পারলে না।

সাদা দুধের মত বেড়ালটার রঙ—রক্তে-ধূলোয় পিঙ্গল হয়ে গেছে। কি যন্ত্রণা-কাতর শব্দ।

স্বর্ণ এগিয়ে গেল—দুপা, এক পা ক'রে।

তাকে স্পর্শ করলে।

বেড়ালটা মরে গেল।

স্বর্ণের একি হল?

স্বর্ণের চোখে একি দৃষ্টি! একি হ'ল তার? এসব সে কি দেখছে? ওই যে গর্ভবতী ছাগলটা যাচ্ছে—তার গর্ভের মধ্যে দুটি ছাগল ছানাকে দেখতে পাচ্ছে। ওই যে কলাগাছটা—ওর ভেতর দেখতে পাচ্ছে—কলার মোচা।

তার জিভ সরস হয়ে উঠছে। লকলক করে উঠছে! একি হল তার? হে ভগবান!

* * *

এমনি করে নাকি স্বর্ণ হয়েছিল ডাইনী।

সে আবার কাউকে ডাইনী বিদ্যে দেবে—তবে তার মরণ হবে। নইলে ওই মাথা ভাঙা বেড়ালটার মত কাতরাবে, কাতরাবে, কাতরাবে—তবু তার মৃত্যু হবে না। মৃত্যু চোখের সামনে বসে থাকবে।

ও বলবে—আমাকে নাও গো। আমাকে নাও।

মৃত্যু বলবে—কি ক'রে নেব? এই বিদ্যে তুই আগে কাউকে দে—তবে নেব। নইলে তো পারব না।

স্বর্ণের হাত নাই তার ভিতরের ডাইনীর উপর।

সে কি গ্রামের কারুর বাড়ী যেত পারে? বাপরে!

আমার অনেক বয়স পর্যন্ত স্বর্ণ বেঁচে ছিল। আমি বলতাম—স্বর্ণ পিসি।

ছেলেবেলায় কখনও সামনে যেতে সাহস হত না। বড় হবার পর ওপথে গিয়েছি এসেছি; নিজের ঘরের আধো-অন্ধকার আধো-আলোর মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি। চুপ করে বসে থাকত। কারও সঙ্গে কথা বলত না। কেউ কথা বললে তাড়াতাড়ি দু-একটা জবাব দিয়ে ঘরে ঢুকে যেত।

আমার বিশ-বাইশ বছর বয়স যখন হল, তখন আমি তার বেদনা বুঝলাম। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেও সে বিশ্বাস করত—সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ ক'রে সে মনে মনে শিউরে উঠত। কাউকে চোখে দেখে ভাল লাগলে চোখ বন্ধ করত। তার আশঙ্কা হ'ত, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেলবে;—হয়ত বা খেয়ে ফেলেছে বলে শিউরেও উঠত। মনে হ'ত ডাইনীমন্ত্র—বিষাক্ত তার ভালবাসা—লোভ হয়ে তীরের মত গিয়ে তাকে বিঁধে ফেলেছে তার হৃৎপিণ্ডে!

ডাইনীতে আজ আর বিশ্বাস করি না। এ-কালের ছেলেরাও করে না। কিন্তু স্বর্ণ ডাইনীর ডাইনীত্বের একটি বিচিত্র পরিচয় আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। সেই কথাটি বলব।

তখন আমার বয়স নয় কি দশ। কিন্তু ঘটনাটি আজও মনে হয় এই ক'দিন আগের দেখা ঘটনা। হঠাৎ শুনলাম—ও-পাড়ার অবিনাশদাদাকে স্বর্ণ ডাইনে খেয়েছে। অর্থাৎ ডাইনে নজর দিয়ে—দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করেছে, তার ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাকে শুষে খাচ্ছে। গ্রামটা একেবারে তোলপাড় করে উঠল। বিখ্যাত গুণীন ছিলেন আমাদেরই বাড়ীতে। আমার বাবা গ্রামের বাইরে বাগানে তারামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেইখানে থাকতেন এক সন্ন্যাসী, পশ্চিম দেশীয় সাধু। আমি তাঁকে বলতাম গোঁসাইবাবা; অর্থাৎ গোস্বামী বাবা। তিনি জানতেন অনেক বিদ্যা। তাঁকে খবর দেওয়া হ'ল। তিনি এলেন; আমি তাঁরই সঙ্গে গেলাম, স্বর্ণ ডাইনের কীর্তি দেখতে এবং গোঁসাইবাবার ডাইন তাড়ানো দেখতে।

অবিনাশদাদা, অবিনাশ মুখুজ্জের বয়স তখন সতের আঠারো! বাড়ীতে আছে মা আর দুই বোন। অবিনাশদাদার মা—গোঁসাইবাবাকে বলেন

গোঁসাইদাদা, অবিনাশদাদা বলেন—গোঁসাইমামা। অবিনাশ দাদার বাড়ী তখন লোকে লোকারণ্য ; স্বর্ণ ডাইন অবিনাশকে খেয়েছে, রামজী সাধু ঝাড়বেন।

মেটে কোঠার উপর অবিনাশদাদা শুয়ে আছেন, চোখ বন্ধ। প্রবল জ্বর। ডাকলে সাড়া নাই। মাথার শিয়রে বসে মা। পাশে বসে বোন। চোখের জল ফেলছেন। রামজী সাধু গিয়ে একপাশে বসলেন—তার পাশেই আমি।

ডাকলেন—ভাগ্না। অবিনাশ ভাগ্না।

কোন উত্তর দিলেন না অবিনাশদা।

—অবিনাশ! এ! গায়ে নাড়া দিলেন।

এবার অবিনাশ ঘুরে শুল। বললে—মর হা' ঘ'রে গোঁসাই। আমি মেয়েছেলে। আমার গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন?

—হুঁ। তু কৌন? মেয়েছেলে? কে রে তু?

অবিনাশদা উত্তর দিল না।

—এ। তু কে রে? এ?

—বলব না

—বলবি না।

—না।

মন্ত্র পড়া শুরু হ'ল। বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়েন আর ফুঁ দেন—ছু! ছু! ছু!

পরিত্রাহি চীৎকার করে অবিনাশ। বলছি। বলছি, বলছি!

তবু মন্ত্র পড়া চলল, সঙ্গে সঙ্গে ফুৎকার।—ছু! ছু! ছু!

—বাবারে, মারে! মরে গেলামরে! ও গোঁসাই আর মেরো না। বলছি আমি বলছি!

—বোল। বোল তু কে? বোল।

—আমি স্বর্ণ!

আজও স্পষ্ট কানে শুনতে পাচ্ছি। আমি স্বর্ণ। চোখে সব দেখতে পাচ্ছি! থাক সে কথা!

গোঁসাই প্রশ্ন করলেন—স্বর্ণ? তু কাহে ইঁয়া? আঁ? এখানে কাহে?

—আমি একে খেয়েছি যে।

—হাঁ—হাঁ। উ তো জানছি। ওহি তো শুধাচ্ছি—কাহে—কাহে খেলি?

—কি করব? আমার ঘরের সামনে দিয়ে এই বড় বড় আম হাতে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি থাকতে পারলাম না, আমি আম না পেয়ে ওকেই খেলাম।

—কাহে, তু মাঙলি না কাহে? কাহে বললি না—হামাকে দাও?

—কি করে বলব? একে লোভের কথা, তার উপরে মেয়েলোক, আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না।

—হাঁ! তব ইবার তু যা ভাগ্।

—না। তোমার পায়ে পড়ি, যেতে আমাকে বোল না।

আদেশের স্বরে গোঁসাই বললেন—যা তুই। হামি বলছে।

—না! বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অবিনাশদার মুখ দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী।

—না? আচ্ছা। এ দিদি, আন্ সর্‌যা।

সরষে এল। হাতের মুঠায় সরষে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ছুঁ শব্দে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে মারলেন অবিনাশদাদার গায়ে।

চীৎকার করে কেঁদে উঠল অবিনাশদাদা—বাবারে মারে, ওরে মেরে ফেললে রে! ওরে বাবারে!

আবার মারলেন সরষের ছিটে।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আর মেরো না, আমি যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ যাব।

সঙ্গে সঙ্গেই অবিনাশ কেঁদে উঠল—ওগো, যেতে যে পারছি না গো।

—পারছিস না? চালাকি লাগাইয়েছিস, অঁা? হাত তুললেন রামজী সাধু, মারবেন ছিটে।

অবিনাশ চীৎকার করলে আবার—না না। যাচ্ছি।—

—যাবি?

—হ্যাঁ যাব।

—তব্ এককাম কর্। ঘরের বাহারে একঠো কলসীমে জল আছে, দাঁতে উঠাকে লে যা। নেহি তো—

—তাই, তাই যাচ্ছি।

জ্বরে অচেতন অবিনাশ উঠে দাঁড়াল। দাদার মা ধরতে গেলেন। রামজীবাবা বললেন না।

ঘর থেকে অবিনাশ বের হ'ল। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি তার। ঘরের

বাইরে দোতালার বারান্দায় জলপূর্ণ কলসী আগে থেকেই রাখা ছিল, সেটার কানা দাঁতে কামড়ে তুলে নিলে। দাঁতে ধরেই সে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে, উঠানে নামল, বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, দাঁত থেকে কলসীটা খসে পড়ে ভেঙে গেল, সে নিজেও পড়ে গেল মাটির উপর—ধরলেন গোঁসাইবাবা। এবার বিপুল বলশালী পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসী কিশোর বা সদ্য-যুবা অবিনাশকে ছোট ছেলেটির মত পাঁজাকোলে করে তুলে উপরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। গোঁসাইবাবার পাশে পাশেই রয়েছি আমি।

এবার গোঁসাইবাবা ডাকলেন—অবিনাশ, মামা!

—অ্যাঁ?

—কেমন আছ?

—ভাল আছি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিনাশদাদার জ্বর ছেড়ে গেল। আমার শিশু-চিত্তে ডাইনী আতঙ্ক দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল। স্বর্ণ সে দফা যে মার খেয়েছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

অনেক দিন পর। এখন আমার বয়স তের-চোদ্দ বৎসর। স্বর্ণ হঠাৎ আমাদের বাড়ী যাওয়া-আসা শুরু করলে। পান তরকারি নিয়ে আসত। শুনলাম, ফুল্লরাতলায় যাওয়া-আসার পথে মায়ের সঙ্গে স্বর্ণের কথাবার্তা হয়েছে। মা তাকে বলতেন, ঠাকুরঝি। ওইটুকুতেই সে কৃতার্থ। স্বর্ণ আসত এরপর আমাদের বাড়ী। আমার ভয় চলে গেল। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, দেখতাম স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো-অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নিঃসঙ্গ পৃথিবী-পরিত্যক্ত স্বর্ণ।

স্বর্ণ ছাড়া আরও অনেক ডাইনী ছিল। তার চেয়ে গল্প ছিল অনেক বেশী। প্রকাণ্ড মাঠে একটা অশ্বত্থগাছ ছিল। মাঠটার চারিদিকে আর যে গাছগুলি ছিল সেগুলি সবই বট, মাঝখানে ওই অশ্বত্থগাছটি খানিকটা হেলে দাঁড়িয়ে ছিল। একদিকের শিকড় উঠে বেরিয়ে পড়েছিল। মনে হত গাছটার আধখানা আছে আধখানা নাই। শুনতাম ওটা ডাকিনীর গাছ। দেশে নাকি ছিল ভারী এক গুণীন। কাঁউরের অর্থাৎ কামরূপের বিদ্যাও তার জানা ছিল। একদিন গরমকালের রাত্রে গ্রামের প্রান্তে বসে

কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে গান গল্প করছে, এমন সময় আকাশ পথে একটা শব্দ শোনা গেল। প্রচণ্ড বেগে যেন একখানা মেঘ উড়ে চলছে! সকলে বিস্মিত হল—একি? আশ্চর্য মেঘ তো! গুণীন হেসে বললে—মেঘ নয়! গাছ উড়ে চলছে।

—গাছ? গাছ উড়ে চলে?—কি বলছ?

—চলে। কাপরূপের ডাকিনীবিদ্যা যারা জানে। তারা গাছে বসে বিদ্যার প্রভাবে উড়িয়ে নিয়ে চলে—দেশ থেকে দেশান্তর। ডাকিনী চলেছে আকাশ পথে।

বিশ্বাস করলে না কেউ। বললে—তুমি ধোঁকা দিচ্ছ।

—দেখবে।

—দেখাও?

গুণীন হাঁকতে লাগল মন্ত্র। আকাশে চীৎকার উঠল, চিলের মত চীৎকার, এক সঙ্গে যেন বিশ-পঁচিশটা চিল দুরন্ত ক্রোধে আকাশের বুক চিরে চীৎকার করে উঠল—ঈ—।

সকলে ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু গুণীন আপন মনে মন্ত্র উচ্চারণ করেই চলল। মেঘের মত জিনিসটির গতি থামল না। কিন্তু সে সামনে আর ছুটল না। পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে মাটির উপর নেমে এল এক অশ্বত্থগাছ। গুণীনের মন্ত্র তখনও থামেনি। মাটি ফাটল, গাছের শিকড় মাটির সেই ফাটলে ঢুকল, গাছটি এখানে জন্মানো গাছের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল! তার চেয়েও বিস্ময়ের কথা—গাছের মাথায় দেখা দিল অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে। একপিঠ এলোচুল কিন্তু সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা।

লোকে মাথা হেঁট করলে!

ডাকিনী বললে—আমাকে নামালে তুমি গুণীন, দশের সামনে এই অবস্থায়। আমাকে লজ্জা দিলে! আমি ডাকিনী হলেও মেয়েছেলে, আমার লজ্জা রক্ষা কর, আমাকে কাপড় দাও।

গুণীন হাসল।

ডাকিনী তখন হাত বাড়িয়ে বললে—দাও, কাপড় দাও।

গুণীন হেসে ঘাড় নাড়লে।—সবুর কর। সবুর কর।

কিন্তু যারা গুণীনের সঙ্গী—তাদের সবুর হল না!

একজন বললে—ছি ভাই!

গুণীন তাকে ধমক দিলে—না।

ততক্ষণে একজন অতর্কিতে গুণীনের কাঁধের গামছাখানাই টেনে মেয়েটিকে ছুঁড়ে দিলে। গুণীন আঁতকে উঠল—করলি কি? করলি কি?

ডাকিনী খিল খিল করে হেসে উঠল। গামছাখানায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত সামনের দিকে ঢেকে নিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের দিকে গামছটার প্রান্তটা ধরে উপরের দিকে টেনে নিয়ে পিছনের দিকে মাথা পার করে ফেলে দিলে! গুণীন মর্মান্তিক চীৎকার করে উঠল—সকলে সভয়ে দেখলে, গুণীনের দেহের চামড়াও পায়ের দিক হতে ছিঁড়ে ক্রমশঃ মাথার দিকে গুটিয়ে পিছনের দিকে উল্টে গেল। চামড়া ছাড়ানো মানুষটা পশুর মত আর্তনাদ করে উঠল সে গিয়ে আবার চাপল সেই গাছে। গুণীন সেই অবস্থাতেই তখনও মন্ত্র পড়ছিল।

মন্ত্র আধখানার বেশী পড়তে পারলে না সে। গাছটা আধখানা উঠল না, আধখানা ছিঁড়ে আবার উঠল আকাশে। আবার আকাশে শব্দ হতে লাগল। উড়ন্ত মেঘের মত চলে গেল—কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে। ওই অশ্বত্থ গাছটা সেই আধখানা গাছ।

আজ সে কালের পরিবর্তন হয়েছে। ডাইনাতে বিশ্বাস ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে। ডাইনীও আজ আর নাই বললেই হয়। অশিক্ষার গাঢ় অন্ধকারে যারা আজও ডুবে আছে তাদের মধ্যে হয়তো আছে। সে কালের ডাইনীর বিচিত্র গল্পও আজ লোকে ভুলে আসছে। এই গল্পগুলির মধ্যে শুধু অন্ধ বিশ্বাসই তো নাই—আছে কত মানুষের মর্মান্তিক বেদনা! সারাটা জীবন তারা এই অপবাদের গ্লানি বহন করে চলত। নিজেরাও বিশ্বাস করে নিত এই অপবাদকে সত্য বলে আর ভগবানকে ডাকত স্বর্ণের মত—আমার এ লজ্জার বোঝা নামিয়ে দাও প্রভু। এ ভয়ঙ্কর জীবনের অবসান কর। চোখের জল মুছে ফেলত কাঁপড়ের আঁচলে, মাটিতে কোন ক্রমে একফোঁটা ঝড়ে পড়লে শিউরে উঠত, মা বসুমতীর বুক যে জলে উঠবে।

'মৌচাক'। বৈশাখ ১৩৪৮

সমাপ্তি

সাগরের বুকে প্রাতঃ সবিতার রক্তরাঙা মূর্তির প্রতিচ্ছবি। যুগ যুগান্তের বিরামহীন ধ্যানে সে এ সিদ্ধি লাভ করেছে, আজো তার বুকে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা; আজো সে ঢেউয়ের মাথায় তাঁরি উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করছে নিয়মিত; শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন--

বালুবেলায় ছোট বাঙলো দাঁড়িয়ে। অনন্ত সমুদ্রের পাশে মানুষের সৃষ্টি কতো অসহায়, কতো ক্ষুদ্র; মানায় না যেন কিছুতেই।

ইজি-চেয়ারে মাথা রেখে তন্দ্রাতুর মনীষ শুয়ে। উদ্দাম বাতাস, লক্ষ্যহীন সে, তাই সব জিনিসের মাঝেই এনে দেয় বিশৃঙ্খলার ভাব। উড়ছে মনীষের রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলো রোগপাণ্ডুর ফ্যাকাশে কপালের ওপর, চোখের ওপর, মুখের ওপর; আর তার জীবন-শেষের ক্ষুদ্র কাব্য, তার শেষ সৃষ্টি, তার জীবন চোয়ানো স্মৃতি, সেও যেন স্রষ্টার আসন্ন বিদায় ব্যথায় লুটোপুটি খাচ্ছে কঠিন মেঝের ওপর! তবুও মানুষ অচেতন, নির্লিপ্ত। প্রতি মুহূর্তে মরণের পানে এগিয়ে যাওয়ার নিঃশেষতা, তার ওপর গত রাত্রির নিদ্রাহীন ক্লান্তি, আর সবার ওপর তার কামনাহীন নিশ্চিন্ততা। জীবন তার ফুরিয়ে যাক্ কোনো আপত্তি নেই। সে যে রচনা করেছে তার ক্ষুদ্র কাব্যের, রূপ দিয়েছে কল্পনাকে, ভাষা দিয়েছে মূককে। সে আজ স্রষ্টা। তার সৃষ্টি তারি প্রতিনিধি হয়ে পৃথিবীর বুকে অনন্তকালের জন্যে স্থান করে নেবে। তার দেহের নিঃশেষে আজ কোন ব্যথার হবে না। তার জন্যে আজ করুণাশ্রুর পথ অবরুদ্ধ; কোনো প্রয়োজনও নেই তার···

বীথিকা প্রাতঃভ্রমণ সেরে এসে বিস্ময়সূচক ভঙ্গীতে বলে উঠলো—এখনো শুয়ে!

তীব্র হলেও তার কথার আওয়াজ মনীষের চেতনায় আঘাত করলো না, সে আনন্দহীন।

বীথিকা হাতের ছোট ক্যামেরাটা টেবলের ওপর রাখলো। হঠাৎ তার

দৃষ্টি আকর্ষিত করলো দিনের আলোয় ম্লান হয়ে যাওয়া জ্বলন্ত ল্যাম্পটা; মেঝেতে একরাশি ফুলস্কেপ কাগজ এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে। সে লক্ষ্য করে দেখলো। নতুন লেখা; এখনো কালি শুকিয়ে কালো হয়নি। ঝাঁঝাল স্বরে সে বলে উঠলো—বুঝেছি, আবার সেই সারা রাত্রি জেগে লেখা হয়েছে! ডাক্তারের বারণ, স্বাস্থ্যের অক্ষমতা, কিছুই যদি না বুঝতে চাও—বেশ, যা মনে চায় করো। আমিও আর কথাটি কইছি না, পরেও উঠি না আর!

শেষের কথা কয়টা ধরা-গলায় হলেও মনীষের তন্দ্রা ভেঙে গেলো—আজই আমার শেষ দিন বীথিকা। লেখারও সমাপ্তি, আর ···

—থাক্‌, থাক্‌, খুব হয়েছে! কেন আর মিথ্যের বোঝা বাড়াবে প্রতিজ্ঞা করে। বহুবারই তো দেখা গেছে—বরঞ্চ তুমি যত পারো লেখো। আয়ুর পরিসমাপ্তি জোর করে টেনে আনো। আমি কিছুতেই থাকতে চাই না!

বীথিকা সশব্দ-পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। মনীষের শুকনো ঠোঁটে একটু অগ্নিময় হাসি খেলে গেলো। আবার টেবিলের উপর তার মাথাটা পড়লো ঝুঁকে।

সারাদিন অবিচ্ছিন্ন নীরবতা একাকীত্বের সূক্ষ্মতম অনুভূতি। বীথিকা গেছে ফরেস্টে; পাইনের মর্মরতা শুনতে, হরিণের চঞ্চল খেলা দেখতে। হয়তো বা অভিমানের গ্লানি ও মনের ব্যথাকে সরিয়ে সৌন্দর্য ও আনন্দ বোধের পূজা করতে।

—'মা-গো। আর পারি না', মনীষ পাশ ফিরতে চেষ্টা করে; শক্তির দৈন্য মুখে-চোখে প্রকাশ পায়। ওটা ওর ধৃষ্টতা; সামর্থ্যের ওপর জোর খাটানো। প্রকৃতি এর প্রতিশোধ নেয়, বিরামহীন জোরে, আরও জোরে। বিকৃত মুখে বুকটা চেপে ধরে মনীষ, টকটকে রক্ত এক-ঝলকা বেরিয়ে আসে। তারপর নিঝুম। মনীষ এলিয়ে পড়ে। রোগের কী ভীষণ যন্ত্রণা! বিধাতার কী ক্ষমাহীন মার!

অনেকটা সময় কেটে যায়···

পূর্ণিমার সন্ধ্যা। আকাশে চাঁদ, বালুবেলায় অপরিমেয় জ্যোৎস্না, আর সবচেয়ে লাভবান ঐ সমুদ্র, ঐ গর্জনে উদ্বেল জলরাশি, ঐ তরল শক্তি; পৃথিবীর তিনভাগ গ্রাস করেছে ও, এখনো ওর অন্তহীন ক্ষুধা! ওর বুকে অজস্র চাঁদ, অকৃপণ জ্যোৎস্না ঢেউয়ের দোলায় হাসছে, নাচছে। ভেঙে চুরমার হয়ে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে: কী পূর্ণ, কী মহান, কী অব্যক্ত সুন্দর ও···

মনীষের মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করছে ; যেন অসাড় প্রাণহীন ! চোখের জ্যোতি তার তীব্রতা হারিয়ে ফেলেছে। অন্ধকারকে সে ভালোবাসে, সে তারই পূজা করছে ! ঐ যে আনবিল জ্যোৎস্না—ও অমন ফ্যাকাশে কেন ? ধোঁয়া ? কুয়াশা ? না, না, জ্যোৎস্নার কোনো অপরিচ্ছন্নতা নেই ; নিষ্কলুষ সে, অমলিন সে ! তবে ? ঐ যে আবার। অন্ধকারের ভীষণতা যেন ভয়ে বিহ্বল করে দিচ্ছে !

—ওঃ, কী আলোড়ন···সমুদ্র তুমি আজ হার মানবে আমার কাছে। আর পারি না···উঃ ভগবান···

মনীষ শক্ত করে চেপে ধরলো টেবলের ওপর তার লেখা কাগজগুলোকে, তার শক্তির সাফল্য, তার জীবনের প্রমাণ ; তার শেষ সৃষ্টি !

—যেন একটু আলো—

কিন্তু সত্যি, না স্বপ্ন ? অস্ফুট স্বরে মনীষ ডাকলো—বীথিকা !

টেবিলের ওপর ল্যাম্পটা রেখে—বীথিকা জবাব দিলো—কি ?

—একটু বোসো বীথি !

—কেন ? লিখবে না ?

—আজ আমার চরম সাফল্য বীথি। লেখা আমার ফুরিয়ে গেছে। আজ আমি নিরর্থক। কর্মহীন।

বীথিকা মনীষের হাতটা চেপে ধরে আনন্দ মিশ্রিত স্বরে বললো—সত্যি ? সত্যি তুমি আর লিখবে না ? আর অনিয়ম, অত্যাচার, রাতজাগা করবে না বলো ? লক্ষীটি ! ঐ জন্যেই তো তোমার শরীর আরও ভেঙে যাচ্ছে।

উৎকণ্ঠা ভরে মনীষের বুকের উপর বীথিকা মাথাটা চেপে রাখলে।

—না, না, না ; সত্যিই না বীথিকা। একটু ক্লান্ত হাসি, দীপ্তিহীন।

বীথিকা মনীষের কপালে একটি ছোট চুমু খেলো ; সোহাগ পুলকের ক্ষুদ্র নিদর্শন।

আঃ ! কী তৃপ্তি, কি স্নিগ্ধ ! আর না, আর কিছুই চায় না মনীষ। অন্ধকার তুমি এসো, অবসাদ তুমি এসো, শান্ত সুপ্তি এসো···

জানলার বাইরে এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ সমুদ্রের পানে তাকিয়ে থেকে বীথিকা বলে উঠলো—আমি তাড়াতাড়ি সমুদ্রে স্নানটা সেরে আসি। এক্ষুনি আসছি, কি বলো ? এই সময়ে ঐ ঢেউগুলোর ডাক আমার কাছে অনুপেক্ষনীয়। কি—কি বদ অভ্যেস !

নীষের হাতটা ছেড়ে দিয়ে সে বেরিয়ে গেলো ··

—মা···ও···

একটা ছোট, ভারি নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে···

অতি কষ্টে একটু বেঁকে শুলো মনীষ। আলোর তীব্রতা বাড়িয়ে দিল। পাশ থেকে কলমটা তুলে নিয়ে কাগজে আঁচড় কাটতে লাগলো···

দৃষ্টি তার অনন্ত সমুদ্রের পানে···

সে ভাবে—সীমাহীন সাগরের সৌন্দর্য উপভোগ করছি। আজও, আমার বাঁচার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত ; জীবনের চরম সাফল্য আমার এই সৃষ্টি। আমার কাব্য তারি এই অনাবিল আনন্দ। কী অনির্বচনীয় সুন্দর ঐ অসীম মহাসাগর! একের পর এক একটা ঢেউ অশ্রান্ত গর্জন করতে করতে এসে বালির তটে আছড়ে পড়ছে গতিবেগের তীব্রতায়। মাথায় ওদের প্রচুর এলোমেলো ফসফরাসের দীপ্তি। যেন পাশের ফেনা, নীলিমার অসীম সৌন্দর্যকে তারা আলোর মালায় সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য নিবেদন করছে। ঐ আলো, ঐ উদ্দামতা, ঐ উচ্ছল জলতরঙ্গ তোমায় ডাক দিয়েছে বীথিকা। যাও রাণী। উপভোগ কর ওর অকুণ্ঠ আঘাত, গায়ে মাখ ওর উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা, ওর অত্যাচার! আর আমি?···ওরি কাছ হতে দূরে—বহুদূরে ঐ যে বিরাট গাম্ভীর্যময় সমুদ্রে, অনন্ত অসীম আকাশের কোলে মিশে গেছে—রহস্যময় গভীর অন্ধকারের মাঝে —তাকে উপলব্ধি করি দূরে হতে বসে। ওর ডাক বড় করুণ। পারের বাঁশীর মতোই। অথচ আমার কাছে অলঙ্ঘনীয়···

মনীষ হাওয়ায়-ওড়া লেখা কাগজ একখানা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিতে যায় ; পারে না। হঠাৎ প্রচণ্ড কাশির বেগ আসে। সে বেসামাল হয়ে পড়ে। কী ব্যথা ওর মুখে! দীনতার কী সকরুণ মূর্তি! রক্ত এক ঝলক, আবার কাশি। আবার রক্ত, আবার···

—মাগো, আর যে পারি না।

মনীষ শুয়ে পড়ে। নিস্পন্দ, নিথর, চোখের পাতা বন্ধ, অনন্ত অন্ধকারের ধ্যানে মগ্ন ; স্থির মহাশান্তির প্রভাবে অচঞ্চল···

বাইরে তখন উদ্দাম জনস্রোত, চাঁদিমার অকুণ্ঠ বিস্তৃতি। ঢেউয়ের মাথায় আলোর ফেনা। আর তাদের মাঝে বীথিকার পূর্ণ আত্মবিসর্জন, গা-ভাসানো!

আর এদিকে অস্পন্দ মনীষের হাতে তার কাব্য, তার সৃষ্টি, তার জীবন-চোয়ানো স্মৃতি—

সে কাব্যের নায়ক মনীষ, নায়িকা কল্পনার বীথি···রহস্যময়, করুণ···!

'বঙ্গলক্ষ্মী'। চৈত্র ১৩৪৩

শবরীর প্রতীক্ষা

বৈশাখে লিপিকা এনে দিয়ে গেল ঝড়
ধরণী বেপথুমতী কাঁপে থরথর
বলে, কি বারতা কঠিন নিষ্ঠুর।
আষাঢ়ে লিপিকাখানি নিয়ে এল মেঘ
সুদীর্ঘ সরসলিপি সজল আবেগ
ভরা ধরণীর চিত্ত হয়ে গেল ভোর।
আশ্বিনে লিপিকা এল রৌদ্রনিলীমায়—
ধরণী প্রসন্না পূর্ণা, পড়ে লিপিকায়।
জাগে সেথা কোজাগরী জাগর নিশায়।
হেমন্ত লিপিকা আসে সোনালী লেখার –,
ধরণী সীমন্ত টানা রূপালী রেখার
মাঝে সিন্দূরের বিন্দু, হাসে পূর্ণতায়।
পৌষালী লিপিকা এল, ধরণী জরতা
শবরী দণ্ডকারণ্যে মাটির মূরতি
ধ্যানে ডাকে প্রাণারাম শ্রীরাম কোথায়?
ফাগুনে লিপিকা এল, মুকুলে যৌবনে
জরতীর জরা মোছে, নবীন যৌবনে
জেগে ওঠে, দৃষ্টি তোলে রামের নয়নে।

গান

১ ॥

সেই মেলাতে কবে যাব
ঠিকানা কি হায়রে !
যে মেলাতে গান থামে না
রাতের আঁধার নাইরে ।
ও রসময় ভাই রে ।

২ ॥

আহা—ভালবেসে—এই বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে—
তুমি হাস—আমি কাঁদি
বাঁশী বাজুক কদম তলে রে !
আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি আমার হবে রাজা
(হার মানিলাম) হার মানিলাম
তুলিয়ে দিয়ে জয়ের মালা তোমার গলে রে
আমার ভালবাসার ধনে হবে তোমার চরণ পূজা
তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে
পিদীম জ্বালে রে ।

৩ ॥

ও আমার মনের মানুষ গো !
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর ।
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা
আমায় হেথা টানে নিরন্তর
সেই ছটাতে ঘর পুড়িল পথ করিলাম সার !
চারিদিকে চার বৃন্দাবনে বংশী বাজে কার ?
ঘর জ্বলিল—মন হারালো ছটায় সুরে গো !
সুখের একি আকুল আতান্তর !

৪ ॥

চাঁদ তুমি আকাশে থাক আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনেকো হে চাঁদ, তোমার সোনার অঙ্গে লাগবে কালি
না না, তাও করো মার্জনা—আজ থেকে আর তাও দেখব না—
জানতাম নাকো এই কু-চোখের দৃষ্টিতে বিষ দেয় হে ঢালি।
তাই চলেছি দেশান্তরে, আঁধার খুঁজেই ফিরব ঘুরে,
কাকের মুখে বার্ত্তা দিও—ষোল কলায় বাড়ছ খালি।

৫ ॥

চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে কে দেখে না চাঁদ?
তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভাল ঘুচুক আমার দেখার সাধ।
ওগো চাঁদ তোমার লাগি—
ওগো চাঁদ তোমার লাগি—না হয় আমি হব বৈরাগী,
পথ চলিব রাত্রি জাগি সাধবে না কেউ তো আর বাদ।

৬ ॥

চাঁদ তুমি আকাশে থাক—আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে—সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।
বলতে তুমি ব'লো নাকো, (আমার) আমার মনের কথা থাকুক মনে।
তুমি দূরে থাকো সুখে থাক আমিই পুড়ি মন-আগুনে!

৭ ॥

ফুলেতে ধূলাতে প্রেম হয় নাকি ফুল ফোটার কালে!
ফুল ফোটে সই আকাশ মুখে চাঁদের প্রেমে হেলে দুলে।
ধূলা থাকে মাটির বুকে, চরণতলে অধোমুখে
ফুল ঝরিলে ধরে বুকে.
সেই লেখা তার পোড়া কপালে!

৮ ॥

এই খেদ মোর মনে মনে
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে
হায়! জীবন এত ছোট কেনে!
এ ভুবনে?

জীবনে যা মটল নাকো মিটবে কি তা হায় মরণে ?
এ ভুবনে ডুবলে যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা ?
হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা ?
এ জীবনে কান্না যত—হয় কি হাসি সে ভুবনে ?
হা   জীবন এত ছোট কেনে ?
এ ভুবনে ?

৯ ॥

মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে
আমার মনের ভালবাসার কদমতলা—
চার যুগেতেই বাজায় সেথা বংশী আমার বংশীওলা।
বিরহের কোথায় পালা—
কিসের জ্বালা ?
চিকন-কালা দিবস নিশি রাধায় যাচে।

১০ ॥

সাড়া দে মা—দে মা সাড়া,
ঘর পালানো ছেলে এলো—বেড়িয়ে বিদেশ-বিভুঁই পাড়া
তোর সাড়া না পেলে পরে মা, কিছুতে যে মন ভরে না,
নাচ-দুয়ারে পা সরে না, চোখে বহে জলের ধারা।

১১ ॥

মধুর মধুর বংশী বাজে
কোথা কোন্ কদমতলীতে
আমি পথের মাঝে পথ হারালাম
ব্রজে চলিতে।

পোড়া মন ভুল করিলি
চোখ তুলিলি পথের ধূলা থেকে
রাই যে আমার রাঙা পায়ের
ছাপ দিয়েছে এঁকে,
ঢুকলি ছেড়ে পথের ধূলো
চন্দ্রবলীর কুঞ্জগলিতে ॥
অনেক আলোর ঘটায় অনেক
ছটা এলোমেলো
আমার হাতের মাটীর পিদীম
লাজে নিভাইল।
এমন যে হায় গভীর আঁধার
কোন পথে যাই বলো ললিতে :
মধুর মধুর........

১২ ॥

মিলন মধু মাধুরীভরা স্বপনরাতি ফুরায়ো না
এ সুখ সম—শেফলী ঝরায়ো না—(ঝরায়ো না)
স্বপন আজি—দেখিতে দাও—দেখিতে দাও—
কাজল মায়া—নয়ন ভরি মাখিতে দাও
ডাকিতে দাও—জাগো প্রিয়—ঘুমায়ো না মোরে ফিরায়ো না
আকাশে মেঘ থাকিতে দাও—থাকিতে দাও—
বাদল ধারে নিখিলধরা ঢাকিতে দাও—
অধরে অধর রাখিতে দাও—আঁকিতে দাও—
এ সুখ স্মৃতি নয়নপাতে ; নয়নে বারি ঝুরায়ো না
এ সুখ মম শেফালী সম—ঝরায়ো না—
স্বপন রাতি ফুরায়ো না।

১৩

তোমার শেষ বিচারের আশায়—
বসে আছি। তোমার রাজকাছারী দেউড়ীতে হে—
বসে আছি।
চোখের জলই পাওনা কি হায় শুধু
এই জীবনের বিকিকিনির পেশায়।

কি যে আমার পাওনা দেনা—
তুমি ছাড়া কেউ জানে না।
অপর জনে তা মানে না—ডিগ্রি নিয়ে শাসায়।

খেয়া ঘাটে পারে পারে
মাশুল দিয়ে বারে বারে
শেষ খেয়ার ধারে এবার এলেম দেউলে দশায়
পাওনা যদি না থাকে তো বল অকূলে কূল ভাসাই
অথৈ পাথার সর্বনাশায়।

১৪ ॥

ওরে আমার ভাইরে
বলি তোর—আলোর তরে ভাবনা কেনে হায়রে।
অন্ধকারেই পরাণ পাখী সেই আশেতে ধায়রে
লক্ষ পিদীম চন্দ্র সূর্য—তাইরে নাইরে নাইরে।
না থাক,
আছে এক জনা ভাই—
এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়
দুই চোখে তার দুইটি পিদীম
হায়—সেকি রোশনাইরে!
সেই জনা মোর মনের মানুষ—
এইখানে খোঁজ পাইরে।

আমার বিয়ে যেমন তেমন দাদার বিয়েয় রায়বিশে
আয় চকাচক মদ খেসে—
দাদার চোখে অঙের নেশা
(তো) নিশার রঙে চোখ রাঙা সে—
পরব পা (পর) চুটকী ঘুঙুর
ঝুমাঝুম বাজবে কিসে
নাকে দিব নথের ফাঁদি
বউয়ের ভাই তু দাম দিসে।

আর ঢকাঢক মদ খেসে—
মদ খেসে লো মদ খেসে—
থাক না মাথার সান্ (ঘোমটা) খুলে—
গায়ের আঁচল যাক খসে ॥
নে হেসে লো নে হেসে
নে হেসে আজ যত পারিস
কাল তাড়াবে বউ এসে।
মরণ : বউয়ের ভায়ের করণ দেখে
পরাণ বুঝি যায় কেশে !
দাঁড়ায় আমার গা ঘেঁষে।

স্মৃতিমূলক রচনা

শিল্পীর স্বাধীনতা

কম্যুনিজম—যে তত্ত্ব বলে—সকল মানুষের সমান অধিকার—সব মানুষ সম-মর্যাদার অধিকারী, যে তত্ত্বের মধ্যে কল্পনা এক স্বর্গরাজ্যের—যে রাজ্যে অন্নে বস্ত্রে শিক্ষায় স্বাস্থ্য-সুখে এক স্বর্গরাজ্যের, যে রাজ্যের মধ্যে অনাচার নেই, পীড়ন নেই, শাসকের রক্তচক্ষু নেই, ভয় নেই, যে রাজ্য-অভয়ের রাজ্য, সেই কম্যুনিজমের প্রতি ১৯১৮ সালের পর থেকে অন্তত বিশ বৎসর ধরে প্রায় প্রত্যিটি লেখকই আকৃষ্ট হয়েছেন। হওয়ারই কথা। রামায়ণে গুহক চণ্ডাল, সুগ্রীব, হনুমানের সঙ্গে ভারতরাজপুত্র রামচন্দ্রের মিতালির কল্পনার মধ্যে, মহাভারতে ব্যাধপুত্র একলব্যের প্রতি অবিচারের কাহিনীর মধ্যে মহর্ষি বেদব্যাসের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁদের কালে এই তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হলে তাঁরাও প্রথম দৃষ্টিতে এর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। পীড়নহীন ভয়-হীন দুঃখহীন এক জগতের কল্পনা যে সকল কালে সকল মানুষের। কল্পনাজীবী লেখকদের এই তো চিরন্তন কল্পনা।

১৯১৮ সালে রুশ দেশে গণবিপ্লব হয়ে গেল, ১৯২১ সালে মহাত্মাজীর প্রথম গণ-আন্দোলন হয়ে গেল—সে আন্দোলন ব্যর্থ হলেও তারই মধ্যে স্বপ্ন জাগল গণবিপ্লবের। তখন আমি রাজনৈতিক কর্মী। রহস্যাবৃত রাশিয়ার কথা—অপরূপ কথা শুনি—তার সঙ্গে কল্পনা করি। বই পাইনে। দু-একখানা বই রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে পাই—তা সংক্ষিপ্ত। মার্ক্সের ক্যাপিটাল পেয়েছিলাম কয়েকদিনের জন্য—কিছুটা পড়ার পর বইখানি ফেরত দিতে হয়েছিল এবং যে কিছুটা পড়েছিলাম তাও ইংরিজীতে স্বল্প জ্ঞানের জন্যে বুঝতে পারিনি। ১৯৩০।৩১ সালে জেলের মধ্যে বন্দীদের আলোচনা-আসরে কম্যুনিজম তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা শুনেও যা শিখলাম জানলাম, তাও এক স্বপ্নরঙীন মোড়কে মোড়া আদর্শবাদ—তার ভিতরের আসল তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক কিছু জানি নি। নিজেই নিজের আদর্শবোধ অনুযায়ী কম্যুনিজমের এক রূপকে তৈরি করে নিয়ে তাকেই তার স্বরূপ বলে ধরে নিয়েছিলাম। ১৯৩১ সালে জেল থেকে বের

হবার সময় বন্ধুদের বলে এসেছিলাম—সক্রিয় রাজনীতির পথে দেশসেবার কর্ম আমি ছেড়ে যাচ্ছি আজ, সাহিত্যের পথে দেশসেবার কর্মের সংকল্প নিয়ে জেল-গেটের বাইরে পা দেব। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সাহিত্য-সেবাকর্মে প্রথম ফল আমার 'চৈতালী ঘূর্ণি'। কাঁচা রচনা কিন্তু তার বিষয়বস্তু আমার দেখা জিনিস; এক চাষী জমিদার ও মহাজনের শোষণে এবং অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়ে কলে শ্রমিক হল—তারপর মালিক-শ্রমিকের বিরোধের ফলে ওই লোকটির মৃত্যু হল। ভদ্রলোকের ছেলে পার্শ্ব-নায়ক সুরেন—সেও সত্য—সে আজও জীবিত, আজও সে দেশসেবায় বিযুক্ত রয়েছে বীরভূমে। তারপর কালিন্দী-গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম লিখেছি। তার মধ্যে আমার বিপ্লবের স্বরূপ কল্পনা আমার নিজস্ব। তার মধ্যে ন্যায়প্রধান, নীতিপ্রধান, সত্যপ্রধান এবং ঈশ্বরবিশ্বাস সুদৃঢ় অটল; যে ন্যায়, যে নীতি, যে সত্যের জন্য বিপ্লবের কামনা—আবাহন, তার উৎস ঈশ্বরবিশ্বাস। তারই মধ্যে মৃত্যু—অমৃত রাজ্যের সেতু। ১৯৪৩ সালে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘের নিমন্ত্রণে সম্মেলনের সভাপতিত্ব যখন গ্রহণ করি তখনও এদের স্বরূপ সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। এই সংঘের প্রথম সভাপতি ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সভাপতি ৺অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়। সুতরাং সন্দেহ তখনও করবার কারণ ঘটেনি। এবং ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট দল তখন সদ্য প্রকাশ্য রাজপথে বের হয়েছে লাল ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে। তাদের ঘোষণা, তারাও ভারতবর্ষে সৃষ্টি করবে কল্প-রাজ্যের। সম্মেলনের অধিবেশনের পরদিন শুনলাম—কংগ্রেসের মত পূর্ণ একটি বৎসর আমাকে সভাপতি হিসাবে যুক্ত থাকতে হবে এদের সঙ্গে। এবার দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লিখলাম 'মন্বন্তর'। মন্বন্তরের মধ্যে কম্যুনিষ্টপন্থী কর্মীই নায়ক। কিন্তু লেখক একজন কম্যুনিজমধর্মী নায়ক। মহাত্মাজীর অনশনের সময়ে সে লিখেছে—"পৃথিবী যাই বলুক—ভারতের চিরন্তন সাধনার ধারা জয়যুক্ত হয়েছে। বশিষ্ঠের পুণ্যফল আজও নিঃশেষিত হয় নাই…। তুমি দীর্ঘজীবী হও মহাত্মা, তুমি চিরায়ু লাভ কর। ভারতের সত্য-ধর্মের প্রতীক তুমি।…আমি বেঁচে থাকব মানুষের মুক্তি-প্রতীক্ষায়। মহাযজ্ঞ আবার হবে। যজ্ঞশেষে উঠবে মানুষের মুক্তিচক্র। সত্যকারের সমাপ্তিতে আসবে নববিধান। সে নববিধানের প্রারম্ভে রচিত হবে বিশ্বমানবের মহাশাস্ত্র।…কতজন আনবে কত শাস্ত্র, কত বাণী। তার মধ্যে ভারত নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে তার চিরন্তন বাণী। হে মহাত্মা, যা ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে, যা মূর্ত হয়েছে তোমার কর্মে, সাধনায়। অন্তর

বিজ্ঞান। জীবনের প্রতি প্রেম—জীবের প্রতি শ্রদ্ধা—সত্যের প্রতি আগ্রহ—মোহমুক্ত কল্যাণ দৃষ্টি—হিংসার প্রতিরোধে অহিংস অনমনীয় দৃঢ়তা…। অমৃতময় মানবসমাজ রচিত হবে।"

আমার কল্পনা আমার কাছে মিথ্যা নয়, ভারতবর্ষের পক্ষেও মিথ্যা নয়, স্বাধীন ভারতবর্ষের ষোল বৎসরের রাষ্ট্রনীতি, পঞ্চশীলের উপর নিষ্ঠা এবং সামরিক উপকরণ নির্মাণে অনাগ্রহ তার প্রমাণ। কিন্তু কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে আমার ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা এ সত্য আমি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম। কাছে আসার ফলে তাদের রঙীন আবরণ একে একে তারাই উন্মোচিত করে নগ্ন স্বরূপে আমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হতে লাগলেন। প্রথম আঘাতের কথা বলি—এই সংঘের আপিসে একদিন গিয়ে শুনলাম—একজন কম্যুনিস্ট সাহিত্যিক নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে গাল দিচ্ছেন—বিভীষণ, কুইসলিং বলে। সেইদিনই বিরোধ শুরু হল। চোখ খুলল। আমি জবাব দিয়ে বাড়ি এলাম। পরদিন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি খ্যাতনামা অধ্যাপক সাহিত্যিক এসে সনির্বন্ধ অনুরোধে বিরোধ মিটিয়ে নিলেন। ঘোষণা করা হল—এই ধরনের উক্তি সংঘে নিষিদ্ধ। কারণ, সংঘ কম্যুনিস্ট দলের নিজস্ব নয়। কিন্তু সেও তো মিথ্যা। তারপর স্বরূপ দেখলাম যে, সত্য এদের মধ্যে নেই—যা সত্য তা দলীয় স্বার্থ। দলীয় স্বার্থে মিথ্যাও বরণীয়। ন্যায় নীতি সত্য সব তাই—সব তাই। এমন কি মানুষের কল্যাণ তাও তাই। কম্যুনিস্টের স্বর্গরাজ্য কম্যুনিস্ট দলের একাধিপত্য। সেখানে ব্যক্তি নেই। আত্মা নেই, ঈশ্বর নেই, অমৃত নেই। আছে আত্মাহীন প্রাণ। আছে মৃত্যু আছে হিংসা, আছে কৌশল; তাতেই বিশ্বাস ও আনুগত্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি অন্ন বস্ত্র বস্তু জ্ঞানের। তাতে অবিশ্বাস অনানুগত্যে আছে দণ্ড; বন্ধন, মৃত্যু। আত্মজ্ঞান—আত্মা অমৃত—ঈশ্বর—তার অধিকারের গণ্ডি থেকে নির্বাসিত ও বিসর্জিতই নয়—ধ্বংসস্তূপের আবর্জনার মত অপসারিত করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। অন্তর আর্তনাদ করে উঠল। আমি ভারতবর্ষের মানুষ—ভারতবর্ষের লেখক—আমার কণ্ঠ দিয়ে আমার লেখনীমুখে কি করে উচ্চারিত হবে জীবনের শেষ মৃত্যুর নিঃসীম অন্ধকারে! সত্য ভ্রান্তি। অমৃত মিথ্যা, ঈশ্বর অলীক! পৌরাণিক ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ না করলাম, ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে পরম বুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র? নির্বাণামৃতের প্রসাদ মিথ্যা? রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, সাধনা, বাণী, আনন্দলোক-

মঙ্গলালোকে তাঁর বিরাজমানতা মিথ্যা? নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মাতৃসাধনা ও ঈশ্বরবিশ্বাস মিথ্যা? আমার অন্তরের তৃষ্ণায় আমার যাত্রা ও উপলব্ধি মিথ্যা? —না।

অন্ন আমি চাই—কিন্তু তাই সব নয় আমার কাছে। আমি চাই অমৃত।

সম্পদ চাই জীবনকে সমৃদ্ধ করতে, কিন্তু জীবন চাই অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত হবার জন্য।

বস্তুজ্ঞান আমি চাই—আত্মজ্ঞানে উপনীত হবার জন্য।

শুধু বিত্তের প্রতিশ্রুতিতে আমি নিজেকে বিক্রয় করতে পারি না। 'ন বিত্তেন তপ্‌ণীয়ো মনুষ্য'। বিত্তের বিনিময়ে আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতা চিন্তার আকাশে পক্ষ বিস্তারের জন্মগত অধিকার আমি বিসর্জন দিতে পারব না; পারি না।

১৯৪৪ সালে আমার স্থলে সংঘের সভাপতি হলেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯৪৫ সালের জানুআরীতে সভাপতি হলেন শ্রীশৈলজানন্দ। হ্যালিডে পার্কে বিপুল জনসমাবেশের সম্মুখে—প্রকাশ্যে তীব্র প্রতিবাদ করে বেরিয়ে এলাম।

ঈশ্বরকে, অমৃতকে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অস্বীকার করে যে তত্ত্ব—সে তত্ত্বকে অন্ন, বস্ত্র, সম্পদের প্রলোভনে বা মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে—কোন কারণে গ্রহণ করতে পারি না। "যেনাহং নামৃতস্যাম্ কিমহ্ তেন কুর্যাম্।"

মনের আয়নায় নিজের ছবি

একালের আত্মসমীক্ষার আয়নায় নিজেকে দেখে নিজের ছবি, ইংরেজীতে যাকে বলে 'সেল্‌ফ্ পোর্ট্রেট', তা আঁকায় বিপদ আছে। আমার পক্ষে তো অসম্ভব। কারণ যে যুগে মানুষের সংজ্ঞা শুধু জীব (জন্তু কথাটা খাতির করে নেই বললাম), অবশ্য বুদ্ধিমান বা যুক্তিবাদী জীব, সে যুগে আত্মসমীক্ষার আয়নায় এই মানুষের ভিতর থেকে একটি জন্তুর চেহারা দেখা যাক বা না যাক, বের করতেই হবে। না হলে বিদগ্ধ সমাজে সেটা সত্য হবে না। এ যুগের শিক্ষিত ভারতবর্ষের মন পুরোপুরি ইউরোপের কাছে দীক্ষা নিয়েছে; তাতে বেদ মাত্র দুটি—একটি ফ্রয়েডীয় বেদ, অপরটি মার্ক্সীয় বেদ। একটির কথা হল সবের বীজ কাম, ফ্রয়েডীয় ভাষায় লিবিডো, মার্ক্সবাদের

বীজ হল অর্থ বা ওয়েল্থ্। ধর্ম ছিল এদেশের মূল কথা—সেটাতে ঢেঁড়া দাগ দিয়ে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

গান্ধীজী রামনাম করতেন, তাঁর অহিংসার ও সব কর্মের মেরুদণ্ড ছিল ঈশ্বর। ধর্মকে ঈশ্বরের কান বলতে পারি, কান টানলে মাথা আসার মত ধর্মের সঙ্গেই ঈশ্বর আসে। এ যুগে ঈশ্বর বাতিলের সঙ্গে মাথার সঙ্গে কানের মত ধর্ম গেছে। ধর্মের মধ্যেই ছিল অহিংসা; কানের মাকড়ীর মত পরানো ছিল; কান গেছে মাথার সঙ্গে, কিন্তু মাকড়ী দুটো খুলে নেওয়া হয়েছে—মনুষ্যরূপী জন্তুর নাকে পরানো হয়েছে ভালুকের নাকে-পরানো দড়ি-বাঁধা মাকড়ীর মত। তাকে অহিংস করে বিশেষরূপে সভ্য করবার জন্য। এই মতই বড় রাষ্ট্রনেতা থেকে ক্ষুদে ছাত্রনেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক সবাই পোষণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের শ্রেষ্ঠ অংশ ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন, তার মধ্যে সুরের তারিফে আমরা গদগদ, রচনাকৌশলে বিমুগ্ধ, শুনে বা পড়ে হায় হায় করেও আমরা ঈশ্বর ও ঈশ্বর-বিশ্বাসকে দরিয়ায় ভাসিয়ে ড্রাম বাজিয়েছি। সেও বড় সাহিত্যিক, ছোট সাহিত্যিক, শিল্পী থেকে সবাই, কে নয়? কেমন করে কোন্ চক্রান্তের ফাঁকে এর মধ্যে আমি টিকে আছি জানিনে।

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন আছেন তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস নিয়ে, দেখে বুঝতে পারি—চক্রান্তের ফাঁক এটা নয়; চাকার দাঁতে ভাঙা যায়নি বলেই আছে। সেই কারণেই ভরসা করে বলতে পারছি যে, ঠিক এইভাবেই আত্মসমীক্ষার আয়নায় আমার সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন কোন একটি জন্তুকে আবিষ্কার করা আমার পক্ষে শক্ত বললে কিছুই বলা হবে না, বলতে হবে সম্ভবপরই নয়। এতে ফ্রাস্ট্রেটেড বা হতাশা-পীড়িত বললে তাই, কেউ বুর্জোয়া বললে তাই, কেউ ফু—ল বললে তাই। তবে এ দিয়ে আমি ভারতবর্ষীয় এ নাকচ করা যাবে না। কিন্তু আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলছি যে কোন সাফল্য বা সার্থকতা, যাকে সাকসেস্ বলে, তা খুব উঁচু ডালে আছে আর আমি নীচে দাঁড়িয়ে 'ঈশ্বর ওটাকে ফেলে দাও' বলে তো ডাকিনে। এবং গরীব, গৃহস্থ, ধনী, অলেখক, যে কোন লেখকের, বড় লেখকের সঙ্গে মেলামেশায় তো আমি কোন কম্যুনিস্ট লেখকের থেকে আলাদা নই। সুতরাং ও সংজ্ঞাগুলো আমাকে স্পর্শ করে না বা আমার সম্পর্কে খাটে না। আমার জন্ম ১৮৯৮ সনে, চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস করি।

নাস্তিক্যবাদ চর্চা করতে গিয়ে শান্তি পাই নি। মিথ্যা হয়ে গেছে, কারণ ঈশ্বরের মতই একটি সত্তার হাতছানিতে আবার বিশ্বাসেই ফিরে এসেছি। তাকে খুঁজেছি, ডেকেছি, আজও খুঁজি, আজও ডাকি; মনে মনে সরবে না হোক, নীরব একটা ইশারা পাই। আত্মসমীক্ষা আমি প্রতি পদে করি; কিন্তু বাজারের কেনা আয়নায় আমার চেহারা ভাল নয় এটা জেনেও এবং মুখে বলে, লেখায় লিখে প্রায় ঘোষণা করেও নিজের সঙ্গে কোন জন্তু-জানোয়ারের চেহারার মিল দেখতে পাইনে।

বাইরের চেহারা আমি বাজারে আয়নায় যত ভাল করে দেখেছি—মনঃসমীক্ষার আয়নায় মনের চেহারা আমি তার চেয়ে বেশী ভাল করে দেখেছি। যদি বলি মনের চেহারাকে দেখতে দেখতে আত্মাকে দেখেছি কখনও —চকিতের মত, তবে মিথ্যা বলব না। বিশ্বাস কেউ না করেন, বলব না—অঘটন আজও ঘটে বা There are more things in heaven and earth ইত্যাদি। সে যাক।

বাইরের আয়নায় আমার শ্রী নেই দেখে একটা সুযোগে আমি নামের আগে 'শ্রী' পরিত্যাগ করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে এ নিয়ে নিজের কাজটাকে বিচারও করেছিলাম। এটা আমার স্বভাব। যে কাজই করি, করার পর ভেবে দেখি, এটা কেন করলাম। ধরা যাক, হঠাৎ কোন বাল্যবন্ধুর চিঠির উত্তরে যদি কিছুটা উচ্ছ্বাস পায় বা কোন বন্ধুকে হঠাৎ মনে পড়ে তাকে নিজে থেকেই পত্র লিখি—তবে হঠাৎ একসময় ভাবতে বসি কেন এটা করলাম? এর কতটা সত্য, কতটা লোক-দেখানো ব্যাপার? ওকে কি সুকৌশলে আমার বড়ত্বটা জানালাম না? কোন মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে বা পত্র লিখলে তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নিই। বেশীর ভাগই মা। কারণ আমি ঈশ্বরকে মাতৃরূপে পূজা করি। দু-চারটে ক্ষেত্রে বোন, এসব ক্ষেত্রেও প্রশ্ন করি এটা স্বতঃস্ফূর্ত না মনের আলোর কালি ও অগ্নি-নিবারণের জন্য এটা একটা কাঁচের ফানুস লাগালাম।

রাত্রির পর রাত্রি নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে জন্মমৃত্যু সম্পর্কে ভেবেছি—আজও ভাবি, জন্মমৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে গেলেই ঈশ্বর এসে পড়েন। ঈশ্বরের কথা ভাবতে গিয়ে মাতৃরূপের মধ্যে তাঁর স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করি। যখন ছেদ পড়ে তখন আবার অকস্মাৎ প্রশ্ন করি—কেন এইভাবে উত্তরহীন কেনর উত্তর খুঁজি? অবাঙ্‌মনসোগোচর ঈশ্বরকে গোচরে

আনবার চেষ্টা করি কেন? কোন্ অতৃপ্তির জন্য?

এমন কি কারুর কোন ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে তারিফ করে নিজেকে প্রশ্ন করি, আমার কি লোভ হল? ওকে কি ঈর্ষা করলাম?

কোন সুন্দরী নারীর দিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে সংকোচ হলেও প্রশ্ন করি, তাকালাম কেন? সংকোচ করলাম কেন? এবং মনকে চিরে চিরে দেখি।

যেখানেই কোন সংশয় হয়েছে—সেখানেই আত্মগ্লানি হয়েছে এবং তিরস্কার করেছি নিজেকে। অনেক ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত করেছি।

দু-চারজন সমসাময়িক লেখক বা বন্ধু এর সাক্ষী আছেন। কোন কারণে যদি মনে হয়েছে আমার কোন আচরণ বা উক্তি অন্যায় হয়েছে তবে তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে পত্র লিখেছি।

আবার লিখেও মনে হয়েছে এর মধ্যেও সুকৌশলে প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা করলাম না তো? যখন নামের আগে শ্রী ত্যাগ করি তখনও ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলাম। সেদিন মনে হয়েছিল এটা খানিকটা সত্যও বটে। সত্যও ছিল। কিন্তু নিরন্তর চর্চায় আজ প্রতিষ্ঠার সীমানা পার হয়ে আর এক জায়গায় পৌঁছেছি। সেটা হল আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্র। আজ বলতে সংকোচও হচ্ছে না যে আত্মশুদ্ধি বা পরিশুদ্ধি বা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে পৌঁছে ঈশ্বর-প্রসাদ পাবার একটা বীজ আমার মধ্যে ছিল, হয়তো জন্মগতভাবেই। মনে রয়েছে এবং আমার স্মৃতিকথার মধ্যেও লিখেছি যে প্রথম বয়সে এটা উপ্ত হয়েছিল দেশপ্রেমের উত্তাপে। ফাঁসীকাঠ তখন বাংলাদেশে মহাভারতের মহাপ্রস্থানের পথ; ওই পথে পাও দিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ে হয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। আমার স্ত্রী বলেন, আমি অতি কঠোর প্রকৃতির লোক এবং অবাধ্য স্বামী। কিন্তু আমি জানি, আমি অত্যন্ত পত্নী-অনুরক্ত।

প্রথমে বয়সে প্রতিষ্ঠাকামী এবং তার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী-রূপে মর্যাদা-সম্পন্নতার আবরণে দাম্ভিক ছিলাম। ও দুটো প্রায় অগ্নিশিখার উত্তাপ এবং অগ্নিবর্ণের মত একটার সঙ্গে আর একটা জড়ানো। একটা থাকলেই আর একটা থাকে। তখনকার চেহারা কল্পনা করে ভাবতে চেষ্টা করছি—তার মধ্যে কোন জীবকে আবিষ্কার করা যায় কিনা। হয়তো বাঘ-ভালুক বলা যেতে পারত কিন্তু ওই আত্মদানের কামনার জন্যে মেলাতে পারা যাচ্ছে না। কারণ ওরা আর সবই হয়তো পারে; বাচ্চা বয়সে বাঘকে

শিখিয়ে সার্কাসে তাকে দিয়ে অনেক কিছু করানো যায়; কিন্তু কোনমতেই তার মধ্যে ভাল কিছুর জন্যে প্রাণ দানের বাসনা উদ্রিক্ত করা যায় না। জন্তু বা animal সে কখনই নয়। জীবন আছে বলে জীব—একথা সত্য বলে মানতেই হবে। কিন্তু বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী এবং কাম (লিবিডো) ও অর্থ (মেটিরিয়েল ওয়েলথ্)-নিয়ন্ত্রিত জীব, মানুষের এ সংজ্ঞা আমার কাছে এবং আমার মত কোটি কোটি ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ভুল—এটা মানুষের অপমান। মানুষের মধ্যে এমন একটি সত্তা আছে যা কোন জীব-জন্তুর মধ্যে নেই। জীবজন্তু নড়ে, চড়ে, রাগে, কাঁদে, হাসে, ভয় পায়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম বোধ করে; এ শক্তিকে বলে চেতনা। সে সচেতন। কিন্তু মানুষ শুধু সচেতন নয়, তার চৈতন্য আছে। সে একজনকে কামার্ত দেখলে কামার্ত হয়ে তাকে আক্রমণ করে বসে না, লজ্জিত হয়। নিজের ক্ষুধার খাদ্য অপরকে দিয়ে নিজের উদরপূর্তির তৃপ্তির চেয়ে বেশী তৃপ্তি অনুভব করে; একজনের দুঃখ-শোকে সেও দুঃখ-সুখের বেদনা অনুভব করে। তার চোখের জলের নির্গমনপথ একটি ধারায় নয়—অজস্র ধারায়। শুধু নিজের যন্ত্রণায় বা দুঃখে নয়, পরের যন্ত্রণা এবং দুঃখেও সে কাঁদে। পর তো সংসারে কোটি কোটি। সুতরাং চোখের জল তার অজস্র ধারায় ঝরে। যে এই কান্না কাঁদে তাকে জীবজন্তু কি করে বলব? জীবজন্তুর জীবনে এ কান্না নেই। আমি আত্মসমীক্ষার আয়নায় দেখতেও পাই, এ কান্না জীবন কাঁদে না—জীবনের মধ্যে থেকে জাগ্রত আত্মা কাঁদে।

আমি আত্মসমীক্ষার দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি এবং বিগতকালে স্মৃতির ক্যামেরায় তোলা এই দর্পণে দেখা যে ছবিগুলি জীবনের দেওয়ালে ঝুলছে তা দেখে মনে জাগছে একটি গাছের কথা। সেই মাটির তলায় উপ্ত বীজে সেই বিবর্ণ অঙ্কুর থেকে তার পুষ্পিত ও ফলবন্ত পরিণতি পর্যন্ত নানান অবস্থার ছবি দেখতে পাচ্ছি। আবার মাটির তলার পঙ্ক এবং পচনরস পানে যে মূলজাল লক্ষ মুখ হয়ে ক্রমবিস্তার লাভ করেছে তাও দেখতে পাচ্ছি। তবুও পরম এবং চরম সত্য উপরে, ওইটেই তার স্বরূপ। ওখান থেকেই বীজ এবং বীজ থেকেই সৃষ্টি যতকাল ততকাল তাঁর বংশানুক্রমিক অঙ্কুর বিস্তার। থাক, ধোঁয়া সরিয়ে দিয়ে বাস্তবে যা করি—অর্থাৎ ভাবনায় যেটা রূপায়ণ তার কাঠকুটো জুগিয়ে সাদামাটা কথার ফুঁয়ে অগ্নিশিখার আলোয় পরিষ্কার করে দি। ছবির ক্ষেত্রে—ফ্লাশ-লাইটের কাজ হবে।

ভোরবেলা ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ঈশ্বরের নাম এবং কল্পনার ছবি জেগে ওঠে। মুখ দিয়েও বেরিয়ে আসে। তার পরই তাগিদ আসে চায়ের। মুখ হাত ধুয়ে এক গ্লাস লেবু-চা নিয়ে বসি। পাশে থাকে সিগারেটের বাক্স আর দেশালাই। খবরের কাগজ পড়ি। ধরুন আজকের কথাই বলি। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬২র কথা। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বড়দিন উপলক্ষে বলেছেন, চীনের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করছি, তা সত্ত্বেও আমরা যেন চীন দেশের মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ না করি। এটা আমারও মনের কথা, প্রাণের কথা। এইখানেই আত্মসমীক্ষার আয়নায় আমার আত্মাকে দেখতে পাচ্ছি। ১৯৫৯ সনে মাদ্রাজে All India Writers Conferenceএ সভাপতি হিসেবে অভিভাষণে চীনা আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী এই দৃঢ় ধারণাবশে বলেছিলাম—"We shall resist enmity with our life, but even in a moment of greatest danger, we shall be nobodies' enemy." এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই লেবু-চায়ের পর দুধ-চায়ের জন্য হাঁক দিচ্ছি। সিগারেট দুটোর পর তৃতীয়টা হয়ে গেল। আমি যদি গাছ হই তবে এরই মধ্যে মাটির তলার মূলের ছবি শাখাবৃন্তে ফুলের ছবি দুইই চলছে একসঙ্গে। আবার এরই মধ্যে বাড়ির সামনে এসেছে ভিক্ষার্থী এবং পাড়ার দুটি খোকা। ভিক্ষার্থী শুধু ভিক্ষাই চাইছে না, দুপুরবেলা নিমন্ত্রণ চাইছে। খাবে সে। আমার জীবনের মধ্যে ওটা বাঁধা নিয়ম। ওরা তা জানে। একজন থেকে দুজন, কোন কোন দিন তিনজনও নিমন্ত্রণ নিয়ে যায়। আমার বাড়িতে এক এক বেলায় আটত্রিশ জন লোক খানেওলা। ওর সঙ্গে আর একজন দুজন এমন কি তিনজনেও বিশেষ আসে-যায় না। ও না হলে মন খুঁত খুঁত করে আমার। কেউ যদি বলেন, এটা বুর্জোয়া মনের পরিচয়, বলুন। আমার খাইয়ে খুশি। এর পর ছেলে দুটির দাবি—গাছে অনেক বোগেনভেলিয়া ফুল ফুটেছে, দুগোছ তাদের পেড়ে দিতে হবে। দিলাম।

এরপর লিখতে বসি। ভারতীয় মতে মেঝেতে পাতা আসনে বসে, ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখি আমি। পাশে ডানদিকে আমাদের কুকুর—নাম বেটী অর্থাৎ কন্যা—সে এসে বসে। বুড়ো হয়েছে বেটী। এবার বোধ হয় যাবে। যত যাবার সময় হচ্ছে তত যেন আমাকে আঁকড়ে ধরছে। আমি যতক্ষণ বসে থাকব ততক্ষণ বসে থাকবে, উঠলেই উঠবে। মধ্যে মধ্যে

আমি উঠছি সেও উঠছে, আবার আসছি বসছি সেও বসছে। আজকাল প্রায়ই বমি করে ফেলছে, ঘরের মধ্যেই। করলে সেটা আমিই সাফ করব। বাইরের আয়নায় আমার চেহারা শ্রীহীন। মনঃসমীক্ষণের আয়নায় আমার এই বমি সাফ করার চেহারাটা কেমম লাগে অর্থাৎ হরিজনের মত লাগে কিনা ঠিক বলতে পারব না। পৃথিবীতে একটা কথা আছে, নিজেকে আয়নায় কেউ অসুন্দর দেখে না। আমি অবশ্য বাইরের আয়নায় নিজেকে শ্রীমন্ত দেখি না কিন্তু মনের আয়নায় আমাকে অসুন্দর দেখালেও ঠিক ধরতে পারছি না।

বলতে ভুলেছি। লেখার শুরু করি ভগবানের নাম লিখে। একখানি খাতা, একখানা ডায়েরীরই বইয়ে দিন দিন ইষ্টনাম লিখি। বছরে এক লক্ষ লেখার সংকল্প থাকে। এ বছরের আগে পর্যন্তও খুচরো কাগজে লিখতাম। খুচরো বলতে অবশ্য খোলা কাগজ বলছি। যেমন-তেমন কাগজে লিখতে আমার মন সরে না। যাই হোক, দামী হলেও খোলা কাগজ দিনের পর দিন জমানো সহজ নয়। এবার থেকে তাই খাতা করেছি। ইষ্টনাম লেখা শেষ করে লিখতে বসি। নিত্য লেখা অভ্যাস। এ লেখনকর্মকে আমি ধর্ম বলে মেনে নিয়েছি। যা হোক কিছু লিখি, সে দু-দশ পৃষ্ঠাই হোক আর দু-দশ ছত্রই হোক। এবং লিখবার শুরুতেই লেখার হরফ এবং লাইন যদি পরিষ্কার এবং সোজা না হয় তবে সে কাগজখানাই বাতিল করে দিই। কোন কোন দিন তিন-চারখানা কাগজ বাতিল হয়। কোনদিন বেশী। কমপক্ষে দুখানা। আবার পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা কি দশ পৃষ্ঠা লিখেও বাতিল করে দিই। একখানা বই লিখতে বোধ হয় আর একখানা বইয়ের মত লেখা বাতিল হয়ে যায়। শুধু এইই সব নয়—বন্ধুজনে বিস্ময় প্রকাশ করেন, আমি যে কথা বলতে যাচ্ছি তার জন্যে। গোটা বই লিখে কাগজে ছাপা হবার পর বাতিল করে আবার নতুন করে লিখি। সংস্করণে সংস্করণে মার্জনা তো নিয়ম। বন্ধুরা বলেন বড় অসন্তুষ্ট লেখক আমি। একসময় ভেবেছি বাইরের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে অসন্তোষটা মেজে-ঘষে অপরূপ করে তোলার এক বিচিত্র অভিপ্রায় এটা। ফ্রয়েডীয় মতে তাই হয়তো বটে, মার্ক্সীয় মতে বুর্জোয়া লক্ষণও হয়তো হতে পারে। কিন্তু আমি বেশ ভাল করে জানি আমার জীবনে একটি আত্মশুদ্ধির নিরন্তর চেষ্টা আছে, মার্জনায় লেখাকে শুদ্ধ এবং নিখুঁত করাটাও সেই চেষ্টার পরোক্ষ প্রকাশ। বাইরের শ্রীহীনতা সম্পর্কে খেদ নেই বলব না—

কিছুটা আছে, কিন্তু সেটা খুব একটা গুরুতর কিছু নয়। নইলে যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভেও নিত্য দাড়ি কামাইনি কেন? এখন কামাই সে এই বছর দুই হল। সেও রাম বলে একজন সেবক এসে ধরেবেঁধে আমাকে অভ্যেস করিয়েছে।

তবে তখনও এবং এখনও বাড়িতে আধময়লা কাপড়, আধময়লা জামা পরে থাকি। চোখের চশমাটা গোল বাধায়—নইলে অনেক অপরিচিত জন এসে আমাকে মাটিমাখা হাতে দেখে প্রশ্ন করে, বাবু বাড়ি আছেন? বলা ভাল, বাগানে আমার শখ আছে, সে সেই ছেলেবেলা থেকে, আট-দশ বছর থেকে গ্রামের বাড়িতে বাগান ছিল এখনও আছে, কলকাতাতেও আছে। লিখতে লিখতে ক্লান্তি এলেই উঠে গিয়ে মাটি খুঁড়ি। এ অভ্যাসের মধ্যেও টেনেবুনে রূপের অভাবের পরিপূরণের ইচ্ছে বা বুর্জোয়া মনের পরিচয় বের করা যায়; তা মেনেও নিতাম যদি অভ্যেসটা আট-দশ বছর বয়স থেকেই না থাকত। তখনও কম্‌প্লেক্সটা গজাবার সময়ই হয়নি। এবং আমার মা বলেন, ছেলেবেলায় আমি কালো ছিলাম না, এবং শ্রী নাকি যথেষ্ট ছিল। আমার ছেলেরা কথাটা মানে না—ওরা শুনে হাসে। তবে আমার মনে আছে যৌবনের ছবি—তাতে সত্যিই শ্রীর এই অভাব ছিল না। সে কালের যে সব ফোটোগ্রফ আছে তাকে রাজপুত্রের ছবি বলে চালানো না যাক তার বন্ধুবান্ধবদের কেউ বলেল আপত্তি হত না। এই শ্রীর অভাবটা ঘটল ১৯৩১ সনে—জেলখানায় রোগাক্রান্ত হয়ে। সে রোগ আজও ভাল হয়নি। শ্রীও ফেরেনি। এই আজই একজন মহিলা লেখিকা বললেন, আপনার ডিসেন্ট্রি আজও ভাল হয়নি? আমি বললাম, না, রোগটি আমার মধ্যে বেশ সমৃদ্ধভাবেই ভাল আছেন। থাক। ওতে আমি সুখী। ও রোগে আমার মৃত্যু হবে না। তবে ও রোগটা ভাল হলে আমি বাঁচব না।

যাক। ফুলের গোড়া আজ খুঁড়ছিলাম। খেতে ডাকলে। মনটা অপ্রসন্ন হল, মুখে কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। খাবার প্রতি আমার ভালবাসা নেই। সে অসুখের জন্য নয়; ছেলেবেলা থেকেই। খেতে বসলেই মেজাজ খারাপ হয়।

খাই অত্যন্ত কম। চা খেতে ভালবাসি। আর সিগারেট। চা আগে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কাপ খেয়েছি, এখন আট-দশ কাপ; সিগারেট এখন তিরিশ থেকে চল্লিশে উঠেছে। বাগান খোঁড়া ছেড়ে উঠতে হল। হাত ধুয়ে খেতে

বসলাম। একটু ছানা আর একটা কলা। আগে টোস্ট ডিম ভাল লাগত, এখন ওসব ভাল লাগে না। খেয়ে হাত ধুয়ে আবার লিখতে বসলাম। একটি কবিতা লিখছি। ছেলেবেলায় কবিতা লিখতাম। তারপর কবিতা একেবারেই ছেড়েছিলাম। তবে গান লিখি মধ্যে মধ্যে। বিশেষ করে পল্লীগীতি ভাল হয়। অনেকে ভ্রম করেন এগুলিকে প্রাচীনগীতি বলে। "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে"—এর তারিফ সবাই করেছেন। "মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন্ কদমতলীতে ; কোন্ মহাজন পারে বলিতে ?" এ গান বেরুনোর পর দু-একজন প্রশ্ন করেছিলেন, কোন্ প্রাচীন গীতিকারের রচনা এটি ? কিন্তু কবিতা কালেকস্মিনে লিখলেও তাকে লেখা বলা যায় না। দেশের এই দুর্যোগে—সেই ছেলেবেলার দেশপ্রেমে জোয়ার ধরে বইতে চাচ্ছে। কবিতার ছন্দের দুই কিনারা না পেলে ঠিক আবেগের বেগ প্রকাশ পাবার সুযোগ পাচ্ছে না বলে কবিতা লিখছি। হাতে একটা সিগারেট ধরা আছে—পুড়ছে পাশ থেকে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে। একটা গোটা সিগারেট ধরিয়ে রেখেছিলাম আসনের পাশে, সেটা পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে, বেঁকে যাওয়া একটা ছাইয়ের সিগারেটে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সিগারেটের শেষের ধোঁয়াটা পীড়াদায়ক। নিবুতে হল। নিবুতে গিয়ে নজরে পড়ল অন্ততঃ দশটা পোড়া সিগারেট-প্রান্ত আর ছাইয়ে নোংরা হয়ে গেছে জায়গাটা। তা যাক। ও আমার অঙ্গভূষণ না হোক অঙ্গের সয়ে-যাওয়া গ্লানির মত। তাকিয়ে থেকে আবার চোখ ফিরিয়ে লিখতে লাগলাম। এর মধ্যে ডাক এল। দেখে ঠেলে রাখলাম। চিঠি অনেক আসে। লোকে ভালবেসেই লেখে। অনেক ভাল কথা—মন্দ কথাও লেখে। ভালবাসার জন্যও মন্দ কথা লেখে। সেটা বেশী হয় গল্প-উপন্যাসের চিত্ররূপের জন্য। ফিল্ম-ডিরেক্টররা বিয়োগান্তকে মিলনান্ত করে দেয়। বইয়ের মুগ্ধ পাঠক ছবি দেখে এসে কঠিন কথা লিখে। সবই ফেলে দিই। মন্দ বলেই যে ফেলি তা নয়। আমার জীবনে কোথায় একটা ইস্ক্রুপ ঢিলে আছে। সেটাকে আমি বলি বৈরাগ্য। নইলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিককালের তরুণতম লেখকের পত্রের অধিকাংশই হারিয়ে যেত না। শুধু চিঠি নয়, ঘড়ি, বোতাম, টাকা, ব্যাগ কতবার যে হারিয়েছি তার সঠিক হিসাব নেই।

পাশে টালা ওয়াটার ওয়ার্কসে ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে। কবিতাটা শেষ হল। কাউকে শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছে। না শোনালে তৃপ্তি পাইনে।

স্ত্রী দেশে রয়েছেন। ছেলেকে ডেকে শোনাই। এ সময়ে বাইরে কে এসেছে। দেখা করতে হবে। আগে মনে মনে বিরক্ত হতাম। এখন আর হইনে। হতে পারিনে। দেখা করে ফিরে এলাম। দাড়ি কামাবার জায়গা ঠিক করে দিয়েছে এর মধ্যে। কামাবার সরঞ্জাম আমার ভাল। ওতে শখ আছে। কামিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে একবার পায়চারি করব। কিন্তু চটিটা কোথায় গেল? মনে পড়ল বাগানে ফেলে এসেছি। নিয়ে এসে স্নান সেরে উপরে পূজোর ঘরে গেলাম। পূজোতে এক ঘণ্টা লাগে। লাগলও তাই। পূজো সেরে, রেশমী কাপড় ছেড়ে সুতী কাপড় পরে খেতে বসলাম। দিনে খাওয়া হবিষান্ন। আতপের মুঠি-দুই ভাত, মুগ-কলাই সেদ্ধ, খানিকটা ঘি, দু-চারটে ভাজা এই। এর পর একটু ঘুম। ঘণ্টাখানেক। তারপর বিকেলে ইউনিভারসিটিতে দারভাঙ্গা হলে একটা মীটিং আছে। চীনা আক্রমণ নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মীটিং। মীটিংয়ে একসময় খুব শখ ছিল। সভাপতিত্বে লোভ ছিল। বক্তৃতা করবার একটা আগ্রহ ছিল। আজকাল ভাল লাগে না।

আমার থেকে অন্যে ভাল বলবে এই আশঙ্কায় ভাল লাগে না কিনা মনকে যাচাই করেছি। কিন্তু তা নয়। এখনও ভাল বলতে পারি আমি, বাদপ্রতিবাদে তো খুব ভাল বলি, তবুও ভাল লাগে না। একসময় সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত পালন করতাম, গান্ধীজীর দৃষ্টান্তে। বাকসংযমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হত বা হয়েছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাতে বক্তৃতা করবার আগ্রহ কমেনি; আগ্রহ এবং শক্তি দুই বেড়েছিল। এখন শক্তি কমেনি, হয়তো আজও বাড়ছে কিন্তু আগ্রহ কমছে।

টেলিফোন বাজছে, ওরাই ফোন করছে।

টেলিফোনটা আমার লেখার জায়গার পাশেই থাকে, ওইটে যত আবশ্যকীয় যন্ত্র তত পীড়াদায়ক। লিখছি, টেলিফোন এল।

হ্যালো!

আমি একটু তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে কথা বলব।

বলুন, আমি বলছি।

জানেন, আপনার লেখা এত ভাল লাগে—

বলা বাহুল্য, ওপারে যিনি তিনি আমার নাতনী শকুন্তলার বয়সী একটি মেয়ে। নয়তো হ্যালো। কাকে চাই? এটা কি তারাশঙ্করবাবুর বাড়ি? হ্যাঁ। তিনি কি আছেন?

না বলতে পারিনে। কারণ ব্রতপালনের মতই আমি সত্য কথা বলি। কেবল একটি মিথ্যা কথাই বহুজনকে বলি। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, অর্ধ মিথ্যা—আমার শরীর খারাপ, মীটিংয়ের কথাতে বলি। অর্ধ মিথ্যা এই কারণে বলছি যে শরীরে রোগ আমার আছেই; তাকে অনুভব চব্বিশ ঘণ্টাই করি, কাছে সারিডন থাকে। দিনে একটা দুটো খেতেই হয়। টেলিফোনের যন্ত্রণার কথা শেষ করি। একটা দিক বলছি। আর একটা দিক—কোনদিন কোন কারণে টেলিফোন না এলেও যন্ত্রণার সামিল একটা আশ্চর্য অস্বস্তি অনুভব করি।

যাক, মীটিংয়ে যাচ্ছি, এ সময়টা নাতিনাতনীদের নিয়ে বসে বেশী আনন্দ পাই, চৌদ্দটি নাতিনাতনী আমার। কিন্তু কি করব? যেতে হল। মীটিং কেমন খারাপ লাগে, সবাই মুখোশ পরে বসে থাকে। যত হোমরাচোমরা তত মুখোশগুলো ভারি, আমারও হয়তো আছে। কিন্তু যাচাই করে বলছি আজ অন্ততঃ ছিল না। আজকাল থাকে না আমার। মুখোশ তো মুখোশ—এই তো সামনে বাঁধানো দাঁতের পাটি দুটো পড়ে আছে, ও দুটোই পরিনে আমি, কেবল কথা ফসকে যাবে বলে মীটিংয়ে যাবার আগে পরতে হয়, তাও অনবরত দাঁতে দাঁতে ঘষে, এবং বাড়ি ফিরেই খুলে ফেলি, খাবার সময়েও পরিনে তো মুখোশ। না, মুখোশ থাকে না, আমার। আজকাল মধ্যে মধ্যে ছোট নাতনী লালী এবং নাতি গোরাকে দেখিয়ে দাঁত পরি আর খুলি, বলি, কই, তোরা তোদের দাঁত খোল্‌তো দেখি।

মুখোশ নেই, তবে স্বীকার করব, পোশাক আছে মীটিংয়ে স্যুটটুট নয়, জামাকাপড় পরিচ্ছন্ন পরিপাটি পরি আমি বাইরে যাবার সময়, স্বীকার করে ভাবছি তবে কি ওখানেই এই ফ্রয়েডীয় এবং মার্কসীয় ব্যাখ্যা সত্য।

না, বাইরে এবং ঘরে এখনও এক হতে পারিনি এ সত্য—তাতে কম্‌প্লেক্স বা বুর্জোয়াত্ব সত্য নয়। বাইরেকে এখনও সম্মান করতে হবে বইকি! এখনও যে গৃহী আমি—ঘরের পালা শেষ করে বাইরে বের যেদিন হতে পারব, সেদিন পোশাক হবে কৌপীন কি কন্থা, সেদিনের জন্যই তৈরি হচ্ছি আমি। পারব কিনা জানি না তবে যে অহং বা ব্যক্তিত্বকে তৈরি করলাম, তাকে মাটির প্রতিমার মত বিসর্জন দিতে পারব যেদিন সেদিনই হবে আমার মানবজীবনের সিদ্ধি।

মনঃসমীক্ষার দর্পণে যা দেখছি তার একটা ছবি যেন আমার সামনেই

রয়েছে। আমারই হাতের, গাছের শিকড় কেটে তৈরি একটা মূর্তি, একজন শ্রমিক একটা বোঝা ঘাড়ে করে উপরে চড়াই ভাঙছে। যেন ওটা আমিই চলেছি—জীবনের বোঝা নিয়ে ওই শিখরে গিয়ে নামিয়ে সকল কাজের পালা শেষ করতে।

রাত্রি অনেক হয়েছে—নিশীথ পূজার সময় হল।

বাঙলা দেশের হৃদয় হতে

চীনা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, সেই উপলক্ষে প্রতিবাদ সভা। বীরভূম জেলার একখানা বড়গ্রামে। জনসমাগম হয়েছিল প্রচুর। প্রচুরের চেয়ে বেশী। বিস্মিত হবার কিছু নেই এই কথাই সবাই বলবে। আসমুদ্র হিমাচল এ আঘাতে নিষ্ঠুর ক্রোধে, ক্ষোভে জেগে উঠেছে। ক্ষোভটাই বেশী। কারণ এ আক্রমণ কল্পনার বাইরে মানুষের। এই তো সেইদিন পর্যন্ত হিন্দী-চীনী ভাই ভাই রবে, ধ্বনিতে আকাশে বাতাসে ঝড় বয়েছে। বর্ষায় বৃষ্টি হয়নি, শীতে শীত কম হয়েছে, গ্রীষ্মে গমর হয়েছে, কিন্তু ও ধ্বনিতে ভাটা পড়েনি। নগরে নগরে ধ্বনি উঠেছে, তার প্রতিধ্বনি গ্রামেই শুধু নয়, হাটে বাজারে মাঠে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। শুনে এসেছি—চীনের সঙ্গে ভারতের হাজার বছরের সম্পর্ক—বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। এই নতুন কালে সে বন্ধুত্ব নাকি এমন হল যে তাব ক্ষয় বা লয় কখনও হবে না। তার উপর এই অঞ্চলটার পর পর দু'ইলেকসনে এম. এল. এ. হয়েছে কম্যুনিস্ট ডাক্তার। মাসে একবার সে লাল ঝাণ্ডা ঘাড়ে মিছিল করে যায়, মীটিং করে। তাতে এ দেশের মানুষের দুঃখের জন্যে যত রাগ ফেটে পড়ে তত উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে চীনের কথায়। চীন স্বর্গরাজ্য! চীনের মানুষের মত ভাল মানুষ হয় না। চীনের নেতারা সাক্ষাৎ দেবতা। ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষের মানুষকে যে কতই ভালবাসেন তাঁরা, তা বলে শেষ করা যায় না। কত বড় বড় লোক চীন থেকে ফিরে কত বক্তৃতা করেছে, তাও তারা কাগজে পড়েছে শুনেছে। বড় বড় বই লিখেছে লেখকেরা।

সেই চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। চীন বিশ্বাসঘাতক? বিশ্বাস করে ঠকার মধ্যে যে ক্ষোভ সে ক্ষোভ ক্রোধের চেয়েও মারাত্মক।

গ্রামটি বড় গ্রাম। এখন প্রায় শহর। এখানে কম্যুনিস্ট পার্টির একটি আপিসও আছে। বাইরে থেকে জনচারকে পাকা কর্মীও এসেছে এবং এখানকার জনদশেক বেকার ছেলে আর জন ছয়েক আধাবেকার তাদের সঙ্গে জুটে ষোল জনে ষোল কথায় পূর্ণচন্দ্রের মত বারো মাস প্রচারের পূর্ণিমা চালিয়ে রেখেছে। তাদের একজনকে এখানে লোকে বলে লালচাঁদ। লোকটির উপাধি চক্রবর্তী, কিসের যেন মিস্ত্রী, সে যুদ্ধের প্রথমটায় লোককে বোঝাতে চেয়েছিল, এসব বিলকুল মিথ্যে। চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেনি, শান্তি আন্দোলনের নেতা চীন তা পারে না। কখনও পারে না। ভারতবর্ষই আমেরিকার উস্কানিতে চীনের অনেকটা জমি দখল করে নিয়েছিল, সেইটে বারবার ছেড়ে দিতে অনুরোধ সত্ত্বেও ছেড়ে না দেওয়ায় চীন ঠেলে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এই মাত্র। তা দেবে না, নিজের এলাকা।

কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি। ভাগ ভাগ ভাগ। এই তো আর এক প্রতিবেশী মাসে তিনবার চড়াও হচ্ছে, গরু ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে, মানুষ নিয়ে যাচ্ছে, কখনও লুটপাট করে যাচ্ছে, জমি দখল করেছে, তাতেও যে দেশ লড়াই করে না শুধু প্রতিবাদ করে, তারা চীনের জমি দখল করে বসেছে বিশ্বাস করতে বলে? মিথ্যে দম্বাজী চালাচ্ছে! সেদিন পাশের গ্রামে এমনি একটা ছোট সভায় কোত্থেকে এক ছোকরা হাতের আস্তিন গুটিয়ে চোখ পাকিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ান দাঁড়ান বলে দাঁড়াতেই লালচাঁদ পিছন ফিরে চলতে শুরু করেছিল। লোকে কিন্তু ছাড়েনি। অনেক লাঞ্ছনা করে ছেড়ে দিয়েছে। এটা কিন্তু বাহ্য। বানের ফেনার মত। মানুষের বুকে মনে দারুণ ক্ষোভের অন্তরালে এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে যে নিষ্ঠুর ধিক্কার আর আঘাতের জন্য যে মর্মান্তিক বেদনায় যে কঠিন ক্রোধ সেইটেই আসল। তা দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এখানকার মানুষটাকে তো আমি চিনি। এ যে আমার গ্রাম, জন্মভূমি, ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আমি এদের নিয়ে কাজ করেছি। এদের নিয়ে আমি লিখেছি। সেই শান্ত নিরীহ উদাসীন মানুষের দল, তাদের এ কি নূতন রূপ!

এই দেখতেই আমি চেয়েছিলাম। গ্রামে এই জন্যেই গিয়েছিলাম। দিল্লী দেখেছি, কলকাতা দেখেছি, গোটা ভারতবর্ষের কথা পড়েছি। দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরেই আমার গ্রামে শুধু এই জন্যেই এসেছিলাম। দেখে আসি আমার গ্রামে কি হচ্ছে। এসেই শুনলাম, সভা হচ্ছে আজই। জেলা

ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন, সরকারী কর্মচারীরা আসছেন, রাজনৈতিক নেতারা আসছেন, প্রতিবাদ সভা হবে। শেষে প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য দান নেওয়া হবে। বিনা নিমন্ত্রণেই ছুটে গেলাম। গিয়ে অবাক হলাম। এত লোক! তাদের মুখ চোখ দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। নারী পুরুষ বালক বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন, হিন্দু-মুসলমান দলে দলে এসেছে।

কর্তৃপক্ষ সাগ্রহে গ্রহণ করলেন আমাকে। বলতেও বললেন, বললাম, বলব বই কি, আমার গ্রাম। ১৯২১ সাল থেকে ৩০ সাল পর্যন্ত এ আমার সাধনভূমি। আমি এসেছি মায়ের নবরূপ দেখতে। বলব না?

সকলের শেষে বললাম আমি। এবং ঐ কথাই বললাম, আমার জন্মভূমি এই নবগ্রামের নবরূপে মহাপ্রকাশ দেখতে এসেছি আজ। কালে কালে যুগে যুগে মহাপ্রকাশ হয় দেশের। বিশেষ করে ভারতবর্ষের, মা ভারতবর্ষের মৃন্ময়ী রূপের মধ্যে চিন্ময়ী ধ্যানস্থ। চিন্ময়ী হলেন মহাশক্তি মহিমার উৎস, মাটি থেকে বেরিয়ে এসে চোখের সামনে দাঁড়ান, মানুষকে জাগান। বলেন, ওঠো জাগো, অন্যায়কে দূর কর। ন্যায়ের জন্য জীবন দাও। অমর হও। আমার পায়ে প্রাণ বলিদান, সর্বস্ব দান করে আমার হাতের অমৃত পাত্র থেকে অমৃত প্রসাদ গ্রহণ কর। চিতোরে একবার এমনি সঙ্কটে মা বলেছিলেন, ময় ভুখা হুঁ। আজ চীন আক্রমণের সঙ্কটের মধ্যে ঠিক তেমনিভাবেই মা জেগেছেন—বলছেন আমি জেগেছি, পূজা আন্। ওরে তোরা পূজা আন্। যাঁর চোখ আছে তিনিই মায়ের এই মহাপ্রকাশ দেখেছেন, যাঁর কান আছে তিনিই শুনেছেন আহ্বান। সেদিন লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী বলেছেন, আমি চোখের সামনে দেখছি, বিচিত্র দৃশ্য। ভারতমাতার মুখের উপর একটা আবরণ ছিল, সেটা সরে যাচ্ছে। ভিতর থেকে দিব্যমূর্তিতে মা জাগছেন। আমি দেখেছি তাঁর মূর্তি। তাঁর ললাটে বহ্নি, হাতে বরাভয়, খড়্গ চর্ম। তিনি বলছেন, পূজা আন্, ওরে পূজা আন্, ধন আন্, মান আন্, প্রাণ আন্। পূজা দে। মহাপূজা সারা ভারত জুড়ে শুরু হয়ে গেছে। আমি দিল্লিতে দেখে এসেছি। সে কি মহাপূজা! ধনী ধন ঢেলে দিচ্ছে, ভিক্ষুক ভিক্ষার কপর্দক দিচ্ছে, জোয়ান প্রাণ উৎসর্গ করছে, মানুষ রক্ত দিচ্ছে, নারী সেবার অঞ্জলি দিচ্ছে, আভরণ দিচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। আমি এক মহিমময়ী মহিলার বিচিত্র পূজা দেখেছি। পাঞ্জাবের সাবৃতি দেবী। দেখলাম পূজামণ্ডপে এসেছেন, ষোল বছরের ছেলের হাত ধরে। ছেলেটির হাতে একখানি টেলিগ্রাম। সাবৃতি

দেবীর স্বামী ছিলেন ভারতীয় ফৌজের সৈনিক। সমর বিভাগ টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন সাবিত্রি দেবীকে, আপনার স্বামী নিখোঁজ। এর অর্থ অতি নিষ্ঠুর। সাবিত্রি দেবী সে খবরে ভেঙে পড়েন নি, কাঁদেন নি। ছেলের হাত ধরে এসেছেন—এই নাও মা আমার কিশোর ছেলেকে। তার বাপের শূন্য স্থান পূর্ণ করে তোমার সেবা করবে। এক বৃদ্ধ রাজপুত এসেছেন তিন পৌত্র নিয়ে। নাও মা জননী এই নাও আমার পূজা। এক অন্ধ সন্ন্যাসী এসেছে একখানি মাত্র কম্বল তাঁর, তাই নিয়ে। এই আমার পূজা। এসেছেন তিনি কাশী থেকে দিল্লি পূজা দিতে। আজ আমাদের নবগ্রাম জননীর মধ্যে ভারত জননী এসে দাঁড়িয়েছেন। ১৯২১ সালে একবার এমনিভাবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ১৯৩০ সালে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি আপনাদের ডেকেছিলাম। আপনারা পূজা দিয়েছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য ১৯৪২-এ আমি ছিলাম না এখানে। ১৯৪৭ সালে মা দাঁড়িয়েছিলেন, আজ আবার দাঁড়িয়েছেন। বলছেন আনো, তোমরা পূজা আনো। আপনারা প্রণাম করুন, বন্দে মাতরম্।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দে মাতরম ধ্বনিতে যেন একটা সমুদ্র কল্লোল-ধ্বনি তুললে, বন্দে মাতরম্।

এরপর আর বলতে হল না, পূজা আনুন। যজ্ঞকুণ্ডে আগুন ছিল—ইন্ধন ছিল, আমার আবেগের ফুৎকারে জলে উঠল মুহূর্তে। তবে আমি কৌশল বশে কথাগুলি বলিনি। এ যে আমার গ্রাম। আমার জন্মভূমি। যে সব বুদ্ধিমানেরা, চিন্তানায়কেরা বলেন, কোন গ্রামে বা কোন দেশে জন্ম গ্রহণের জন্য সেখানকার মাটির জন্যে প্রেমভক্তি অনুভব করা একটা মিথ্যা আবেগ মাত্র, তাতে গৌরবের কিছু নেই, আমি তাদের দলে নই। কিন্তু সে কথা থাক। ভিড় করে লোকে এগিয়ে এল ডায়াসের দিকে। আমার বক্তৃতার মধ্যেই লোকের হাত উদ্যত হচ্ছিল, তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। পুরুষেরা পকেটে হাত দিচ্ছিলেন। কারুর হাতে অর্থ মুষ্টিবদ্ধ ছিল। কিশোর ছেলেদের অনেকে হাতের আংটি নাড়ছিল। একজন তার ফাউন্টেন পেনটা খুলে উদ্যত করেই ছিল এতক্ষণ। বাঁ দিকে মেয়েরা বসেছিলেন। তাঁদের সামনে পশ্চিম দিক। শীতের অপরাহ্নের আলো তাঁদের মুখের উপর পড়েছিল। তারা কাঁদছিলেন। সাবিত্রি দেবীর কথা যখন বলি, তখন থেকে কাঁদছেন। চুড়ি দুল গলায় হার আংটি নাড়ছেন। প্রথম সারিতেই একটি অপরিচিতা মহিলা বসেছিলেন, তিনি যেন নিস্পন্দ। স্থির দৃষ্টি, চোখ থেকে চোখের জল গড়িয়ে এসে টপ টপ করে

কোলের কাপড়ের উপর ঝরে পড়ছিল। মুছতেই তিনি ভুলে গেছেন। বক্তৃতা শেষ করে বসলাম, তখন দান পড়তে শুরু করেছে টেবিলের উপর। এই যে আমার, আমার, আমার। উদ্যোক্তারা বললেন, একে একে, একে একে ভাই। আমাদের লিখতে দিন। কিন্তু কে শোনে। আগে কে দেবে তার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। আমার মনে হল, মেয়েদের কথা। ওঁরা দেবেন। অনেক দেবেন। অঙ্গ থেকে আভরণ খুলে দেবেন তার দাম অনেক বেশী। কিন্তু ভিড়ের জন্য আসতে পারছেন না। একজন নাম লিখবার লোক সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। গরম আলোয়ানটার খুঁট পাতলাম

—দিন।

প্রথমজনই আমাদের নিত্যবাবুর স্ত্রী, হাতের দুগাছা চুড়ি খুলে দিলেন। বললাম, বাঃ। দ্বিতীয়জন তখন কানের দুল খুলছে। একটি কিশোর মেয়ে। তারপরের জন হাতের আংটি খুলে বাড়িয়ে রেখেছে। গরীবের মেয়ে, গ্রামেরই কন্যা। তারপরই সেই মেয়েটি। সে এখনও তেমনি স্থির হয়ে বসে আছে। মগ্ন হয়ে গেছে যেন। চোখের জলের ধারা তখনও চিক চিক করছে। মোছেনি। কোন নবাগতা বিদেশিনী। চিনি না। কোন অফিসারের স্ত্রী অথবা কোন শিক্ষয়িত্রী বা কোন সম্পন্ন ঘরের মেয়ে ও বধূ। এবং এখানকার অধিবাসিনী নন। মুখে চোখে নগরবাসের মার্জনা। হাতে একহাত চুড়ি। মুখে অনেক খুঁত, কিন্তু তবু একটি সুষমার সৌন্দর্য আছে। নিতান্ত তরুণী নন। ভাবতে ভাবতেই তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। আমি সামনে দাঁড়াতে তাঁর যেন সম্বিত ফিরল। চোখের জল মুছে একটু হেসে বললেন, বড় ভাল বললেন। চোখের জল রাখতে পারিনি!

আমি বললাম—এইবার দান দিন।

—গহনা? চোখের দৃষ্টি কেমন হয়ে গেল।

—হ্যাঁ। যা খুশি। মায়ের পূজা।

বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার দান আমি দিয়েছি। আগেই দিয়েছি।

—আবার একবার দিন।

—দেব। সময় হলেই দেব। কিন্তু সন্ধ্যের মুখে গায়ের গহনা খুলে স্বামীর অকল্যাণ করতে পারব না। টাকাও সঙ্গে নেই। থাকলে দিতাম।

আমার মন রূঢ় আঘাত খেলে। বিরূপতায় বক্র হয়ে উঠল, বললাম,

আপনার স্বামীর কল্যাণই হবে। মেয়েটি তীব্রভাবে আমার দিকে তাকালে। পরক্ষণেই কিন্তু সংযত হয়ে বললে—মাপ করবেন, আমার ব্রত আছে। গহনা খুলতে পারব না। তারপরেই হেসে বললে, এঁদের কাছে নিন। ওই দেখুন, ও ধরে বসে আছে। বলেই সে উঠল এবং বেশ সপ্রতিভ পদক্ষেপে সগৌরবে চলে গেল। আমি একবার তার দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। স্বামী সোহাগিনী গরবিনী, অদ্ভুত! এক বক্র হাসি ফুটে উঠল মুখে। পরক্ষণেই থাক বলে পরের জনের কাছে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি কানের দুল দুটি ফেলে বললে, ওকে চিনলেন না?

বললাম, না। দরকার নেই। কি কাজ অনর্থক নিন্দে করে। থাক। এগিয়ে গেলাম। সকলের কাছ হয়ে ঘুরে যখন এলাম তখন ভর্তি হয়ে গেছে আঁচল। নবগ্রামের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তখন সন্ধ্যে প্রায় হয়ে গেছে।

বারান্দায় আসর জমিয়ে বসেছি, ধীরেন, আমার পাচক পরিচারক সেবক রক্ষক চা ঠিক করেই রেখেছিল। সেও সভায় গিয়েছিল, আমার বেরুবার উদ্যোগ দেখেই সে ছুটে চলে এসেছে। আমরা এসে বসতেই সে বললে, চা দিই।

বললাম, নিশ্চয়। চায়ের জন্য হাই উঠছে। আনো। বাবুরা সব রেগে গেছে আমার উপর। বক্তৃতা করে আমিই দেরী করে দিয়েছি।

আমার সঙ্গে বন্ধু কয়েকজন ছিলেন। বাল্যবন্ধু বীরেশ্বর, সত্যবাবু, ভুলুবাবু, শ্রীমান শ্যাম। সত্যবাবু বললে, চা হতে হতে চট করে ঘুরে আসি আমি।

ধীরেন বললে,—আজ্ঞে না, চা রেডি।

বলতে বলতে দু-তিনখানা জীপ এসে দাঁড়াল। কে এল? শ্যাম মুখ বাড়িয়ে দেখে বললে, ওখানকার সবাই। মানে সভার সবাই। এস, ডি, ও, টেস, ডি, ও, সবাই।

উঠে দাঁড়ালাম, তাই বটে; এস, ডি, ও, বি, ডি, ও, প্রভৃতি দশ বারো জন এসেছেন।

—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি আমরা। আপনি তো থাকেন না এখানে। আজ যখন আছেন, তখন সুযোগ ছাড়তে পারলাম না। আমি সদর এস, ডি, ও। এরা সব বিভিন্ন ব্লকের বি, ডি, ও।

—আসুন আসুন। আমার এ সৌভাগ্য। বসুন।

দেখতে দেখতে আসর জমে উঠল। প্রথমে সাহিত্য, তারপর অন্নের সমস্যা, কালোবাজারের সমস্যা, আমাদের দেশের মানুষের অজ্ঞতার সমস্যা—সমস্যা তো অনেক।

এখানকার একজন বি, ডি, ও, বললেন, শুনলাম কে একজন মহিলা নাকি আপনাকে—

হেসে বললাম, হ্যাঁ। বললেন, সন্ধ্যেবেলা গহনা খুলে স্বামীর অকল্যাণ করতে পারবেন না।

—মাই গড!

বললাম, থাক। তাঁর ধারণা!

—লিখুন না, এসব ভুল ভাঙুক লোকের।

এস, ডি, ও, বললেন, ওঃ আপনার সেই সব বই পড়ে জীবনে যে কত ধারণা বদলেছিল কি বলব। ঘুরে গেল আলোচনাটা এবং এমন জমে উঠল যে, আধ ঘণ্টা কি তারও বেশী কারও কোন খেয়াল ছিল না। হঠাৎ খেয়াল হল, ক্লক ঘড়িতে ন'টা বাজল। এস, ডি, ও, নিজের ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন, ওঃ ন'টা হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে বললেন, আজ উঠি অনেক দূর যাব। সিউড়ি, দুবরাজপুর—রাজনগর। অনুমতি চাচ্ছি!

তার পর বাড়ির বারান্দায় বসেছিলাম একা। গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। হঠাৎ এক সময় একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। আহা হা। আমার আত্মমগ্নতার মধ্যে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ যথাসময়ে উঠে অমল ধবল জ্যোৎস্নায় পৃথিবীর বুকে যেন রূপের প্লাবন বইয়ে দিয়েছে। বহুকাল এমন অপরূপ জ্যোৎস্না দেখিনি। ডিসেম্বরের প্রথম শীত নেই এবার! তবু খুব হাল্কা একটি কুয়াশার আস্তরণ জ্যোৎস্নায় যেন একখানি দুগ্ধ ধবল অঙ্গবাস উত্তরীয়ের মত মনে হচ্ছে। মনে হল, নবগ্রাম জননী যেন অমল ধবল অঙ্গবাসে নিজেকে আবৃত করে ধ্যানমগ্নার মত দাঁড়িয়ে আছেন। বারন্দা থেকে নেমে উঠানের বাগানে এসে দাঁড়ালাম। চোখ তুলে তাকালাম উপরের দিকে। চোখ আর ফিরল না। গ্রামের মাথায় অবারিত জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলে যাচ্ছে।—তালগাছের মাথা, পাকা বাড়ির চিলেকোঠা—মেটে দোতলার টিনের চাল—সত্যবাবুদের বাড়ির নারকেল গাছের লম্বা পাতাগুলো কোনটা ঝলমল, কোনটা ঝকমক,—কোনটা ঝিকমিক করছে। আকাশ স্বচ্ছ নীল, কতকগুলি উজ্জ্বল তারা সেখানে।

হঠাৎ একটা ক্যাঁচ শব্দে আমার মন আকাশ থেকে মাটিতে নামল। রাস্তার মুখে কাঠ এবং শিক দিয়ে তৈরী ফটকটা কেউ খুলছে। তৈলহীন হাসকলটা ডুমনীর উপর ঘুরবার সময় শব্দ হয়, কেউ ঢুকছে। কে? কে? ঠিক আমার এই মুহূর্তের কল্পনার মতই একটি মেয়ে। ধবধবে কাপড় পরা, শ্যামলী একটি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই, একরাশি চুল, তা এলানো। বউমা তো নয়। বউমা আমার ভাইপোর স্ত্রী। তিনি কন্যার মত এসে আমার সুখ অসুখ দেখে ব্যবস্থা করে যান। বড় ভাল মেয়ে। কিন্তু হতভাগিনী। বিধবা। সে তো নয়! এ সধবা। হাতে সোনার চুড়ি ঝিকমিক করছে। কে?

মেয়েটি এসে ভিতরে ঢুকে সামনে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল! একটু মুখ তুলেই দাঁড়াল—মুখ দেখাবার জন্যেই। বললে, তখন প্রণাম করা হয় নি। চিনতে আর বাকী ছিল না। ইনিই সেই সভার গরবিনী মহিলাটি। সম্ভবত এখানে নবাগতা। সম্ভবত অনুতপ্ত হয়ে এসেছেন।

মেয়েটি মুচকে হেসে বললে, চিনতে পারলেন না তো।

কেমন চমক গেলে গেল। হাসির ঢংটা চেনা। কিন্তু মেলাতে পারছি না। কে?

—ছি ছি ছি! না তাইবা কেন? বড়লোকের এই তো লক্ষণ!

আমি বললাম, কিছু মনে করো না মা, ঠিক—

সে বললে, দূর দূর দূর! কি যে বলেন? মা কিসের।

—তবে মেয়ে।

—না। তাইবা কেন হতে গেলাম!

—তবে বোন।

—তাও না।

এবার হেসে বললাম, এরপর যে সম্পর্ক হতে পারে এ বয়সে তা আর হয় না।

—হয়। শ্যালিকা। যুবতী শ্যালিকা বৃদ্ধেরও থাকে।

এবার চমকে উঠলাম—তাহলে তুমি—

—হ্যাঁ। শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী; দ দ হ। দনুজদর্পহারিণী।

—ওরে, ওরে, ওরে! বলে তার মাথাটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলাম।

তাইতো তাইতো এ তো জগদ্ধাত্রীই বটে। আমার নিজের খুড় শ্বশুরের ছোট মেয়ে, আমার তৃতীয় সন্তান, আমার বড় মেয়ে গঙ্গার বয়সী, হয়তো মাস দুয়ের ছোটই হবে।—আমার দোষ নেই, আজ বাইশ বছর ওকে দেখিনি। বাইশ কেন—চব্বিশ বছর হয়ে গেল। নবগ্রাম ছেড়ে কলকাতায় বাসা করেছি উনচল্লিশ সালে। তারপর উনষাট সাল পর্যন্ত গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কই রাখিনি। মধ্যে মাঝে গিয়েছি, সে বছরে একবার কোন বছর তাও না। একবার বিয়াল্লিশ সালে গঙ্গার বিয়ের সময় দেশে দু'মাস ছিলাম একনাগাড়। মনটা আর্তনাদ করে উঠল। বুকের ভিতরটায় একটা ব্যথা উঠল। আজ দু'মাস হল গঙ্গা বিধবা হয়েছে। ওঃ! একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আপনি ঝরে পড়ল।

বললাম,—ওরে তোর জামাইবাবুর জীবনে রাত্রি নেমেছে। সব ঢাকা পড়ে গেছে।

সে বুঝল, বললে, অত্যন্ত বেদনা-হতকণ্ঠে বললে—জানি জামাইবাবু!

—আয় ভেতরে আয়।

—চলুন। কতকাল দেখিনি আপনাকে। ওঃ! দূরদূরান্তর থেকে কাগজে আপনার খবর পড়ি, ছবি দেখি, লোকদের বলি আমার জামাইবাবু। জানেন, লোকে বিশ্বাস করে না।

আত্মসম্বরণ করতে হয় না—আপনা থেকেই হয়—শুধু মিষ্টি প্রসঙ্গান্তর প্রয়োজন। প্রশংসার চেয়ে মিষ্টি প্রসঙ্গ আর কি আছে সংসারে। সেদিনের কথা স্মরণ করে লিখতে গিয়ে এইটেই বুঝতে পারছি। আমি জগদ্ধাত্রীর ওই কথায় বললাম, তুই তোর টাইটেলটা বলে বলিসনে কেন, জান, তার প্রমাণ আমার দ-দ-হ টাইটেল। এ টাইটেল তিনি দিয়েছেন। তিনি ছাড়া দিতে পারতই বা কে?

বারান্দায় উঠে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজে তার সামনে বসলাম। সে চেয়ারে বসে বসে হেসে বললে, তাকি বলিনি! এবং ওইটুকুই শুধু বলিনি। আরও কত বলেছি।

—আর কি বলেছিস? বলেই মনে হল, জগদ্ধাত্রীকে কিছু খাওয়াতে হবে। বললাম, ধীরেন চা কর।

—আমি কিন্তু খাব না। আমার পেটে আলসার।

—তবে?

—কিছু না জামাইবাবু। তা ছাড়া আজ উপোস; ব্রত করেছি। দেখছেন না চুল খোলা। সভা থেকে এসে স্নান করেছি।

—কি ব্রত রে? এই সময়?

—ও আমার মনগড়া ব্রত জামাইবাবু, শুক্লপক্ষের চতুর্দশী আর অমাবস্যায় উপোস করি, দিনে ব্রাহ্মণের কাছে চণ্ডীপাঠ শুনি। রাত্রে মায়ের জপ করি এক লক্ষ।

অবাক হয়ে গেলাম। বেদনা বোধও করলাম। এমনই করে এই অল্প বয়সে ওকে ধর্মের বাতিকে পেয়ে বসল। তাহলে এরপর হবে কি? শুচিবাইগ্রস্তা! অথচ কি প্রাণবন্ত মেয়েই না ছিল। ছুটোছুটি হুল্লোড়, যত প্রখরা তত মুখরা। দুর্দান্ত মেয়ে, কেউ বলত গেছো মেয়ে, কেউ বলত কটকটি। আমি বলতাম জগদ্ধাত্রী দ-দ-হ। একবার মনে আছে ওকে বলেছিলাম—আমার মত বরের হাতে পড়িস তো বুঝতে পারবি।

ও বলেছিল, ওরে আমার তুমি রে। কি ভাব নিজেকে? তখন ওর বয়স বছর দশেক। আমাকে তুমি বলত! শুধু ওইটুকুই বলেনি—আরও বলেছিল —তোমার থেকে অনেক ভালো বরে বিয়ে হবে আমার। ভারী তো জেল খেটে আর দু'পাতা লিখে অহঙ্কার!

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম স্পর্ধায়। বলেছিলাম, দাঁড়া, তাহলে তো তোকে আমাকেই বিয়ে করতে হবে। খুড়োমশায়কে বলছি গিয়ে, কত আর পাত্র খুঁজবেন, জগদ্ধাত্রীকে আমার হাতেই দিন। জানিস তো তোর বাবার ঠাকুরদা ষাট বিয়ে করেছিলেন। কুলীনের ঘরে সতীন দেখলে চলে না। তার উপর দিদি সতীন হবে। কষ্ট কিছু হবে না।

ও বলেছিল—তাহলে তোমার কষ্টের আর বাকী থাকবে না। নাকে দড়ি দিয়ে তোমার দুর্গতির শেষ রাখব না দুই বোনে। হ্যাঁ! আমি পাপটাপ মানি না।

সেই জগদ্ধাত্রী এই হয়ে গেছে। সভায় তার চোখে জল দেখেছি। শুধু যে কথা ক'টা বলেছে, তার মধ্যে যেন, হ্যাঁ, কিছুটা মিল পাওয়া যায়! মুহূর্তে একবার মনে হল, ওকে জিজ্ঞাসা করি সভাতে তুই অমন কথা বললি কেন? কিন্তু না, থাক। আমার কাছে এসেছে কতদিন পর! থাক।

জগদ্ধাত্রী বললে—কি ভাবছেন বলুন তো? হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন?

মিথ্যে বললাম না—বললাম, ভাবছি সেই জগদ্ধাত্রী কত বড় হয়েছে। কি

হয়ে গেছে। কি মিষ্টি কথা! ভাবছি দ-দ-হ পাল্টে স্থ-ম-ভ টাইটেল দি, সুমধুর ভাষিণী। তার সঙ্গে আর একটা হ জুড়লেই হাসিনীও হয়ে যাবে।

হাসতে লাগল জগদ্ধাত্রী। বললে, তা নাও হতে পারে। আপনার মত বড়লোকের সামনে—

—থাক থাক! টাইটেল ঐটেই তোকে দিলাম আজ! তোর কথা বল তো। জিজ্ঞাসাই করিনি। তোর বিয়ের সময়ও আসতে পারিনি। বর কি করে রে?

—সে তো আর্মিতে কাজ করে।

মনে পড়ল। হ্যাঁ, হ্যাঁ। গত ওয়ারের সময় বিয়ের পরই ফ্রণ্টে গিয়েছিল, না?

—পরই মানে? বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে গেল। সেদিন কাল রাত্রি। তার পরদিন ফুলশয্যা। সকালে টেলিগ্রাম এল, দুপুরে চলে গেল। ফুলশয্যা আর হল না। ফিরল তিন বছর পর। আফ্রিকা বর্মা হয়ে। জানেন, যদি কোন অন্য লোক এসে বলত, আমি সেই, তাহলে আমার ধরবার উপায় ছিল না, সেই কিনা। মুখখানাও মনে ছিল না।

হাসতে লাগল।

—এখন কোথায়?

—জানিনে কোথায়, তবে ফ্রণ্টে। চীনেদের সঙ্গে লড়ছে।

চমকে উঠলাম।—চীনেদের সঙ্গে লড়ছে?

জগদ্ধাত্রী বললে, ব্রত আমার তারই জন্যে।

ঝিম ঝিম করে উঠল মাথাটা। ওঃ! কি সহজ শান্তভাবে বলছে জগদ্ধাত্রী!

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে বললাম—কতদিন গেছে?

—এই আট দিন!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বমডিলা পড়েছে আট দিনের আগে।

জগদ্ধাত্রী শান্ত সহজ স্বরে বললে—একমাস আগে ওর কন্‌ট্রাক্ট শেষ হল, শিলং-এ ছিলাম। রিটায়ার করে দেশে আসব, গোছগাছ করছিলাম। হঠাৎ, যুদ্ধটা বাধল, টোয়াং পড়ার খবর এল। উনি এসে বললেন, জগদ্ধাত্রী সে আমলে যুদ্ধ করেছি ইংরেজের জন্যে। তারপর এতদিন স্বাধীন দেশে নিরাপদে ক্যাণ্টনমেণ্টে ঘুরে আরামে চাকরী করলাম, মাইনে নিলাম। আজ স্বাধীন

দেশ, আমার দেশ বিপন্ন হল, যুদ্ধ বাধল, শত্রু দেশে ঢুকল, আজ রিটায়ার করবার সুযোগ নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে আরাম করব? আমি বললাম, কি করতে চাও বল? বললেন, নতুন কন্‌ট্রাক্টের জন্য দরখাস্ত করি! আমি বললাম, কর। নিশ্চয়ই করবে। জান আমার জামাইবাবু, বিখ্যাত ব্যক্তিটি দেশের জন্যে জেল খেটেছিল। তার জন্যে কি গৌরব। তুমি যাও। নির্ভয়ে যাও! আমি ব্রত করব। নিশ্চয় ফিরে আসবে। দেশেয় জয় হবে।

উনি খুব খুশি হলেন। দরখাস্ত করলেন. ওখানেই থাকলাম অপেক্ষায়। দশ দিন আগে নতুন কন্‌ট্রাক্ট সই করলেন। আট দিনের দিন সকালে আপিস গিয়েই ফিরে এলেন—বুকে বুলেট বেল্ট, কোমরের বেল্টে রিভলভার সঙ্গীন ছোরা গুঁজে। বললেন, এখনই রওনা হচ্ছি। কাল পরশুতেই বোধ হয় ডিপার্টমেণ্ট তোমাদের দেশে পাঠাবে। চলে যেয়ো ছেলেদের নিয়ে! কেমন?

—বললাম, বেশ। প্রণাম করলাম।

উনি যেতে গিয়ে বললেন, যদি না ফিরি—

আমি বলতে দিলাম না। বাধা দিয়ে বললাম, ফিরবে। তবু শোন, তাই যদি সত্যি হয় তবে সব ভার আমার রইল—

বললাম—যা বলছ যদি তাই হয় তবে যেদিন খবর আসবে—সেইদিনই বড় খোকাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নিজে আমি আর্মিতে ভর্তি করে দেব।

উনিও অবাক হলেন—বললেন, তারপর।

তারপর আমি নিজে যাব। রাইফেল ছুঁড়তে শিখেছি ক্লাবে। দাঁড়াব গিয়ে ফ্রণ্টে!

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বুঝতে পারিনি চোখে জল ঝরছে।

জগদ্ধাত্রী উঠে প্রণাম করে নিঃশব্দে বারান্দা থেকে সেই অপরূপ জ্যোৎস্নার রূপের জোয়ারের মধ্যে যেন মিলিয়ে গেল। জানি এ রূপ জগদ্ধাত্রীর শাশ্বত রূপ নয়, আবার বদলাবে। তবু রবীন্দ্রনাথের গান মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করে উঠল—

'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি—
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।"

আমার জীবনে সুভাষচন্দ্র

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণী'।...

বইখানি উৎসর্গ করলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে। বাঙলার যৌবনশক্তির তিনি প্রতীক। নবযুগের অগ্রদূত। শুধু তাই নয়, এই সময় তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

সে কথাটিই এখানে বলব।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম, তারপর সরকারের সঙ্গে আপোষ কথাবার্তার সূত্রপাত হ'ল। এদিকে বাংলা দেশে লাগল কংগ্রেস নিয়ে বিরোধ। একদিকে সুভাষচন্দ্র অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। দু'জনকে কেন্দ্র ক'রে প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্বাচনে জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'ল। আমি তখন কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংশ্রব ত্যাগ করলেও কংগ্রেসের সভ্য।...বীরভূমেও এই বিরোধ বাধল। সেখানে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে সিউড়ীর গোপিকাবিলাস সেনগুপ্ত, সুরেন সরকার প্রভৃতি। স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎ মুখোপাধ্যায় মশায় নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করছেন। নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশী। তিনি লাভপুরে ডেটিন্যু হিসেবে কিছুদিন ছিলেন, তারপর আমার বাগানেই খানিকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি করেছিলেন একখানি। চতুর ব্যক্তি। তাঁর ধারণা ছিল তিনিই আমাকে মানুষ করেছেন এবং আমি তাঁরই একান্ত অনুগত। এই বিরোধে সবচেয়ে বেশী অনিয়ম এবং অনাচার করেছিলেন তিনি। এবং আমার অজ্ঞাতসারে আমায় বিশ্বস্ত আনুগত্য অনুমান ক'রে সব অনিয়মেই আমাকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। যে সভা হয়নি সে সভা কাগজে কলমে খাড়া ক'রে আমাকেই তার সভাপতি হিসেবে জড়িয়েছিলেন। কালে মহারাষ্ট্র ভবনে আনে মহোদয়ের আদালতে যখন বিচার সুরু হ'ল তখন বীরভূমের মূল সাক্ষী হ'লাম আমি। আমি রাজনীতি ছাড়তে চাইলেও রাজনীতির কম্বলরূপী ভালুক আমায় ছাড়লে না।

ওয়েলিংটন লেনে সাবিত্রীপ্রসন্নের [কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

প্রেস, কাগজের আপিস এবং বাসা। আমি ওখানেই তখন অতিথি হিসেবে রয়েছি। কিরণ রায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জমে উঠেছে। এমনি সময় একদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কোণের বি-পি-সি-সি থেকে স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর, সাবিত্রী-প্রসন্নকে অনুরোধ জানালেন যেন তারাশঙ্করকে নিয়ে একবার তিনি আসেন।

আমি বললাম, না। তিনি যা বলবেন সে আমি পারব না। মিথ্যা বলব না।

কয়েকদিন পর আবার অনুরোধ এল। বললাম, না।

বার বার তিনবার।

এর পর একদিন সাবিত্রীপ্রসন্ন বললেন, চল এক জায়গায় বেড়িয়ে আসি।

—কোথায় ?

—চল না। বললে চিনবে না হয়তো।

তিনজনে বের হ'লাম। আমি, সাবিত্রীপ্রসন্ন, কিরণ রায়। ভবানীপুরে এলগিন রোডের মোড়ে নেমে সাবিত্রীপ্রসন্ন আমাকে এনে তুললেন স্বর্গীয় শরৎবাবুর বাড়িতে। সামনের ঘরে আট দশ জন দর্শনার্থী। ভিতরে বোধ হয় দশ পনেরোটা কি তার বেশী টাইপ রাইটার খট্‌খট্‌ শব্দে অবিরাম চলেছে। ডানদিকের ঘরে সুভাষচন্দ্র আলোচনা করছেন সহকর্মীদের সঙ্গে। একটি অগ্নিশিখার মত দীপ্তিমান কিশোর ব্যস্ত হয়ে ঘুরছেন। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। কে ঠিক বলতে পারি না। সাবিত্রীপ্রসন্ন সংবাদ পাঠালেন। সুভাষচন্দ্র মিনিট কয়েক পরেই বেরিয়ে এলেন। আলাপ করলেন কয়েকটি কথায়, কিন্তু তাতেই পেলাম প্রাণের স্পর্শ।

—আপনিই তারাশঙ্করবাবু! আপনার সঙ্গে কথা বলা আমার যে কি প্রয়োজন! আমি আসছি। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।

ভাইপোকে ডেকে বললেন, চা দাও।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটল। একজন কংগ্রেসকর্মী—মাথায় চুল মুখে দাড়ি গোঁফ কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—একটু যেন ব্যঙ্গ করেই ব'লে উঠলেন, ওই! হল—। সাহিত্যিক নিয়ে এইবার জল খাওয়ানো মজলিস—।

বাকী কথা মুখেই রইল তাঁর। সুভাষচন্দ্র চলে যাচ্ছিলেন, ঘুরে দাঁড়ালেন বাঘের মত এবং বাঘের মতই গর্জন করে উঠলেন, হোয়াট!

এক বিন্দু অতিরঞ্জন করিনি, বক্তা ভদ্রলোক মুহূর্তে ধপ্‌ করে বসে গেলেন চেয়ারে।

—আমার অতিথি! ব'লে সুভাষচন্দ্র ভিতরে ঢুকে গেলেন।

আমি ভীত হয়েছিলাম খানিকটা। শক্ত ক'রে মনকে বাঁধলাম। সাবিত্রীকে শুধু বললাম, তুমি অন্যায় করেছ। আমাকে এমনভাবে এখানে আনা তোমার উচিত হয়নি।

বেরিয়ে এলেন সুভাষবাবু।

সঙ্গে সঙ্গে নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। সুভাষবাবু তাঁকে বললেন, না। আপনি যান।—তিনি চলে গেলেন।

সুভাষবাবুই প্রথমে কথা আরম্ভ করলেন, আপনি কেন সাক্ষী দেবেন?

আমি খুব সংযত করলাম নিজেকে। বললাম, আমি তো মিথ্যা বলব না! একটা কথা—। ব'লেই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম আমি।

তিনি প্রসন্ন মুখেই বললেন, বলুন।

বললাম, দেখুন, আমরা যারা কংগ্রেসের কর্মী হয়ে কাজ করি, তারা দেশের সেবা করতেই আসে, তারা তো সুভাষচন্দ্র বা জে. এম. সেনগুপ্তের সেবা করতে আসে না! আমি দেশের সেবা করতে চেয়েছি—চাই—তাই সত্য বলতে সাক্ষী দেব আমি।

মুহূর্তে দুই পাশ থেকে দু'টি আঙুলের টিপুনি খেলাম। একদিক থেকে কিরণ অন্যদিক থেকে সাবিত্রী আমাকে টিপলেন। আমি এর অর্থ ঠিক বুঝলাম না। বুঝতে চাইলামও না! আমি তখন কঠোর সত্য বলতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সাবিত্রী, কিরণ আশঙ্কা করেছিলেন, সুভাষচন্দ্র উষ্ণ হয়ে উঠবেন। আবার হয়ত গর্জন করবেন।

আমি সুভাষবাবুর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। তাঁর সুন্দর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য, টকটকে রঙ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি হাসলেন, প্রসন্ন হাসি। বললেন, নিশ্চয়। মানুষকে দেবতা হিসাবে সেবা করলে সাধনাই পণ্ড হয়ে যাবে কিন্তু আমি সত্য কথাটাই জানতে চাই। বলুন আপনি। সত্য কি ঘটেছিল?

পিছনে ঘরের ভিতরের দিকে তাকালেন তিনি, একান্তে আলাপের স্থান খুঁজলেন। দেখলেন স্থান নাই। বললেন, চলুন, লনে বেড়াতে বেড়াতে কথা বলি।

চারজনেই লনে বেড়াতে বেড়াতে কথা বললাম। আমি বিবরণ ব'লে গেলাম, তিনি মধ্যে মধ্যে দু'একটি প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন, আপনার কথা

আমি অকপটে বিশ্বাস করলাম। আপনি সত্য বলেছেন। আমি দুঃখিত, লজ্জিত—নরেনবাবু এই সব করেছেন—আমাকে ছোট করেছেন, কলঙ্কভাগী করেছেন। আপনি বিশ্বাস করুন, এ আমি চাই নি। এ আমি চাই না।

আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, আপনি শরৎবাবুকে [বীরভূমের] নিয়ে বিরোধ মিটিয়ে দিন।

আমি পারিনি। শরৎবাবুরা রাজী হন নি।

আমি তখন এই মানুষটির কাছে প্রায় আত্মসমর্পণ করেছি মনে-মনে।

'চৈতালী ঘূর্ণী' তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলাম।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আর একবার আমার দেখা হয়েছিল। কালানুক্রমেও এই ঘটনার খুব অল্পদিন পর। এবং আমার সাহিত্য জীবনের উপক্রমণিকা পর্বে এর কিছুদিন পর নেমে এল নাটকের যবনিকার মত একটি সংঘাতময় ছেদ। তিনিই আমাকে পথ নির্বাচনে কিছুটা সাহায্য করলেন—এই সাক্ষাতে।

তার আগে আমার তখনকার জীবন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। জেল থেকে বেরিয়ে এসে—জেলখানার সংকল্প মনে রেখে—বৈষয়িক জীবন থেকে মুক্তি নেবার জন্য ছোটভাইকে সব ভার অর্পণ ক'রে বোলপুরে একটি ছাপাখানা করলাম। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল একখানা কাগজ বের করব। সাপ্তাহিক কাগজ, নীলাম ইস্তাহার সর্বস্ব নয়, রীতিমত দেশপ্রেম প্রচার পত্রিকা। সাবিত্রীপ্রসন্ন আমাকে প্রেস ও সরঞ্জামপাতি কিনে দিলেন।···

প্রেস কিনে বোলপুরে প্রেস করলাম। বোলপুর কোর্টের পাশেই ছাপাখানা। চেক, রসিদ, আদালতের ফর্ম, ক্যাশ-মেমো, প্রীতি-উপহার ছাপি, একসারসাইজ বুকে কপিং পেন্সিলে গল্প লিখি।···

হঠাৎ বিপত্তি উপস্থিত হ'ল ছাপাখানা নিয়ে।

বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন স্বনামধন্য গুরুসদয় দত্ত। রায়বেঁশে নিয়ে বীরভূমকে মাতিয়ে তুলেছেন। রায়বেঁশে নৃত্য, ব্রতচারী দল বাংলায় সংস্কৃতিকে যেটুকু সমৃদ্ধ করেছে—তা স্বীকার ক'রেও বলব যে, সেদিন এই মাতনটি যাঁরা দেশকর্মী তাঁদের চোখে ভাল ঠেকে নি। এই মাতনটি সেদিন দেশের মানুষের দৃষ্টিকে কংগ্রেস আন্দোলন থেকে ফিরিয়ে অন্য দিকে নিবদ্ধ করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে ব'লে মনে হয়েছিল। এবং এই রায়বেঁশে বা ব্রতচারী

আন্দোলন প্রচার করতে তিনি যে শাসকের প্রতাপ প্রয়োগ ক'রেছিলেন—তাতেই এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেছে।...দত্ত সাহেব ব'লেই তিনি খ্যাত ছিলেন, তাঁর প্রতাপে—ইস্কুলে ইস্কুলে, গ্রামে গ্রামে তখন রায়বেঁশে নৃত্যের ঢোল বাজতে লেগেছে। উকীল নাচছে, মোক্তার নাচছে, ডেপুটি নাচছে, সাব-ডেপুটি নাচছে, দারোগা নাচছে, চৌকিদার নাচছে, হাকিম নাচছে, আসামী নাচছে, রায়বাহাদুর নাচছে, রায়সাহেব নাচছে, জমিদার নাচছে, ধনী নাচছে, হেডমাস্টার নাচছে, সেকেণ্ড মাস্টার নাচছে, ছাত্র নাচছে—সে এক অত্যদ্ভুত কাণ্ড। না নেচে পরিত্রাণ নাই। হাত ধরে টেনে এনে বলেন—নাচুন রায়বাহাদুর! তেমনি ছিল তাঁর অসহিষ্ণুতা। আই. সি. এস. সুলভ অসহিষ্ণুতা যে কি বস্তু যাঁরা জানেন—তাঁরাই বুঝবেন সে কথা।

রায়পুরের কংগ্রেসকর্মী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী বা চট্টোপাধ্যায় দত্ত সাহেবের একটি আচরণে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। দত্ত সাহেব বীরভূমে যেখানে যত প্রাচীন মূর্তি পেয়েছিলেন সব সংগ্রহ করে এনেছিলেন। মূর্তি, পট, দারুশিল্প; সে বোধ হয় ওয়াগন ভর্তি জিনিস। রায়পুরে ছিল প্রাচীন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ একটি মূর্তি, তিনি সেটিও সংগ্রহ ক'রে আনেন। গ্রামের লোকে ক্ষুব্ধ হলেও প্রতিবাদ করতে সাহসী হয়নি। ব্যোমকেশ আনন্দবাজারে এই সম্পর্কে একটি নামহীন পত্র লেখে, পত্রখানি প্রকাশিত হয়। তাতে দত্ত সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। প্রথম সন্দেহ করেন—পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নকে। তাঁকে বোধ হয় কিঞ্চিৎ শাসনও করেছিলেন এবং নিজের প্রতাপে গ্রামের প্রসাদ-ভিক্ষুকদের দিয়ে এই প্রতিবাদের প্রতিবাদপত্র আনন্দবাজারে প্রকাশিত করলেন। ব্যোমকেশ আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং রায়বেঁশে নিয়ে এক ব্যঙ্গ কবিতা লিখে আমাদের প্রেস থেকে ছাপিয়ে নিলে। তখন আমরা অর্থাৎ আমি বা আমার মেজভাই—কেউই বোলপুরে ছিলাম না। কম্পোজিটরদের দিয়ে ব্যোমকেশ ছাপিয়ে নিয়ে জেলাময় দিলে ছড়িয়ে। কবিতাটির প্রথম দু'লাইন ছিল আমাদের জিলায় প্রচলিত একটি ছড়া—

আমার বিয়েয় যেমন তেমন,
দাদার বিয়েয় রায় বেঁশে
আয় ঢকাঢক্ মদ খে-সে।

ব্যোমকেশ একটু বুদ্ধিহীনের কাজ করেছিল। আমার অনুপস্থিতিতে ছাপানো তার অন্যায়ও হয়েছিল এবং নির্বুদ্ধিতার কাজও হয়েছিল। আমি থাকলে

ছেপে দিতাম, দাম নিতাম না এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানিতে ছাপাখানার নামও দিতাম না। কম্পোজিটর কোন সন্দেহ করেনি; ছেপে প্রেসের নাম দিয়েছিল এবং ফাইলে তার কপিও রেখেছিল। ওদিকে দত্ত সাহেবের হাতে কাগজখানা পড়তে দেরী হ'ল না। দত্ত সাহেব জলে উঠলেন। বিশেষ পুলিশ কর্মচারী এল বোলপুর, প্রেস খানাতল্লাস হ'ল, কাগজখানাও বের হ'ল। কম্পোজিটর সমেত থানায় গেলাম। বললাম এ কবিতা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কম্পোজিটর বেচারী বিনা ধমকেই ব'লে দিলে রায়পুরের ব্যোমকেশবাবু ছেপে নিয়ে গিয়েছেন, বিয়ের প্রীতি-উপহার বলে। এখন ওই কাগজখানার বলে কিন্তু কোন রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা দায়ের করা যায় না এবং আমাদেরও গ্রেপ্তার করা যায় না। থানা থেকে ফিরে এলাম। বিশেষ পুলিশ কর্মচারীটি চলে গেলেন—দত্ত সাহেবকে বিবরণ নিবেদন করতে কয়েকদিন পরেই এল নোটিশ। অমাদের উপর নোটীশ এল দু'হাজার টাকা জামানত দিতে হবে।

মামলা কিছু হয়নি। তলব হ'ল। তিরস্কৃত হ'লাম। কিন্তু জামিন বা বণ্ড কি দেব স্থির করতে পারলাম না। সময় নিলাম।

ঠিক এই সময় একদিন শুনলাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এসেছেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতে।...

বেলা তিনটে, তখন বোলপুর স্টেশনে আপ-ডাউন দু'খানি ট্রেনের ক্রসিং হয়। তিনটেয় বোলপুরে চাপলে সাড়ে সাতটা-আটটায় হাওড়া পৌছান যায়। আমাদের বাড়ি লাভপুরে যেতেও আপ ট্রেনখানি সবচেয়ে সুবিধের। আমি বোলপুর থেকে বাড়ি ফিরছি। আপ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ চোখে পড়ল একখানি গাড়ি এসে থামল স্টেশনের বাইরে। সুভাষচন্দ্র—দীপ্তিমান তারুণ্যের জীবন্ত মূর্তি—চারিদিক যেন উদ্ভাসিত ক'রে নেমেই ওভারব্রিজ পার হয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমার ইচ্ছা হ'ল, দেখা করি। কিন্তু সন্দেহ হ'ল, চিনতে পারবেন কি? কি বলব? কি পরিচয় দেব?

হঠাৎ চোখে পড়ল, সুভাষচন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। চোখ দেখেই বুঝলাম, চিনেছেন—স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে যে মানুষ বিচরণ করেন, সমগ্র দেশ যাঁর চিন্তার ক্ষেত্র, অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত যাঁর দৃষ্টি প্রসারিত, স্বপ্নে যিনি বিরাট দেশের ভবিষ্যৎ রচনা করেন, তাঁর

পক্ষে আমার মত অতি সাধারণ চেহারার একজনকে একবার পনের-বিশ মিনিট দেখেই কি মনে রাখা—চেনা সম্ভবপর? দেখলাম, সম্ভবপর। প্রতিভা—অতিমানবের শক্তিতে যাঁরা শক্তিমান—তাঁরা পারেন। এই শক্তি দেখেছি রবীন্দ্রনাথের। আর আমি বিলম্ব করলাম না। ডাউন প্ল্যাটফর্মে গেলাম, নমস্কার ক'রে দাঁড়ালাম।

তিনি তখন স্মৃতি মন্থন ক'রে আমার নাম ঠিক ধরেছেন। বললেন, তারাশঙ্করবাবু!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এখানে? কি করেন এখানে?

বললাম সংক্ষেপে—প্রেস করেছি এখানে।

তিনি বললেন, ভালো। প্রেস চলছে কেমন?

এবার বললাম, চলছিল কোন রকমে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, বন্ধ করব কি চালাব।

—কেন?

বিবরণ বললাম। তাঁর আশ্চর্য শুভ্র চোখ দু'টি দপ্‌ ক'রে যেন জলে উঠল। সে সত্যিই জলে ওঠা। এমনভাবে চোখ জলে ওঠা আমি আর কারও দেখিনি। তার ছটা আমার চোখে লাগল। উত্তাপ আমি অনুভব করলাম। বললেন, না। বন্ধ করে দিন। বণ্ডও দেবন না, জামিনও দেবেন না।

স্থির হয়ে গেল পথ।

প্রেস বন্ধ হ'ল। গরুর গাড়ি ক'রে লাভপুরে এনে ফেললাম।

সাবিত্রীপ্রসন্ন

গত ২২শে মে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের খেলা শেষ হয়ে গেল।

সাবিত্রীপ্রসন্নের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক জীবন একরকম শুরু থেকে জড়িয়ে আছে।

সাবিত্রীপ্রসন্ন তখন 'উপাসনা'র সম্পাদক। খ্যাতনামা কবি এবং দেশপ্রেমিক ও সেবক বলেও সম্মানিত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে সুপরিচিত; দেশবন্ধু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, বিধানচন্দ্র

থেকে তখনকার বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ থেকে ১৯২৯ সনে আমার সঙ্গে পর্যন্ত তাঁর পরিচয়। আমার দু'টি গল্প তিনা মাসে পর পর কল্লোলে বের হতেই তিনি আমাকে পত্রযোগে আহ্বান করেছিলেন। কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

সেদিন আমি আশ্রয় পেয়েছিলাম সাবিত্রীপ্রসন্নের মধ্যে, দেখেছিলাম গ্রামের মানুষ তাঁর মধ্যে বেঁচে আছে; এবং একজন দেশসেবক ও দেশপ্রেমিক উজ্জ্বল মূর্তিতে অধিষ্ঠিত। আমার সঙ্গে চরিত্রগত মিল পেয়েছিলাম। তিনি আমারই সমবয়সী। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় আমার সুবিদিত। কলেজ-জীবনে তিনি আমার থেকে এক বছরের অগ্রগামী। কলেজ-জীবনেই সেণ্ট পলস কলেজে সরস্বতী পূজা নিয়ে মিশনারী কর্তৃপক্ষের ছাত্রদের যে সংঘর্ষ হয় সে সংঘর্ষে সাবিত্রীপ্রসন্নই ছিলেন অবিসংবাদী ছাত্রনেতা। চোখে না দেখলেও বিবরণ থেকে তাঁর সেই কালের তরুণ প্রদীপ্ত মূর্তি কল্পনা করতে পারি। তাঁর চোখের দীপ্তি সঞ্চারিত হচ্ছে ছাত্রদের চোখে। কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ছাত্র মিছিলের কণ্ঠে। যে ধ্বনি ও দীপ্তির আকর্ষণে তখনকার দিনের তারুণ্যের নবোদিত ভাস্কর সুভাষচন্দ্র এসে তাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন।

সাবিত্রীপ্রসন্ন জীবন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে বাংলার গ্রামের একটি তরুণের চিত্তেও তাঁর স্পর্শ পাঠাতে পেরেছিলেন। তখন তাঁর পল্লী কবিতা আমার ভাল লাগে, পরাধীনতার বেদনার কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে, স্বাধীনতা কামনার দীপ্ত আবেগ মনকে চঞ্চল করে। তাই তাঁর নাম আমার পরিচিত ছিল। অবশ্য প্রথম প্রথম আমি তাঁর সমকক্ষতায় পৌঁছতে পারি নি, সমকক্ষ ছিলামও না, খানিকটা শ্রদ্ধার ব্যবধান রেখেই চলতাম। কিন্তু 'উপাসনা'ই হয়ে উঠেছিল আমার সাহিত্য সেবার আশ্রয়। সেটা ১৯২৯ সন। ১৯৩০ সনের আন্দোলনে জেলে চলে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে যোগাযোগে ছেদ পড়ল। কিন্তু সাবিত্রীপ্রসন্ন ছেদ টানলেন না, তিনি তার মধ্যেও যোগসূত্রটি বজায় রাখলেন। তার আগে 'উপাসনা'য় আমার 'চৈতালী ঘূর্ণী' প্রথম উপন্যাস বের হয়েছে দু-তিনটি সংখ্যায়। ১৯৩০ সনের প্রথমেই সাবিত্রীপ্রসন্ন একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন—কি নাম ছিল ঠিক মনে নেই। তবে কাগজখানির সঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেসের যোগ ছিল। সম্ভবতঃ তিরিশের আন্দোলনকে সাহায্য করতেই কাগজখানির সৃষ্টি হয়েছিল।

আমি জেলে গেছি সংবাদ শুনে সাবিত্রীপ্রসন্ন আমার ছবি সংগ্রহ করে তাঁর এই কাগজে আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ প্রকাশ করেছিলেন।

জেল থেকে বেরিয়ে এসেই কাগজখানি দেখেছিলাম। দেখে যেমন উৎসাহ অনুভব করেছিলাম (কারণ সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রে এই আমার প্রথম ছবি প্রকাশিত হল) সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীপ্রসন্নের প্রীতি অনুভব করে কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম। এদিকে কল্লোল তখন উঠে গেছে। 'উপাসনা'ই আমার একমাত্র অবলম্বন হয়ে রইল।

এবার কলকাতায় এসে সাবিত্রীপ্রসন্নের বাড়িতেই উঠেছিলাম। বেশ কিছুদিন—বোধ হয় পনেরো-কুড়ি দিন ছিলাম। একসঙ্গে বাস, একসঙ্গে আহার এবং রাত্রিতে দীর্ঘক্ষণ গল্পগুজব আলাপ-আলোচনার মধ্যে কাটিয়েছি, অন্তরঙ্গতা ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়েছিল। সে অন্তরঙ্গতা আরও ঘন হল আরও একটি ঘটনায়। সাবিত্রীপ্রসন্ন একদিন "চলুন, এক জায়গায় বেড়িয়ে আসি" বলে আমাকে এনে সরাসরি তুলেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে।

এখানে তিনি আমাকে এনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সামনে উপস্থিত করলেন। সেদিন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, তাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম এবং আজও পর্যন্ত জীবনের যে ক'টি দিনকে আমি শ্রেষ্ঠ বলে গণনা করি তার মধ্যে সেই দিনটি অন্যতম একটি দিন তাতে সন্দেহ নেই এবং এমন দিন বোধ করি জীবনে আর আসবে না।

এরপর প্রায়ই আমরা মিলিত হয়েছি স্বর্গত বিমলচন্দ্র সিংহের লান্সডাউন রোডের বাড়িতে। সাহিত্য শিল্প আর দেশের কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকত না, সুখ-দুঃখ নানান কথার মধ্যে সেই পুরাতন অন্তরঙ্গতা আবার বর্ণে স্বাদে উজ্জ্বল এবং মধুর থেকে মধুরতর হয়ে উঠেছিল।

নিত্য নূতন করে পরস্পরকে আবিষ্কার করেছি। তাঁর মধ্যে যেমন পেয়েছি সরল উদার দেশপ্রেমিককে, তেমনি দেখেছি একটি অভিমানী মানুষকে। একটি অভিমান তাঁর ছিল। অবহেলার অভিমান। তিনি অনুভব করতেন যে প্রাপ্য বলে কিছু পান বা না পান, যে অবহেলা তাঁর প্রাপ্য নিশ্চয় ছিল না, সেই অবহেলাই তাঁর জীবনের পাত্র তিক্ত করে তুলে উপচে পড়েছে। চরিত্রের যে জটিলতায় মানুষ কুটিল চক্রান্ত করে কাম্যবস্তুর প্রাপ্য বলে আদায় করে তাঁর চরিত্রে সে জটিলতা ছিল না। কুটিল পথে নামা হাঁটা

তাঁর সাধ্যের অতীত ছিল। ঘৃণা হলে, নিজেকে অশুচি মনে করতেন।

আবার যে উগ্রতা থাকলে, উচ্চ কণ্ঠে দাবি জানিয়ে বা জোর করে মানুষ আদায় করে নেয় নিজের প্রাপ্য, তাও তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন শান্ত মানুষ। মানুষের কাছে মানুষ আপনি-সসম্মানে তুলে দেবে নিজ নিজ প্রাপ্য এতেই ছিল তাঁর বিশ্বাস এবং এতেই ছিল তাঁর রুচি।

আমি নিজে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখছি। মনে হয়েছে, কার্যকারণে এইটে যে তাঁর জীবনে দুর্ভাগ্যের মত এসেছিল, তার জন্য দেশের নেতা এবং সমাজপতিরা দায়ী হলেও সাধারণ মানুষেরা দায়ী নয়।

কিছুকাল আগে চীন আক্রমণের সময় সাবিত্রীপ্রসন্ন আর একবার প্রজ্জ্বলিত হবার চেষ্টা করেছেন, কয়েকটি কবিতায় তার পরিচয় আছে; এবং দেশপ্রেমিক কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের মূল্য সেদিন নূতন করে অনুভব করলো দেশ।

স্বাধীনতার পর গান্ধীজীর সাধনপীঠে সাধনভ্রষ্ট মানুষের আবির্ভাব দেখে নিরন্তর বেদনা অনুভব করেছেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন শক্তি কাড়াকাড়ির নির্লজ্জ চক্রান্ত দেখে সভয়ে চোখ বুজেছেন কিন্তু তবু তিনি সরে আসেন নি, প্রত্যাশা করেছেন। কোথা থেকে কোনদিন নূতন সাধকদলের আবির্ভাব হবে, আবার কেরোসিনের অভিসিঞ্চন বন্ধ হবে এবং নূতন করে পড়বে ঘৃতের আহুতি। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের নির্মলতায় ও আলোকে সকল কলুষ ও গ্লানির মেঘাচ্ছন্নতা ও কুয়াশা দূরীভূত হবে, জীবন সঞ্জীবিত সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে।

সেই সাবিত্রীপ্রসন্ন চলে গেলেন। দেশ ও বঙ্গসাহিত্য একজন নির্মলচিত্ত সেবককে হারালে। নিজেকে আজ বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

অপরাজিত বিভূতিভূষণ

বাংলা সাহিত্যের নাটমণ্ডপে পথের পাঁচালীর আসর ভাঙ্গিয়া গেল। মেঘমল্লার রাগিণী শেষ হইয়া গেল! অরণ্যভূমের বিচিত্র সঙ্গীত অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গলাদেশের ভাঁটফুল-বনতুলসী-কাশফুলভরা মাটির একতারা বাজাইয়া যে বাউল টহল দিয়া ফিরিতেছিল—নগরের রাজপথে ঐশ্বর্যবিলাসের ছটায় আত্মহারা মানুষ যে গানের ধ্বনি শুনিয়া শান্ত ছায়ানিবিড় গ্রামের স্মৃতিতে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে, অশান্তি-অতৃপ্তি-ক্ষোভ হইতে মুক্তি-পথের ইসারা

পাইয়াছে, এক শাশ্বত আনন্দময় মর্মলোকের সন্ধান পাইয়াছে—সেই বাউলের কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল।

অপরাজিত রচয়িতা—অপরাজিত বিভূতিভূষণ নাই? এত শীঘ্র ডাক আসিল? বাংলা সাহিত্যের মন্দিরে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' নিভাইয়া দিয়া আরতির কাল উত্তীর্ণ হইতে না হইতে বিভূতি, দেবতাত্মা বিভূতিভূষণ মহাপ্রয়াণ করিলেন! বাঙ্গলার পল্লীভূমের বনকুসুমের পূজা-উপচারের যে দিব্যগন্ধে মুগ্ধ বাঙ্গলার পাঠকসমাজ শোক-দুঃখ, দারিদ্র্য, বেদনা, তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা ভুলিয়া ক্ষণেকের জন্য দিগন্তের দিকে চাহিয়া বিয়োগান্ত জীবন-রহস্যের মধ্যে অমৃতের আনন্দের আভাষ পাইয়া ধন্য হইত—সে দিব্যগন্ধ আজ ম্লান হইয়া গেল!

বিভূতিভূষণের রচনার সাহায্য না লইয়া বোধ হয় তাঁহাকে বুঝাইতে পারা যায় না। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, বিভূতিভূষণ ছিলেন সাধক। অমৃতময় আনন্দই ছিল তাঁর ইষ্ট—তারই মধ্যে তিনি তাঁর পরম পুরুষকে পাইবার সাধনায় মগ্ন ছিলেন। আজকার এই বস্তুবিজ্ঞান সর্বস্বতার যুগে তাঁকে সম্যক উপলব্ধি করার মত মানসিক গঠনশক্তি নিশ্চিতরূপে হ্রাস পাইয়াছে। অনেক অতি আধুনিকের নিকট মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন শুনিয়াছি—"কেন এবং কি লেখেন বিভূতিবাবু?" এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন একদা মহাকাল। বর্তমান বৎসরের কার্তিক সংখ্যার কথাসাহিত্য পত্রিকায় বিভূতিভূষণ 'কুশল পাহাড়ী' নামে একটি কাহিনী লিখিয়াছেন—সেই কাহিনী হইতেই অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহাতেই আছে বিভূতিভূষণের আত্মপরিচয়—এই পরিচয়ই বিভূতিভূষণের রচনার ঘরের চাবিকাঠি। এই রচনায় তিনি তাঁর পরম পুরুষকে কোন্ রূপে কোন্ পরিচয়ে দেখিয়াছিলেন, চিনিয়াছিলেন, সেই কথাই বলিয়াছেন। "কবির্মনীষা পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ"। এই শ্লোকের 'কবি' কথাটির অর্থ তিনি যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তাহা এই—"কবিই তিনি বটেন। শালগাছে যখন ফুল ফোটে, বর্ষাকালে যখন পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়—তখন ভাবি, কবিই তিনি বটেন।—তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েছি।" অবশ্য এই শ্লোক ও শ্লোকের এই ব্যাখ্যা তিনি একদা শুনিয়াছিলেন সুন্দরগড় স্টেটের অরণ্যভূমের কুশল পাহাড়ীতে এক সাধুর নিকট। কিন্তু তাঁর নিজেরও ছিল এই উপলব্ধি, সে উপলব্ধি ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বিভূতিকে এই সাধুই বোধ হয় শুনাইয়াছিলেন, সুপ্ত ইষ্টমন্ত্র জাগরণে সাহায্য করিয়াছিলেন। তারও প্রমাণ তাঁর এই রচনার মধ্যেই আছে। কলিকাতায় তিনি এক ধনীর গৃহে পার্টিতে

গিয়াছিলেন—এই সাধু-সাক্ষাতের সাত বৎসর পর। সেখানে আলোচনা চলিতেছিল ইলেকশনের, দেওঘরের বাড়ীর, ফার্ণিচারের, কলিকাতার বাড়ীর প্ল্যানের, নানা মতবাদের; বাহিরে ক্রাইসলার বুইক মিনার্ভা কারের সারি, ভিতরে ঘর—বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত; আলোচনায় চলিতেছে তখন রাজনৈতিক তথ্যের বিশ্লেষণ—তার মধ্যে বসিয়া বিভূতিভূষণ যাহা দেখিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার উক্তিতেই প্রকাশ পাইবে।

"সেই বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত ঘরে সুবেশ সুশিক্ষিত ভদ্রজন-সমাগমের মধ্যে ব'সে আমার মনে আসছিল, কুশল পাহাড়ীর সেই প্রাচীন সাধুর কথা। তার সেই সুন্দর সরল বাণী, নির্জন বনানী ঘেরা বটতলাটিতে যা সেই রাত্রে উচ্চারিত হয়েছিল—এখানে ব'সে অবার তারই স্মৃতি জেগে উঠল অতীত দিনের শোনা আধো-ভোলা, আধো-মনে-পড়া কোন মধুর গানের একটি চরণের মত।"

এইটুকু না বুঝিলে বিভূতিভূষণকে বুঝিতে পারা যাইবে না। বিভূতিভূষণের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় একটু অন্তরঙ্গ হইলেই এ সত্য উপলব্ধি করিতে পারিত অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। দম্ভ লইয়া অহংকার লইয়া পরিচয় করিতে গেলে, দম্ভ অহংকার ধুলায় মিশাইয়া যাইত। তাঁর কীর্তির চেয়েও তিনি নিশ্চিত-রূপে মহৎ ছিলেন। সে পরিচর আমি জানি। সে কথা আজ এইক্ষণে নয়। বেদনায় অনেক কথা বলিতে মন রাজী হয় না। আজ সাশ্রুনেত্রে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবি। বাংলা সাহিত্য-মন্দিরের ঘৃতদীপ নিভিয়া গেল। নূতন কালে বৈদ্যুতিক আলোকে মন্দির দীপ্ত হয়তো হইবে, কিন্তু—ঘৃতদীপ?

হে অমৃতপথযাত্রী—হে অমৃতময় আনন্দের তপস্বী সাধক—আমার প্রণাম গ্রহণ কর। হে বন্ধু—হে প্রিয়বর,—আমার—তোমার অনুরাগী পাঠকবৃন্দের অশ্রুর অঞ্জলি গ্রহণ কর।

'সপ্তপদী' প্রসঙ্গে

কিছুকাল আগে রেডিয়ো থেকে কয়েকজনকে 'মনে রাখার মত মানুষ' এই পর্যায়ে নিজের নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলা হয়েছিল। এ পর্যায়ের কথিকাগুলি সত্যই একেবারে বিস্ময়কর এবং কৌতূহলোদ্দীপক।

ইংরেজীতে যাকে বলে **Truth is stranger than fiction** ; কিন্তু যিনি **fiction** রচনা করেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সত্য অবশ্যম্ভাবীরূপে তাঁর **fiction**-ভুক্ত বা তার অঙ্গীভূত হয়ে বসে থাকে। অবশ্য যদি সে অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য সদ্য-লব্ধ না হয়। পৃথিবীর সব লেখকই এই বিচিত্র বিস্ময়কর সত্যের মধ্য দিয়ে সেই জীবন-সত্যকে খুঁজে বেড়ান, স্বর্ণসন্ধানী বা মণিমাণিক্য-সন্ধানী দুঃসাহসীর মতো। সে সন্ধান যার মেলে সে-ই ফকির থেকে হয় ধনী। এর সন্ধানেই বড় বড় লেখকেরা মানুষের মেলার মধ্যে বিহ্বলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। লিখবার উদ্দেশ্যে ঘোরেন না, দেখবার উদ্দেশ্যেই ঘোরেন। লণ্ডন প্যারিসের পথে-গলিতে, রাশিয়ার শহরে-গ্রামে ব্ল্যাক সীর তটভূমিতে বড় বড় লেখকেরা ঘুরেছেন, দেখেছেন। যাঁরা পূর্বকালে এদেশে মহাকাব্য লিখেছেন তাঁরা পদব্রজে ভারতের হিমালয় থেকে সমতল নগরগ্রাম অরণ্যভূম পরিভ্রমণ করেছেন। এই সত্য মিলে গেছে এমনই বিচিত্র মানুষের জীবন-সত্য থেকে। আমারও এ স্বভাব ছিল, আজও আছে। এককালে বাংলার মেলায় মেলায় ঘুরেছি। গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। এখনও ঘুরি। এমনি ঘোরার মধ্যে দেখা পেয়েছিলাম একজন মনে রাখার মতো মানুষের। আমি লেখক, আমার মনে রাখার মতো মানুষ মনেই থাকেনি—আমার মনের সাগরে অবগাহন করে আমার লেখার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সপ্তপদী সৃষ্টির এই বিচিত্র সত্যটি—ইদানীং কালে আমার রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা বাস্তব-বৈচিত্র্য অনুসারী। এবং সত্য সত্যই এক্ষেত্রে **Truth is stranger than fiction.**

সপ্তপদীর সমাদর হয়েছে। এবং গল্পের নায়কের অস্তিত্ব ও সত্যের কথা রেডিয়ো-শ্রোতাদের কাছে বলেছি ও প্রবন্ধের বইয়ের মারফৎ পাঠকদের কাছেও হাজির করেছি। সেইটুকু পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করছি।

মানুষের বাস্তব জীবনে রাম মেলে না কিন্তু মহাকবি রবীন্দ্রনাথ মেলে—মহাত্মা গান্ধী মেলে—নেতাজী সুভাষচন্দ্র মেলে—আমার জীবনেই মিলেছে। তাঁরা তাঁদের কর্মে কীর্তিতে ইতিহাসের পাতার মারফতে চিরকাল মানুষের মনে থাকবেন। যারা না দেখেছে—তারাও রাখবে। কিন্তু এ-ছাড়া কিছু মানুষ আছেন তাঁদের ছবি ওঁদের ছবির নিচের সারিতে ঝুলানো থাকে, তাঁরা একান্ত-ভাবে আমার কালে আমার মনেই অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। আমার মুখে বা আমার লেখার মধ্যে আঁকা তাঁর ছবি হয়তো অনেক লোকের মনেই আঁকা

হয়েছে। কতদিন তা উজ্জ্বল থাকবে তা বলতে পারিনে, সে নির্ভর করছে আমার লেখার সার্থকতার উপর। তবে সে মানুষ আমার মনে অক্ষয় হ'য়ে থাকবে চিরদিন। আমি লেখক বলেই এ-কথা বলছি। আমার কাছে মনে রাখবার মতো মানুষ যারা আমার লেখার মধ্যে অবশ্যই রূপ নিয়েছে তারা। এক শশী ডোমই কি কম বার এসেছে ফিরে ফিরে! আজ বিশ্লেষণ-বিচার করতে গিয়ে দেখছি—নিজেই আমি ছদ্মবেশ নিয়ে বেশিবার এসেছি। সে আমার নিজের কথা বলেছি। সে মনে রাখার মতো মানুষের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু প্রথম থেকেই একটি মানুষ অমৃত-ভরা স্বর্ণপাত্রের মতো আমার চোখের সামনে ভাসছেন।

ক'দিন বা দেখা, কতটুকু বা পরিচয়, হিসেব করে বলতে বললে বলি—

১৯১৬ সালে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলাম। পড়বার সুযোগ হ'য়েছিল মাস ছয়েক। সেই সময় অতি দৃপ্ত প্রচুর উল্লাসে ভরা কলেজ মাতানো একটি লম্বা ছেলেকে দেখেছিলাম। তার পদক্ষেপ বলে দিত—এ আর কেউ নয় সে; বহু কলরবের মধ্যে একটি সবার উপরে ছাপিয়ে উঠত, শুনেই বুঝতাম সে; খেলার মাঠে গোলের মধ্যে বল নিয়ে ঢুকে গেল যে—সে আর কেউ নয়, সে—সে। যেন একটা ঘূর্ণাবর্ত। বোধহয় ফোর্থ ইয়ারে পড়ত। আমাদের থেকে বয়সে বড়, বলবার ক্ষেত্রও হয় নি—সুযোগও হয় নি। কলেজের দক্ষিণদিকে তখন জুনিয়ার ও সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ ইস্কুল—সেখানে পড়ে বড় বড় লোকের ছেলে আর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ছেলে। মধ্যে মধ্যে দেখি সে তাদের মধ্যে বসে সিগারেট খায়। হঠাৎ গুজব শুনলাম ওই ছেলেটি ক্রিশ্চান হয়ে যাচ্ছ। সেকালে মনটা ছঁ্যাৎ করে উঠেছিল। হিন্দুর ছেলে ক্রিশ্চান হয়ে যাচ্ছে? ছি—ছি—ছি। অকপটেই আজ স্বীকার করব যে সেকালে ক্রিশ্চান ধর্ম ইংরেজদের ধর্ম—ইংরেজদের ধর্ম বলে তার উপর সাধারণভাবে হিন্দুরা প্রীত ছিল না। তাছাড়া প্রতি ধর্মেই একটা গোঁড়ামি আছে। এবং তার মধ্যে আমাদের ধর্মের বিধিনিষেধের কঠোরতার সঙ্গে বিদ্বেষও বেশী এ-কথা অস্বীকার করব না।

আরও ছি-ছি করে উঠলাম যখন শুনলাম ক্রিশ্চান ধর্ম সে গ্রহণ করবে একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করবে বলে। তারা দুজনেই দুজনকে ভালোবেসেছে। কিন্তু মেয়েটির বাপ বলেছেন—ক্রিশ্চান না-হলে তিনি এ-বিবাহে মত দেবেন না। তাই সে বলেছে—ভাল কথা—ক্রিশ্চানই সে হবে।

এরপর সে কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজের পটভূমি থেকে মুছে গেল। আর তাকে দেখা গেল না। আর সে দুপদাপ পদধ্বনি শোনা যায় না, কণ্ঠস্বর শোনা যায় না; খেলার মঠে লম্বা একটি খেলোয়াড়কে বল নিয়ে নেটের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখা যায় না। শুনলাম—বিয়ে করে রেলে-টেলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

বাস—মুছে গেল সে কলেজ-স্মৃতি থেকে। আমিও ক'মাস পর পুলিসের তাড়ায় পড়া ছেড়ে গ্রামে এলাম। বাড়িতে অন্তরীণ হলাম। দিনে দিনে বিস্মৃতির স্থূল অন্ধকার সে আমলের দেখা লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে তাকে গ্রাস করলে—যেমনভাবে মাটির স্তর গ্রাস করছে মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার সঙ্গে কত নামহীন গ্রামকে কত কুটীরকে। মনের বিস্মৃতির গ্রাস বোধ করি আরও বিচিত্র। আমার একটি গল্প আছে—এক তরুণ যাত্রাদলের গায়ক একটি গ্রাম্য তরুণীকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু মিলন তাদের হল না। দীর্ঘকাল পরে সেই যাত্রাদলের গায়ক—তখন সে প্রবীণ, এলো সেই গ্রামে গাওনা করতে; সেই মেয়েটি তখন গৃহিণী-জননী-প্রৌঢ়া-স্থূলাঙ্গী: যাত্রাদলের গায়ক যতক্ষণ আসরে গান করলে ততক্ষণই সতৃষ্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজলে—তাকে যদি দেখতে পায়। মেয়েটি সামনেই বসে গান শুনছিল। কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারলে না। বাহির সংসারে মানুষ মরলে তাকে পুড়িয়ে ছাই করি, মাটির তলায় কবর দি। মনের সংসারে মানুষ জীবিতকেও মাটির তলায় চাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। তাকে বোধ করি মাস কয়েকের মধ্যেই কবর দিয়েছিলাম মনের মধ্যে।

•

এর চল্লিশ বৎসর পর। ১৯৫৬ সাল। বিশেষ কারণে স্থান এবং পাত্রের নাম গোপন রেখেই বলছি—সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে—ভারতবর্ষের প্রায় এক প্রান্তসীমায় গিয়েছিলাম—সভাসমিতির নিমন্ত্রণে। যাঁর বাড়িতে উঠেছিলাম তিনি একদা ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। আমারই সমবয়সী। জীবনের পরিচয় আদান-প্রদানের সূত্রে প্রকাশ পেল যে তিনি এবং আমি একই সালে, একই কলেজে, একই শ্রেণীতে পড়েছি। মুহূর্তে পরস্পরে বেশ একটু নিবিড় অন্তরঙ্গতা অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে অতীতকাল সাড়া দিয়ে উঠল। সেই কলেজ জীবনের কথা ছোটখাটো টুকরো টুকরো বেরিয়ে আসতে লাগলো। যেন প্রবল একটা বর্ষণে মাটি ধুয়ে বেরিয়ে পড়েছে—কয়েকটা কাঁচের বা শাঁকের চুড়ির টকরো, কোনো একটা ভাঁড়ের ভাঙা কানাটা হয়তো বা গোটাই

একটা খুরি বা পাথরের শীল। একে মনে আছে? ওকে? আছে বই কি। সেই তো রোল নম্বর একশো—কি এক? দাঁত দুটি উঁচু। কপালে চুলের একটা ঘুর্ণি?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আর তাকে?

—কাকে বলুন তো? কেমন দেখতে?

একদিন তাঁর সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে জীপে ঘুরছি, দু'ধারে বন আর পাহাড়, হঠাৎ এক জায়গায় এসে প্রশ্ন করলেন—একে মনে আছে? আমাদের সময়ে ফোর্থ ইয়ারে পড়ত, লম্বা কালো—হৈ হৈ করে মাতিয়ে রাখত সব। মেম বিয়ে করবার জন্যে ক্রিশ্চান হয়েছিল?

বলালম—আছে বইকি!

—দেখবেন তাকে?

—এখানে কোথায় সে?

—চলুন, দেখবেন।

জীপকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন একখানি গ্রামে। পাহাড়ের কোলে—আদিবাসীদের গ্রাম। তার মধ্যে কাঠে তৈরী একটি চার্চ। সেই চার্চের পাদরী, একজন দীর্ঘ শীর্ণকায় মানুষ—মুখে আশ্চর্য প্রসন্ন হাসি। গ্রামের ছেলেদের পড়াচ্ছেন। বললেন—উনি।

অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—উনি?

—হ্যাঁ। কিছুদিন হল ওঁকে আবিষ্কার করেছি—কথায় কথায় পরিচয় হল—জানলাম উনিই তিনি।

সেই প্রচণ্ড দুর্দান্ত হৈ হৈ-করা ছেলে—যে একটি নারীর জন্যে ধর্ম-বাপ-মা সব বিসর্জন দিতে পারে—সেই ইনি। শান্ত-প্রসন্ন-মধুর।

বন্ধু বললেন—একটা ট্রাজেডির দৃষ্টান্ত।

—মেয়েটি মরে গেছে?

—না। ঘটেছিল কি জানেন; এই যে ক্রিশ্চান না হলে বিয়ে দেবে না, এ জেদ ছিল বাপের। মেয়েটি তা চায়নি। সে চেয়েছিল তিন আইনে বিয়ে হোক। ইনি ধর্ম মানতেন না, জাত মানতেন না। ইনি ক্রিশ্চান হলেন, নিজের থেকে। এবং গিয়ে বললেন—আমি ক্রিশ্চান হয়েছি। আর তো বাধা নেই।

মেয়ের বাপ বললেন—না।

কিন্তু মেয়ে সমস্ত শুনে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর

বললে—তুমি আমার জন্যে; আই মীন একটি মেয়ের জন্যে, তোমার ঈশ্বর, তোমার ধর্ম ত্যাগ করলে?

উনি খুব উৎসাহের সঙ্গে হেসেছিলেন—বলেছিলেন—আমার জীবন দিতে পারি তোমার জন্যে।

মেয়েটি বলেছিল—মাফ কর আমাকে। আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। তুমি আমার জন্যে এতকালের ঈশ্বরকে ত্যাগ করলে। কাল আমার থেকে কোনো সুন্দরী মেয়ে তোমার ভালো লাগলে আমাকে ত্যাগ করবে না কে বললে?

মেয়েটি ওকে বিয়ে করেনি। কোনো মতেই রাজী হয়নি, বাপ মায়ের অনুরোধও রাখেনি।

উনি চলে এলেন মর্মাহত হয়ে। সারারাত ভাবলেন। স্থির করলেন—ঈশ্বর এত বড়? এত প্রিয়? যার জন্যে সংসারের প্রিয়তম জনকেও উপেক্ষা করা যায়? তাহলে তিনি তাঁকেই খুঁজবেন। তাঁর সেবাতেই জীবন নিয়োগ করবেন। সেই থেকে উনি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। প্রথমে ছিলেন গারো পাহাড়ে। সেখানকার আদিবাসীদের সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সাধনা করেছেন। পাকিস্তান হবার পর এখানে এসেছেন।

বললাম—সেই মেয়েটি?

—তার খবর উনি আর করেন নি, রাখেনওনি।

আমার মনে হল—আমার অন্তর্লোকের সকল স্তর ভেদ করে এক অতি সাধারণ—অসাধারণ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। অট্টহাস্যের বদলে প্রসন্ন ধীর হাস্যে সুপ্রসন্ন, দুর্দান্তপনার পরিবর্তে পরম প্রশান্ত, উল্লাস চঞ্চলতার অধীরতার পরিবর্তে শান্ত ধীর।

মনে পড়ল বিখ্যাত উপন্যাস কুয়ো ভেডিস।

—Where goest Thou Lord!

—উত্তর হল—To Rome to be crucified again!

অল্প কয়েকটি কথা বলেছিলাম। উত্তরে কথা পেয়েছি অল্প। কিন্তু প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাস্যে যেন অমৃতধারায় স্নানপুণ্য অনুভব করেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম—ঈশ্বর পেয়েছেন?

শুনেছিলাম—পেয়েছি বইকি। নইলে এত আনন্দ পাই কোথা থেকে।

ফিরে এলাম। আমার মনের স্মৃতির ঘরে একটি অতি সাধারণ মানুষের

অসাধারণ জ্যোতির্ময় প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এলাম। ঐতিহাসিক বিরাট পুরুষদের ছবির সারি অনেক উঁচুতে টাঙানো। ঘাড় উঁচু করে দেখতে হয়। এঁর ছবি ঠিক তাঁদের নিচেই ঝুলছে। মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াই। আমার কাছে যিনি অবিস্মরণীয়—তিনি আমার লেখার মধ্যে দেখা না দিয়ে তো পারেন না। সপ্তপদীতে তিনি কৃষ্ণেন্দু হয়ে দেখা দিলেন।

* * *

বাকী থেকে গেছে নায়িকার কথা। নায়িকার নাম রিনা ব্রাউন। অবশ্যই কাল্পনিক নাম। এবং কৃষ্ণেন্দুর হারিয়ে-যাওয়া প্রেমিকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তাকে আমি দেখিনি। কথাও বিশেষ শুনিনি। রিনা তবু পুরো কাল্পনিক নাম। এ ক্ষেত্রে গল্প একটু সত্য—যা রূপকথার রাজ-কন্যার খসে-পড়া একগাছি সোনার বর্ণ চুলের এক অপরূপাকে মনে করিয়ে দেবার—যা আমি পেয়েছিলাম তাই বলি। আসল মানুষটি এবং কৃষ্ণেন্দু যেমন এক নয়, উপন্যাসের রিনা ব্রাউনও তেমনি সেই অসাধারণ মেয়েটি নয়—যে বলেছিল বা বলতে পেরেছিল. 'আমার মোহে তুমি যখন তোমার এতদিনের ধর্ম এতদিনের বিশ্বাসের ভগবানকে ত্যাগ করেছ তখন কে বললে আমার থেকে সুন্দরী কাউকে দেখলে তাকে পরিত্যাগ করবে না।' পূর্বেই বলেছি তাকে আমি দেখিনি তাকে আমি জানি না। যা ঘটেছিল তাতে সেই মেয়ের পক্ষে একমাত্র চিরকুমারী থাকাই উচিত। সত্য ক'রে এই মেয়ের কি হয়েছিল বা হয়েছে তা সেই পারানীও জানেন না। বাস্তবসত্য, গল্প উপন্যাসের কল্পনার বিচিত্র সত্য থেকেও অদ্ভুত। হয়তো অবিশ্বাস্য। লিখতে বসে রিনার চরিত্র নিয়ে বেশ ভাবনায় পড়েছিলাম। হঠাৎ একটি দেখা, মাত্র কয়েক বারে কয়েক ঝলক দেখা একটি ইংরেজ বা আমেরিকান বা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইংরিজীবাসিনী এক বিচিত্র বিদেশিনী মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। তার কয়েকটি কথা এবং ছবি মনের মধ্যে ভাসছে।

১৯৪৪ সালে পুরীর সমুদ্রতীরে তাকে প্রথম দেখেছিলাম। দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে—চোখের পাতাগুলি ঘন কালো এবং ফুলের কেশরের মতো দীর্ঘ। মাথার চুলে ঘনকৃষ্ণ শোভাই শুধু নয়—বিষুবরেখার অঞ্চলস্থ ঘাসের ঘন বর্ণাঢ্যতা এবং সমৃদ্ধিও তার রক্তের ইতিহাসের একটি সাক্ষ্য বহন করছিল। তার পরনে স্ল্যাক; গায়ে ফুলহাতা ব্লাউজ, মাথায় একখানা গাঢ় লাল রঙের রুমাল। উচ্চ হাস্য-প্রমত্ত কণ্ঠস্বরে অর্ধস্থির পদক্ষেপে ঝড়োজীবনের ইঙ্গিত আর

ইঙ্গিত ছিল না—স্পষ্ট পরিচয় হয়ে ব্যক্ত হয়েছিল। এক মুহূর্তে পুরীর সমুদ্রতটের সকল মানুষের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে সবিস্ময়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্ফারিত হত। সঙ্গে অবশ্যই অহরহ কেউ-না কেউ যুদ্ধের পোশাকপরা শ্বেতাঙ্গ থাকতই। একদিন পূর্ণিমার রাত্রে সমুদ্রতটে তাকে তীব্রকণ্ঠে বলতে শুনেছিলাম—বোধকরি তার সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল—সে বলেছিল—What do I care for God? I am no Christian. My father did not baptize me. He was ashamed of me. I hate you. Yes I hate you. Your heaven is not my heaven. My heaven is hell. My God is the God of hell.—বর্বর মাতাল সৈনিকটা তাকে মেরেছিল মুখের উপর। ইংজের আমল, যুদ্ধের কাল, বি-এন-আর হোটেলের এলাকা, কয়েকজন এদেশের লোকের সঙ্গে আমিও ছিলাম—কিন্তু কেউ কিছু বলেনি, বলতে সাহস করেনি এবং অনধিকার চর্চাও মনে হয়েছিল। পরদিন আবার তাকে দেখেছিলাম—মুখে তার কালসিটের দাগ; ঠোঁটটা ফুলে গেছে। সমান উৎসাহে প্রমত্ত প্রদক্ষেপে ঘুরছে। সর্বনাশের পথের যাত্রিনী।

এই মেয়েকে কলকাতাতেও চৌরঙ্গী অঞ্চলে দেখেছি। একদিন একা ময়দানে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি নিশ্চল প্রতিমার মতো; তখন অপরাহ্ণ বেলা। কি ভাবছিল কে জানে। তার স্বর্গের কথা? তার ঈশ্বরের কথা? তার জীবনের কথা?

তারপর তাকে দেখি শিলংয়ের পথে। বছর দেড়েক বাদে। এই সময়ের মধ্যেই তার জীবন দেহ অমিতাচারের ফলে দীর্ণ হয়েছে পোকা-ধরা লতার মতো।

এর চেয়ে ভাল বাস্তব উপমা মনে হচ্ছে না। এই কিছুদিন আগে বোধ করি মাস ছয়েক হবে একটি ভালো অপরাজিতার লতা এনে বাড়িতে পুতেছিলাম। প্রথম সে বাড়তে লাগল ঘন সবুজ বর্ণে, চওড়া পাতার পর পাতা মেলে; মোটা সারস ডাঁটার সর্পিল বিস্তারে। চোখ জুড়িয়ে যেত। হঠাৎ গাছটায় পোকা ধরল। পাতা ছোট হল—কুঁকড়ে যেতে লাগল, ডাঁটা শীর্ণ হল—শিরা-ওঠা হাতের মতো লম্বা রেখা জাগল তাতে, পাতা ডাঁটার বর্ণে এমন একটা কিছু মিশল যা দৃষ্টিকে পীড়িত করে। এই মেয়েটির অবস্থাও তখন ঠিক তেমনি। গৌহাটি থেকে এক বাসে যাচ্ছিলাম। তার সঙ্গে ছিল একটি তরুণ যার বয়স তার থেকেও অনেক ছোট, দুগ্ধপোষ্য না হোক

নিতান্তই কিশোর একটি, যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে, মেয়েটাই তাকে পাকড়েছে বা কিশোরটি যুদ্ধক্ষেত্রের আবহাওয়ায় তার কাঁচামাটির পেয়ালার মতো কাঁচা অপরিণত জীবন-পাত্রে এই মেয়েটার জীর্ণ যৌবনের ঝাঁঝালো মদ ঢেলে আকণ্ঠ পান করতে ছুটে এসেছে বলির বিল্বপত্রভোজী পশুর মতো। মেয়েটার হাত কাঁপছে অর্থাৎ সুরা কম্পন শুরু হয়েছে। চোখ দুটো অহরহ ঢলঢল করছে। বিড়বিড় করে বকছে। বমি করতে শুরু করলে বাসে। গৌহাটির বাঙালীরা আমাকে প্রচুর কমলালেবু দিয়েছিলেন। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকাচ্ছিল কমলাগুলির দিকে। আমি তাকে কয়েকটি লেবু দিয়েছিলাম। সে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কত দাম? আমি হেসে বলেছিলাম—তোমাকে দিলাম, তুমি অসুস্থ, খাও। আমি তো লেবু বিক্রি করি না।

মেয়েটিকে একদিন ফুটপাতে পড়ে থাকতেও দেখেছি; একটা জীপ এসে তুলে নিয়ে গেল।

মেয়েটির ওই কয়েকটি কথা মনে হল সপ্তপদীর নায়কের আমূল পরিবর্তনের কথা মনে ক'রে। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না—সে বেরুল ঈশ্বর খুঁজতে, ঈশ্বর কি জানতে! রিনাই তো আঘাতের মধ্যে দিলে তার ঈশ্বরকে। পেলে কি? বৃহত্তর ঈশ্বর-বিশ্বাস, দৃঢ়তর বোধ পাওয়াই সম্ভব।

কিন্তু হারিয়ে রিক্ত হওয়াও তো অসম্ভব নয়।

ঈশ্বরের জন্য প্রিয়তম মানুষকে বর্জন করে। রিক্ততাই সাধারণভাবে মানবিক। পূর্ণতা অসাধারণ। অস্বাভাবিক না হলেও দুর্লভ। তাই মেয়েটির ওই সমুদ্রতীরের কথা মনে ক'রে এবং শ্বেতাঙ্গ জাতির দুর্ধর্ষ বেপরোয়া দুঃসাহসের পথের দুর্মদেরা যেভাবে পৃথিবীময় নিজেদের দেহের প্রয়োজন মিটিয়ে সন্তান উৎপাদন ক'রে তাদের ফেলে চলে এসেছে এবং বর্ণসঙ্কর সমাজ বলে নিজের সন্তানদেরই ঘৃণা করে এসেছে সে-কথা মনে ক'রে ওই মেয়েটিকেই তার ওই কয়েকটা কথার মধ্যে ইতিহাসকে আশ্রয় করে রিনারূপে অঙ্কিত করেছি। জানি যে, মেয়েটার রক্তের মধ্যেই হয়তো পাপ-পুণ্য না-মানার ঈশ্বর না-মানার বীজ ছিল, হয়তো জন্মস্বৈরিণী, কিন্তু আমি তার কয়েকটা প্রদত্ত কথার মধ্যে একটা ব্যথা-বেদনার আভাস পেয়েছিলাম। কেবলমাত্র ওইটুকুর জন্যেই সে আমার মনে স্মরণীও হয়ে আছে, তাই ওইভাবেই সমবেদনার তর্পণের জল তাকে অর্পণ করে তাকে এঁকেছি আর বলেছি—আমি লেখক, তুমি আমার কাছে এই তর্পণের তর্পণীয়া। তুমি

আমার অনাত্মীয় অবান্ধব, হয়তো বা অপঘাতই তোমার নিয়তি ; তোমাকে তবু দিতে হবে আমার শ্রদ্ধার নির্মল জল। আমার শ্রদ্ধাতেই সে ফিরেছে। কুম্ভকোণমের কৃষ্ণস্বামীও যে আমার শ্রদ্ধায় মহিমান্বিত।

তরণীসেন

আমার ছেলেবেলাটা বড় একা একা কেটেছে! তিন চার বছর যখন বয়স, সে এখন থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, তখনকার পল্লীগ্রামের রেওয়াজ এখন থেকে অনেক আলাদা ছিল। সে সময় যাঁদের অবস্থা একটু ভাল ছিল তাঁরা ছেলেদের অত্যন্ত সাবধানে রাখতেন। ছেলেকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সঙ্গী সাথী জুটিয়ে খেলা করতে দিতেন না। আমাদের বাড়ীতে তখন আমিই একটি মাত্র ছেলে, তাও মায়ের প্রথম ছেলেটি হয়ে মারা যাওয়ার পর হয়েছি। গলায় এক বোঝা মাদুলী, মাথায় ঠাকুরের কাছে মানতের চুল ; সুতরাং আমার উপর বাড়ীশুদ্ধ লোকের কড়া নজর। বাড়ীর ভেতর আর বৈঠকখানার সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। এর মধ্যেই ঘুরতে ফিরতে হ'ত। সন্ধ্যেবেলা দেখতে যেতাম ঠাকুর বাড়ীতে ঠাকুরের আরতি। এই সময় অনেক ছেলেদের দেখা মিলত। আরতির পর ভোগ হত ; কাটা ফল, কাঁচা মিষ্টি, ছোলা ভিজে, গুড় আর লুচি ; সেই প্রসাদ বিতরণ করতেন পুরুত মশাই। তার জন্য এসে বসে থাকত ছেলেরা। তাদের সঙ্গে আলাপ হ'ত। হ্যাঁ, সন্ধ্যার আগেই একটা পীড়াদায়ক ব্যাপার ছিল, সন্ধ্যার আগে মাথার ওই মানতের লম্বা চুলগুলি নিয়ে বেড়া-বিনুনী বাঁধতে বসতে হ'ত। চুপ ক'রে নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু হয়ে বসে থাকলে ঘুম আসত, ঘুম না এলে আমি ক্রমাগত মাথা নিয়ে টানাটানি করতাম টাগ-অব ওয়ারের মত। তাতে আমারই চুলের ডগায় ব্যথা হতো। আমি চীৎকার করতাম। এর ওষুদ জানতেন একমাত্র আমার মা, তিনি খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন। অনেক বই তাঁর পড়া ছিল। তিনি আরম্ভ করতেন, 'এক ছিলেন "ঘেসেড়া নন্দন"। মানে ঘেসেড়ার ছেলে। ছোট্টো কচি বাচ্চা।' বাস্, আমার আর ঘুমও আসত না কিম্বা নড়তে চড়তেও ইচ্ছে হ'ত না!

চুল বেঁধে ঠাকুর-বাড়ীতে যেতাম ; ছেলেরা সব ঠাট্টা করত। তাদের

ঠাট্টাগুলো এখনও আমার ঠিকঠাক মনে আছে। তারা প্রথমটা আমাকে কিছু বলত না, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত।

—এই ভাই, মেয়েছেলের মত চুল বেঁধেছে, দেখ!

ওদের দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে ছিল, শুকনো পাকাটে চেহারা, বেঁকা-বেঁকা পা—সে বলত, জানিস নে বুঝি, ও তো মেয়ে-ছেলেই। ও বউমানুষের মত বাড়ীতেই থাকে, কুটনো কোটে, বাঁটনা বাটে, জল তোলে, ফুল তোলে। বলেই সে ছড়া কাটত, 'জল আনতে যায়রে, তাবিজ নাড়া দেয়রে।' তারপর বলত, ওর নাম কি জানিস? তারাশঙ্কর নয়—তারাশঙ্করী।

মনে মনে অত্যন্ত রাগ হ'ত। কিন্তু কিছু বলবার উপায় ছিল না। রাগ কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পেত না; ঠাকুরবাড়ী থেকে ফিরেই মা রামায়ণ বা মহাভারত নিয়ে বসতেন। শুনতে শুনতে সব ভুলে যেতাম। মহাভারতের চেয়ে রামায়ণই আমার বেশী ভাল লাগত। রামায়ণের কাহিনী খুব অল্প বয়সেই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। একখানি রামায়ণ ছিল আমাদের, রামায়ণখানি বর্ধমানের মহারাজা অনুবাদ করিয়ে ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, গদ্যে লেখা, তাতে অনেক ছবি ছিল। কাঠের ব্লক করে কাল কালীতে ছাপা ছবি। তার ছবিগুলি আমার খুব ভাল লাগত। সবচেয়ে ভাল লাগত "বিরাধ ক্রোড়ে সীতা।" বিরাধ রাক্ষস কালো প্রকাণ্ড চেহারা—ভয়ঙ্কর মুখ, তার বগলে সাদা ধপধপে মোমের পুতুলের মত সীতা। লক্ষ্মণ ধনুকে তীর জুড়ে তাকে মারছেন! শুনে শুনে এবং ওই ছবিগুলো দেখে বিরাধ রাক্ষস থেকে খর দূষণ কালনেমি—এদের কাহিনী আমি শিখে ফেলেছিলাম পাঁচবছর বয়সের মধ্যেই। মহাভারতেরও অনেক গল্প শিখেছিলাম।

ও কথা এখন থাক। এখন চুলের কথা বলি। শুধু ছেলেরাই নয় বাবার কাছে যারা অপরিচিত লোক আসতেন—তাঁরাও অনেকে আমাকে খুকী বলে ভ্রম করতেন। একবার একজন বেহারী ভদ্রলোক এসে আমাকে ডাকলেন খোকী, এ খোকী!

আমি বললাম—না, আমি খোকী না।

তিনি আমার বিনুনী ধরে নাড়া দিয়ে বললেন—খোকী তুমি শ্বশুর বাড়ী যাবি না?

সে দিন আমার খুব রাগ হয়ে গেল। কোন রকমে একখানা কাঁচি সংগ্রহ করে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসলাম। কিন্তু মা বাবাকে স্মরণ ক'রে চুল কাটতে

সাহস হ'ল না, কেটে ফেললাম ভুরুগুলি। এর ফলে বাড়ীতে কিছু তিরস্কার ভোগ করতে হল বোধ করি এ কথা বলতে হবে না। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীতে ছেলেদের মহলে আমার যে অবস্থা হ'ল সে কথা বলেও আমি বোঝাতে পারব না। তারা কথায় কিছু বললে না, কেবল আঙুল দেখিয়ে হাসতে লাগল। আমার মনে হল হয় ওদের আমি খুন করে ফেলি—নয় ওরাই আমাকে খুন করে ফেলুক। দুটোর একটা না করলে হবে না। আমি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, যুদ্ধ করব আমি তোমাদের সঙ্গে।

—যুদ্ধ?

—হ্যাঁ। যুদ্ধ। কাল দুপুরবেলা, এইখানে।

—আয় না, আজই।—সিঁটকে পা-বেঁকা ছেলেটা বলে উঠল।

—ও রকম না। যুদ্ধ। কাল দুপুরবেলা এস। ধর্মযুদ্ধ।

ওরা একটু ভড়কে গেল। স্থান কাল নির্দিষ্ট করে ধর্মযুদ্ধটা ঠিক ওরা ঠাওর করতে পারলে না। যাই হোক পরের দিন একখানা বাখারিকে তরোয়াল করে নিয়ে এসে দাঁড়ালাম। —এস। কিন্তু তরোয়াল কই তোমাদের?

ওরা অবশ্য ওধার দিয়ে গেল না। জন কয়েক মিলে এসে জাপটে ধরে বাখারিখানা কেড়ে নিয়ে আমায় মাটিতে ফেলে প্রায় অভিমন্যু বধ করে দিয়ে চলে গেল। সময়টা ঠিক পুজোর আগে। আকাশে সেদিন খুব মেঘ ছিল; ওরা চলে যাওয়ার পরই নামল বৃষ্টি। মনের দুঃখে খুব ভিজলাম। এই ভেজার ফলে কি না জানি না, আমার জ্বর হল, ভুগলাম আটাশ দিন। ডাক্তার ছাড়াও আমার বাবা শরণাপন্ন হয়েছিলেন বৈদ্যনাথের, যিনি নাকি আমাকে দয়া করে পাঠিয়েছেন এবং যিনি আমার ওই মাথার ক্ষেতের ফসলগুলির মালিক। বাবা তাঁর পাণ্ডার কাছে টাকা পাঠিয়ে বিল্বপত্রে পূজা করবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং লিখেছিলেন দেবতার দেওয়া ছেলের এমন অসুখ হয় কেন? উত্তরে পাণ্ডা লিখলেন, বাবা বলেছেন আমার দেওয়া ছেলেকে আমার কাছে আজও আনা হল না কেন? এখানে থাকলেই আমি এমন হাত বুলিয়ে দেব যে সব রোগ ভাল হয়ে যাবে।

তোড়জোড় পড়ে গেল। বৈদ্যনাথ ধাম। সত্যি কথা বলতে কি বাবা বৈদ্যনাথকে আমি আজও মানি। খুব ভক্তি হয়েছিল সে সময়, তার জের এখনও আছে। বৈদ্যনাথে গিয়েই আমি বিনুনীর লজ্জা থেকে মুক্তি পেলাম। চুলগুলি কামিয়ে দেওয়া হ'ল। শরীরও বেশ সেরে গেল। বাড়ী ফিরলাম

স্বগৌরবে নেড়া মাথা উঁচু করে। সঙ্গে নিয়ে এলাম একরাশ মুড়ি পাথর। দেওঘরে ওগুলি সংগ্রহ করেছিলাম;

সকলে প্রশ্ন করেছিলেন, ওগুলোয় হবে কি?

আমি উত্তর দিতে পারিনি, কিন্তু ওগুলো ফেলে আসতে কোনক্রমেই রাজি হইনি। বাড়ী ফিরে অবশ্য ওগুলিকে নিয়ে একটা খেলা আবিষ্কার করে ফেললাম। লঙ্কার যুদ্ধ-খেলা আবিষ্কার করলাম। একটি নীলচে লম্বাটে মুড়ি হ'ল রাম, ধবধবে সাদা ওই আকারের একটি মুড়ি হল লক্ষ্মণ; সবচেয়ে সুন্দর পাথরটি হল সীতা; হনুমান ইত্যাদি বাছতেও দেরী হল না। গণ্ডগোল হল রাবণ এবং কুম্ভকর্ণকে নিয়ে। অবশেষে একদা রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ সংগ্রহ করে আনলাম। আমাদের দেশ বীরভূমে, মুড়ি পাথর এবং লাল কাঁকর মাটির রাজত্ব। সেখানে খুব বড় বড় এক ধারার পাথর পাওয়া যায়। তাকে বলে অসুরের কাড়ি বা হাড়। তাই দুটো এনে রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ সাজালাম। পাতলা বাখারীর ছোট ছোট ধনুক এবং তীর তৈরী করে রামায়ণের খেলা সুরু করে দিলাম। এই সময়ে একজন বন্ধু আমার জুটল। আমাদের গ্রামের সবচেয়ে বড়লোক যাঁরা তাঁদের বাড়ীর ভাগ্নে। এদেরও অনেক টাকা। কোলিয়ারী আছে। কখনও কোলিয়ারীতে থাকে, কখনও এখানে আসে। এবার তারা এখানে নতুন বাড়ী করে স্থায়ীভাবে থাকতে লাগল। তাদের বাড়ীর বড়ছেলে। ছেলেটি ঠিক আমার বয়সী। ছেলেটির মাও ঠিক আমার মায়ের বয়সী। তাঁদের দুজনের মধ্যে ভাবও খুব বেশী। কাজেই ছেলেটির সঙ্গেও আমার খুব জমে গেল। আমার রামায়ণের খেলায় সেও মাতল। রামের সৈন্য, রাবণের সৈন্য সামনাসামনি সারি দিয়ে সাজানো, আমরা দুজনে দুপক্ষে বসতাম। আমরাই তীর ছুড়তাম। ঠিক রামায়ণের কাহিনীকে অনুসরণ করে যুদ্ধ চলত। সে একদিন রামের পক্ষে বসত, পরের দিন রামের পক্ষে বসতাম আমি।

এই খেলা অনেকদিন চলেছিল। তারপর এল আরও অনেক খেলা। এরই মধ্যে একদিন এই বন্ধুটির সঙ্গে ঝগড়া হল আমার। বন্ধুটি সেই পা-বেঁকা সিঁটকে ছেলেটার দলের সঙ্গে মিতালী করে এবার আমাকেই যুদ্ধে আহ্বান করলে। বাখারীর তরোয়াল-লাঠি নিয়ে দল বেঁধে তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হল। প্রায় গ্রামের ছেলেকেই জুটিয়ে ফেললে তারা। অনেক কষ্টে আমি সংগ্রহ করলাম কয়েকজনকে। অস্ত্র করলাম তীর-ধনুক। বাঁটুল

ছুঁড়তে আমি ভালই পারতাম। ধনুক-ও একটা ছিল। কিন্তু মাটির গুলিগুলো আকস্মিক বৃষ্টিতে যুদ্ধের আগেরদিন রাত্রে গলে কাদা হয়ে গেল। ভাবছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল বানর ও রাক্ষস বাহিনীকে। অর্থাৎ নুড়ি পাথরগুলির কথা। বড় বড় যোদ্ধারা কোন কাজে লাগল না। ছোট ছোট পদাতিকদের সংগ্রহ করলাম। ছোট্ট একটি সুন্দর পাথর ছিল, সেটি হ'ত 'তরণীসেন'। তাকেও নিলাম।

এবার যুদ্ধে কিন্তু আমার দল সংখ্যায় অল্প হলেও জিতল। তীর এবং বাঁটুলের সম্মুখে ওরা লাঠি এবং বাখারীর তরোয়াল নিয়ে এগুতে পারলে না। এবং ওরই মধ্যে ওদের রাজা আমার বন্ধু এবং প্রধান সেনাপতি (পা-বেঁকা সিঁটকে ছেলেটি) দস্তুর মত ঘায়েল হয়ে গেল। আমার বন্ধুর সামনের দুটি দাঁত ছিল বড় বড়। আমার একটা নুড়ি বাঁটুল গিয়ে লাগল তার একটা দাঁতে। রক্তপাত হল না অথচ আধখানা দাঁত উড়ে গেল। আমারই আর একটা বাঁটুল গিয়ে লাগল পা-বেঁকার ঠিক হাঁটুতে। জোরে লাগল। সে জখম হয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল। এদিকে তখনও বাঁটুল তীর ছুটছে। ওদের সৈন্যরা ছুটে পালাল।

বন্ধুর আধভাঙা দাঁত আজও পড়েনি, আছে। পা-বেঁকার খবর জানি না। সে কোথায় চাকরী করে।

আমার কিন্তু আজও মনে পড়ে 'তরুণীসেন' নুড়িটিকে। চমৎকার ছিল নুড়িটি। ওই দুটি মোক্ষম বাঁটুলের মধ্যে একটি ছিল ওই 'তরুণীসেন।'

রঙমশাল। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

কি চেয়েছি—কি পেয়েছি

"তোমার অপূর্ণ বাসনা কি এবং কোনগুলি? তুমি কি পেলে আর কি পেলে না?"

এ প্রশ্ন চিরন্তন প্রশ্ন। এর উত্তরও চিরন্তন। সেই আদিকাল থেকে এক উত্তর।

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম।
ফিরে মরীচিকা সম।

বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে বক্ষে
ফিরিয়া পাই না
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

শুধু তো তাই নয় আরও আছে—

যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই
আপনার মন ভুলাতে
শেষে দেখি হায় ভেঙে সব যায়
ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে।

এর থেকে বড় সত্য আর নাই। এ সংসারে কোন মানুষ এমন আছেন বা ছিলেন যিনি বলে গেছেন বা বলবেন—"আমি সব পেয়েছি, আর কোন অতৃপ্তিই নেই; আমার সকল বাসনা পূর্ণ হয়েছে।" কোন্ কামনা পূর্ণ হয়নি এ প্রশ্ন করলে তার উত্তরও সেই চিরন্তন এক উত্তর; সে উত্তর হল—জানি না।

আমাদের কল্পনার সব পেয়েছির এক কল্পলোক আছে যে লোকের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হলে, সেই লোকে পৌঁছুলেই সব পাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু বিচিত্র কথা এই যে, সে সিংহদ্বার খোলে না; আজও খোলে নি। আমরা মানবযাত্রীর মিছিল অনন্তকাল ধ'রে দুর্গমতম পথ, দুস্তর নদী-সমুদ্র অতিক্রম করে সেই তোরণ-দুয়ারের সম্মুখে এসে পৌঁছে করাঘাত করবার চেষ্টা করছি; বলছি—দ্বার খোলো! দ্বার খোলো! কিন্তু দুয়ার খোলে না!

আজ জীবনের পশ্চিম দিগন্তের সমীপবর্তী হয়ে আমার মন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—বলতো কি-চেয়েছিলে আর কি পেলে?

আমি সেই উত্তর দিই—জানি না!

অনেক বন্ধু প্রশ্ন করেন—বলতো কোন্ আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রইল?

আমি জীবনে নাকি পেয়েছি অনেক। তা অবশ্য অস্বীকার করতে পারব না। হ্যাঁ, পেয়েছি অনেক। অন্ততঃ এই দেশের পক্ষে। যা পেয়েছি তার হিসেব দিতে হবে না—তা সকলে জানেন। কিন্তু কি পাইনি? অর্থাৎ কামনা করেও পাইনি? এর হিসেব সহজ নয়।

মনের ঘরের অন্ধকার কোণগুলো হাতড়ে হাতড়ে বেড়াতে হবে। কোথায় কোন্ অন্ধকার কোণে কোন্ অপূর্ণ অবজ্ঞাত বাসনা বিষণ্ণ শুকনো মুখ নিয়ে বসে আছে তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতে হবে—তুমি কে গো?

থাক। স্পষ্ট কথায় বাস্তব হিসাব-নিকাশে আসি। কতক লোক বলেন—আশাতীতভাবে সফল আমার জীবন। দু'দশ জন বলেন—সফল থেকে সাফল্যমণ্ডিত বলা ভাল। সফল এবং সাফল্যমণ্ডিত শব্দ দুটির অর্থের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। সফল শব্দের অর্থ করলাম না, করবার কোন প্রয়োজন নেই। সাফল্যমণ্ডিত শব্দটি যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা বোধ হয় বলতে চান সোনার জলের মত একটা রাসায়নিক পদার্থকে বাইরে থেকে চাপানো হয়েছে।

তা করুন, যার যা অভিপ্রায়। আমার জীবনে আমি এইটুকু বলতে পারি আমি কখনও সত্যের অপলাপ বা অমর্যাদা ঘটিয়ে একটা অঙ্ক-কষা বা ছ'কে নেওয়া চেষ্টার দ্বারা কোন সাফল্যকে অর্জন করতে চাইনি বা করিনি। এই সত্যের প্রতি সম্ভ্রম বা আনুগত্য বারবার আমাকে মিথ্যা অপপ্রচারের কলঙ্ক থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু ও কথা থাক।

আমার জীবন যে সাফল্য অর্জন করেছে বা একটি বৃক্ষের মত সহজ ও স্বাভাবিক শক্তিতে ফলবান হয়ে উঠেছে এবং যে জলসিঞ্চন বা সম্ভ্রম-সম্মান পেয়েছে এর জন্য সক্রিয় চেষ্টা বা 'চেষ্টাচরিত্র'সম্মত কোন কল্পনা আমার ছিল না। সকলেই জানেন ও স্বীকার করবেন—আকাঙ্ক্ষা প্রথম থাকে বীজের মত, তারপর তার থেকে বের হয় অঙ্কুর, তারপর মেলে পাতা, তারপর সে বাড়ে ; যত বাড়ে তত আকাশের নীলকে স্পর্শ করবার জন্য সে উদ্বাহু হয়ে ওঠে। কবি কালিদাস বলেছিলেন—

মন্দঃ কবিযশপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং
প্রাংশুলভ্য ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ।

আমার সাহিত্যিক জীবনে প্রথম সম্মান—শরৎ পুরস্কার ও শরৎচন্দ্র স্বর্ণপদক। এই পদক ও পুরস্কারের প্রথম প্রাপক আমি। সেদিনের কথা মনে আছে। একান্ত নিস্পৃহভাবেই কিছু করছিলাম, রাত্রি তখন ৭টা। আমাকে একজন খবর দিয়ে গেলেন "পুরস্কার এবং পদক সর্বসম্মতিক্রমে আপনাকে দেওয়া হয়েছে।" আকাদেমী পুরস্কার পাই পুরস্কার প্রবর্তনের দ্বিতীয় বৎসর। প্রথম বৎসর এ পুরস্কার পেয়েছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর তখন জীবনান্ত ঘটেছে আকস্মিক দুর্ঘটনায়। দ্বিতীয় বছর যখন সংবাদ পেলাম সংবাদটি আমার কাছে আকস্মিক মনে হয়েছিল। তার সাক্ষী দু'জন আছেন। 'দেশ' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক শ্রীমান সাগরময় এবং আমার অনুজপ্রতীম শ্রীকানাইলাল সরকার। তাঁরা তখন আমার সামনে বসে। আমার বড় মেয়ে রেডিয়োর খবর শুনে আমাকে কথাটা বলে গেল। তবে হ্যাঁ, রবীন্দ্র পুরস্কার আমি পেয়েছি প্রবর্তনের অনেক পরে। এবং এই পুরস্কারটির জন্য আমার মনে ক্ষোভ ছিল। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। এমনিভাবে অন্য যা কিছু পেয়েছি তা সবই যেন যিনি দেবার তিনি এগিয়ে এসে হাতে তুলে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে প্রথম থেকেই কামনা আমার ছিল না, কিন্তু জীবনে

সাহিত্যিক হিসেবে যেমন যেমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছি তেমনি তেমনি কামনা আমার মনের মধ্যে শাখা মেলেছে। তবুও আজ যখন হিসেব করতে বসেছি তখন দেখছি—আকাঙ্ক্ষা বা কামনা-বাসনা বিস্ময়কর সফলতায় পূর্ণ হয়েছে একথা যেমন সত্য তেমনই বিচিত্রভাবে শৈশব-বাল্য-কৈশোরের অনেক আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ ব্যর্থ হয়ে জীবনের ফেলে আসা পথে বা খেলাঘরে অনাদৃত খেলনার মত ধুলার তলায় ঢাকা পড়ে আছে।

সামান্য কিছু আয়ের জমিদারের ঘরে জন্ম আমার। জমিদারীর আয় থেকে কিন্তু আমার বাবার জমিদার-জীবনটা বড় ছিল। কোঁচানো কাপড় পরতেন, গান বাজনার শখ ছিল, জীবনে প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর জীবনে আক্ষেপ ছিল—তাঁর বাবা উকীল ছিলেন, তিনি উকীল হন নি বা হতে পারেন নি। তাঁর সেই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তিনি আমার জীবনে সঞ্চারিত করেছিলেন। তখন কতই বা বয়স আমার; পাঁচ-ছয়ের বেশী নয়। আমাকে বলতেন—তুমি উকীল হবে। মস্ত বড় উকীল। কাশ্মীরী শাল দিয়ে তৈরী উকীলের 'শামলা' (সেকালের উকীলের টুপি) রেখে গেছেন আমার বাবা, আমি তা যত্ন করে রেখে দিয়েছি, সেই শামলা মাথায় দিয়ে কোর্টে যাবে। তোমার বয়স শুনে লোকে বলবে—হবে না, ওর ঠাকুরদা যে মস্ত উকীল ছিলেন!

একথা বাবার মৃত্যুর পর (আমার ৮ বছর বয়সে আমার বাবার মৃত্যু হয়) পিসীমা আমাকে নিরন্তর মনে পড়িয়ে দিয়েছেন। মাও বলেছেন। বাবার মৃত্যুর পর আমার বাবার মামা (আমার সম্পর্কে পিতামহ হতেন) এসে অভিভাবক হয়েছিলেন আমাদের; তিনিও বলতেন। এবং তিনি আরও বলতেন—আমার পিতামহের ওকালতির সাফল্যের গল্প। বলতেন-- একবার একজন জজসাহেবের একটা সত্ত্বের মকর্দমায় আমার পিতামহের মক্কেলকে হারিয়ে দিয়ে ডিক্রী দিয়েছিলেন। আমার পিতামহ নিজে পয়সা খরচ করে হাইকোর্টে আপীল করে সেই মকর্দমা জিতে আসেন। এবং সেই উপলক্ষে উৎসব করেছিলেন, তাতে ঢাকের বাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। দেবস্থলে পূজা দেবার অজুহাতে কোর্টের সামনে দিয়েই ঢাকীরা ঢাক বাজিয়েছিল।

মধ্যে মধ্যে আজও কল্পনা করতে ইচ্ছা হয় যে—এই সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, এর আগে অন্তত বি. এল. পাশ করে উকীল হয়ে যদি তারপর পেতাম!

নিতান্তই তুচ্ছ হয়তো, অনেকে এর জন্য বিদ্রূপও করতে পারেন, তা করুন। মনে হয়!

শৈশবে আরও দুটো সাধ ছিল। তার একটা সবারই থাকে। তার একটা পত্নী কামনা। সপ্তশতী চণ্ডীতে পর্যন্ত অর্গলা স্তোত্রে আছে---আমাকে যেন মনোরমা ভার্যা দিয়ো, শুধু মনোরমা হলেই চলবে না, মনোবৃত্ত্যানুসারিণী

হওয়া চাই। এখানেও স্বীকার করব যে, এ নিয়ে জীবনে আর সংগ্রামের শেষ নেই। পত্নী আমার মাথায় খাটো, ছোট মানুষটি, রূপে মনোরমা নন একথা বলব না। আমার যা রূপ, অর্থাৎ আমি কালো কৃশকায় মানুষটি আয়নায় নিজেকে যতখানি মনোরম মনে করি তিনি তার তুলনায় অনেক বেশী মনোরমা। তবে তাঁর থেকে মনোরমা এ সংসারে অনেক অনেক অনেক। তা নিয়ে আক্ষেপ কখনও হয়নি এমন বলব না, আবার এও বলব না—তার দুঃখেই আমি পাট পাট হয়ে আছি। তবে দেহের ওজনে হাল্কা ; ছোট্ট কৃশাঙ্গী মেয়েটি মনের ওজনে অত্যন্ত ভারী, অত্যন্ত শক্ত। তার উপর তাঁর উপর তাঁর পিতৃকুলের মনোবৃত্তি এবং মনের গড়ন আমার মনের গড়ন ও মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ার জন্য যে সংঘর্ষ হয়েছে তার পরিচয় আমার রচনাকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে। তবে এর শেষ হয়েছে, কারণ সমাপ্তিতে তিনি জিতেছেন। আশ্চর্যভাবে ধর্মজীবনে এসে সকল অন্যায়, সকল ক্ষুদ্রতাকে অনায়াসে অতিক্রম করেছেন এবং নদের সঙ্গে নদীর মত, আলোর সঙ্গে আলোর মত সুপ্রসন্ন মিলনে মিলে গেছেন। তবুও বিচিত্র কথা এই যে, সামান্য কলহে বা মতভেদে বিমর্ষ হয়ে কল্পনা করতে বসি,—কখনও গৃহত্যাগের কল্পনা, কখনও বা অতীত সারা জীবনটাকে একেবারে উল্টেপাল্টে, নূতনভাবে বিচার করি। বার্ধক্যেও তরুণ বয়সের মত অভিমান করে বসি। তবুও মনে হয় মনের সাতমহলার কোন কোন গোপন মহলে কোন এক মেয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে, যাকে পেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি, পাওয়া হয়নি।

আরও দুটো বাসনা-আকাঙ্ক্ষা, দশ বারো বছর বয়সে আমার মনের মধ্যে বাইরে থেকে বীজের মত এসে পড়েছিল এবং অঙ্কুরও মেলেছিল। একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল—বড় খেলোয়াড় হবার আকাঙ্ক্ষা। ছেলেবেলা ফুটবলে গ্রামের দলের কৃতী খেলোয়াড় বলত লোকে। ১৯১১ সালে মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা শীল্ড জিতে নিজেদের ছবি পাঠিয়েছিলেন স্কুলে স্কুলে। তখন ক্লাস এইটে পড়ি। ইচ্ছে হয়েছিল আমার ছবিটি যদি ওদের সঙ্গে থাকত! সে ইচ্ছেটি এখনও পর্যন্ত কোন কোন বিচিত্র ক্ষণে উঁকি মারে।

আর আছে দুটি বাসনা।

অপূর্ণই রয়ে গেল। আজ স্ত্রী পুত্রের কাছে মাঝে মাঝে বলি—এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেল, হয়তো এর জন্যে আবার আমাকে জন্মান্তর গ্রহণ করতে হবে। সে আকাঙ্ক্ষা সুকণ্ঠ গায়ক হবার আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা এককালের মনোবৃত্ত্যানুসারিণী মনোরমা পত্নী কামনার তুল্য দুর্নিবার কামনা। আমি যদি সুকণ্ঠ গায়ক হতে পারতাম! আমার সবকিছু বিনিময় করতে প্রস্তুত ছিলাম এর জন্য। বিশ্বজগতের মুহূর্তে চিত্তজয়ের জন্য এর থেকে বড় সম্পদ বা বড় সম্মোহন অস্ত্র আর তো নেই!

মিয়া তানসেনের বিচিত্র কাহিনী শুনেছি, পড়েছি।

তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর কথা শুনেছি। তিনি ভগবানের দরবারে বনের মধ্যে গান করতেন, বনের পশুপক্ষীরা হিংসা ভুলে স্তব্ধ হয়ে শুনত। হরিণের পাশে চিতা, অজগরের পাশে খরগোস, গাছের শাখায় বাজের পাশে শ্বেত পারাবত পাশাপাশি বসে শুনতো সে গান।

বিশ্ববিধাতা সে গান শুনে বিগলিত হতেন; যেমন বিগলিত হয়েছিলেন নারায়ণ নারদের গান শুনে।

সে আনন্দধারা গঙ্গাস্রোতের মত মানুষের সমাজে শাপগ্রস্তদের মুক্ত করত।

কিন্তু কণ্ঠসম্পদ আমার নেই। জীবনে হারমোনিয়াম কিনেছি, এস্রাজ নিয়ে চেষ্টা করেছি। বেহালার সুরের টানে আমার সারা শরীরে কেমন একটা অনুভূতির সাড়া বয়ে যায়। কিন্তু সে হয়নি, আত্মনিয়োগের অবসর মেলেনি। আজও ভাবি সব ছেড়ে দিয়ে শেষ বয়সে বেহালা শিখি এবং জীবনে যে পূজার্চনার পাট আমার আছে তার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে বেহালার সুরেই মনের কথা নিবেদন করি। তা হল না। আরও আছে। জীবনের শেষ প্রহরে হঠাৎ রোগশয্যায় শুয়ে একদা রঙ তুলি নিয়ে ছবি আঁকা খেলা খেলতে শুরু করেছিলাম। পেরেওছিলাম। ইচ্ছে ছিল সত্যকারের ছবি আঁকব। কিন্তু তা ত হল না। চোখ গেল। তাছাড়া—

"যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে
অবসর কভু মিলিল না।"

আরও আছে। আকাঙ্ক্ষা আছে সজ্ঞান মৃত্যুর। মৃত্যুর সময় যেন বলে যেতে পারি মৃত্যু কেমন? তার রূপ, তার স্পর্শ, তার গন্ধ, তার স্বাদ, লোক-আগোচর কোন কণ্ঠস্বর যদি তার থাকে এবং যা জানতে পারি যা বুঝতে পারি তাই যেন বলে যেতে পারি। বলে যেতে পারি—মৃত্যু, যা অনিবার্য তার স্বরূপ এই।

এটি আমার আকাঙ্ক্ষা; অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নয়; পূর্ণ হবার সময় আজও আসেনি। সে আসবে। সেই পথের দিকে তাকিয়ে দেখি নির্জন অবসরে। সে কতদূরে? বলতে পারি না সে আকাঙ্ক্ষা আমার পূর্ণ হবে কিনা!

এ সমস্ত তো ভাগ করে এক একটি করে খতিয়ে হিসেব করে দেখা। না হলে সমস্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা দেনা-পাওনা একত্রিত করে দেখতে গিয়ে দেখছি—সাহিত্যেই সব কথা বলা হয়নি; যা বলতে চেয়েছিলাম তা বলা হয়নি। বলতে পারিনি। আরও যেন অনেক কিছু বলার ছিল।